রুনু গুহ নিয়োগী
সাদা আমি
কালো আমি
তৃতীয় খন্ড

মৃত্যুর ফাঁদ কেটে বারবার বেরিয়ে এল যে পুলিশ অফিসার, তাকে বিতর্কের ফাঁদও ছিঁড়তে হল একাধিকবার। পালিয়ে গিয়ে নয়, কর্ম দিয়ে। কর্মের সাধনায় মত্ত সে পুরোপুরি স্বতন্ত্র। তাই তারই ডাক আসে সন্ত্রাসবাদ দমনের, আরবান গেরিলাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার। বোমার অবিশ্রান্ত ধারার মাঝখান থেকে পুরনো কলকাতার হৃদয়কে ফিরিয়ে আনার। বর্ষার থিকথিকে অন্ধকার ভেদ করে কসবার জলা থেকে খুনীকে গ্রেফতার করার। আবার তারই কাঁধে চেপে বসে ফেরারি প্রতারককে খুঁজে বার করার দায়িত্ব, ব্যাঙ্ক কিংবা হাইওয়ে ডাকাত ধরে শাস্তি দেওয়ার চ্যালেঞ্জ। পারবে কি?

রুণু গুহ নিয়োগী

(তৃতীয় খণ্ড)

এম. এল. দে. এণ্ড কোং
১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০৭৩

# রুণু গুহ নিয়োগী
# সাদা আমি কালো আমি

**(তৃতীয় খণ্ড)**

এম. এল. দে. এণ্ড কোং
১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
কালাচাঁদ দে
কলকাতা-৭০০০৭৩

© দেবাশিস গুহ নিয়োগী

প্রথম প্রকাশ : প্রজাতন্ত্র দিবস, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৯৯
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৫ই আগষ্ট, ১৯৯৯
তৃতীয় মুদ্রণ, ২রা জানুয়ারি, ২০০১

প্রচ্ছদ :
তড়িৎ চৌধুরী

লেজার টাইপ সেটিং :
ক্রেস্ট গ্রাফিক্স ২,
চার্চ লেন
কলকাতা ৭০০০০১

মুদ্রক :
অফসেট আর্ট প্রিন্টার্স
৭৩, ইলিয়ট রোড
কলকাতা ৭০০০১৬

মূল্য :
আশি টাকা

# Sada Ami Kalo Ami
# (Third Part)
by Runu Guha Niyogi

# আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে) ইত্যাদি প্রথম দিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

## আরও ক'টি কথা

একটা মানুষের জীবনে কত কথা বলার থাকে! কত কথা! বিশেষ করে এক পুলিশের জীবনে। ছুটতে ছুটতে শেষ ধাপে পৌঁছে, পেছনের ফেলে আসা জীবনের মহাসাগরের দিকে ফিরে তাকিয়ে কত কথা মনে পড়ে। কত স্মৃতি! কত মানুষের মুখ! আর সেই মুখের আড়ালে কত বিচিত্র মনুষ্য চরিত্র! সেই চরিত্রের মিছিল থেকে চয়ন করে তাদের মুখের আড়াল সরিয়ে আসল মানুষটাকে তুলে ধরতেই আমার কলম ধরা !

কোনও দুটো মানুষ এক হয় না। দুটো অপরাধীও এক হয় না। অপরাধের সংজ্ঞা এক হলেই যে অপরাধীরা একই চরিত্রের হবে, এমন ধারণার কোনও অবকাশ নেই। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ একই ধরনের অপরাধ করতে পারে, এমনকি তাদের উদ্দেশ্যও একই হতে পারে। কিন্তু চরিত্রের গুণগত পার্থক্য থাকার কারণে তাদের মোড অফ অপারেশন আলাদা হয়ে যায়। আবার মোড অফ অপারেশন এক হলেও উদ্দেশ্যে তফাৎ হতে পারে। 'সাদা আমি কালো আমি'র সব খণ্ড জুড়ে আমি অপরাধ জগতের একই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে মিল ও পার্থক্যের একটা চিত্র ধরার চেষ্টা করেছি। যদি কোথাও অসফল হই, সেই ব্যর্থতার দায় আমার।

'আবারও বলছি, সত্য কথনের অঙ্গীকারে আমি আবদ্ধ। তারই বশবর্তী হয়ে আমাকে বাধ্য হয়ে এমন কিছু গোপন কাহিনী লিখতে হয়েছে, যা কিছু পাঠকের কাছে হয়তো হতে পারে অপ্রিয়, কিন্তু আমি অপারগ। আমার এমন কোনও উদ্দেশ্য আগেও ছিল না এবং এখনও নেই যে কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে কিংবা কারও কেচ্ছা প্রকাশ করে নিজে উল্লসিত হব। কোনও ব্যক্তি যদি আঘাত পান, আমি আগাম তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিচ্ছি। আমি শুধু পাঠকদের কথা চিন্তা করে সত্যের উদঘাটন করেছি !

প্রত্যেকের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে হলে আমার একটা অক্ষর ও লেখা হতো না। সেক্ষেত্রে, যাঁরা সত্য কথা জানার জন্য উন্মুখ, তাঁদের বঞ্চিত করা হতো। জানি, যাদের ইচ্ছাপূরণ হচ্ছে না, তারা আমার লেখা নিয়ে একটা হট্টগোল বাধানোর চেষ্টা আগেও করেছে, আগামী দিনেও করতে পারে। তার জন্য আমি প্রস্তুত। আমি আমার অঙ্গীকার থেকে সরে যাব না। সেই বাসনা বিন্দুমাত্র থাকলে আমি এ পথে হাঁটতম না। আমি জানি, এই খণ্ডের কিছু অংশের লেখা সম্পর্কে কেউ বলতে পারেন, আমি শ্লীলতার সীমারেখা লঙঘন করেছি।' আমি দায়িত্ব নিয়ে জানাচ্ছি, সামাজিক শ্লীলতার সীমারেখার মধ্যেই আমি আবদ্ধ থাকার চেষ্টা করেছি। শুধু বাস্তবতার জন্য, দায়ে পড়ে, অপরাধ ও অপরাধীর চরিত্র ও কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যেটুকু যেখানে প্রয়োজন, তার চিত্র তুলে ধরেছি। এবং শ্লীলতা বজায় রেখেই!

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মতো এ খণ্ডও পাঠক সমাজে সমাদৃত হলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। এবং এই খণ্ডেও কিছু নাম গোপন করে, তাঁদের সামাজিক অবস্থানের জন্যই নামটা উল্টো লিখেছি।

এটাই শেষ নয়। আগামী খণ্ডে আরও ঘটনা, আরও অকথিত কাহিনী পাঠকদের সামনে নিয়ে আসব। আশা করি, তাঁরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবেন।

রুণু গুহ নিয়োগী

প্রজাতন্ত্র দিবস।
২৬ শে জানুয়ারী, ১৯৯৯

কলকাতা পুলিশে আমার
উত্তরসূরীদের হাতে দিলাম **----**

ষাট সত্তরের দশক জুড়ে আমাদের লালবাজারের গোয়েন্দা দফতরের বাঁধুনি ছিল বড় সুন্দর। উঁচু নীচু অফিসার ও অন্যান্য কর্মীরা সব এক সুতোয় বাঁধা যেন একটা মতিহার। একই গাছের ডালপালা, শাখাপ্রশাখা। যে শাখাপ্রশাখারা একই সূত্র থেকে পায় বেঁচে থাকার রসদ, কর্মের জ্বালানী। বিভেদের সীমারেখা টানার জন্য ফোঁস যে দু একজন করেনি, তা নয়, কিন্তু প্রতিবারই তাদের অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়েছে এবং তারাও মনের ইচ্ছা গোপনে রেখে মূল স্রোতের সঙ্গে মিলতে বাধ্য হয়েছে। তারাও বুঝতে পেরেছে, অকারণ বিভাগীয় রেষারেষিতে কর্মের পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠে, আসল কাজকেই পিছনে ফেলে দেয় আর তার পরিণতিতে ভুগতে হয় প্রত্যেককেই।

নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে আমরা প্রতিবছর পরিবার পরিজন নিয়ে বনভোজনে বেরিয়ে পড়তাম। এক বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে অন্য বিভাগের কর্মীদের ফুটবল, ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হত। শুধু তাই নয়, আমি যখন প্রথম গোয়েন্দা দফতরে খুনের তদন্তের শাখায় যোগ দিই, তখন আমাদের শাখায় ছোট বড় অফিসারদের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠতা ছিল যে, আমরা ওই শাখার অফিসারদের বাড়িতে মাসে একবার করে পিকনিক করতাম। এটা এক এক অফিসারের বাড়িতে ঘুরে ঘুরে হত। যে অফিসারের বাড়িতে যে মাসে পিকনিক হত, সে রাতের সব খরচ তাঁর।

আমাদের শাখায় তখন ছিলেন আমাদের অনেকের থেকে সিনিয়র অফিসার শিশুরঞ্জন দাস। যিনি শিশু দারোগা হিসাবেই বেশি খ্যাত ছিলেন। আমরা তাঁকে কাকু বলে ডাকতাম। উনি এমনিতে খুবই দক্ষ এবং চতুর অফিসার ছিলেন, কিন্তু হাড়কিপ্টে। আমাদের শাখার মাসিক পিকনিকগুলো বিভিন্ন অফিসারের বাড়িতে যথারীতি চলছিল। কাকুও সেইসব পিকনিকে যোগ দিয়ে প্রচণ্ড হইহুল্লোড় করতেন। মাসের পর মাস এভাবেই চলছে। এক একজন অফিসারের বাড়িতে দু-বার, তিনবার করে ভোজ হয়ে গেছে, কিন্তু কাকু একেবারে নীরব। তিনি কোনও মাসেই বলছেন না, "হ্যাঁরে, এ মাসে তোরা আমার বাড়িতে আয়।" এটা আমাদের নজরে পড়লেও আমরা কেউ এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করি না। শত হলেও তিনি আমাদের চেয়ে সিনিয়র।

কিন্তু প্রদ্যুৎদা ছিলেন দুষ্টুবুদ্ধিতে একেবারে ওস্তাদ। তিনি একদিন আমাকে আর দীপককে ডেকে বললেন, "কাকুকে আজ আমি জব্দ করব, ওর কিপ্টেমির খেসারত সুদে আসলে আদায় করব, তোরা কেউ কিছু বলবি না, শুধু আমার কথায় সায় দিয়ে যাবি।"

সেদিন ছিল শনিবার। আমাদের পিকনিকগুলো শনিবারেই হত। আমরা প্রদ্যুৎদার কথায় রাজি হলাম। কি মজা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, তা প্রত্যক্ষ উপভোগ করতে ভেতরে ভেতরে কৌতূহলের ছটফটানি বেড়ে গেল। সন্ধেবেলা দেখলাম প্রদ্যুৎদা কাকুকে একটা তদন্ত করতে হাওড়ায় পাঠানোর বন্দোবস্ত করছেন। সেজন্য তিনি আমাদের তখনকার অফিসার ইনচার্জ শম্ভু দাস সরকারকে বুঝিয়ে স্বপক্ষে টেনে আনছেন। কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্যটা বলছেন না।

তার কিছুক্ষণ পর শম্ভুবাবু কাকুকে ডেকে পাঠালেন। কাকু এলে তিনি বললেন, "শিশুবাবু, আপনি আজই হাওড়ায় গিয়ে তদন্তটা সেরে আসুন।" শম্ভুবাবুর মুখের ওপর আমরা কেউ কোনও প্রশ্ন করতাম না। কাকু সিনিয়র, তিনিও কোনও কথা বলতেন না। তবু শম্ভুবাবুর নির্দেশ শুনে একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, "কিন্তু স্যার, ওখানে তো প্রদ্যুতের যাওয়ার কথা ছিল।" শম্ভুবাবু এমনিতেই রাশভারী 'প্রকৃতির, 'তিনি তেমনভাবেই বললেন, "ছিল, ও যাবে না, অন্য একটা জরুরি কাজ আছে।"

কাকু আর কি করবেন? মুখে শুধু "ঠিক আছে" বলে শম্ভুবাবুর সামনে থেকে সরে এসে প্রদ্যুৎদাকে এদিক ওদিক খুঁজতে শুরু করলেন। প্রদ্যুৎদা কাছেই ছিলেন। কাকু তাঁর

দিকে কটমট করে তাকিয়ে মুখ দিয়ে একবার "লু" শব্দ বার করে বেশ চিৎকার করে ডাকলেন, "শঙ্কঠা, এই শঙ্কঠা।" কনস্টবল শঙ্কঠা মিশির কাকুর ছায়াসঙ্গী। ওর কাছে কাকু প্রায় দেবতার সমান। শঙ্কঠা তাই সবসময়ই কাকুর কাছে কাছেই থাকে, যদি কাকু তাকে অন্য কোনও কাজে পাঠান।

শঙ্কঠা কাছেই ছিল। কাকুর চিৎকারে শঙ্কঠা কী বুঝল বোঝা গেল না সে কাঁচুমাচু মুখে কাকুর সামনে রামভক্ত হনুমানের মতো এসে দাঁড়াল, "কি বাবা?" কাকু ওর ওপরেই ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন, "কি বাবা আবার, আজ ফিরতে রাত বারটা বাজবে, চল" কাকু শঙ্কঠাকে নিয়ে হাওড়ার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন।

কাকু লালবাজার থেকে চলে যেতেই প্রদ্যুৎদা আমাদের বললেন, "চল, চল, আর দেরি করিস না।"

আমরা তো তৈরি হয়েই ছিলাম। দফতরের ওপর থেকে নিচে নেমে একটা গাড়িতে বিধুবাবু, প্রদ্যুৎদা, দীপক, আমি, স্বদেশ, মোট ছ'জন কাকুর পাইকপাড়ার খেলাৎবাবু লেনের পুলিশ কোয়ার্টারের উদ্দেশে চলতে শুরু করলাম।

কালীপুজো পার হয়ে গেছে। কৃপণ শীত আসব আসব করছে। আমাদের লোভ বাড়াচ্ছে। কিন্তু দরজা খুলে আসছে না। যদিও সন্ধে নেমে যাচ্ছে ঝপ করে। আমরা সেই ভর সন্ধে পার করে সাড়ে সাতটা নাগাদ কাকুর বাড়ির সামনে গাড়ি নিয়ে হাজির।

প্রদ্যুৎদা দলপতি। তিনিই কলিংবেল বাজালেন। মিনিট খানেকের মধ্যে বৌদি দরজা খুলে আমাদের দঙ্গল দেখে অবাক। মুখে সেই বিস্ময়ের রেখা রেখেই প্রশ্ন করলেন, "আপনারা? আপনাদের সেই কীর্তিমান কাকুটি কই?" প্রদ্যুৎদা ঘরের ভেতর বৌদির আপ্যায়ন ছাড়াই ঢুকতে ঢুকতে বললেন, "আসছে।" আমরাও প্রদ্যুৎদাকে অনুসরণ করে ঘরের ভেতর ঢুকে গেলাম। বৌদি আর কি করেন, দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে আমাদের ঢুকবার জন্য জায়গা ছেড়ে দিলেন। আমরা ঘরে ঢুকে যে যেখানে পারি বসে পড়লাম। বৌদিই প্রদ্যুৎদাকে প্রশ্ন করলেন, "আসছে মানে, কোথায়?" প্রদ্যুৎদা যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে বললেন, "এই আধঘণ্টার মধ্যে এসে যাবে।"

প্রদ্যুৎদার উত্তর শুনে বৌদি একটু চুপ করে থেকে বললেন, "তা হলে আপনাদের জন্য একটু চা বানিয়ে আনি।" প্রদ্যুৎদা প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, "না-না, এখন আর চায়ের প্রয়োজন নেই, সারাদিন আপনার ধকল গেছে, কাকু আসুক, আমরা একেবারে খেয়েদেয়ে চলে যাব।" প্রদ্যুৎদার কথা শুনে বৌদির বিস্ময়ে ঝুলে পড়া মুখটা আরও ঝুলে পড়ল। তিনি বললেন, "সারাদিন কি এমন ধকল গেছে যে আমি আপনাদের চা বানিয়ে দিতে পারব না?" প্রদ্যুৎদা মুখে একটু হাসি ঝুলিয়ে বলল, "আপনি আমাদের সামনে যতই অস্বীকার করুন না কেন, আমরা কি বুঝি না, বাড়িতে এতগুলো লোকের অতিরিক্ত রান্না করতে গেলে পরিশ্রম অন্যদিনের চেয়ে বেশি হবে?" বৌদি বিস্ময়ের শেষ বিন্দুতে পৌঁছে গিয়ে সেই সুরেই প্রদ্যুৎদাকে প্রশ্ন করলেন, "এতগুলো লোকের অতিরিক্ত রান্না, মানে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।" প্রদ্যুৎদা পাকা খেলোয়াড়, তিনি ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ও, তাহলে কাকু আপনাকে কিছুই বলেনি, অথচ—।" বৌদি সমস্তটাই ঘোরের মধ্যে শুনছেন, জানতে চাইলেন, "অথচ কী?" প্রদ্যুৎদা বললেন, "অথচ কাকু আজ অফিসে গিয়েই আমাদের বলল, তোরা সবাই আজ রাতে আমার বাড়িতে খাবি। সেজন্যই তো আমরা একসঙ্গে এলাম।" প্রদ্যুৎদা এবার নাটকীয় ভঙ্গিতে কথাটা মাঝপথে থামিয়ে বৌদিকে বললেন, "ঠিক আছে, আমরা আজ চলি, অন্যদিন আসা যাবে।" প্রদ্যুৎদার কথায় আমরা বাকিরা সবাই উঠে পড়েছি। বৌদি এবার প্রায় আঁৎকে উঠে বললেন, "সে কি, যাবেন কোথায়, এসেছেন যখন তখন না খেয়ে যেতে দিচ্ছি না।" আমরা প্রায় সমস্বরে বলে উঠলাম, "না, না, এখন এত খাটা খাটনির দরকার কী।" বৌদি ততক্ষণে বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠেছেন, বললেন, "চুপ করুন তো আপনারা, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ওই লোকটার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই বলে, আমারও কি নেই?"

আমাদের আর কোনও কথা বলতে না দিয়ে তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। বৌদি অন্তরালে চলে যেতেই প্রদ্যুৎদা হেসে প্রথমে বিধুবাবু, তারপর আমার আর দীপকের সঙ্গে প্রথম রাউন্ড জিতে যাওয়ার জন্য হাত মিলিয়ে নিলেন। যখন হাত মেলাচ্ছি, সে সময় আমরা পাশের ঘর থেকে বৌদির গলার আওয়াজ শুনতে পারছি। তিনি একে ওকে বাজারে, দোকানে পাঠাচ্ছেন। আর অনর্গল কাকুর উদ্দেশে এক একটা বাণী ছেড়ে যাচ্ছেন।

মিনিট দশেক পর বৌদি একটা ট্রেতে করে চা সাজিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমরা তখন যে যা হাতের কাছে খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন পেয়েছি, সেগুলো পড়তে শুরু করেছি। বৌদি ট্রে হাতে ঢুকেই আমাদের উদ্দেশে বললেন, "আধঘণ্টা তো পার হয়ে গেল, এখনও দেখা নেই।" আমরা হাতে হাতে কাপগুলো নিচ্ছি ঠিকই, কিন্তু বৌদির কথায় প্রত্যেকেই পেটের মধ্যে হাসি চাপতে গিয়ে, তার ধাক্কা সামলাতে হাত নাড়িয়ে চা ছলকে ফেলছি কাপ থেকে। কাকু যে রাত সাড়ে বারটার আগে বাড়ি ফিরতে পারবেন না, তাতো আর বৌদি জানেন না। কাকু যে হাওড়ার গলি ঘুপচিতে হেঁটে হেঁটে পা ফুলিয়ে ফেলছেন, সেটা বৌদি জানবেন কী করে? তাই তিনি সরল বিশ্বাসেই আমাদের কাছে প্রশ্ন রাখছেন। আর আমরা সেই প্রশ্ন শুনে পেটের হাসি চাপছি। প্রদ্যুৎদা কোনও মতে বললেন, "এসে যাবে ঠিকই।"

বৌদি বললেন, "এসে তো যাবেই, কিন্তু কি আক্কেল দেখুন, নেমন্তন্ন করে গৃহকর্তারই দেখা নেই।" সহকর্মী সম্পর্কে এ কথার উত্তর দেওয়া উচিত নয়। আমরা তাই বোবা। আমাদের মৌনতায় বৌদি বোধহয় আরও একটু উৎসাহ বোধ করলেন, বললেন, "সারা জীবন আমাকে এভাবেই জ্বালিয়ে গেল।" প্রদ্যুৎদা বললেন, "এ কথাটা আমাকেও শুনতে হয়।" বৌদি প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন, "না, না, এর মতো কেউ নেই, পারতেন আপনারা আপনাদের গিন্নিকে কিছু না বলে নেমন্তন্ন করে এসে নিজে উধাও হয়ে যেতে? কেউ এমন করে না। এ লোকটি একদম আলাদা।" আমরা আবার সবাই চুপ। দায়ী যে কাকু নন, দায়ী আমরাই, তা তো আর গলা ফাটিয়ে বলতে পারছি না।

আমাদের চা খাওয়া শেষ। বৌদি কাপগুলো ট্রেতে তুলে ভেতরের ঘরে যেতে যেতে বললেন, "আমি চলি, দেখুন কতক্ষণে তিনি আসেন।"

সাড়ে আটটা। আমরা বাড়ির ভেতর থেকে রান্নার ছ্যাঁকছোঁক, বাটনার হুড়ুম দুড়ুম আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। অল্পসল্প গন্ধও 'ভেসে আসছে নাকে। ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছি। বৌদি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে রান্নাঘরে অসম্ভব ব্যস্ত, মাঝে মাঝে তাঁর গলার তেজের কিরণের ছটার হলকা এই ঘর থেকেও বেশ অনুভব করতে পারছি।

রাত ন'টা। অর্থাৎ দেড় ঘণ্টা হল আমরা এসেছি। বৌদি হন্তদন্ত হয়ে আমাদের ঘরে ঢুকলেন। প্রদ্যুৎদার দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখছেন তো কেমন কাণ্ডজ্ঞান লোকটার। আধ ঘণ্টা বলে দেড় দু ঘণ্টা হয়ে গেল, এখনও ওনার টিকিরও দেখা নেই।" প্রদ্যুৎদা বৌদির কথার এমনভাবে উত্তর দিলেন যেন কিছুই হয়নি, প্রদ্যুৎদা বললেন, "আসবে, আসবে, হয়ত কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।" বৌদি এতক্ষণ আর যাই হোক অন্তত আমাদের সামনে মেজাজ হারাননি। তিনি এবার একটু গলা চড়িয়ে বলে উঠলেন, "ব্যস্ত, কিসের ব্যস্ত মশাই? বাড়িতে লোকজন পাঠিয়ে দিয়ে উনি এখন ব্যস্ততা দেখাচ্ছেন।" গলাটা চড়ে গেছে, নিজেই বুঝতে পেরে ঝট করে কথার তোড় বন্ধ করে দিলেন এবং কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে নরম গলায় বললেন, "আচ্ছা, কোথায় আপনাদের কাকু গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে তা তো বললেন না?" প্রদ্যুৎদা সব ব্যাপারেই তৈরি। তিনি ঝট করে বললেন, "হাতিবাগানে। যেখানে মাস খানেক আগে আপনি কাকুর জন্য দাঁড়িয়েছিলেন।" বৌদির ভ্রু কুচকে উঠল, "হাতিবাগানে? আমি দাঁড়িয়েছিলাম? কোনখানে?" প্রদ্যুৎদা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, "দর্পণা সিনেমা হলের সামনে।" বৌদি সেই একই ভঙ্গিতে প্রশ্ন রাখলেন, "মাসখানেক আগে আমাকে দেখেছিলেন?" প্রদ্যুৎদা বললেন, "কাকু তো তাই বলেছিল। সেদিন ঠিক ওই জায়গায় আসতেই বলল, তোরা এগিয়ে যা, তোদের বৌদি সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমাকে ছবি দেখাতে নিয়ে যেতে হবে। তারপর কাকু নেমে ওই হলটার

সামনে গেল। তারপর এক মহিলার সঙ্গে হলে ঢুকে গেল। তবে আমরা মুখটা দেখতে পাইনি। পেছনটা দেখেছি। বেশ মোটাসোটা, খোপায় ফুলের মালা।” বৌদির নাক ফুলতে লাগল, তিনি বললেন, “আপনাদেরও বলিহারি, আপনারা আমাকে কখনও খোপায় মালা গুঁজতে দেখেছেন? আর ওই লোকটা আমাকে কোনওদিন সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেছে?” তারপর একটু দম নিয়ে বললেন, “ঠিক আছে, আজ ওখানে কি করতে নামল? আপনাদের কোনও কাজে?”

প্রদ্যুৎদা মুখটা একেবারে শিশুর মতো সরল করে ফেলল, বলল, “না-না না, তাহলে তো আমরাও সঙ্গে থাকতাম। ওখানে কাকু নেমে একজন মহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমরা উল্টোদিকে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। মিনিট পনের পর কাকু এসে আমাদের বললেন, তোরা আমার বাড়িতে যা, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি। তখন আমরা চলে এলাম। কাকুর ভাব দেখে মনে হল তিনি কাকুর শালী, মানে আপনার বোন।”

বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল প্রদ্যুৎদার কথা শুনে তাঁর সপ্তমে চড়া মেজাজটা দশমে চড়ে গেল। কিন্তু সেই মেজাজে কোনওমতে একটা ঘোমটা টেনে তিনি প্রদ্যুৎদাকে বললেন, “আমার বোন? মহিলা? ওখানে ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবে? না, না, আমার কোনও বোন নয়। কি রকম মহিলা বলুন তো?” প্রদ্যুৎদা কি উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়ই বৌদিকে ভেতর থেকে তাঁর কাজের মেয়ে ডাক দিতে প্রদ্যুৎদা চুপ করে গেলেন। বৌদিও উত্তর শোনার জন্য বসে না থেকে ভেতরের দিকে যেতে যেতে বললেন, “আমি আসছি।”

বৌদি ভেতরে চলে যেতেই প্রদ্যুৎদা তাঁর সরল মুখের খোলসটা পট করে ফেলে দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে খিকখিক করে হেসে উঠলেন, তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, “শালা শিশু দারোগার পিণ্ডি একেবারে চটকে দেব। কিপ্টেমির খাল খিঁচে দেব।” প্রদ্যুৎদার কথা শুনে আমরা কাকুর পরবর্তী দশা বেশ আন্দাজ করতে পারছি। বৌদির ঝড়ে যে কাকুর মাথার চুল একটাও শুয়ে থাকবে না, তা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। বিধ্বস্ত, অগোছালো, দিশাহীন কাকুর চেহারাটা দেখে যে সবাই মজা লুটবে, সেটাও আন্দাজ করতে পারছি।

মাংস রান্নার গরম মশলার গন্ধ ম-ম করছে। বুঝতে পারছি, ওই মাংস প্রদ্যুৎদার পাল্লায় পড়ে আমাদেরও খেতে হবে এবং পরিণতিতে কাকুর দেওয়া প্রদ্যুৎদার ভাগের গালাগালিও আমাদের প্রত্যেককে হজম করতে হবে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সাড়ে ন'টা। কাকু এখন কোথায়? হাওড়ার পাট চুকিয়ে কি লালবাজারে? সম্ভব নয়। তবে যেখানেই থাকুক, নিশ্চয়ই সারাক্ষণ গজগজ করছে ভেতরে ভেতরে। আমি আর দীপক ফিসফিসিয়ে এ ব্যাপারে কথা বলছি, প্রদ্যুৎদা আমাদের কথার মাঝে ঢুকে গিয়ে বললেন, “বৌদি নিশ্চয়ই আমাকে জিজ্ঞেস করবে ওই মহিলা কেমন দেখতে, তখন শুনিস, যা একখানা বর্ণনা দেব না, একেবারে ভিরমি খেয়ে যাবে, আর সেই ঝালটা পড়বে কাকুর ওপর, যা একখানা সিন হবে না।” কাকুর কথা ভেবে আমরা হেসে উঠলাম।

পৌনে দশটা। বৌদি এলেন, বললেন, “সব রেডি, চলুন, খেয়ে নিন।” প্রদ্যুৎদা ঝট করে বললেন, “না-না, কাকু আসুক, আমরা একসঙ্গে বসব।” কোমরে আঁচল গোঁজা বৌদি প্রদ্যুৎদার মুখে কাকুর আগমনের প্রতীক্ষার কথা শুনেই চণ্ডিকা মূর্তি ধরে বললেন, “রাখুন তো আপনাদের কাকুর কথা, কখন আসবে ঠিক নেই, আদৌ আসবে কি না তাও জানা নেই। আপনারা কেন বসে থাকবেন, আপনাদের বাড়িতেও তো বৌ বাচ্চা আছে, তারা বসে থাকবে, চলুন, খেয়ে নেবেন। ”

বৌদির রাগটা যে গর্জনসমেত কার ওপর বর্ষাচ্ছে, তা আমরা বুঝতে পারছি, এও বুঝতে পারছি এই বর্ষা আজ রাতে থামবে না আর সেই ধারার চোটে কাকু যে কোথায় ছিটকে পড়বে কে জানে।

আমি বলে উঠলাম, “খেয়ে নিয়ে বরং অপেক্ষা করা যাক, বৌদিকেও তো আমাদের রিলিফ দেওয়া দরকার।” প্রদ্যুৎদা বলে উঠলেন, “ঠিক বলেছিস, আমরা খেয়ে বরং বৌদিকে ছুটি দিই।”

বৌদি আমাদের ভেতরের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। মাঝারি মাপের ঘর, সেখানে দুটো টেবিলে আমাদের বসার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। একটা টেবিলে চারজন, অন্যটায় দু'জন। আমি, প্রদ্যুৎদা, দীপক, বিধুবাবু চারজনের টেবিলটায় বসলাম। স্বদেশরা অন্য টেবিলে। বৌদি আমাদের পরিবেশন শুরু করলেন। ভাত, ডাল, মাছভাজা, তরকারি। বুঝলাম, ডাল তরকারিগুলো আগেই নিজেদের জন্য রান্না করা ছিল। তারপর এল গরম মাংস। যার গন্ধ এতক্ষণ অপেক্ষা করতে করতে খিদে বাড়াচ্ছিল। বৌদি মাংস পরিবেশন করে প্রদ্যুৎদার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, “আচ্ছা, ওই মহিলা কেমন দেখতে?” প্রদ্যুৎদা একটা মাংসের টুকরো নিয়ে কামড়ে কামড়ে হাড় থেকে মাংস ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন, “দূর এমন কিছু না। কালোই, তবে বেশ লম্বা, নাকটা থ্যাবড়া হলেও চোখ দুটো ভালই, ধার আছে।

একটু মোটাই আর দজ্জাল দজ্জাল চেহারাটা। বাঁ হাতে আবার একটা তাবিজ মতো কি বাঁধা আছে।”

বৌদি প্রদ্যুৎদার কথা মনোযোগ দিয়ে চুপ করে শুনে প্রশ্ন করলেন, “তাবিজ? ওই তাবিজ দিয়েই কি বশ করেছে?” আমরা সবাই চুপ। প্রদ্যুৎদা বিধুবাবুকে বললেন, “তাবিজই তো মনে হল, না?” বিধুবাবুর মুখে ভাত। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, “হ্যাঁ।” বৌদি এবার জানতে চাইলেন, “আচ্ছা, ওরা কী করছিল?” প্রদ্যুৎদা বললেন, “কী আবার করবে, হেসে হেসে কথা বলছিল। আমাদের তো মনে হল অনেকদিনের পরিচিত।” বৌদির গলায় যেন একটা কান্না আটকে আছে, তিনি সেই গলায় জানতে চাইলেন, “পরিচিত? আপনাদের তাই মনে হল?” প্রদ্যুৎদা আস্তে করে ঘাড় নাড়লেন।

মিষ্টি এল, খেলাম। উঠে পড়লাম। সাড়ে দশটা। হাতমুখ ধোওয়ার পর আমরা আবার সামনের ঘরে এলাম। প্রত্যেকের মুখে চপল গাম্ভীর্য। বৌদি ও প্রায় পেছন পেছন এলেন। প্রদ্যুৎদা বৌদিকে বললেন, “বৌদি, আমরা আজ আপনাকে অনেক জ্বালিয়েছি, আর কাকুর জন্য অপেক্ষা করে আপনাকে জ্বালাতে চাই না, আমরা বরং চলি, কাকু এলে বলে দেবেন।”

বৌদির মুখটা থমথমে, তিনি কোনও মতে বললেন, “এলে বলব।” আমরা আর না দাঁড়িয়ে বাইরে এসে গাড়িতে বসলাম, আমাদের পিঠের ওপর বিকট শব্দে দড়াম করে দরজা বন্ধের আওয়াজ। বোঝা যাচ্ছে এ দরজা খোলাতে কাকুর আজ দম বন্ধ হয়ে যাবে। হাওড়ার ধুলোবালি খেয়ে এসে নিজের বাড়ির সামনেই মাথা ঠুকতে হবে। গাড়ি মিনিট দুয়েক চলার পর প্রদ্যুৎদার মুখে খই ফুটতে শুরু করল আর হো হো হাসি। আমরাও সেই হাসিতে যোগ দিলাম।

পরদিন লালবাজারে আমরা সবাই অপেক্ষা করে আছি কাকুর জন্য। কিন্তু তিনি এলেন না। কোনও খবরও দিলেন না। বোঝা যাচ্ছে বৌদির প্লাবন সামলাতেই তিনি অফিস কামাই করলেন। অর্থাৎ আমাদের কপালে দুঃখ আছে।

তার পরদিন এলেন। একটু দেরিতে। মুখে টকটকে মেঘ জমে আছে। চোখ দু'টো সিঁদুরের মতো লাল। চুলে চিরুনির ছোঁয়া লাগেনি, মনে হচ্ছে যেন হিংস্র সিংহের কেশর। শিকার পেলেই গর্জে উঠে থাবা মারবে। আমরা সবাই একটু দূরে দূরে, সামনে এগিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছি। প্রত্যেকেই ব্যস্ততা দেখাচ্ছি।

কাকু নিজের টেবিলে গিয়ে বসলেন। বসেই প্রথমে অফিসের অ্যাশট্রেটা ছুঁড়ে মেঝেয় ফেলে দিলেন। তাঁর নিজের সিগারেটের নেশা ছিল না। তবু অন্যের প্রয়োজনে একটা অ্যাশট্রে টেবিলে রেখেছিলেন। রাগ ঝাড়ল সেটার ওপর। অ্যাশট্রের ভেতর জমে থাকা সিগারেটের টুকরো, ছাই, ও পোড়া দেশলাই কাঠি ছড়িয়ে পড়ল। আমরা ওদিকে দেখেও

দেখছি না, যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে যে যার কাজে অতিরিক্ত ব্যস্ত। শঙ্কঠা কাকুর অনুপস্থিতিতে মনমরা হয়েছিল। আগমনে তার মুখে খুশীর ছটা লেগে ছিল। কিন্তু প্রথমেই অ্যাশট্রে ছুঁড়ে পরিস্থিতিকে বোল্ড আউট করাতে তার হাসি হাসি মুখটা শুকিয়ে গেল। সে বুঝল তার বাবার মেজাজ খুবই উত্তাল।. তবু সে অ্যাশট্রেটা কুড়িয়ে ঢাকনা লাগিয়ে কাকুর টেবিলের কোণায় নিয়ে রাখল। এদিকে আমাদের অবজ্ঞা দেখে কাকু বোধহয় আরও ক্ষেপে গেলেন, তিনি এবার একটা পেপারওয়েট নিয়ে মেঝেতে ছুঁড়ে মারলেন। সেটা গড়াতে গড়াতে আমাদের দফতরের বারান্দায় গিয়ে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়াল। শঙ্কঠা সেটা বারান্দা থেকে কুড়িয়ে বিধুবাবুর টেবিলের ওপর রাখল। ওর মুখ দেখে মনে হল, সেটা সে আর কাকুর টেবিলের ওপর রাখতে ভরসা পাচ্ছে না, যদি সেটা কাকু তার দিকেই ছুঁড়ে মারেন, সেই ভয়ে। কারণ ততক্ষণে কাকু তার রাখা অ্যাশট্রেটা দ্বিতীয় বার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

আমাদের নির্বিকার প্রতিক্রিয়ায় কাকুর সুবিধা হল না। এবার তিনি ফাইল ছুঁড়তে লাগলেন। একটা ফাইল এসে পড়ল প্রদ্যুৎদার টেবিলে। প্রদ্যুৎদা সব শুনতে এবং দেখতে পাচ্ছিলেন, তবু এতক্ষণ তিনি একটা ফাইলে মুখ গুঁজে গম্ভীর হয়ে ছিলেন। কাকুর ছোঁড়া ফাইলটা টেবিলে এসে পড়ার পর মুখ তুলে কাকুর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "ও কাকু তুমি এসেছ, বৌদি কিন্তু পরশুদিন মাংসটা খাসা রেঁধেছিল। বাড়ি গিয়ে তুমি নিশ্চয়ই খেয়েছ। আর একদিন জমিয়ে খেতে হবে মাইরি।" প্রদ্যুৎদার কথায় কাকু চিড়বিড়িয়ে উঠে বললেন, "শালা –।" প্রদ্যুৎদা গালাগালি শুনে হাসতে লাগলেন। কাকু আরও রেগে গিয়ে যা ইচ্ছে তাই বলতে লাগলেন। কাকুর মুখের তোড়ে আমরা এক এক করে বেরিয়ে ঘর ফাঁকা করতে লাগলাম। প্রদ্যুৎদা কিন্তু বসে রইলেন আর মিচকি মিচকি হাসতে লাগলেন।

আমাদের ইনচার্জ শম্ভু দাস সরকার ঢুকলেন। শিশু দারোগা চুপ। আমরা ওত পেতে আছি পরবর্তী দৃশ্যের জন্য। শম্ভুবাবু ঢুকেই কাকুকে দেখে প্রশ্ন করলেন, "আরে শিশুবাবু, গতকাল এলেন না কেন? হাওড়ার রিপোর্টটা পুরো জানা যায়নি?" কাকু এতক্ষণ যে গর্জন করছিলেন, সেই তেজ কিছুটা কমিয়ে উত্তর দিলেন, "আসব কি স্যার, সেদিনই প্রদ্যুৎরা আমার বাড়ি গিয়ে যা তা করে এসেছে, আপনাকে বলেছে একটা জরুরি কাজ আছে, এই স্যার ওর জরুরি কাজ।"

"শম্ভুবাবু কাকুর কথা শুনে বললেন, "শুনেছি, তা যা তা আর কি করেছে, খাওয়া দাওয়াই তো  করেছে, তাছাড়া আর তো কিছু নয়।" কাকু বললেন, "শুধু খাওয়াদাওয়া করলে কি কিছু বলতাম? ওরা আমার বাড়িতে বলে এসেছে, আমি নাকি স্যার, এক তাবিজওয়ালা মহিলার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করতে গেছি। তা নিয়ে বুঝতে পারছেন স্যার, বাড়িতে – " শম্ভুবাবু কাকুর কথা শুনে হাসি চাপছেন বোঝা গেল, কিন্তু মুখে বললেন, "ঠিক, এটা ওরা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।" শম্ভুবাবুর অতি সাধারণ প্রতিক্রিয়া শুনে কাকু হতাশ গলায় বললেন, "আর কিছু ওদের বলবেন না স্যার? ওরা আমার বাড়িতে কুরুক্ষেত্র বানিয়ে চলে এল।" শম্ভুবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক সময় মতো বলব, এখন বলুন হাওড়ায় কী পেলেন?"

শম্ভুবাবুর কৌশলে কাকু চুপ করে গেলেন এবং বাধ্য হয়ে হাওড়ার তদন্তের কথা বলতে শুরু করলেন। সে রাতের প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। এভাবেই আমরা কাজের ফাঁকে মজা করে দিন কাটাতাম। এতে আমাদের কাজের ক্লান্তি দূর হতো, নিজেদের মধ্যে অবাঞ্ছিত রেষারেষি ভুলে আরও কাছাকাছি আসতাম। কাকুও কিন্তু খুব মজা করতে পারতেন।

একদিন সকালবেলা কাকু, বিধবাবু, প্রদ্যুৎদা আর দীপক তালতলায় গেছে একটা খুনের গোপন তদন্ত করতে। সঙ্গে কাকুর কনস্টেবল শঙ্কঠা মিশির। তদন্ত করতে করতে দুপুর গড়িয়ে গেছে। প্রত্যেকেরই অল্পসল্প খিদে পেয়েছে। কিন্তু মুখে কেউ কিছু বলছে না। হঠাৎ কাকু দীপককে বললেন, "কিরে, খিদে পেয়েছে?" দীপক বলল, "তা তো একটু পেয়েছে, কেন?" কাকু গম্ভীর হয়ে বললেন, "চল, তোদের এক জায়গা থেকে খাইয়ে

আনি।”

কাকু তালতলায় একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো, পেছন পেছন বাকি তিনজন। ওই গলিটায় একেবারে গায়ে গা লাগিয়ে পরপর বাড়ি। কাকু একটা দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একতলার সদর দরজার কড়া নাড়তে লাগলেন। একটা চব্বিশ পঁচিশ বছরের যুবক দরজাটা খুলল। কাকু তাকে প্রশ্ন করলেন, “কি, তুমি আমাকে চেনো?” যুবকটি বলল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার চিনি।” কাকু সোজা সদর দরজা ঠেলে সামনের ঘরটায় ঢুকে পড়ে দীপকদের ডেকে বললেন “আয়, এটা আদু গোমসের বাড়ি।” তারপর ওই যুবকের দিকে তাকিয়ে বললেন, “তুমি আদুর ছেলে তো?” যুবকটি মাথা নেড়ে সায় দিতে কাকু তাকে বললেন, “আদুকে ডাকো, বল আমি এসেছি।”

কাকুর কথা শুনে যুবকটি মাথা নিচু করে ফেলল, তারপর খুব আস্তে করে বলল, “আপনি কি শোনেননি স্যার, বাবা মারা গেছে।” সে কি!” বলে কাকু আর্তনাদ করে উঠলেন, তারপর ফিটগ্রস্ত রুগীর মতো কাঁপতে কাঁপতে চোখ উল্টে সামনের একটা চেয়ারে ঝপাস করে বসে পড়লেন, হাত দুটো অসাড়, চেয়ারের হাতলের দুদিকে ঝুলে আছে, পা দুটো লম্বা হয়ে সামনের দিকে বাড়ানো। মুখে বিড়বিড় করে বলে চলেছেন, “আদু নেই, ইস, আদু' নেই, কী যে হবে, আদু নেই।” কাকুর চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। দীপকরা ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ দরজার সামনে ভেউ ভেউ করে কান্নার আওয়াজ শুনে দীপকরা পেছন ফিরে দেখল, শঙ্কঠাও কাঁদছে। তারও চোখ দিয়ে রীতিমতো জল গড়াচ্ছে। শঙ্কঠার কান্না দেখে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই দীপকদের, কারণ তাঁরা জানে কাকু যা করবেন, শঙ্কঠাও তাই করবে। তারা নির্বিকার হয়ে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। কিন্তু আদুর ছেলে এই রকম পরিস্থিতির জন্য একেবারে প্রস্তুত ছিল না। সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে একবার কাকুর দিকে দেখছে আর একবার দীপকদের দিকে।

দীপকরা তিনজন কাকুর অসাধারণ অভিনয় দেখে অবাক। তারা জানে, আদু গোমস যে মাস ছয়েক আগে মারা গেছে, সে সম্পর্কে কাকু খুবই ওয়াকিবহাল। আদু ছিল কাকুর সোর্স। এমন কি আদুর মৃত্যুর খবর কাকুই ওদের জানিয়ে ছিলেন। আবার কাকু দীপকদের খাওয়ার কথা বলে এই বাড়িতে নিয়ে এসে ফিট হয়ে যাওয়ার অভিনয় শুরু করেছেন।

কাকু তাঁর উল্টে রাখা চোখ অল্প করে ফাঁক করে অস্বাভাবিকভাবে চোখের মণিটা স্থির করে বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, “জ-ল, জ-ল, জ-ল।” বিভ্রান্ত আদুর ছেলেটা কাকুর সামনে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, “জল দেব স্যার?” কাকু কাতর কণ্ঠে কোনও মতে বললেন, “হ্যাঁ।” আদুর ছেলে ছুটে বাড়ির ভেতর দিকে চলে গেল এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যে একটা জলভর্তি জগ ও একটা গ্লাস নিয়ে এল।

কাকু ওইভাবেই হাত পা ছড়িয়ে চেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছেন। তখন ও দীপকরা কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে কাকুর কাণ্ড দেখে যাচ্ছে। আদুর ছেলেটা জগ থেকে খালি গ্লাসে জল ভর্তি করতে উদ্যত হতেই কাকু ডান হাতটা কোনওক্রমে ওপরদিকে তুলে তাকে নিরস্ত করে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন,

"শুধু জল নয়, শুধু জলে আমার গা গুলায়, শুধু জল নয়।” আদুর ছেলে কাকুর একেবারে কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, “কি দেব স্যার?” কাকু আবার চোখ উল্টে ফেলেছেন, আদুর ছেলের প্রশ্ন শুনে কোনওমতে বললেন, “মিষ্টি, মিষ্টি।” আদুর ছেলে আবার বাড়ির ভেতরদিকে দৌড় লাগাল। তারপর মিনিট দুয়েকের মধ্যে একটা ছোট প্লেটে গোটা চারেক পান্তুয়া নিয়ে এল। প্রদ্যুৎদা কাকুকে দেখিয়ে ওকে বললেন, “তুমি নিজের হাতে ওনাকে খাইয়ে দাও।” আদুর ছেলে প্রদ্যুৎদার নির্দেশ পেয়ে চামচেয় একটা পান্তুয়া তুলে কাকুর মুখের সামনে ধরে বলল, “একটু মুখটা খুলুন স্যার। মিষ্টি এনেছি।” কাকু চোখ বন্ধ রেখেই সামান্য হাঁ করলেন। আদুর ছেলে চামচটা কাকুর আধখোলা মুখের ভেতর ধরে কাতর কণ্ঠে নিবেদন করল, “আর একটু বড় করে খুলুন স্যার।” কাকু খুললেন। আদুর ছেলে পান্তুয়াটা কাকুর মুখে ঢুকিয়ে দিল। কাকুর মুখটা ফুলে গেল। কাকু পান্তুয়াটা চিবোতে লাগলেন।

দীপকরা দেখতে লাগল কাকুর পান্তুয়া খাওয়া। আদুর ছেলে প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে আছে। কাকু শেষ করলেন। একইভাবে আদুর ছেলে আর একটা পান্তুয়া দিল। কাকু খেলেন। দ্বিতীয়টা শেষ করতেই কাকু হাত তুলে আদুর ছেলেকে আর মিষ্টি দিতে বারণ করলেন। দীপকরা ভাবল, আর যদি না খান, তবে ওদের যে খাওয়াতে নিয়ে এসেছেন তার কী হবে? ওদিকে আদুর ছেলে অনুনয় করে বলল, "আর একটা খান স্যার।" কাকু চোখ বুজেই মাথা নেড়ে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বিড়বিড় করে বললেন, "যশোদা মিষ্টান্ন থেকে আনো।" আদুর ছেলে নরমভাবে জানতে চাইল, "যশোদা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মিষ্টি?" কাকু মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, হ্যাঁ। আদুর ছেলে গ্লাসে জল ঢেলে বলল, "ঠিক আছে, আপনি একটু জল খান।" কাকু জল খেলেন।

আদুর ছেলের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সে একেবারে বোকা বনে গেছে। তার বাবার মৃত্যুসংবাদে একজন প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে, সে বুঝতে পারেনি। কাকুর নির্দেশ শুনে সে জগ আর গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে সদর দরজা দিয়ে বাইরে যশোদা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের উদ্দেশে রওনা হওয়ার উদ্যোগ করতেই কাকু কঁকিয়ে উঠে ওকে হাত তুলে ইশারা করে কাছে ডাকলেন। আদুর ছেলে কাকুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কাকু প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম করে কাঁপা গলায় তাকে বললেন, "আদু, আমাকে যশোদার জলভরা তালশাঁস সন্দেশ আর পান্তুয়া খাওয়া তো, আহারে, কই রে তুই আদু, আদু—।" কাকু বারবার চোখ মুছছেন। আদুর ছেলে কাকুকে ,

আর কী বলবে? সে কাকুর কথা শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, "আমি এক্ষুণি আসছি স্যার।"

ছেলেটা ঘর থেকে রাস্তায় নেমে যেতেই প্রদ্যুৎদা কাকুর কাছে গিয়ে বললেন, "এটা কী হল কাকু?" কাকু তাঁর দাঁতের পাটি শক্ত করে চেপে রেখে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলেন, "যেখানে ছিলি সেখানে গিয়ে বোস, অন্য কেউ এসে যেতে পারে, আমাকে আমার কাজ করতে দে, শালা।" কাকু একই ভঙ্গিতে চেয়ারের ওপর পড়ে রইলেন। প্রদ্যুৎদা বাধ্য হয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এলেন।

আদুর ছেলে মিনিট পাঁচ সাতের মধ্যেই ফিরে এল। ওর এক হাতে একটা বেশ বড় যশোদা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের প্যাকেট। দেখেই বোঝা যায় ওর ভেতরে আছে সন্দেশ। আর অন্য হাতে একটা মাঝারি মাপের মিষ্টির হাঁড়ি। পান্তুয়া বোঝাই। সে দীপকের দিকে লাজুকভাবে একবার তাকিয়ে, কাকুর একই দশা দেখে নিঃশব্দে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল। মিষ্টি খাওয়ার জন্য দীপকরা অপেক্ষা করতে লাগল। কাকু মাঝে মাঝে একটা চোখ খুলে দীপক, বিধুবাবু ও প্রদ্যুৎদাকে দেখছেন। ওরা মনে মনে গজগজ করছে এভাবে মিষ্টি খাওয়ার জন্য। কিন্তু মুখে কিছু বলছে না, যাতে আদুর বাড়ির কেউ কাকুর ভড়ং সম্পর্কে বুঝতে পারে।

আবার মিনিট পাঁচ। আদুর ছেলে ঘরে ঢুকল। তার হাতে একটা ট্রে, ট্রেতে সাজানো মাঝারি মাপের পাঁচটা প্লেট। প্লেটের ওপর সন্দেশ ও পান্তুয়া। আদুর ছেলের পেছন পেছন ঘুরে ঢুকল একটা দশ বারো বছরের ফ্রক পরা মেয়ে। দুহাতে ধরে আছে পাঁচটা জলভর্তি গ্লাস সাজানো একটা ছোট ট্রে। আদুর ছেলে কাকুর সামনে গিয়ে বলল, "স্যার, যশোদার মিষ্টি এনেছি।" ওর কথা শুনে কাকু একই ভঙ্গিতে শুয়ে মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ বার করলেন। দুবার চোখের পাতা উল্টে পাল্টে চুপ করে রইলেন। আদুর ছেলে ট্রে হাতে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে প্রদ্যুৎদার দিকে তাকাল। তার মুখের অভিব্যক্তিতে একটু সাহায্য পাওয়ার আকুলতা। প্রদ্যুৎদা উঠে দাঁড়ালেন, কাকুর কাছে গিয়ে তাঁর কাঁধে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "কাকু, ওঠ, জল আর মিষ্টি খাও। সব ঠিক হয়ে যাবে। আদুর ছেলেটাকে তো মুক্তি দাও।" কাকু প্রদ্যুৎদার কথা শুনে আবার গোঁ গোঁ শব্দ বার করে আস্তে আস্তে চেয়ারে ঠিক হয়ে বসতে বসতে বললেন, "হ্যাঁ, ওকে মুক্তি দেওয়া দরকার।" কাকুর ওঠার কায়দা দেখেই বোঝা গেল, তিনি বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা এর পরেও চালিয়ে গেলে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

তিনি চেয়ারে উঠে বসলেন, দুর্বল। আদুর ছেলে গদগদ হয়ে বলল, “স্যার, মিষ্টি খান।” কাকু হাত বাড়িয়ে দিলেন। আদুর ছেলে মিষ্টির একটা প্লেট কাকুর হাতে দিল। তাতে চারটে পান্তুয়া ও দুটো জলভরা তালশাঁস সন্দেশ। বাকি তিনটে প্লেটেও একইভাবে মিষ্টি সাজানো। সেগুলো দীপকদের হাতে হাতে সে তুলে দিল, ওরা মিষ্টি খাওয়া শুরু করল। ফ্রক পরা ছোট মেয়েটা জুলজুল করে ওদের খাওয়া দেখছে। আদুর ছেলে মাথা নীচু করে ঠায় কাকুর সামনে দাঁড়িয়ে।

মিনিট তিনেকের মধ্যেই কাকুর প্লেট পরিষ্কার। আদুর ছেলে কাকুকে বলল, “স্যার, আর দুটো মিষ্টি দিই?” কাকু চোখের মণি দুটো ওপর দিকে তুলে ওর দিকে তাকিয়ে ভাঙ্গা গলায় বললেন, “আছে?” আদুর ছেলে গদগদ হয়ে তাড়াতাড়ি “হ্যাঁ” বলে দ্রুত বাড়ির ভেতরে গিয়ে একটা প্লেটে অনেকগুলো পান্তুয়া ও দুটো সন্দেশ নিয়ে এসে কাকুর সামনে দাঁড়াল। কাকু নিজের প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, “বেশি দিস না।” আদুর ছেলে প্লেটে দুটো পান্তুয়া ও একটা সন্দেশ দিতে কাকু বলে উঠলেন, “না, না, আর দিস না, আমার আবার একটু সুগারের ধাত আছে। ডাক্তার বেশি মিষ্টি খেতে বারণ করেছে।” অন্যেরা কেউ আর মিষ্টি নিল না। জল খেল। কাকুও মিষ্টি শেষ করে দু' গ্লাস জল খেয়ে মৃদু গলায় কান্না কান্না সুরে আফসোস করলেন, “আদু রে, আদু।” তারপর উঠে দাঁড়ালেন। আদুর ছেলের কাঁধে বাঁ হাতটা রেখে দুঃখী দুঃখী ভঙ্গিতে বললেন, “যখনই দরকার হবে আমার কাছে যাবি লজ্জা করবি না।” আদুর ছেলে মাথা নাড়ল। তাতে ‘হ্যাঁ’ বা 'না' কিছুই বোঝা গেল না। হয়তো ভাবছে, দেখা করতে যাওয়া মানেই তো মিষ্টি নিয়ে যাওয়া। দরকার কি, তার চেয়ে না যাওয়াই ভাল।

কাকুরা চারজনেই রাস্তায় নেমে এলেন। আদুর ছেলে সদর দরজা থেকে বিদায় জানানোর পর ওঁরা নিজেদের গাড়ির উদ্দেশে এস এন ব্যানার্জি রোডের দিকে পা চালাতে লাগলেন।

মিনিট দুয়েক পর বেশ খানিকটা এগিয়ে এলে প্রদ্যুৎদা কাকুর পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, “কাকু, তুমি অভিনয় করলে নির্ঘাৎ অস্কার পেতে।” উত্তরে কাকু প্রদ্যুৎদাকে বললেন, 'কেন শালা, দুপুরের টিফিনটা কি খারাপ খেয়েছিস?” প্রদ্যুৎদা বললেন, “সে জন্যই তো বলছি। এই দারুণ প্রতিভাটা তুমি মরতে দিও না।” তারপর শঙ্কঠাকে বললেন, “তুই কেন কাঁদছিলি?” শঙ্কঠা নির্বিকার চিত্তে বলল, “বাবা কাঁদছিল বলে।” প্রদ্যুৎদারা হেসে উঠলেন। আমরা সবাই জানতাম, কাকু যাই বলুক, শঙ্কঠা তাই বলবে। কাকু যদি পশ্চিমদিক দেখিয়ে বলে “এ্যাই শঙ্কঠা, এই দিকে সূর্য উদয় হয় তাই না?” শঙ্কটা উত্তর দেবে, “আপনি যখন বললেন বাবা, তখন নিশ্চয়ই ওই দিকেই সূর্য ওঠে।” সুতরাং কাকু কাঁদলে শঙ্কঠাও যে কাঁদবে, এতে আর যেই হোক, প্রদ্যুৎদা বা দীপকরা আশ্চর্য হবে না। প্রদ্যুৎদা শঙ্কঠার উত্তর শুনে শুধু বললেন, “শালা।”

অভিনয় দক্ষতা সব পুলিশেরই কিছু না কিছু থাকে। শুধু পুলিশ কেন, আমাদের সামাজিক জীবনেও প্রতি মানুষের ক্ষেত্রে অভিনয়টা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে গেছে। সেটা কখনও ভাল কাজে, কখনও বা খারাপ কাজে আমরা অকৃপণভাবে ব্যবহার করে চলি। সমাজ আরও যত অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে থাকবে আমাদের অভিনয়ের দক্ষতার ধার আরও নিপুণ থেকে নিপুণতর হতে থাকবে, সেটা যেন বেঁচে থাকার একটা অবলম্বন। যদিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেটা মানুষের আদর্শগত ক্ষয়িষ্ণুতার মূর্তিমান প্রতীক।

আবার তাৎক্ষণিক অভিনয়ের ক্ষমতায় যে কত জীবন মরণের সমস্যা থেকে বাঁচা যায়, তা আমি কতবার পদে পদে অনুভব করেছি তা বলা যাবে না। তখন থাকতাম আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের কলকাতা পুলিশ টেনিং স্কুলের আবাসনে। আমার ঘরের জানালা দিয়ে উত্তরদিকে ঘোড়দৌড়ের পুরো মাঠটাই দেখা যেত। শনিবার দিন ঘোড়দৌড়ের সময় আমার ঘরের জানালায় দর্শক ভর্তি হয়ে যেত। দর্শকরা সবই আমাদেরই সহকর্মী, সেই সুবাদে তারা আমার ঘরে আসত এবং আমার পছন্দ অপছন্দকে তারা পাত্তাই দিত না। সুতরাং আমি ঘোড়দৌড় চলাকালীন নিজের ঘরেই অনাহূত উদ্বাস্তু হয়ে যেতাম।

লক্ষ্মী ও মুন্না নামের দুটো ছেলে আমাদের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব রকম ফাই-ফরমাশ খাটত। তাদের দিয়েই ওরা বাইরের বুকি থেকে রেসের টিকিট কিনত। বাজি জিতলে ওদের মাধ্যমেই বুকির সঙ্গে সব লেনদেনের কাজটা সম্পন্ন করত।

কলকাতা পুলিশের ফুটবল টিমে আমার অন্যতম সহ খেলোয়াড় অনিল মৈত্র ছিল ওই দর্শক দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ঘোড়দৌড়ের দিন সে আমার ঘরের জানালা প্রথম দখল করত। ওর ঘরটা ছিল আমার ঘরের দক্ষিণ দিকে পাঁচ ছ'টা ঘরের পরে।

একদিন বিকেল দুপুরের মাঝামাঝি সময়, আমি আমার ঘরে খাটের ওপর শুয়ে আছি, মুখের সামনে একটা বই। রাস্তার উল্টোদিকে ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে লোকজনের আওয়াজে বোঝা যাচ্ছে; আজ রেসের দিন। অর্থাৎ ঘরে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি অপাংক্তেয় হয়ে যাব। এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, আর ভাবি না। জানি ঘরের ভেতর দর্শক সমাগমে আমার আর বই পড়া হবে না।

প্রথমেই দাঁতগুলো বার করে ফিকফিক হাসতে হাসতে ঢুকল আমার প্রিয় বন্ধু অনিল। বেঁটে গাট্টাগোট্টা কালো অনিলের সাদা দাঁতগুলো চিকচিক করছে, দেখলাম, খালি গা অনিল, শুধু একটা আন্ডারওয়ার পরে আছে। আমাকে বলল, "কিরে, কি করছিস?"

আমি উত্তর দিলাম না। অনিলের তাতে কিছু যায় আসে না। সে সোজা উত্তরদিকে আমার ঘরের জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘোড়দৌড় শুরু হয়ে যাবে, এখন আমার সঙ্গে অযথা কথা বলে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। তবু আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, "আজ শালা মারবই, তখন কিন্তু খেতে চাইবি না।" আমি ওর এই কথারও কোনো উত্তর দিলাম না। পাশ ফিরে দেওয়ালের দিকে মুখ করে বই পড়তে লাগলাম। জানি, রেসে জিতলে আমাকে আর আরেক বন্ধু ও সহ খেলোয়াড় প্রণব বর্মণকে অনিল খাওয়াবেই। বর্মণ তো প্রতিদিন অনিলকে পটিয়ে ওর পয়সায় খাবেই খাবে। অনিলের মনটা উদার, বর্মণ যে ওকে একদিনও পয়সা খরচা করে খাওয়াচ্ছে না, ও সে ব্যাপারে পুরোপুরি উদাসীন।

ঘোড়দৌড় শুরু হয়েছে, আমি অনিলের চিৎকারেই বুঝতে পারছি। অনিল একা, দলের অন্য সদস্যরা এখনও কেম্ আসেনি জানি না। এদিকে অনিল লাফাচ্ছে আর "হেই, হেই" করে চিৎকার করে যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে ওর সাধের ঘোড়াকে আরও দ্রুত ছোটার জন্য উৎসাহ দিচ্ছে। "হেই, হেই" চিৎকারের পর অনিল শুরু করল, "মার, মার" চিৎকার। অর্থাৎ ওর বাজি ধরা ঘোড়া অন্য ঘোড়া থেকে পিছিয়ে আছে, তাই ও সেই এগিয়ে থাকা ঘোড়াগুলোকে হারাতে আরও জোরে ওর ঘোড়াকে ছুটতে বলছে।

এমন সময় আমার খোলা ঘরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। আমি বই, থেকে মুখ তুলে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি, একজন অচেনা মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, তাঁর পেছনে আরও দু তিনজন প্রায় একই বয়সের ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আমার ঘরের ভেতর তাকিয়ে আছেন। আমি তাকাতেই, যিনি কড়া নাড়াচ্ছিলেন, তিনি প্রশ্ন করলেন, "এখানে কি অনিল মৈত্র আছেন?" প্রশ্ন শুনেই আমি একলাফে আধশোয়া থেকে ভদ্রলোকের সামনে টানটান দাঁড়িয়ে পড়লাম। তখন আমি তাৎক্ষণিক অভিনয় ক্ষমতার তুঙ্গে। আমার পেছন থেকে ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে মুখ করে অনিল তার চিৎকারের মাঝেও প্রশ্নটা শুনেছিল। কিন্তু প্রশ্নকারী যেন এখন তাকে কোনও রকম বিরক্ত না করে তাই সে পেছন দিকে না তাকিয়েই বেশ জোরে বলে উঠল, "না-না, এখানে অনিল মৈত্র নামে কেউ থাকে না।" আমি আর কী করি? খুব নম্রভাবে বললাম, "সে তো এ ঘরে থাকে না, আপনি উত্তরদিকের নয় নম্বর ঘরে যান, সেখানে পাবেন।" ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, "কিন্তু ওখান থেকেই তো বলল, এই ঘরটায় তিনি আছেন।"

আমি যা বোঝার বুঝে নিয়েছি, ভদ্রলোকও ঠিকই শুনে এসেছেন। অনিলও আছে এবং আমার পেছনদিকে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে "মার মার" বলে চিৎকার করে যাচ্ছে। উপায়ান্তর না দেখে আমি বললাম, "ঠিক আছে, আমি দেখছি ও কোথায় আছে, আপনি ওর ঘরে গিয়ে বসুন।" ভদ্রলোক আমার কথায় বিশ্বাস করে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে অনিলের ঘরের দিকে হাঁটা দিলেন। আমি আমার ঘরের দরজায় ঠায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম ওঁরা ঠিক ঘরে ঢুকছেন কি না।

নিশ্চিন্ত হওয়ার পর আমি ছুটে অনিলের কাছে এলাম। অনিল তখনও আন্ডারওয়ার পরে তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়েই চলেছে। ওর পেছনে ওকে নিয়ে যে একটা ছোট নাটক হয়ে গেল, তার কোনও খেয়ালই নেই। আমি কাছে গিয়ে ডাকলাম, "এই অনিল, এই অনিল, শোন।" কে কার ডাক শোনে? ও তখন ঘোড়ার লেজের পেছনে সেই নিশানায় জান প্রাণ নিয়ে ছুটছে। বাধ্য হয়ে আমি ওর একটা হাত ধরে মারলাম টান। টানের চোটে সে আমার দিকে ঝুঁকে টাল সামলে চোখে মুখে আগুন ছড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, "কি হয়েছে কি?" ওর চোখ মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ও পুরোপুরি ঘোড়ায় মত্ত। বোধহয়, ঘোড়াগুলো শেষ ল্যাপে পৌঁছে গেছে, জেতা হারার সন্ধিক্ষণে। আর আমি কিনা রসকষহীনভাবে ঠিক সে সময়ই ওর নেশা ভাঙালাম। বুঝে গেলাম, এ সময় ওর নেশা ভাঙাতে আমাকে ওর থেকেও জোরে চিৎকার দিতে বা ওই রকম কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু বেশি চিৎকার দিলে আগন্তুক ভদ্রলোকেদের কানে পৌঁছে যেতে পারে ভেবে আমি ওর কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে প্রথমে একটা ময়দানী খিস্তি দিলাম। তারপর প্রায় কানের মধ্যে মুখটা ঢুকিয়ে বললাম, "শালা, আজকে তোকে পাত্রীপক্ষের লোকেরা দেখতে আসবে, বলেছিলি না?" আমার কথায় একটু নরম হয়ে গিয়ে অনিল বলল, "হ্যাঁ, তো কি হয়েছে?" ওর কান থেকে মুখটা সরিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বললাম, মনে হচ্ছে ওরা এসেছে।"

আমার কথায় ও বিদ্যুৎচমকের মতো চমকে উঠে বলল, "এসেছে? এটা আসার সময় হলো? শালা বিকেলে আসার কথা ছিল, তা না করে একেবারে দুপুরেই চলে এসেছে। শালা মেয়ের বিয়ের জন্য আর তর সইছে না। এদিকে আমার কালো ভোঁদকা চেহারা, দেখলে তো আর পছন্দ করবে না। ফালতু এ সময়ে জ্বালাতন।" তারপর একটু দম নিয়ে জানতে চাইল, "বসিয়েছিস কোথায়?" বললাম, "তোর ঘরে ওদের বসিয়েছি।" এবার ও চট করে নিজের শরীরের সাজ দেখে আমার দিকে তাকিয়ে কাতরভাবে জিজ্ঞেস করল, "কি হবে? আমার এই আন্ডারওয়ার ছাড়া সব জামাকাপড়ই তো ওই ঘরে।" ঠিক সে সময় ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে একটা বিরাট চিৎকার কানে আসতেই অনিল জানালা দিয়ে সেদিকে তাকাল। আমি ওর তাকানো দেখেই দু হাত দিয়ে ধরে ওর মুখটা ঘরের দিকে ফিরিয়ে বললাম, "এখনও ওদিকে দেখছিস?"

অনিল ওর মুখটা আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে বলল, "কী করব এখন?" বললাম, "দাঁড়া, দেখি কি করতে পারি।" আমি ওকে আমার একটা জামা পরতে দিলাম। ও পরল, একটু বড়। যা হোক করে চালানো যায়। কিন্তু প্যান্ট তো হবে না। বেশ খানিকটা বড় হবে। অনিল জামা গায়ে চাপিয়ে আন্ডারওয়ার পরে দাঁড়িয়ে আছে। শরীরের নীচের দিকে কিছু একটা চাপানোর তাগিদ নিয়ে আমার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার হাসি পেল, হেসেই ফেললাম, বললাম, "এক মিনিট অপেক্ষা কর, আমি আসছি।" অনিলকে দাঁড় করিয়ে একটা ওর মাপের জামা প্যান্ট জোগাড় করতে আমি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। জামাটা বড্ড বড় হয়েছে, সেটাও চালানো ঠিক হবে না। এদিক ওদিক দ্রুত ছুটতে লাগলাম।

ঘর থেকে বেরিয়ে ভাবছি, কার জামা প্যান্ট ওর ঠিক সাইজ মতো হবে? আমাদেরই ব্যাচের সলিল ঝা ও চিররঞ্জন শীট অনিলের মতোই বেঁটে, গাট্টাগোট্টা চেহারার। আমি একটু দূরে ওদের ঘরের দিকে প্রায় ছুটলাম। সলিলকে পেয়ে গেলাম। নিলাম ওর একটা জামা। প্যান্টগুলো সব নোংরা। ছুটলাম চিররঞ্জনের ঘরের দিকে। একটা প্যান্ট পছন্দ করে ফিরে এসে দেখি, অনিল জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তবে চিৎকার করছে না। ওকে ওই অবস্থায় দেখে বললাম, "এখনও ওইখানে দাঁড়িয়ে আছিস? আর আমি তোর জামা প্যান্ট খুঁজে যাচ্ছি।" অনিল ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে করুণভাবে তাকাল, বলল, "আমার ঘোড়াটা হেরে গেছে মাইরি।" বললাম, "নিকুচি করেছে তোর ঘোড়া। ভদ্রলোকেরা অনেকক্ষণ হলো তোর ঘরে বসে আছে, প্যান্টটা পর, তাড়াতাড়ি চল।" আমি জামা পান্ট দিতে অনিল এবার তাড়াতাড়ি করল।

আমিই অনিলকে নিয়ে ওর ঘরের দিকে দুরুদুরু বুকে চললাম। ভয়টা, যদি ওরা অনিলকে চিনতে পারে, এই সেই লোক যে রেসের সময় আমার ঘরে জানালা দিয়ে তাকিয়ে লাফাচ্ছিল আর চিৎকার করছিল। একটাই বাঁচোয়া যে তারা অনিলের পিঠ ছাড়া অন্য কিছু দেখেনি। আর সেই পিঠটা এখন ঢাকা।

অনিলের ঘরের দরজা খোলা। পাত্রীপক্ষের লোকজন সবাই অধীর অপেক্ষায় অনিলের জন্য বসে আছে। আমিই প্রথম ঢুকলাম। পেছনে অনিল। আমাকে দেখে মাঝবয়সী ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, "পেয়েছেন?" আমি মোলায়েমভাবে হেসে বললাম, "হ্যাঁ। আসলে ও ভুলেই গিয়েছিল যে, আপনারা আসবেন। তাই অন্য ঘরে গিয়ে আড্ডা মারছিল।"

অনিলও আমার পেছন পেছন ঘরে ঢুকে পড়েছে। ওকে দেখিয়ে বললাম, "এই হচ্ছে অনিল, যার সঙ্গে আপনারা আলাপ করতে এসেছেন।" ভদ্রলোকেরা অনিলকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করছেন, আর আমি তাঁদের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে লক্ষ্য রাখছি, শরীরের ভাষায় কোনও রকম প্রতিফলন হয় কিনা, যাতে বোঝা যায় যে তাঁরা অনিলকে চিনতে পেরেছেন। চিনতে পারলে যে পাত্রীপক্ষ সটান বাড়ি ফিরে যাবেন, এ ব্যাপারে আমার আর অনিলের মধ্যে কোনও মতান্তর নেই। কারণ কোনও বাঙালি বাড়ির অভিভাবকই চান না এমন পাত্রের সঙ্গে তাঁদের বাড়ির কন্যার বিয়ে হোক, যে কিনা রেস খেলে।

না, তাঁরা অনিলকে দেখে বুঝতে পারেননি যে এই সেই ব্যক্তি যে একটু আগে আমার ঘরের জানালা ধরে ঘোড়দৌড় দেখতে দেখতে লাফাচ্ছিল। অনিলের নমস্কারের বিনিময়ে তাঁদেরও প্রতি নমস্কার সারা হয়ে গেছে। আমি নিশ্চিন্ত হলাম। ভদ্রলোকেদের বললাম, "আপনারা কথা বলুন, আমি আসছি।" তাঁরা একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, আমি না শুনেই ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের ক্যান্টিনের দিকে হাঁটা দিলাম চা জলখাবার দিয়ে আতিথেয়তা করার জন্য। অনিল আমার ভীষণ অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাকে উদ্ধারের কাজটা আমাকেই করতে হবে।

তার ক'দিন আগেই আমি আর অনিল ময়দান থেকে লিগ ম্যাচ খেলে ফিরছি। খেলাটা ছিল মোহনবাগানের সঙ্গে। খেলায় আমরা শক্তিশালী মোহনবাগানের সঙ্গে ড্র করেছি। মনে আমাদের স্বাভাবিকভাবেই ফুর্তি। চৌরঙ্গির মোড়ের কাছে আসতেই অনিল বলল, "আজ

বিয়ার খেলে হয় না?” বললাম, “কিনে নে।”

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডের একটা দোকান থেকে অনিল আমার আর ওর জন্য দু বোতল ঠাণ্ডা বিয়ার কিনল। আমরা ওই দুটো নিয়ে পি টি এসের আবাসনে গিয়ে সৎকার করব। এই উদ্দেশে আমরা চৌরঙ্গির মোড়ে একটা বেসরকারি বাসে উঠলাম। আমি একটু ভেতরে, অনিল বোতল দুটো বগলের তলায় নিয়ে বাসের পেছনের দিকের পাদানিতে দাঁড়িয়ে আছে। বোতল দুটো খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া, কিন্তু ঠাণ্ডা থেকে গরম হওয়ার প্রক্রিয়ায় ঘাম বেরিয়ে খবরের কাগজ আস্তে আস্তে ছিঁড়ে পিছল হয়ে যাচ্ছে। পার্ক স্ট্রিট মোড় ছাড়িয়ে আরও কিছুটা দক্ষিণ দিকে বাস আসার পর ওর বগলের তলা দিয়ে অজান্তে বোতল দুটো রাস্তায় পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে বিয়ারের বুদবুদ উঠে সেগুলো ছড়িয়ে গেল রাস্তায়। বাস ছুটছে। আমি অনিলের মুখের দিকে তাকিয়ে হতাশ। অনিল বোকা বনে আমার দিকে তাকাচ্ছে আর পেছন ফিরে দেখছে ভাঙা বোতলের দিকে। আমার সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তিনি অনিলের বগলের তলা থেকে বিয়ারের বোতল পড়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখেই খেঁকিয়ে বললেন, “ছিঃ ছিঃ, এটুকু ছেলে মদ খাও। তোমার লজ্জা করে না? মদ খেয়ে সর্বনাশ করছ নিজেকে। দুধ খেতে পার না?” বৃদ্ধ ভদ্রলোক অনিলকে ধমকাচ্ছেন আর আমার দিকে তাকিয়ে তাঁর কথার সমর্থন চাইছেন। আমিও বাধ্য হয়ে অনিলের দিকে তাকিয়ে বললাম, “ঠিক, লজ্জা করে না মদ খেতে? লজ্জা হওয়া উচিত।” অনিল আমার কথার উত্তরে একবার কটমট করে তাকাল। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে পেটে হাসি চেপে বাসের সামনের দিকে যাত্রীদের সরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ভান করলাম। কিন্তু গেলাম না। জানি, সামনের স্টপেই অনিল বাস থেকে নেমে যেতে বাধ্য হবে। আমিও তখন নেমে যাব। বাস থামল। অনিল নেমে গেছে। আমিও নামলাম। কেউ কাউকে চিনি না। বাস ছেড়ে দিল। অনিল রাস্তার ধারে পড়ে থাকা একটা আধলা ইঁট হাতে তুলতেই আমি ছুট। অনিলও আমাকে ইঁট হাতে তাড়া করল। ছুঁড়ে মারল। লাগল না। আবার একটা তুলে নিল। দুজনেই ছুটছি। পুরনো থিয়েটার রোডের মুখ থেকে ঘন বর্ষার সন্ধ্যায় যৌবনের পাল তুলে প্রায় কুড়ি মিনিট ছুটতে ছুটতে আমরা একেবারে পি টি এসের সীমানার ভেতর এসে থামলাম। দুজনেই হাঁপাচ্ছি। অনিল ইঁটটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে হাঁপাতে হাপাতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “শালা।” এরকম কতদিন যে আমরা ওই বাসস্টপ থেকে নেমে অতখানি পথ পরিক্রমার সময় আনন্দ করেছি, তার কোনও হিসাব নেই।

সেই অনিলকে পাত্রীপক্ষের লোকেরা দেখতে এসেছেন। আমার তো গুরুদায়িত্ব থাকবেই। আমি আমাদের ক্যান্টিন থেকে যা খাবার পাওয়া যায় সেগুলো প্লেটে সাজিয়ে, চায়ের ব্যবস্থা করে লক্ষ্মী আর মুন্নার হাতে ট্রেগুলো তুলে দিয়ে অনিলের ঘরে যখন পৌঁছলাম, দেখি অনিল দিব্যি পাত্রীপক্ষের লোকেদের সঙ্গে গল্পগুজব করছে। ওর শরীরে যে অন্যের জামাপ্যান্ট চাপানো, সে কথা সে দিব্যি ভুলে গেছে, ওর মধ্যে কোনও আড়ষ্টতাই নেই।

আমি ট্রে থেকে প্লেটগুলো পাত্রীপক্ষের লোকেদের হাতে দিতে দিতে বললাম, “আমাদের ক্যান্টিনে তো বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, তার ওপর এখানে আশেপাশে কোনও দোকান নেই।” বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই বললেন, “এ সবের কি দরকার, আমরা একটু আলাপ করতে এসেছি।” আমি বললাম, “তাতে কি? আমাদেরও তো- -।” ভদ্রলোক কথার উত্তর না দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোমার বাড়ি কোথায় বাবা?” বললাম, “আমার বাড়ি কোচবিহারে।” তিনি জানতে চাইলেন, “সেখানে তোমার কে কে আছেন?” বললাম, “আমার বাবা, মা, দাদা, বৌদি আর আমার স্ত্রী।” তিনি বললেন, “ও, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে।” আমি মুখটা যথাসম্ভব সরল করে বললাম, “এই বছর দেড়েক হল।” তারপর কথার চলন অন্যদিকে ঘুরিয়ে বললাম, “আচ্ছা আপনারা বসুন, আমি একটু আসছি।”

আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম। উত্তরের জানালা দিয়ে দেখলাম ঘোড়দৌড় শেষ হয়ে

গেছে। আমি আবার বই পড়তে শুরু করলাম। মিনিট পনেরো পর অনিল আমার ঘরে এসে আমার যোগাড় করা সলিলের জামাটা শরীর থেকে খুলে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, "কিরে ওরা চলে গেছে? কী মনে হল, এখানে হবে?" অনিল আমার কথার উত্তর না দিয়ে পরণের প্যান্টটা খুলতে খুলতে বলল, "তুই কেন বললি, তোর বিয়ে হয়ে গেছে?" আমি হেসে ফেললাম। বললাম, "উনি যেভাবে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বাড়িতে কে কে আছে, ভাবলাম, তোকে পছন্দ না করে যদি আমাকে পছন্দ করে বসে তখন আবার তোর বিয়েটা হবে না। তাই আমি একেবারে গোড়া মেরে দিতে ওটা বললাম।" অনিলের প্যান্ট খোলা হয়ে গেছে। আমার কথা শেষ হতেই সেটা সে আমার মুখের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "শালা।" তারপর আগের সাজেই শুধু আন্ডারওয়ারটা শরীরে রেখে নিজের ঘরের দিকে হন হন করে চলে গেল।

মাসখানেক পর সেই পাত্রীপক্ষের পাত্রীর সঙ্গেই অনিলের বিয়ে হল। আমরা খুব হই হই করে আনন্দ করলাম। অনিল খোশমেজাজে সংসার করতে লাগল।

কার মেজাজ যে কিসে খোশ হয় এবং সেই মেজাজ শরিফ করতে কী কী উপায় তারা নেয়, তা যদি আগে থেকে জানা থাকত, তবে পুলিশের কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত। ষাটের দশকের মাঝামাঝি, লালবাজারে আমাদের কাছে একদিন সন্ধেবেলায় খবর এল, ভবানীপুর অঞ্চলে এলগিন রোড ও আশুতোষ মুখার্জি রোডের সংযোগস্থলে একটা বেসরকারি বাসের ভেতর এক ভদ্রমহিলার পিঠের দিকের ব্লাউজের নিচে কোমরের শাড়ির উপরে লম্বা করে কে প্রায় ইঞ্চি দুয়েক কেটে দিয়েছে। কাটার সময় তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি জ্বালা জ্বালা অনুভব করার পর ব্যাপারটা দেখতে গিয়ে পিঠে হাত দিয়ে দেখেন পিঠের দিকে কোমরের খোলা জায়গা দিয়ে রক্ত ঝরছে। তিনি তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে পিঠটা ঢেকে পরের স্টপেই বাস থেকে নেমে যান। শাড়িতে লেগে যায় রক্তের দাগ।

খবরটাকে আমরা খুব একটা গুরুত্ব দিলাম না। ভাবলাম, অফিসফেরত যাত্রীবোঝাই বাসে কোনও পকেটমার হয়ত ভুল করে কেটে ফেলেছে। নয়ত অন্য কি উদ্দেশ্যে এমন ঘটনা ঘটতে পারে?

ভুল। আমাদের সিদ্ধান্তটা দিন দশেকের মধ্যেই ভুল প্রমাণিত হল। এই ক'দিনের মধ্যে আরও দুজন অল্পবয়সী ভদ্রমহিলার একই দশার মুখোমুখি হতে হল। এবং প্রায় একই অঞ্চলের গণ্ডির মধ্যে। তাদেরও পিঠেরদিকের ব্লাউজের নিচে পিঠটা আড়াআড়ি ভাবে দু ফাঁক করে নিপুণভাবে কাটা। এবার আমরা আর ঘটনার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারলাম না। বোঝা গেল, হয়ত এই তিনজন ছাড়া আরও অন্য মহিলারাও এই ধরনের অবস্থার শিকার হয়েছেন। তাঁরা লজ্জায় বা অন্য কারণে থানায় অভিযোগ দায়ের করেননি। শুধুমাত্র যে তিনজন লজ্জাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব না দিয়ে প্রতিকারের আশায় থানায় গিয়ে অভিযোগ করেছেন, আমরা শুধু তাঁদের কথাই জানি। ভবানীপুর থানা থেকে সাধারণভাবে অনুসন্ধান শুরু করেছে, কিন্তু তারা এ ব্যাপারে কোনও হদিশই করতে পারেনি। আসামীকে গ্রেফতার করা তো দূরের কথা। এ ব্যাপারে দৈনিক পত্রিকাগুলোতে খবর ছাপা হয়ে যেতে আমাদের কলকাতা পুলিশ বাহিনীর ওপর চাপ বাড়তে লাগল। আর সেই চাপকে সামাল দেওয়ার দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর।

আমি তখন গোয়েন্দা দফতরের মার্ডার সেকশনে। কিন্তু ওপরওয়ালারা আমাকেই দায়িত্ব দিলেন এই সমস্যার সমাধান করার। তখন আমাদের বিভাগে এমন ব্যবস্থা ছিল যে, বিভাগীয় তদন্ত ছাড়াও অন্য বিভাগের তদন্তের ভার অফিসারদের দেওয়া হতো। আমি একজন অ্যাসিস্টান্ট সাব ইন্সপেক্টর সঙ্গে নিয়ে পথে নামলাম। তদন্তের এলাকা ঠিক করলাম পার্ক স্ট্রিট মোড় থেকে দক্ষিণে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড ও রাসবিহারী অ্যাভিনিয়ুর সংযোগস্থল পর্যন্ত। কারণ যতগুলো এই রকম ঘটনা ঘটেছে, প্রতিটাই এইটুকু রাস্তার মধ্যে। অর্থাৎ অপরাধী তার গতিবিধি এবং অপরাধের অঞ্চলটা এই সীমানার মধ্যে বেঁধেছে।

কোথা থেকে শুরু করব তদন্ত, এই চিন্তা করতে করতে আমরা দুজন অফিসের সময় ওই রাস্তার বিভিন্ন বাসে চড়ে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে শুরু করলাম। তখন নিজেদেরই ওপরে বিরক্ত লাগত। মহিলারা দেখতেন দামড়া দামড়া দুটো লোক তাদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে তাদের দিকে নজর দিচ্ছে। সরছে না। অথচ সরে যাওয়ার জায়গা আছে। কখনও বাধ্য হয়ে সরলেও খুব বেশি দূরে সরতাম না। দু চারজন মহিলা আমাদের এমনভাবে কটাক্ষ করতেন যাতে মনে হত, তাঁরা চিনেছেন যে আমরাও সেই গোত্রের লোক যারা বাসের ভিড়ে তাঁদের শরীরের একটু ছোঁয়া পাওয়ার লোভে সারাক্ষণ ছোঁকছোঁক করছি। তাঁদের এইরকম দৃষ্টির ঝলকের মাঝে কিন্তু আমরা অস্বস্তি নিয়েও দাঁড়িয়ে থাকতাম। অপরাধীকে তার অপকর্ম করার সময় হাতেনাতে ধরার আশায়। কিন্তু

ক'টা বাসে আমরা নজরদারি রাখতে পারব? একই সময় শয়ে শয়ে বাস রাস্তায় যাতায়াত করছে, প্রতি বাসেই মহিলা যাত্রীরা রয়েছেন যাঁরা ওই রিকৃত মানসিক অপরাধীর লক্ষ্য। সব বাসেই যদি আমাদের পাহারা দিতে হয়, তবে কলকাতা পুলিশ বাহিনীর আর অন্য কাজ করতে হবে না।

চারদিন আমরা এইভাবে বাসে বাসে চড়ে বুঝলাম, আমরা সঠিকপথে এগোচ্ছি না। এইভাবে অপরাধীকে ধরা খুব মুশকিল। ভবানীপুর থানায় আমরা দু'জন ঘাঁটি গেড়ে প্রতিদিনকার রিপোর্ট নিচ্ছি। কিন্তু কোনও আলোকপাতই হচ্ছে না। পঞ্চমদিনে থানায় ফিরে শুনি, আরও একজন ভদ্রমহিলার একই অবস্থা সেদিন বিকেলে হয়েছে। তার মানে অপরাধী এখনও সক্রিয়। পত্রপত্রিকার লেখালেখিতে তার বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি। একইভাবে সে অপরাধ করে যাচ্ছে। আমরা দু'জন ঠিক করলাম, এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করে অপরাধীর চেহারার বিবরণ কিছু জানতে পারি কিনা, সেই চেষ্টা করে দেখব। আমরা থানা থেকে ঠিকানা নিয়ে সেই ভদ্রমহিলার বাড়ি গেলাম।

কালীঘাটে সেই ভদ্রমহিলার বাড়িতে আমরা পৌঁছলাম সন্ধে পেরিয়ে রাত আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ। ভদ্রমহিলার বাবা তাঁদের একতলা বাড়ির সদর ঘরের দরজা খুলে আমাদের পরিচয় পেয়ে একেবারে খেঁকিয়ে উঠলেন। তিনি মেয়ের উদ্দেশে বেশ জোরে জোরে বললেন, "আমি ঠিকই বলেছি, কি দরকার ছিল থানায় গিয়ে রিপোর্ট করার? বোঝ এবার, বাড়িতে জিজ্ঞেস না করে একেবারে থানায় গিয়ে লিখিয়ে আসার ঠ্যালা সামলাও। ভদ্রলোকের বাড়িতে এখন রোজ রোজ লালবাজার থেকে পুলিশের আমদানী।" আমি ভদ্রলোকের উত্তেজনাকে শান্ত করার জন্য অতি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, "না, না, আমরা ওনাকে একটুও বিরক্ত করব না। তদন্তের স্বার্থে দু একটা জিনিস জেনেই চলে যাব।"

ভদ্রলোক আমাদের কথার কি একটা উত্তর দিচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই পাশের ঘর থেকে প্রায় ঝড়ের বেগে সদর ঘরে ঢুকলেন একজন পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের অবিবাহিত ভদ্রমহিলা। ফর্সা, গোল মুখের ভেতর তীক্ষ্ণ চোখ, মাঝারি উচ্চতার একটু মোটা ধরনের চেহারার মহিলা তাঁর বাবাকে একটু ঝাঁঝিয়েই বললেন, "সে তুমি বুঝবে না বাবা, আমি কতটা যন্ত্রণা পেয়েছি আর অপমানিত বোধ করেছি। আমি সেজন্যই থানায় রিপোর্ট করেছি যাতে ওরা একটা ব্যবস্থা করে। অন্য মেয়েদের যেন আমার মতো হেনস্থা হতে না হয়।" তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "আবার কি জানতে এসেছেন, যা বলার আমি তো ভবানীপুর থানায় সব জানিয়ে দিয়ে এসেছি।" বললাম, "জানিয়েছেন ঠিকই। আমরা আরও কিছু জানতে এসেছি।" ভদ্রমহিলা বললেন, "আমার আর কিছু বলার নেই।

তাঁর উত্তরটা পাশ কাটিয়ে জানতে চাইলাম, "যে লোকটা ' আপনার ব্লাউজের তলায় পিঠের নিচটায় কাটলো, তাকে আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাননি?" ঝাঁঝাল গলায় উত্তর দিলেন, "দেখতে পেলে কি ও বেঁচে থাকত?" আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "তা ঠিক।" তারপর বললাম, "আচ্ছা, যখন আপনার গায়ে আঁচড় দিল, আপনি নিশ্চয়ই বিন্দুমাত্র টের পাননি?" তিনি বললেন, "কতবার একই কথা বলব যে, না, টের পাইনি।" আমি আবার অতি বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম, "কোনও হাতটাতের ছোঁয়া কি অনুভব করেছেন, মানে কখন বুঝলেন?" ভদ্রমহিলা বললেন, "হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে কেমন যেন ঠেলাঠেলি হল, সেই ঠেলা সামলাতে গিয়ে, কেমন যেন মনে হল আমার পিঠটায় জ্বালা জ্বালা করছে।" বললাম, "ঠিক আছে, আর বলতে হবে না। আচ্ছা, যদি দয়া করে ওই কাটা জায়গাটা একটু দেখান।" ভদ্রমহিলার বাবা বলে উঠলেন, "আবার ওখানটা দেখে কী হবে?" আমরা কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই ভদ্রমহিলা বললেন, "দেখাচ্ছি।"

কিছুটা দেখলাম, একেবারে সূক্ষ্মভাবে ব্লেড দিয়ে কাটা। এমনকি ব্লাউজের নিচের দিকের মোটা বর্ডারও কিছুটা নিপুণ হাতে কাটা। খুব সম্ভবত নতুন ব্লেড চালানো হয়েছে। আমি বললাম, "আমরা আজ চলি। বিরক্ত করলাম বলে কিছু মনে করবেন না।"

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে একটা ব্যাপারে আমরা দুজনে স্থির সিদ্ধান্তে এলাম

যে, এইভাবে ব্লেড চালানো একমাত্র ওস্তাদ পকেটমারদের দ্বারাই সম্ভব। ওরাই একমাত্র ট্রেনিং নেয় মানুষের শরীরে প্রাথমিক কোনও অনুভূতি সৃষ্টি না করেই ব্লেড চালানোর।

ঠিক করলাম, পকেটমারদের মধ্যে থেকেই এই অপরাধী খুঁজে বার করতে হবে। পরদিন লালবাজারে পৌঁছেই খবর পাঠালাম কলকাতার পকেটমারের অন্যতম সর্দার নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা করার জন্য। সোনাগাছি অঞ্চলে তার বাড়ি এবং তার পকেটমারীর এলাকা হল দক্ষিণ কলকাতার ওই অঞ্চলটাই, যেখানে এই কীর্তিকলাপগুলো হচ্ছে। পকেটমারেরা নিজেদের মধ্যে এক একটা অঞ্চল ভাগ করে নেয়। এক দলের পকেটমারেরা অন্য দলের এলাকায় গিয়ে পকেটমারী করে না। সেই ভিত্তিতে নন্দের এলাকার কাণ্ডে নন্দকেই ডাকলাম।

সন্ধেবেলায় নন্দ এল। নন্দকে দেখে কোনওভাবে বোঝার উপায় নেই এই লোকটা পকেটমারের সর্দার। লম্বা, কালো, সুন্দর চেহারার নন্দ সবসময় ধোপদুরস্ত সাদা ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি ও কোঁচা দিয়ে ধুতি পরে থাকে। চোখে দামী চশমা লাগিয়ে আস্তে আস্তে বিনয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। রাস্তাঘাটে ওকে দেখলে যে কোনও লোক সম্ভ্রমে পাশ কাটিয়ে দাঁড়াবে।

সেই নন্দ এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি স্যার, আমার ডেকেছেন?" বললাম, "হ্যাঁ।" নন্দ বিনয়ের অবতারের ভঙ্গিতে বলল, "কেন স্যার, কী অপরাধ করেছি?" গম্ভীরভাবে বললাম, "কেন, জানিস না? ন্যাকামি করবি না।" নন্দ তেমনভাবেই বলল, "বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। বুঝলে কি আর আপনাকে আমি মিথ্যা বলব?"

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "তোর লাইনে মেয়েছেলেদের ব্লাউজের নিচে কোমরের ওপরে ব্লেড দিয়ে বাসের মধ্যে কাটা হচ্ছে। তা তুই জানিস না?" নন্দ একেবারে মা কালীর মতো জিভ বার করে বলল, "ছি, ছি, এসব কে করছে? আমি কিছুই জানি না স্যার।" কিছুটা হুঙ্কার দিয়ে বললাম, "না জানলে তো চলবে না নন্দ, জানতেই হবে, এগুলো তোদের দলের লোক ছাড়া অন্য কেউ করেনি। ওরকম সূক্ষ্মভাবে কাটা অন্যদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তুই জানিস না বললে তো আমি ছেড়ে দেব না।" আমার হুঙ্কারে পাকা সর্দার বিশেষ কাৎ হল না। তবু বিনয়ের ভঙ্গি পুরোপুরি বজায় রেখে বলল, "অসম্ভব স্যার, আমার দলের লোকেরা এমন কাজ করতেই পারে না। করলে আমি ওদের হাত কেটে দেব। আমি পরিষ্কার বলে দিই, মেয়েরা হচ্ছে মায়ের জাত, যখন ব্লাউজের ভেতর বুকের কাছে টাকা রাখবে, সেদিকে হাত বাড়াবি না।" আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কড়াভাবে বললাম, তোর বড় বড় বাৎ শুনে আমার লাভ নেই, আমি তোকে একদিন সময় দিলাম আসামী খুঁজে বার করে দেওয়ার জন্য, যদি না দিস, যেখান থেকে তোর ছেলেদের ধরব সেখানেই ওদের হাত পা ভেঙে দেব। তোদের ব্যবসা একেবারে শিকেয় তুলে দেব।"

এবার কাজ হল। নন্দ কাকুতি করে বলল, "একদিন নয়, আমাকে স্যার অন্তত দুটো দিন সময় দিন, আমি আমার ছেলেদের দিয়ে বাসে বাসে পাত্তা লাগিয়ে দেখছি কে করছে।" আমি ঝাঁঝিয়ে বলে উঠলাম, "আর যদি দুদিনে না পারিস তখন কী করব?" নন্দ হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো হতাশ গলায় বলল, "তখন আপনি যা ইচ্ছা হয় করবেন।" চোয়াল শক্ত করে বললাম, "কথাটা মনে রাখিস।" নন্দ ঘাড় কাৎ করে মাথা নিচু করে বলল, "তাহলে এখন আমি যাই?" বললাম, "যা।" নন্দ আস্তে আস্তে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।'

নন্দ চলে যাওয়ার পর আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল যে, নন্দের ঘাড়ে চড়েই এই দুষ্কর্মের নায়কটিকে খুঁজে বার করা যাবে। কারণ নন্দ জানে যদি আসামীর সন্ধান সে দিতে না পারে, তবে ওর দফা রফা করে ছাড়ব। এই পিঠ কাটার কাজটা যে পকেটমারের দলের কেউ করছে, সে বিষয়ে আমার কোনও সংশয়ই নেই। সুতরাং পকেটমারেদের বিরুদ্ধে আমাদের অবিরাম কড়া অভিযান চলবেই। আর সেই অভিযানের ফল যে ওদের না খেয়ে মরা, সেটা নন্দ ভাল করেই জানে। আমরা বাসে বাসে চড়াও হয়ে ওদের ধরব। নন্দ হচ্ছে

'ঠেকদার'। অর্থাৎ একটা দলের পরিচালক। পকেটমারের দলের নিয়ম অনুযায়ী পকেট কাটার পর যা পাবে সব 'ঠেকদারের' কাছে জমা দেবে। ঠেকদার তারপর ভাগ দেবে। তখন সব মানুষ জানতেন, পকেটমার হলেই যদি সেই খবরটা আমাদের লালবাজারের গোয়েন্দা দফতরে জানানো যায় তবে জিনিসপত্র ফেরৎ পাওয়ার আশা আছে। নয়ত নয়। আমাদের কাছে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পকেটমারের খবর এলে আমরা সোজা 'ঠেকদারকে' ধরে এনে হারিয়ে যাওয়া জিনিস উদ্ধার করে দিতাম। ঠেকদাররা আমাদের ভীষণ ভয় করত। নন্দও জানে, আমার কাজটা সে করে দিতে না পারলে ওর 'ব্যবসা' আমরা গুটিয়ে দেব। ও বুঝেছে এটাতে আমাদের সম্মানের প্রশ্ন জড়িত।

দুদিন অপেক্ষা করতে হল না। পরদিনই নন্দ এল। নন্দকে দেখেই আশায় বুক বেঁধে জানতে চাইলাম, "কী খবর নন্দ?" নন্দ বলল, "স্যার, আপনাকে আগেই বলেছি, আমার ছেলেরা এ কাজ করতে পারে না। তাই সত্যি। তবে—" ওর কথা শুনে আমি কিছুটা হতাশ হয়ে গর্জে উঠলাম, "তবে কী?" নন্দ কাচুমাচু হয়ে বলল, "তবে স্যার, একটা ছেলে করতে পারে বলে আমাদের মনে হচ্ছে।" জিজ্ঞেস করলাম, কে  সে?" নন্দ বলল, "ওর নাম স্যার আবদুল, আগে আমার দলেই ছিল, ওর ব্লেডের হাতটা দারুণ। মাস ছ'সাত হল আমার দল ছেড়ে দিয়েছে, ওর স্যার মেয়েছেলের দোষ ছিল। ভাল মেয়ে দেখলেই হাত নিশপিশ করত, এ জন্য কতদিন আমি ওকে গালাগালি দিয়েছি। আমাদের মনে হচ্ছে, আবদুলই এ কাজটা করতে পারে।" জানতে চাইলাম, "কোথায় থাকে সে?" নন্দ বলল, "প্রিন্স আনোয়ার শা রোডে, নবীনা সিনেমার কাছে।" বললাম, "ওকে তো আমাদের চেনাতে হবে।" নন্দ বলল, "সেই ব্যবস্থা আমি করেছি স্যার, আবদুলের সঙ্গে একসময় আমার দলের যে ছেলেটির খুব দোস্তী ছিল, তাকে নিয়ে এসেছি, সে আপনাদের আবদুলকে চিনিয়ে দেবে।" বললাম, "নিয়ে আয় ছেলেটাকে।" নন্দ আমার ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা থেকে ছেলেটাকে ডেকে নিয়ে এল। রোগা, কালো মতন একটা অল্পবয়সী ছেলে। জামা প্যান্ট ধোপদুরস্ত। চুলের ভাঁজ আর চলনে নিজেকে সে বোধহয় সিনেমার নায়ক-টায়ক ভাবে। ভাবুক, আমার দরকার নেই। আমার এখন দরকার আবদুলকে। আর আবদুলকে পেতে গেলে এর সাহায্যের দরকার। ছেলেটা ঘরে ঢুকে সোজা আমার টেবিলের দিকে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল। আমি বাধা দিয়ে মনে মনে নন্দর ট্রেনিংয়ের কথা ভাবলাম। কিন্তু নন্দ তো জানে না শুকনো চিঁড়েতে ভবি ভুলবার নয়। কাজ ছাড়া আমি কিছু জানি না।

ছেলেটিকে বললাম, "তুই তো আবদুলের সঙ্গে অনেক মিশেছিস, তার মানে তুই আবদুল সম্পর্কে সব জানিস, তোর কি মনে হয় ওই কাজগুলো আবদুল করতে পারে?" ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল, "পারে, ও স্যার ওই রকম, মাগী দেখলেই ছুকছুক করে।" নন্দ ছেলেটির দিকে কড়া নজরে তাকাল। তাকানোর ভঙ্গিতে বোঝাতে চাইছে, "ভাষা সামলে।" ছেলেটি ওর ওস্তাদের দৃষ্টিতে যা বোঝার বুঝে নিয়ে মাথা নিচু করে ফেলল। বললাম, "ঠিক আছে। তো তোর নাম কী?" ছেলেটি বলল, "খোকা।"

খোকার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে আমরা আবদুলকে চিনতে পরদিন সকাল দশটা নাগাদ প্রিন্স আনোয়ার শা রোড ও দেশপ্রাণ শাসমল রোডের সংযোগস্থলে এসে দাঁড়ালাম। খোকা জানিয়েছে, এইসময় আর বিকেলবেলা চারটে সাড়ে চারটের সময় আবদুল এই মোড়টায় এসে বাসে ওঠে। খোকা রাস্তার উত্তর দিকে মসজিদের দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়েছে। ওখানে বাস স্টপ, চারদিক থেকে বাস : এসে যাত্রী নামাচ্ছে আর তুলছে। বাস স্টপের সঙ্গে রিক্সা স্ট্যান্ড, সারি দিয়ে সব রিক্সা পুবমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা দু'জন উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে খোকাকে লক্ষ্য রাখছি। কথা আছে, খোকা আবদুলকে দেখলেই গলা জড়িয়ে কথা বলবে। এমন ভাব করবে, যেন আবদুলকে দেখে খোকার মনে খুব স্ফূর্তি হয়েছে, আমরা আবদুলকে চিনে নেব। খোকা তাই এক দৃষ্টিতে পুবদিকে তাকিয়ে আছে। আবদুল ওদিক থেকেই আসবে।

খোকা দাঁড়িয়ে নজর রাখছে, আমরা খোকাকে নজর রাখছি। আধঘণ্টা চলে গেল।

খোকা নড়ল না। আমরাও নড়লাম না। আরও আধঘণ্টা পর এগারটা নাগাদ হঠাৎ খোকা নড়ে উঠল। ওর মুখে হাসি দেখতে পেলাম। আমরা অনড়, শুধু চোখ জোড়া খুলে রেখেছি। খোকা একটু এগিয়ে গেল। উল্টো দিক থেকে সাইকেল চড়ে, হেঁটে একা কিংবা জোড়ায়, পাঁচ ছ'জন লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কোন লোকটা খোকার লক্ষ্য প্রথমে বুঝতে পারলাম না। তবে খোকা যে তার প্রতীক্ষার ফল পেতে চলেছে তা ওকে দেখেই আমরা বুঝতে পেরেছি। এখন খোকার মাধ্যমে আমরা নির্দিষ্ট বস্তুটাকে চিনতে চাই।

খোকা হাসতে হাসতে বেশ কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা ছেলের কাঁধে হাত রেখে কথা বলতে বলতে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। বুঝলাম, এই হচ্ছে আমাদের আগমনের কারণ আবদুল। খোকা আর আবদুল কথা বলতে বলতে আমাদের দিকেই ফুটপাতের একটা চায়ের দোকানের সামনে একটা বেঞ্চিতে বসল। আমাদের থেকে বিশ পঁচিশ হাত দূরত্বে বসে ওরা দোকানদারকে চায়ের অর্ডার দিল। আমরা আস্তে আস্তে দক্ষিণদিকে হাঁটতে লাগলাম। আমাদের যা দেখার দেখা হয়ে গেছে। আবদুলের গায়ের রঙটা মাজা মাজা। মাঝারি উচ্চতার দোহারা চেহারা। বাঁ দিকের গালের ওপর একটা কাটা দাগ। ওটা না থাকলে মোটামুটি মুখটা ভালই ছিল। ওই মুখ আর ভুলব না।

দক্ষিণ দিকে খানিকটা এগিয়ে এসে বাঙুর হাসপাতালটা বাঁ দিকে রেখে একটা গলিতে ঢুকলাম। ওখানেই আমরা আমাদের গাড়িটা রেখেছি। গাড়িতে উঠে আমরা লালবাজারের দিকে রওনা দিলাম। ঠিক করলাম, সেদিন বিকেল থেকেই আবদুলের পেছনে আমরা লেগে যাব।

বিকেল তিনটে। আমরা দুজন লালবাজার থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। আবদুলের গতির ওপর নজর রাখার জন্য চারটের মধ্যে প্রিন্স আনোয়ার শা রোডের সেই মোড়টায় পৌঁছতে হবে। ট্যাক্সি ছুটল দক্ষিণ দিকে। আবদুলের মুখটা চোখের সামনে ঝুলে আছে। খোকার কথা সত্যি হলে আবদুলকে আমরা পাব।

সাড়ে তিনটের সময় আমরা টালিগঞ্জ ফাঁড়ির মোড়ে দীপ্তি সিনেমার উল্টো দিকে ট্যাক্সি থেকে নামলাম। বাকি পথটা হেঁটে যাব। নজরদারির জায়গায় ট্যাক্সি থেকে নেমে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলে সন্দেহজনক লোকেরা ঠিক ধরে নেবে আমরা কোনও মতলব ছাড়া কেনো দাঁড়িয়ে।

তাই হেঁটে এসে দাঁড়ালাম। সকালবেলা যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ছিলাম সেই জায়গায় না দাঁড়িয়ে একটু পুব দিক ঠেসে দাঁড়ালাম। দুজনে রাস্তার দু'দিকে, তারপর অপেক্ষা। চোখের পাতাকে স্থির রাখতে হবে। দু'পাতার মাঝখান দিয়ে পাখি পালিয়ে না যায়।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। খোকার কথাই ঠিক, আবদুল আসছে। সকালে ওকে একরকম বেশে দেখেছি, বিকেলে একদম অন্যরকম। সকালে পায়জামার ওপর একটা ঢিলেঢালা পাঞ্জাবি চাপিয়ে একটা হাওয়াই চটি ফটফট করতে করতে এসেছিল। কিন্তু বিকেলে এল, একেবারে অন্য ঢঙে। সাদা প্যান্ট, সাদা ফুলহাতার টানটান ফুলশার্ট। প্যান্টের ভেতর শার্টটা গোঁজা। একটা বাদামী মোটা চামড়ার বেল্ট প্যান্ট ও শার্টের সীমারেখা টেনেছে। পায়ে চকচকে জুতো। মাথার ওপর চুলে এমন টেরি কেটেছে যে মনে হচ্ছে কোনও সাপ যেন ফণা তুলে ছোবল মারতে উদ্যত। ওই টেরি দেখে ভাবলাম, যদি হাতে নাতে ধরি বাপু তবে আমি টেরিয়ে দেব।

আবদুল আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। হাতে বিশেক তফাৎ রেখে আমরাও ওর পিছু নিলাম। আবদুল উত্তর দিকে এগিয়ে দীপ্তি সিনেমার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আমরাও উদাস উদাস ভঙ্গিতে ওর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম

বিভিন্ন রুটের বাস আসছে। স্টপে দাঁড়াচ্ছে, চলে যাচ্ছে, আবদুল উঠছে ও একটা সিগারেট ধরিয়ে টানছে আর বাস চলাচলের ওপর ঠিক নজর রাখছে। আমরাও ওকে নজর রাখছি।

মিনিট দশেক পর একটা সরকারি বাস এল। আবদুল ওই বাসের সামনের দরজা দিয়ে উঠে গেল। আমরা দুজনও ওই বাসে উঠে পড়লাম। দুজনে দুই দরজা দিয়ে। বাসে খুব একটা ভিড় নেই। সবাই বসে আর সামান্য দু একজন দাঁড়িয়ে আছে। আমরা শুধু তাদের সংখ্যা বাড়ালাম। আবদুলকে দেখে কে মনে করবে যে সে একটা ওস্তাদ পকেটমার। বাসে মহিলা যাত্রী বেশি নেই। বিভিন্ন বয়সীর আট ন'জন। প্রত্যেকেই বসে আছেন। আবদুল তাদের সামনে একটা রড ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে বললে ভুল হবে, নানান রকম কসরৎ করে যাচ্ছে, যাতে মহিলাদের নজর তার ওপর পড়ে। অস্থিরভাবে একবার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাচ্ছে, একবার চুলের টেরি ঠিক করছে, একবার প্যান্টের বেল্টের ওপর আঙুল গুঁজে শার্ট টানটান করে ঠিক করছে। আসলে কী করে যে মহিলাদের আকর্ষণ ওর দিকে টানবে তা বুঝতে না পেরে যা পারছে তাই করে যাচ্ছে। বাস যেমন চলার চলছে, যাত্রী উঠছে, নামছে, আমি পেছন দিকে একটা বসার জায়গা পেয়ে বসে বসে আবদুলের ওপর নজর রেখে যাচ্ছি। আমার সঙ্গী আবদুলের কাছাকাছিই আছে। এ বাসে আবদুলের কোনও সুবিধা হবে না তা আমরা বুঝে গেছি। বাসে তেমন ভিড় নেই যে কারও পকেটমারা সোজা হবে। অন্যদিকে কোনও মহিলাও দাঁড়িয়ে নেই যে তাঁর ব্লাউজের নিচে পেছন দিকে ব্লেড চালাবে।

ভাবছি, আবদুল কোথায় যাবে, কোনখানে নামবে, চট করে নেমে গেলে, আমাদেরও তাড়াহুড়ো করে নামতে হবে। তখন ওর নজরে পড়ে যেতে পারি। তাই অতি সাবধানে চলতে হবে, যাতে কিছুতেই বুঝতে না পারে ওর পেছনে কেউ নজর রাখছে। বাস ভবানীপুর ছাড়াতে আবদুল জায়গা পেয়ে বসে পড়ল। বসতে ভাবলাম, কোথায় যাবে ও? বাসটা যাবে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত। ও কি তবে স্টেশন পর্যন্তই যাবে? তাহলে আমাদেরও হাওড়ায় যেতে হবে। আমরা দু'জন ওর ওপর নজর রাখলেও কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছি না। আলাদা আলাদা হাওড়া পর্যন্ত বাসের টিকিট কেটেছি। পুলিশের কার্ড দেখিয়ে জানান দিইনি যে আমরা পুলিশ। তবে দুজনে মাঝে মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা ইশারায় সেরে নিচ্ছি।

বাস বি বা দী বাগের জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনে এলে আবদুল বাস থেকে নেমে গেল। আমরাও দুজন বাসের দুই দরজা দিয়ে নেমে গেলাম। আবদুল বাস থেকে নেমে দুবার রাস্তার দুদিকে তাকাল। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে সিগারেট ধরাল। আমরা ওর দু'পাশে বেশ খানিকটা দূরত্ব নিয়ে উদাসীন ভাবে রাস্তার যানবাহন চলাচল দেখছি।

আবদুল এরপর সিগারেট টানতে টানতে রাস্তার পশ্চিম দিক থেকে পুব দিকে গেল গোল দীঘির ভেতরে। আমরাও দূরত্ব বজায় রেখে রাস্তার উল্টো দিকে এগিয়ে গেলাম। আবদুল টেলিফোন ভবনের পেছন দিক দিয়ে পুব দিকে এগিয়ে চলেছে। আমরাও আলাদা আলাদা ভাবে অফিস ফেরৎ লোকজনের যাতায়াতের মাঝখান দিয়ে গলে গলে এগিয়ে চলেছি। জানিনা, শেষ পর্যন্ত. আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব কিনা। আবদুল গোল দীঘি পার হয়ে, ট্রাম চলাচলের লাইনও পার হল। এরপর স্টিফেন হাউসের পশ্চিম দিক থেকে বি বা দী বাগ ইস্ট রাস্তা পেরিয়ে পুব দিকে গিয়ে সোজা উত্তর দিকে সেন্ট অ্যানব্রানস গির্জার সামনে বাস স্টপের দিকে এগিয়ে গেল। আমরাও আড়াল করে করে এগিয়ে বাস স্টপে বহু অপেক্ষমান যাত্রীর ভিড়ে মিশে গেলাম।

কলকাতার দক্ষিণ ও দক্ষিণ শহরতলীর বিভিন্ন প্রান্তে যাওয়ার জন্য অনবরত বাস পশ্চিম দিক, উত্তর দিক ও বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটের দিক থেকে আসছে। আবদুলের চোখ বাসগুলোকে যে যথাযথভাবে নিরীক্ষণ করছে আমরা তার শরীরের ভাষাতেই বুঝতে পারছি। আসলে হাওড়ার দিক থেকে যে বাসগুলো আসছে এবং যাদের নির্দিষ্ট রাস্তা তার গণ্ডির ভেতর দিয়ে যাবে সেগুলোতে অসম্ভব ভিড়। বাসের পা দানিতেও পা রাখার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি বাসগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্টপে না দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

ভিড়ের ভেতর আবদুল অবিচল। আমরা ও অবিচল। আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া আছে যে যদি আমরা দেখি আবদুল কোনও যাত্রীর পকেট খালি করে দিচ্ছে, আমরা তা দেখেও নির্বিকার থাকব। ওকে পকেট মারতে দেব। কারণ তখন যদি ওকে ধরি তবে আমরা যে লক্ষ্য নিয়ে ওর পেছনে ধাওয়া করেছি তা পূর্ণ হবে না। আমাদের মধ্যে ঠিক আছে, আমরা অপেক্ষা করব, যতক্ষণ না সে তার কুখ্যাত অপকর্মটি করছে।

প্রায় সাড়ে পাঁচটা নাগাদ গড়িয়া যাওয়ার একটা একতলা সরকারি বাস স্টপেজের সামনে হাওড়ার দিক থেকে এল। সামনের দরজার পাদানিটা ফাঁকা। ক'জন যাত্রীর সঙ্গে আবদুলও পাদানিতে পা রাখল। আমরাও একই পাদানিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে বাস দক্ষিণমুখী ছুটল। আবদুল বাসের ভেতরে যাওয়ার জন্য অন্য যাত্রীদের সঙ্গে নিঃশব্দে ঠেলাঠেলি করতে লাগল। কার্জন পার্কের কাছে বাসটা আসার আগেই আবদুল বাসের ভেতর ঢুকে গেল। ওখানটায় মহিলা যাত্রীদের বেশ ভিড়। বসার জায়গা ভরতি হয়ে যাওয়ার পরেও বেশ ক'জন মহিলা জটলা করে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমরাও ঠেলেঠুলে বাসের ভেতর ঢুকে গেলাম। আবদুলকে একা ছাড়া যাবে না, ওর প্রতিটা কাজের ওপর আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। পকেট কাটলেও ব্যাপারটা দেখে রাখতে হবে। যাতে পরে তার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

বাসটা যখন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড ও জওহরলাল নেহরু রোডের সংযোগস্থলে এল আমরা তখন দু'জনে আবদুলের দুদিকে নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের সামনে বেশ ক'জন মহিলা যাত্রী পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন। বাসের দুলুনিতে মাঝেমাঝেই আমাদের সঙ্গে মহিলা যাত্রীদের শারীরিক সংঘাত হচ্ছে।

আবদুল যেখানটায় দাঁড়িয়েছে তার ডানদিকে যে মহিলা দাঁড়িয়েছেন তিনি বয়সে তরুণী, দেখে মনে হল সদ্য বিবাহিতা, সিঁদুর অতিরিক্তভাবে লম্বা করে কপাল থেকে সিঁথি বরাবর টানা। পরণে লাল তাঁত সিল্ক, সঙ্গে ম্যাচ করা লাল জর্জেটের ব্লাউজ। বাঁদিকের আঁচলটা ব্লাউজের সঙ্গে পিন করে আটকনো। চৌকোনা গলার ব্লাউজের পেছন দিকের উপরে ও নিচে একটু বেশিই ফাঁকা। তাতে ফর্সা পিঠটা প্রায় উন্মুক্ত। আমরা বাঁ দিকে আবদুল আর ওই তরুণী। আবদুলের বাঁদিকে আমার সঙ্গী। তার সামনেও একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি মধ্যবয়স্কা। আমার বাসের জানালা দিয়ে বাইরে দেখার ভান করলেও আবদুলের গতিপ্রকৃতির ওপর সম্পূর্ণ নজর রাখছি। মাঝে মধ্যেই সে উসখুস করছে, আর বাসের ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছে করে তরুণী বধূকে নিজের শরীর দিয়ে ঠেলা দিচ্ছে। সবই ঘটছে ভীষণ দ্রুতগতিতে।

কলকাতা জাদুঘরটা বাঁদিকে রেখে বাস দক্ষিণ দিকে পার্ক স্ট্রিটের মোড়ের দিকে ছুটছে। ভিড়টা প্রায় দলা পাকানো। বাসের ভেতরে দিনের আলো কমে আসায় যাত্রীদের ভিড়ে সেটা প্রায় অন্ধকার। আবদুলকে দেখলাম তার ডান হাতটা ওর সাদা প্যান্টের পকেটে ঢোকাতে। আমি সজাগ। আধ মিনিটের মধ্যে সে পকেট থেকে হাতটা বার করে নিল। ভিড়ের ঠেলায় বুঝতে পারলাম না ওর ডান হাতের মুঠোয় কিছু আছে কি না।

বাস পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়াল। ভিড়ের চাপটা আরও বাড়ল। যাত্রী কেউ নামছেন না, আরও উঠছেন। নিত্যযাত্রীরা এভাবেই দিন শেষে ক্লান্ত শরীরে যুদ্ধ করতে করতে বাড়ি ফেরেন।

পার্ক স্ট্রিট মোড় থেকে বাস জীবনদীপ ভবনের দিকে ছুটতে শুরু করতেই আবদুলের ডান হাতের পাঞ্জা তরুণী বধূর পিঠের ব্লাউজের ঠিক নিচের দিকে খোলা জায়গায় আড়াআড়ি ভাবে আলতো টান মারল। আমি বাসের রড ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে আবদুলের ডান হাতটা চেপে ধরে চিৎকার করে বললাম, "শালা, বদমায়েসী, এতদিনে ধরেছি।" আমার সঙ্গীও ওকে সঙ্গে সঙ্গে জাপটে ধরেছে।

হঠাৎ এমন কাণ্ড দেখে যাত্রীরা কিছু না বুঝেই হইচই শুরু করতে, আমি চিৎকার করে

ড্রাইভারকে বাসটা থামাতে বললাম। কন্ডাক্টারও ঘণ্টা মেরে বাসটা থামিয়ে দিবেন। আবদুল জাপটাজাপটি করে আমাদের থেকে মুক্তি পেতে চাইছে। তার ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমার মাঝখানে আধখানা ব্লেড রেখেছিল। সেটা সে আঙুল দুটো ফাঁক করে নিচে ফেলে দিয়েছে লক্ষ্য করেছি। ওকে বললাম, "তোল শালা ব্লেডটা।" সে বলল, "আমি কিছু জানি না, কিছু জানি না, আমাকে শুধু শুধু এমন করছেন কেন?" চিৎকার করে বললাম, "কেন, শালা জানিস না, ওই ভদ্রমহিলার কী করলি। পিঠের খোলা জায়গাটা কেটে দিলি।" বাস ততক্ষণে দাঁড়িয়ে গেছে। যাত্রীরা উঁকি দিয়ে তরুণী বধূর পিঠের দিকে তাকাচ্ছেন। ইঞ্চি খানেকের মতো কেটেছে, রক্ত দানা দানা হয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি লজ্জায় লাল হয়ে তাড়াতাড়ি আঁচল টেনে পিঠটা ঢেকে দিলেন। শাড়িতে রক্ত লাগতে লাগল। ইতিমধ্যে বাসের বেশ কিছু যাত্রী রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছেন। আমি যাত্রীদের উদ্দেশে বললাম, "আমরা লালবাজারের পুলিশ অফিসার। একে ধরবার জন্য বেশ কিছুদিন ধরে চেষ্টা করে আজ ধরেছি। আপনারা একটু সরে দাঁড়ান, একে আমরা পার্ক স্ট্রিট থানায় নিয়ে যাচ্ছি।"

আমরা আবদুলকে টেনে বাসের দরজা দিয়ে নামানোর সময়ই যাত্রীদের অজস্র মন্তব্য শুনতে পাচ্ছি, তাদের কেউ কেউ আবার দু'চার ঘা আবদুলের পেটে মুখে চালিয়ে দিয়েছে। ওকে রাস্তায় নামিয়ে তরুণী বধূকে চিৎকার করে অনুরোধ করলাম, "দিদি, আপনাকেও আমাদের সঙ্গে একটু যেতে হবে, আপনার অভিযোগ আমাদের লিপিবদ্ধ করা দরকার।" ভদ্রমহিলা একে লজ্জায় অস্থির, তার ওপর পুলিশের ঝামেলায় কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। আমি এবার বাসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, "আপনার কোনও অসুবিধা নেই, মিনিট দশেকের মধ্যেই আপনাকে ছেড়ে দেব।" বাসের ক'জন সহযাত্রীও আমাদের অনুরোধ শুনে ভদ্রমহিলাকে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ যান, এসব লোকদের একেবারে প্রশ্রয় দেবেন না।"

ভদ্রমহিলা অসহায়ভাবে দরজার দিকে এগিয়ে এলেন আমাদের অনুরোধ রক্ষা করার জন্য। এবার আমি বাসের ভেতর আমার পাশে দাঁড়ান দু'তিনজন ভদ্রলোককে বললাম, "আপনারাও চলুন।" তাঁরা প্রায় সমস্বরে বলে উঠলেন, "আমরা?" বললাম, "হ্যাঁ। আপনাদের প্রয়োজন সাক্ষী হিসাবে।" আমার কথা শুনে তাঁদের উজ্জ্বল মুখগুলো মুহূর্তে পাল্টে পাংশুটে হয়ে গেল। একজন বলে উঠলেন, "আমার ভীষণ তাড়া আছে।" অন্য একজন বললেন, "আমারও।"

আমি ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, এই লোকগুলোই ভদ্রমহিলাকে বলছিলেন, 'যান, যান এসব লোককে ছাড়বেন না।' ভদ্রমহিলা রাজী হলেন, আর এরা কেউ ভয়ে রাজী হচ্ছেন না। আমি মাথা ঠাণ্ডা রেখে বললাম, "আপনারা প্রত্যেকে এড়িয়ে গেলে তো চলবে না, দু'চারজনের সাহায্য আমাদের চাই, নয়ত ওই লোকটাকে তো সাজা দিতে পারব না।"

আমার মিনতিতে কিছুটা কাজ হল। দুটো অল্পবয়সী ছেলে, যারা ওই ঘটনাটা পুরোপুরি দেখেনি, তারা বলল, "আমরা গেলে কাজ হবে?" বললাম, "হবে।" ওরা বলল, "তবে চলুন।" তারা বাস থেকে নেমে এল। তাদের নামতে দেখে প্রত্যক্ষদর্শী যিনি প্রথমে বলেছিলেন, আমার তাড়া আছে, তিনিও নেমে এসে বললেন, "চলুন, আজকের কাজটা নয় তো কালই করব, তবু আপনাদের সঙ্গেই যাই।" আমরা আবদুলকে দুজনে দু'পাশে ধরে টানতে টানতে পার্ক স্ট্রিট থানার দিকে নিয়ে চললাম। আমাদের সঙ্গে চলেছেন সেই তরুণী বধূটি আর সাক্ষী হিসাবে অল্পবয়সী দু'টো ছেলে ও ভদ্রলোকটি।

আট ন'মিনিটের মধ্যে আমরা পার্ক স্ট্রিট থানায় পৌঁছে গেলাম। থানায় তরুণী বধূকে প্রথমে কাটা জায়গায় ফার্স্ট এইড দিয়ে তারপর এজাহার লেখালাম ও সাক্ষী হিসাবে ওই তিনজনের বয়ান লিপিবদ্ধ করে তাঁদের ছেড়ে দিলাম। ছেড়ে দেওয়ার আগে ভদ্রমহিলাকে বললাম, "দিদি, আপনার ব্লাউজটা দয়া করে নষ্ট করবেন না কারণ ওটাতে যে রক্ত লেগেছে তা কোর্টে আমাদের দাখিল করতে হবে।" তিনি মাথা নেড়ে চলে গেলেন।

এবার আমি আবদুলকে নিয়ে পড়লাম। ওকে আমি এতক্ষণ সহ্য করেছি। প্রথমেই ওর মাথার ওপর ফণার মতো চুলের টেরিটা ধরে মারলাম এক টান। টানের চোটে সে হাউমাউ করে কেঁদে আমার পায়ের ওপর পড়ল। জানি, ও একটা পাকা পকেটমার। মারের হাত থেকে বাঁচতে এমন অভিনয় করবে যে, যে কোনও লোক ধোঁকা খেয়ে তাকে ছেড়ে দেবে। আমি তো আর অভিনয়ে ভুলব না। ওয়াটগঞ্জের থানা অঞ্চলে দেখেছি এদেরই এক শাকরেদ পকেটমার মারের হাত থেকে বাঁচতে লক আপের ভেতরের পায়খানা থেকে তুলে মলমূত্র নিজের সারা শরীরে মেখে রাখত। অর্থাৎ এবার মারো। তাহলে তোমারও হাতে ওই নোংরা লাগবে। তাই আবদুলের অভিনয়ে আমার বিন্দুমাত্র করুণা হলো না। আমি ডাণ্ডা দিয়ে মারের ওপর লাগালাম মার। বিশেষ করে ডানহাতের ওই আঙুল দুটোর ওপর যে দুটো দিয়ে সে বহু মহিলার পিঠ কেটে ফালা ফালা করেছে।

মিনিট কুড়ি মারের চোটে আবদুলের দম হাল্কা। ওকে নিয়ে আমরা চলে এলাম লালবাজার। ঢুকিয়ে দিলাম লালবাজারের সেন্ট্রাল লকআপে।

দিন সাতেক পর আবদুল আদালত থেকে জামিন পেয়ে গেল। আবদুল বেরিয়ে গেল। আমরা এক মাসের মধ্যে আদালতে ওর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করলাম। কিন্তু যে সব মহিলার সে পিঠ কেটেছিল তাঁরা কেউ লজ্জায় আদালতে এসে বয়ান বা সাক্ষী দিলেন না। ফলে আবদুল বেকসুর খালাস পেয়ে গেল।

খালাস পেয়ে আবদুল মহানন্দে আদালতের চত্বর থেকে বেরিয়ে আসতেই আমরা আবার ওকে ধরে লালবাজার নিয়ে এলাম।

একটাই উদ্দেশ্য, যাতে আবদুল আর স্বপ্নেও সাহস না দেখায় মহিলাদের ওইভাবে শ্লীলতাহানি করার। এবং তার জন্য একটাই ওষুধ আছে। সেটা হচ্ছে মার।

হ্যাঁ, সেই মারই ওকে আবার দিলাম। ওর চুলের টেরি কেটে দিলাম। আবদুল মারের চোটে কাঁদতে কাঁদতে শুধু বলল, “আর আমি করব না স্যার, দেখে নেবেন। আর আমি করব না।” বললাম, “মনে রাখিস।” তারপর ওকে ছেড়ে দিলাম।

আবদুল মনে রেখেছিল। আর কোনওদিন সে আঙুলের ফাঁকে ব্লেড রেখে মহিলাদের পিঠের কোনও অংশ কাটেনি। মারের চোটে ওর বিকৃত রুচি ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সমাজের বিভিন্ন স্তরে কত রকমের বিকৃত রুচির খেলায় প্রতিদিন কত কী ঘটে যায়, কে তার খোঁজ রাখছে? যতক্ষণ না সেই রুচি আলোতে এসে চোখে না দেখা দিচ্ছে পুলিশও সব সময় হদিশ পায় না। সেই রুচির খেলায় খুন হয়ে যায় কত নিরীহ জন!

উনিশশো সাতান্ন সাল। সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষ তখনও নিজের পায়ে হাঁটার দিক নির্ণয়ে ব্যস্ত। বিভক্ত বাংলার বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি সাধারণ বাঙালি। পুব থেকে পশ্চিমে নেমেছে উদ্বাস্তুর ঢল। সমস্যা জর্জরিত ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবাংলার সেটা একটা বিরাট সমস্যা। সেই সমস্যার নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বাঙালি, বিশেষ করে পুবপারের বাঙালিরা উদভ্রান্তের মতো পথ হাতড়ে মাথা কুটে মরছে। কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে গড়ে উঠেছে উদ্বাস্তুদের ছোট বড় কলোনি। মানুষ সেখানে খুঁজে নিয়েছে তাদের কোনও মতে মাথা গোঁজার ঠাঁই। অশ্রুপাতের নদীতে কত যে পরিবার কোন সমুদ্রে ভেসে গেছে তার হিসাব কারও জানা নেই। যারা ভাসতে ভাসতে বেঁচে গেছে তারা প্রাণরক্ষার যুদ্ধে প্রতিনিয়ত রণক্ষেত্রে ক্ষতবিক্ষত।

তবু তখনও বাঙালি সৎ ছিল। প্রতিটা কথাই মিথ্যার আবরণে মুড়ে দিত না। দেশনায়কদের আদর্শকে নিজেদের আদর্শ বলে মনে করত। শত দুঃখকষ্টেও একে অপরকে সাহায্যের হাত নির্দ্বিধায় বাড়িয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতো না। ধান্দাবাজি করার লোকের সংখ্যা খুবই কম ছিল। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মাথা উঁচু করে চলার জন্য লড়াই করে বেঁচে থাকার প্রচণ্ড প্রবণতা ছিল। যাকে বর্তমান প্রজন্মের যুবক যুবতীরা বোকার লক্ষণ বলে থাকে। তখনও সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করত, দেশের নেতারা সৎ এবং তাঁরা সঠিক দিশায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এককথায়, তখন এত গভীর সঙ্কটেও শিক্ষা, সংস্কৃতি, আদর্শ, নীতি, আত্মসম্মান বেঁচে ছিল। অর্থনীতি, রাজনীতিতে এত অবক্ষয় এবং নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি সমগ্র দেশকে গ্রাস করেনি।

প্রশ্ন উঠতে পারে তখন কি দুষ্কৃতিরা ছিল না? ছিল। তার আগে ও পরাধীন ভারতবর্ষে যখন দেশপ্রেমিকরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন তখনও দুষ্কৃতীরা সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিজেদের অপকর্ম চালিয়ে গেছে!

তবে দুষ্কৃতিরা সংখ্যায় অনেক কম ছিল। যেমন ছিল গোপেশ্বর দাস ও ধীরেন সেন। এরা দুই বন্ধু হরিহর আত্মা। এরা একসঙ্গে ব্যবসা করত। মানুষ ঠকানোর ব্যবসা। এই ব্যবসায় তাদের কোনও নির্দিষ্ট পথ ছিল না। যখন যেমন ভাবে পারত সে ভাবেই তারা মানুষ ঠকাত। ওরা সবসময় কেতাদুরস্ত হয়ে থাকত, যেন কোনও অভিজাত পরিবারের উঁচু স্তরের ভদ্রলোক। কথাবার্তাতেও মার্জিত এবং পালিশ করা। ঠকে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কেউ বিশ্বাসই করতে পারত না যে ওরা মানুষ ঠকানোর ব্যবসা করে।

মানুষের টাকা আত্মসাৎ করে ওরা কিন্তু নিজেদের ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা করত না। সেই টাকায় ওরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় কলকাতার ভাল ভাল বার ও হোটেলে আকণ্ঠ মদ্যপান করত এবং মদ্যপান করে অনিবার্যভাবে বাবু কালচারের আগের থেকে গজিয়ে ওঠা কলকাতার উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণের বারবণিতাদের অঞ্চলে গিয়ে যৌনকর্মীদের সঙ্গে রাত কাটাত। বিভিন্ন যৌনকর্মীদের ঘরগুলিই ছিল ওদের রাতের ঠিকানা।

এভাবেই ওরা বছরের পর বছর দিন আর রাত কাটিয়ে গেছে। কিন্তু পুলিশের খাতায় ওদের নাম ওঠেনি। ওরা ঠিক কায়দা করে ফাঁকফোঁকর দিয়ে গলে জীবনের বন্যতা উপভোগ করেছে। সেটাই ছিল তাদের আদর্শ, একান্ত কাম্য, তাদের আরাধ্য জীবন।

চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সে ওরা শুরু করেছিল এ জীবন। তারপর টানা প্রায় পনের বছর ধরে এই স্ফূর্তির পথ ধরে ওরা চল্লিশ বছরের প্রান্তে। আর এই নেশায় তারা বিন্দুমাত্র ক্লান্ত নয়। এটা না পেলেই বরং তারা ক্ষিপ্ত, উদভ্রান্ত, বোধহীন। দুজনে যেন তবলার বাঁয়া

আর ডায়না, একই তালে বাজে। একই ছন্দে উপভোগ করে নরক কিংবা স্বর্গ।

কিন্তু হঠাৎ ছন্দপতন হল। আঠেরই ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যায় বাঁয়াও সুরে বাজছে না, ডায়নাও না। তাদের দুজনেরই পকেট একেবারে শূন্যের কাছাকাছি। যা দিয়ে তারা সন্ধ্যা ও রাত উপভোগ করতে পারবে না। এমনটা ওদের সচরাচর হয় না। কিন্তু গত তিনদিন ধরে ওরা এমন কাউকে পাকড়াও করতে পারেনি যে, ভাল দাঁও মেরে ওদের জীবনতরী সেদিনের সন্ধ্যা ও রাতের নদী পার করতে পারবে।

গোপেশ্বর ও ধীরেনের মাথায় হাত। কী করবে? এভাবে শুকনো সন্ধ্যা আর দীর্ঘ রাত কাটানোর অভ্যাস তো তারা বহুদিন আগে ছেড়ে এসেছে। সূর্যাস্তের পর তাদের অবশ্যম্ভাবী দরকার মদ ও নারীদেহ। তা নাহলে জীবন কিসের? জন্মই ব্যর্থ। কিন্তু উপায় কী? দুজনের পকেটে যা অবশিষ্ট রেস্ত আছে তা দিয়ে তাদের ইচ্ছাপূরণের ধারে কাছে যাওয়া যাবে না।

এদিকে সন্ধ্যা নেমে গেছে অনেকক্ষণ। নতুন ফাগুনের ওলটপালট বাতাস তাদের নেশাকে আরও উসকে দিচ্ছে। এ রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন তারা কবে হয়েছে তা তারা মনেও করতে পারছে না। একটা না একটা উপায় হয়ে গেছে। কিন্তু আজ কোনও রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু উপায় তো একটা বার করতেই হবে। সেই উপায় বার করার জন্য তারা দুজনেই গভীর চিন্তায় মগ্ন। সেই চিন্তার ফসল হিসাবে যা বেরিয়ে আসছে দুজনের মাথা থেকে তা একে অপরকে মাঝে মাঝে বলছে, কিন্তু স্থির সিদ্ধান্তে একমত হতে পারছে না। আবার তারা পথ খোঁজার জন্য ব্যস্ত হয়ে চিন্তার জগতে ঢুকে যাচ্ছে। এদিকে সময়ও চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ ধীরেনের মাথা থেকে চিড়িক করে একটা উপায় বার হল। ধীরেন নিচু স্বরে সেটা বীরেশ্বরকে জানাল। বীরেশ্বরেরও ধীরেনের পরিকল্পনাটা বেশ ভাল লাগল। তার প্রধান কারণ, অল্প খরচে নারী ও সুরাই শুধু পাওয়া যাবে না, আগামী দু'চারদিনের খরচও তাদের হাতে চলে আসবে। শুধু তার জন্য একটাই ত্যাগ করতে হবে। তা হল একটা পাড়ায় তারা চট করে আর ঢুকতে পারবে না। না পারুক, কলকাতায় পতিতালয় তো কম নেই, তার মধ্যে একটায় নয় কিছুদিন ঢুঁ মারবে না। এটুকু আত্মত্যাগ তো স্বীকার করতেই হবে। এটা ওদের অভ্যাস আছে, অনেক রাস্তাই ওরা বিক্রি করে দিয়েছে বিভিন্ন লোকের কাছে। গত পনের বছর ধরে ওরা দুজনে যে সব লোককে ঠকিয়েছে তাদের আস্তানাগুলি ওরা সযত্নে এড়িয়ে চলে, তার জন্য ওদের মাঝে মধ্যে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। ওরা জানে, এ ব্যবসায় এই সমস্যা আছে। কোন ব্যবসায় সমস্যা নেই? সুতরাং ওদের ব্যবসার এই সমস্যা ওরা শিরোধার্য করে নিয়েছে।

এখন আর নতুন করে চিন্তা করার সময় নেই। সময় তার তালে বয়ে যাচ্ছে। বাঁয়া আর ডায়না যখন এক লয়ে বেজেছে, তখন দ্রুত কাজে নেমে পড়া উচিত।

গোপেশ্বর ধীরেনের পিঠে একটা আলতো মিঠে চাঁটি মেরে বলল, "ভালই প্ল্যান এঁটেছিস। তবে একটাই ঝামেলা।"

ধীরেন ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইল, "কীসের ঝামেলা?"

গোপেশ্বর হেসে বলল, "আমাদের আগে আবার কেউ না ওখানে ঢুকে পড়ে।"

গোপেশ্বরের কথা শুনে ধীরেন একটু চুপসে গেল, তারপর চিন্তিত মুখে বলল, "তখন কী আর করা যাবে, আমরা একটু অপেক্ষা করব। ও বের হলে ঢুকব।"

গোপেশ্বর বলল, "ঠিক আছে, তুই এখানেই দাঁড়া। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছি।".

ওরা বৌবাজার ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুর সংযোগস্থলের পুবদিকে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ কথা বলছিল। গোপেশ্বর ধীরেনকে ওইখানেই অপেক্ষা করতে বলে উল্টোদিকে গিয়ে একটা বাস ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে গেল। ধীরেন জানে, গোপেশ্বর কোথায় গেল। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। আর আসন্ন পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে চিন্তা করতে লাগল।

গোপেশ্বর আধঘণ্টা নয়, প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর ফিরল। সন্ধ্যা তখন প্রায় সাড়ে সাতটা। উদ্বিগ্ন ধীরেন গোপেশ্বরের প্রতীক্ষায় এদিক ওদিক পায়চারি করছিল। কারণ ছকটা ধীরেনের হলেও গোপেশ্বর হচ্ছে ছকের মূল কারিগর ওকে ছাড়া পরিকল্পনা সার্থক করা যাবে না।

গোপেশ্বরকে দেখে ও হাঁফ ছেড়ে হেসে বলল, "কীরে এত দেরি হল?"

গোপেশ্বর বলল, "আর দেরি নয়, চল এখন।"

গোপেশ্বরের বাঁ হাতের বগলের তলায় কাগজে জড়ান একটা বোতল। ধীরেন জানে, ওটা হুইস্কির বোতল। ওটাই আজ লক্ষে পৌঁছনোর পটভূমি তৈরির অস্ত্র। ওরা সামনেই কলকাতার দক্ষিণ দিকে যাওয়ার জন্য বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

ধীরেন হুইস্কির বোতলটাকে ইঙ্গিত করে গোপেশ্বরকে প্রশ্ন করল, কি করে ম্যানেজ করলি ওটা?"

গোপেশ্বর বলল, "দয়ারাম মুদির থেকে টাকা ধার করে কিনেছি।" ধীরেন বলল, "ও তো আগেরও ক'টা টাকা পায়।"

গোপেশ্বর বলল, "হ্যাঁ, কাল সব শোধ করব বলেছি, ওর টাকাটা ফেরৎ দেওয়া দরকার, সময়ে অসময়ে ও ধার দেয়।"

"হ্যা।" ধীরেন গোপেশ্বরের কথার উত্তরে ছোট করে বলল,

ওরা যখন দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড়ে বাস থেকে নামল তখন ঘড়িতে সবে আটটা বেজেছে। ওরা দুজনে এবার পশ্চিমদিকে হাঁটতে শুরু করল। দুজনের পরণেই ধুতি আর ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি। পায়ে চকচকে চপ্পল। ওরা হাঁটতে হাঁটতে কালীঘাটের পটুয়াপাড়ার মোড়ে এসে পৌঁছল। তারপর ঘুরে বাঁদিকে কালীঘাট রোডে ঢুকে গেল। ওখান থেকেই কালীমন্দিরের উদ্দেশে দু'হাত তুলে নমস্কার করল। তারপর সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। ওখানে দুপাশে সরু সরু গলির ভেতর রয়েছে অনেক বারবধূর ঘর। ওদের লক্ষ্য পনেরোর 'ই' কালীঘাট রোডের ঠিকানার যৌনকর্মী প্রমীলা। সেখানেই আজ ওরা রাত কাটাতে চায়।

ওরা প্রমীলার ঘরের গলির ভেতর ঢুকে গেল। আলো আঁধারির খেলায় দেখতে পেল প্রায় দশ বারোজন যৌনকর্মী দাঁড়িয়ে আছে। ওদের সামনে গেলে চেনা যায়, মুখ ও যৌবনের একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। কারণ দু'চারটে কুপি যা ওরা গলির মধ্যে জ্বালিয়ে রাখে তা দিয়ে পরিষ্কার কিছুই বোঝা যায় না। ওরা গলিতে ঢুকতেই বারবণিতাদের মধ্যে একটা হাসির ছররা বয়ে গেল। কেউ কেউ ওদের উদ্দেশে বাজার চলতি টিপ্পনি কেটে ওদের ঘরে আসার আমন্ত্রণ জানাল। এ ব্যাপারে গোপেশ্বর ও ধীরেন অভ্যস্ত। প্রথম প্রথম ওরা যখন এই নেশায় নেমেছিল তখন এসব মন্তব্য শুনলে কান মুখ লাল হয়ে যেত। এখন সেই অনুভূতি কবে মরে গেছে তাও মনে করতে পারে না। এখন ওরা এই লাইনে ওস্তাদো-কী-ওস্তাদ। তাই কোনও অচেনা যৌনকর্মীর ইঙ্গিতে ওরা টলে না গিয়ে ঠিক লক্ষ্যে অবিচল থাকতে পারে।

প্রমীলার ঘরটা গলির ডান দিকে। তার মানে প্রমীলা ফাঁকা থাকলে ডানদিকেই দাঁড়িয়ে থাকবে। ওরা দুজনে চোখ টানটান করে ডান দিকে। দাঁড়ানো একের পর এক যৌনকর্মীদের মুখগুলো দেখতে দেখতে এগিয়ে যেতে লাগল।

প্রমীলার ঘর থেকে হাত পাঁচেক দূরত্ব থাকতেই ওরা বুঝে গেল, প্রমীলা ফাঁকা আছে। ওরা দুজনেই একসঙ্গে প্রমীলাকে দেখতে পেয়েছে। প্রমীলাকে দেখে ওদের বুকের ভেতর দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস নেমে গেল, কারণ আজ ওরা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে তা অন্যদিনের উদ্দেশ্যের থেকে একটু আলাদা। আজ প্রমীলার ফাঁকা থাকাটা ওদের দুজনের কাছে অত্যন্ত জরুরি।

গোপেশ্বর ও ধীরেন প্রমীলার সামনে গিয়ে হেসে দাঁড়াল। প্রমীলা ওদের চিনতে

পারল। ওরা এর আগেও দু'তিনবার ওর ঘরে এসেছে। ওরা যখনই আসে একসঙ্গে আসে। সারারাত কাটিয়ে সকালে চলে যায়। ওদের কাছ থেকে মোটামুটি ভাল টাকাই পাওয়া যায়। দুজনে একসঙ্গে আসে বলে প্রমীলার কিছু মনেই হয় না। দু'চারজনকে সে বহুবার একসঙ্গে সামলেছে। এ খেলায় সে এখন প্রবীণাদের মধ্যে পড়ে।

প্রমীলার মনে পড়ে, সে যখন বনগাঁর সীমান্ত থেকে দালালের খপ্পরে পড়ে প্রথম অচেনা সোনাগাছির ঘরে এসে উঠেছিল তখন তার বয়সই বা কত ছিল? বছর চৌদ্দ পনের হবে। তখন ওর ফর্সা শরীরে সবে যৌবনের ঢল নামতে শুরু করেছিল। এমনিতেই ওর চেহারায় বয়স অনুপাতে সবসময়ই একটু বাড়বাড়ন্ত ছিল। সেটাই বোধহয় ওর কাল হয়েছিল। সবার নজর পড়ত ওর শরীরের ওপর। হতদরিদ্র ওর বাবা ওকে প্রয়োজনীয় জামা কিনে দিতে পারত না। ওকে তাই মার শাড়ি, গামছা জড়িয়ে থাকতে হতো। ওই সময়ই সে দালালের খপ্পরে পড়ল।

তারপর সোনাগাছি। সেই প্রথম কলকাতা দর্শন। কলকাতায় ওকে অভ্যর্থনা জানাল ওর প্রথম খাণ্ডারনি বাড়িওয়ালি। সে মুহূর্তেই বুঝে গিয়েছিল সে কোথায় পৌঁছে গেছে। ওর তখন বুকটা খাঁ খাঁ করে কেঁদে উঠেছিল। কিন্তু কান্নার কোনও সুযোগই সে পায়নি। দুটো ষণ্ডামার্কা মহিলা ওকে ধরে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়েছিল। তারপর ওর গায়ের কাপড় চোপড় সব টেনে হিঁচড়ে খুলে নিয়ে একটা ছোট বাথরুমে ঢুকিয়ে সাবান ঘষে ঘষে স্নান করাতে করাতে কত কথাই বলছিল। ওদের মধ্যে যে বয়সে একটু ছোট ছিল সে শুধু বলেছিল, —তুই বেশ ক'বছর আমাদের বাড়ি আলো করে রাখবি, বাবুরা তোকে দেখলে একেবারে পায়ে পড়ে যাবে।”

ওর এই ধরনের কথায় অন্য মহিলাটা তার পানে ছোপ ফেলা দাঁতগুলো বের করে খিলখিল করে হেসে গায়ের জোরে ওর শরীর নিয়ে দলাই মালাই করে ধুলো বালি সাবান দিয়ে তুলছিল। ওদের এই সব আলোচনায় ও কোনও উত্তর দিতে পারেনি, শুধু মাঝে মধ্যে ডুকরে কেঁদে উঠছিল। তাতে ওই দুজনের কোনও বিকার দেখা যায়নি। ওর মনে হয়েছিল এই কাজে ওরা বহুদিন নিযুক্ত আর অভ্যস্ত।

প্রমীলা যেদিন সোনাগাছিতে এসেছিল তার পরের পরদিন রাতে ওর সবকিছু হরণ করা হল। হরণ করল এক মাঝবয়সী লোক। সেই লোকটা ধুতির কোঁচা দুলিয়ে প্রচুর মদ খেয়ে এসেছিল। এবং বাড়িওয়ালি আর দাঁতে ছোপ মারা ষণ্ডামার্কা মহিলাটা ওর হাত চেপে ধরেছিল আর ওই লোকটা বাকি কাজটা করেছিল।

তারপর আর ওকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ওই মাঝবয়সী লোকটা বছরখানেক ধরে শুধু ওর ঘরেই আসত। ততদিনে প্রমীলা সবকিছু জেনে গেছে। ওখানকার হালচাল, আদবকায়দা, সব। কিন্তু বাড়িওয়ালি ওই লোকটাকে ছাড়া অন্য কাউকে ওর ঘরে ঢুকতে দিত না। সে জেনে গেছে, ওই লোকটার থেকে বাড়িওয়ালি একবারে প্রমীলার জন্য অনেক টাকা নিয়েছে। লোকটার নাম কি ছিল প্রমীলা জানত না, ওকে সবাই রায়বাবু বলত, প্রমীলাও ওই নামে ডাকত। রায়বাবু ওকেও কিছু কিছু জিনিসপত্তর দিয়েছিল, সেইসব জিনিসের অনেকগুলোই বাড়িওয়ালি নিয়ে নিয়েছিল। প্রমীলা কোনও বাধা দিতে পারেনি। রায়বাবুকে বলতে পারেনি। ওর ভয় করেছিল। রায়বাবুকে অভিযোগ করলে, সে কথা যদি বাড়িওয়ালি জেনে যায়, তবে বাড়িওয়ালি তাকে মারধোর করবে সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত ছিল। সেই ভয়েই সে কিছু বলতে পারেনি। রায়বাবু বছরখানেক পর আসা বন্ধ করে দিয়েছিল। পরে সে শুনেছে, রায়বাবু দূরে কোথায় বেড়াতে গিয়ে মোটর গাড়ি চাপা পড়ে মারা গিয়েছে। তাই তার আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

রায়বাবু মারা যাওয়ার পর বাড়িওয়ালি ওর দরজা হাট করে খুলে দিয়েছিল। তখন বন্যার মতো জল ওর ঘরে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়েছিল। সেই জলের ধাক্কা সামলাতে ওর প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হয়েছিল। দিনের বেলাতেই কম করে সাত আটজনকে বসিয়ে বিদায় দিতে হতো। এদের বেশিরভাগই কলেজের ছেলে কিংবা নতুন চাকরি পাওয়া বাবুরা। এরা

ঝট করে আসত ঝট করে চলে যেত। কিন্তু রাতের দিকেও আবার ছয় থেকে সাতজনকে বিদায় দিতে হতো। ওদের বাড়িতে যেই আসত সেই ওর ঘরে বসতে চাইত। ও কী করবে? যা করার বাড়িওয়ালিই করত। প্রমীলার কোনও অধিকার ছিল না। টাকা পয়সার লেনদেন সব কর্ত্রীই করত। সে শুধু হুকুম তামিলের দাসী, অন্য কোনও কিছুর দাবিদার নয়। রায়বাবু যখন আসত তখনও তার অনুভূতি ছিল। এমনকী রায়বাবুর পরেও প্রায় মাস ছয়েক তার শরীর একেবারে যন্ত্রে পরিণত হয়নি। তারপর সব মরে গেছে। কখন যে মরে গেছে তা প্রমীলা টেরও পায়নি। যখন টের পেল তখন ওর একটুও দুঃখ হয়নি, বরং আনন্দই হয়েছিল। ও যে একটা শুধুমাত্র মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে তাতে খুশী হয়েছিল, কারণ তাতে ওর সব যন্ত্রণা দূর হয়ে গিয়েছিল। ও তখন শুধুই একটা যন্ত্র। কারখানার মেশিন।

আবেগ মরে যাওয়া একটা টাকা আমদানীর ছাপাখানা। এ লাইনে যে আসে তারই একই পরিণতি হয়, না হয়েও উপায় নেই। প্রক্রিয়াটাই এরকম। নয়ত সম্ভব নয়। শুধু শারীরিক অনুভূতিগুলোই নয়, মনটাও কখন মরে যায় টেরও পাওয়া যায় না। বাবুদের কত রকমের যে আবদার ছলচাতুরী দিয়ে সামলাতে হয় তাও ক্রমশ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা দিয়ে আস্তে আস্তে জানতে হয়।

তারপর প্রমীলাও হয়ে উঠল পাকা যৌনকর্মী। তবে তার শরীরের বাঁধন আর অটুট রইল না। যদিও বাড়িওয়ালি তাকে অন্য নজরে রাখত, খেতে পরতেও দিত অন্যদের চেয়ে ভাল, আলাদাভাবে। কারণ সেইই ছিল তার প্রধান টাকা কামানোর উৎস।

এভাবে প্রায় বছর তিনেক চলার পর যখন প্রমীলা দেখল তার জীবনের জমার ঘর শূন্য, সে তখন একদিন বাড়িওয়ালির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এবং সে বাড়িওয়ালির পোষা গুণ্ডাদের হাতে মার খেল। তবু সে তার দাবির থেকে বেশি সরলো না। মার খাওয়ার সপ্তাহখানেক পর সে আবার তার কাজের বিনিময়ে বাড়িওয়ালির কাছ থেকে নিজের টাকার অংশ চাইল। আবার মার খেল এবং বিছানায় শুয়ে রইল। চার পাঁচ দিন সে কাজ না করাতে বাড়িওয়ালিরও মোটা টাকা আমদানি বন্ধ হয়ে রইল। তারপর একটা ফয়সালা হল। যা হবে, তার আধাআধি।

সোনাগাছির ওই বাড়িতে প্রমীলা এভাবেই কাটিয়ে দিল প্রায় আরও বার তের বছর। ইতিমধ্যে ওই বাড়ির হাত বদল হয়েছে। তারও বখরা বেড়েছে, কমেছে। তার শরীরের ঢলও আস্তে আস্তে শুকিয়ে এসেছে। সে তখন নিজেই বন্দোবস্ত করে কালীঘাটে চলে এসেছে। কারণ কালীঘাটে তার যে একটা ভাল জায়গা হবে সেটা তার বিশ্বাস ছিল। তার বিশ্বাস যে ভুল নয় সেটা কালীঘাটে আসার দিন থেকেই টের পেয়েছে। তার ঘরে ভিড়টা একটু বেশি হতে পুরনো কর্মীরা তাকে হিংসা করতে শুরু করেছে। যদিও সোনাগাছির থেকে কালীঘাটে খাটনির দাম কম। হোক, এখানে বাড়িওয়ালিকে শুধু ঘর ভাড়া দিতে হবে, আমদানীর বেশির ভাগটা ওর হবে, তাতে ও সোনাগাছিতে যা রোজগার করত এখানে তার চেয়ে খুব একটা কম হবে না।

একই কাজ যখন ওকে করতে হবে তখন জায়গা বাছাবাছি ওর কাছে অর্থহীন।

প্রমীলার কপাল আরও খুলে গেল। আট দিনের মাথায় সে পেয়ে গেল একটা বাঁধা বাবু। বিনয়বাবু। এই লোকটাও মাঝবয়সী। ভবানীপুরের দিকে থাকে। বিনয়বাবু সন্ধের একটু পরেই একটা বাংলা মদের বোতল নিয়ে ওর কাছে আসে। মদ খায়। ওকেও দেয়। ওর মদ খাওয়া অভ্যেসটা সোনাগাছি থেকেই হয়েছিল। অনেক বছর ধরে ও এই নেশার ওপরই ভরসা করে চলছে। ওটা না খেলে ওর হয় না। সারা শরীর যন্ত্রণায় ছটফট করে। মদ খেলে ও ভাল থাকে, সুস্থ থাকে। পরদিন কাজে দম পায়। বিনয়বাবু মদ শেষ করে, 'তারপর বসে'। রাত দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ চলে যায়। তারপর ও আবার অন্য লোক ঘরে ঢোকাতে পারে, বিনয়বাবুর তাতে কোনও আপত্তি নেই। আর দিনের বেলা তো ও একেবারে খালি। কাজের একটা দাম ও হাতে হাতে পাচ্ছে। তবে দিনে ও মদ খায় না। তাতে বিনয়বাবুর আপত্তি। বিনয়বাবু চায়, শুধু তার জন্য সন্ধেবেলা প্রমীলা সেজেগুজে ঘরে

অপেক্ষা করুক। ঝরঝরে হয়ে থাকুক। তার সঙ্গেই প্রথম মদ খাক। আর বিনয়বাবু যে টাকা দিয়ে যায় সেখান থেকে কিছু বাজার করে প্রমীলা কিছু রান্না করে রাখুক, মদের সঙ্গে খাওয়ার জন্য। বিনয়বাবু নির্বিবাদী লোক ছিল, সে চাইত প্রমীলা সুন্দর হয়ে থাকুক। কিন্তু প্রমীলা কী করে বলবে যে তার ফর্সা রঙ আর আগের মতো নেই। পনের ষোল বছরের ঝড়ে অনেক অনেক পুড়ে গিয়ে ছোপমারা কালো হয়ে গেছে। তাই এখন অনেক বেশি রঙ মাখতে হয়। শুনেছে, এই রঙ প্রতিদিন মাখলে ছোপ আরও বেশি ধরে। কিন্তু উপায় কী? তাকে তো মাখতেই হবে। এ লাইনে যে থাকবে তাকেই মাখতে হবে। হ্যাঁ, রোজ। নয়ত খদ্দেরের মন ভোলাবে কী করে, কী করেই বা মুখের ছোপগুলো আড়াল করবে? যতদিন এ লাইনে থাকবে ততদিন টিকতে গেলে তাদের রঙচঙ মেখে দরজায় দাঁড়াতেই হবে।

তাছাড়া বাঁচার আর কোনও পথ নেই। প্রতিদিনের ঘর ভাড়াই উঠবে না। অন্য খরচ তো দূর অস্ত। প্রমীলা জানে, বাবুরা ভাবে, যাই তারা দিয়ে যায় তার সবটাই তাদের আয়। তাদের অন্য কোনও খরচ নেই। কিন্তু বাবুদের জন্যই তাদের অনেক খরচ করতে হয়। ঘরভাড়া ছাড়াও গুণ্ডা, দালালের উৎপাত, পুজোর চাঁদা ছাড়াও প্রতিদিনের রঙের খরচ, জামা-কাপড়, বিছানার খরচ, ঘর পরিষ্কারের লোকের খরচ ভালই করতে হয়। তাছাড়া ডাক্তারের পেছনে তাদের আয়ের একটা মোটা অংশ চলে যায়। এরপর খাওয়াদাওয়া ও মদ। সঞ্চয় কোথায়?

সোনাগাছির আর কালীঘাটের খদ্দেরের মধ্যে বেশ খানিকটা তফাৎ আছে। কালীঘাটে দিনের বেলায় বাজারের দোকানদাররা বেশি আসে। এরা নিজেরাও নোংরা, ঘরটাও নোংরা করে যায়। এদের জন্য প্রমীলা বিছানার চাদর আলাদা করে রাখে। আবার সন্ধেয় বিনয়বাবুর জন্য পরিষ্কার বিছানা সাজাতে হয়। তাছাড়া কালীঘাটে গভীর রাতে সোনাগাছির চেয়ে উৎপাত অন্যরকম। এখানে কেওড়াতলার পাশে সরু কাঠের সেতু পার হয়ে চেতলার দিক থেকে কিছু বদমাইশ আসে। এরা কেউ পয়সাকড়ি দেওয়া দূরে থাক, উল্টে বড় উৎপাত করে, কারও খুব দয়া হলে সঙ্গে আনা একটু মদ খেতে দেয়, ব্যস, আর আসে দক্ষিণ থেকে আদি গঙ্গায় খড়ের নৌকায় আসা মাঝিমাল্লা, ফড়ে ও আড়তদারেরা। এরা সব কালীঘাট সেতুর আশেপাশে আলিপুর জেলের ধারে নৌকা নোঙর করে চলে আসে ওদের ঠেকে। এরাও নোংরা। তবে পয়সাকড়ি দেয়, কিন্তু খুব জ্বালায়, সময়ও নেয় অনেকক্ষণ। শরীর ব্যথা করে ছাড়ে। যতটা জ্বালায় ততটা পয়সা পাওয়া যায় না।

প্রমীলা একদিন বাড়িওয়ালিকে বলেছিল, এদের আর ঘরে ঢোকাবে না। বাড়িওয়ালি মুখ ঝামটে বলে উঠেছিল, "ও কথা মুখ দিয়েও বলিসনি, এরাই লক্ষ্মী, সারা বছর আসবে। তুই যেমনই হোস, বুড়ো বয়স পর্যন্ত এদের পাবি।"

প্রমীলা আর উত্তর দেয়নি। প্রতিবাদ না করে মেনে নিয়েছে।

বিনয়বাবু আর এসব খদ্দেরদের নিয়েই প্রমীলা একটা বছর কালীঘাটে কাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু হঠাৎই বিনয়বাবু ওর কাছে আসা বন্ধ করে দিতে ও কিছুটা বিপাকে পড়ল। সেটা সাময়িক। তার আবার একটা বাঁধা বাবু জুটে গেল। হরিসাধনবাবু। টালিগঞ্জে থাকে। এ আবার বিনয়বাবুর থেকেও জেল্লাদার। এ বাংলা মদ খায় না। বিলিতি মদ খায়। নিজেই মদের সঙ্গে খাওয়ার জন্য দোকান থেকে এটা সেটা কিনে নিয়ে আসে। তারপর মদ খেয়ে প্রমীলার সঙ্গে 'বসে' ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে চলে যায়। বিনয়বাবু চলে যাওয়ার পর সে মুক্ত। সে তখন অন্য লোক বসায়। এ রকম একটা দিনেই গোপেশ্বর ও ধীরেন ওর ঘরে এসেছিল। ওরা দুজনে আগে মদ খেয়ে এসেছিল, আবার আরও মদ নিয়ে এসে প্রমীলার সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ ধরে খেয়েছিল, তারপর সারারাত একই ঘরে কাটিয়ে ভোরের দিকে চলে গিয়েছিল। টাকা পয়সাও খুব খারাপ দেয়নি। প্রমীলার রাত ভালই কেটেছিল। সে' ভেবেছিল, অন্তত চেতলার বদমাইশ ও মাঝি মাল্লার হুড়োহুড়ির চেয়ে এরা সাতগুণে ভাল। ব্যাপারটা সে এভাবেই মাপে।"

আঠেরই ফেব্রুয়ারি তাই ওদের দেখে প্রমীলার ভাল লাগল। রাত তার মদে,

আড্ডাতে, ভালই কাটবে। গোপেশ্বরের বগলের তলায় রাখা কাগজে মোড়া লম্বা জিনিসটা দেখে তার অভিজ্ঞ চোখ বুঝে গেছে যে, সেটা একটা বিলিতি মদের বোতল।

'প্রমীলা তার ঘরের ভেজানো দরজাটা ঠেলে ঢুকে বলল, “এসো।” গোপেশ্বর ও ধীরেন প্রমীলার পেছন পেছন ওই ঘরে ঢুকে গেল। প্রমীলা দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। তারপর ঘরের ভেতরে ঢুকে এক কোণে রাখা হ্যারিকেনের জ্বলন্ত ফিতেটা বাড়িয়ে দিয়ে ঘরের আলোটা যতটা পারল উজ্জ্বল করার চেষ্টা করল।

গোপেশ্বর প্রমীলাকে জিজ্ঞেস করল, “আর হ্যারিকেন নেই?”

প্রমীলা গোপেশ্বরের দিকে না তাকিয়ে বলল, “হ্যাঁ আছে।”

গোপেশ্বর বলল, “তাহলে ওটাও জ্বালাও। আগে খাওয়া দাওয়া হবে,

তাস হবে, এই আলোতে চলবে না।”

প্রমীলা বলল, “তা হলে একটু দাঁড়ান।” প্রমীলা আরও একটা বাড়তি হ্যারিকেন জ্বালানোর জন্য তার চৌকির তলায় গলা বাড়িয়ে ঢুকে গেল, হ্যারিকেনটা ওখানেই সে রাখে। সে সেটা বার করে ব্যস্ত হয়ে গেল।

ধীরেন প্রমীলার দিকে তাকিয়ে তার কাজ দেখছে। গোপেশ্বর প্রমীলার মাঝারি মাপের ঘরটা চারদিক খুঁটিয়ে দেখছে। এ ঘরটা এখানকার অন্য ঘরগুলোর থেকে একটু বড়। চৌকিটাও বড়। চৌকি ছাড়াও বেশ খানিকটা জায়গা খালি আছে। যা এইসব বাড়ির ঘরগুলোতে প্রায় থাকেই না। গোপেশ্বর ভাবল, এভাবে সে আগে কখনও এদের ঘরগুলোর ওপর চোখ দিয়ে দেখেনি। তার প্রধান কারণ, ওরা এদের কাছে আসার আগেই প্রায় গলা পর্যন্ত মদ গিলে আসে, তখন এদিকে নজর করার আর না থাকে দৃষ্টি, না থাকে মন। একদিকেই কেন্দ্রীভূত মন প্রতিরাতের শেষকাজের জন্য দুরন্ত ভাবে সেদিকে ছোটে। কিন্তু আজকের দিনটা ওদের দুজনের জীবনে একেবারে ব্যতিক্রম। আজ সে ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে।

সে দেখল, ঘরের যে দিকে তাকাও, চারদিকে বিভিন্ন রকমের ক্যালেন্ডার, আর সব ক্যালেন্ডারেই দেবদেবীর ছবি। মা কালীর ছবিই চার পাঁচটা। যা এদের ঘরে ঘরে থাকবেই থাকবে। গোপেশ্বর দেখল, এককোণে একটা ছোট্ট সস্তার কাঠের লক্ষ্মীর সিংহাসন। সেখানেও বেশ ক'টি ছোট ছোট কাঠের ফ্রেমে বাঁধান দেবদেবী রয়েছেন। তবে কে কে আছেন তা গোপেশ্বর ঠাহর করতে পারল না। একে কম আলো, তার ওপর ফটোগুলো সব সিঁদুরে মাখামাখি, ফটোর ওপর চাপানো আছে মালা, ফুল, বেলপাতা লক্ষ্মীর সিংহাসনের পাশেই একটা আলনা, আলনায় প্রমীলার জামাকাপড় বেশ সাজানো গোছানো। তারই মধ্যে গোপেশ্বর দেখল একটা ভাঁজ করা চেক চেক লুঙ্গি। গোপেশ্বর বুঝল, ওটা প্রমীলার কোনও বিশেষ বাবুর জন্য। গোপেশ্বরের ইচ্ছা হল, তার পাট করা ধুতিটা ছেড়ে লুঙ্গিটা পরার। তাছাড়া ঘরে যা আছে সবই নিত্য প্রয়োজনীয় টুকিটাকি।

ধীরেন প্রমীলার হ্যারিকেন জ্বালানো দেখতে দেখতে প্রমীলাকেও দেখছিল। ওই শরীরের সব কিছুই ওর দেখা, ও পরিমাপ করার চেষ্টা করছিল, প্রমীলা অল্পবয়সে কতটা সুন্দর ছিল। ধীরেনের মনে হল, প্রমীলা সুন্দরীই ছিল। তখন ওদের সঙ্গে প্রমীলার দেখা হলে ওরা যে ওর ঘরে প্রায়ই যেত সে ব্যাপারে ধীরেনের মনে কোনও সন্দেহই জাগল না। ধীরেন দেখল, প্রমীলা গলায় একটা নেকলেশ, কানে দুল, বাঁ হাতের মধ্যমায় সোনার আংটি ও হাতে এক জোড়া করে দু'হাতে চারটে সোনার চুড়ি পরেছে। দুটো হ্যারিকেনের আলো অলংকারগুলোতে পড়ে আরও ঝলমল করে উঠল।

দ্বিতীয় হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে প্রমীলা উঠে দাঁড়িয়ে একবার তার পাতা বিছানাটার দিকে দেখে গোপেশ্বরদের বলে উঠল, “আর একটু দাঁড়াও।”

ওরা দাঁড়িয়ে রইল। প্রমীলা তার আলনার দিকে এগিয়ে গেল। সে আলনার পেছন দিকে রাখা সাদা বিছানার চাদর টেনে নিল। তারপর এগিয়ে গেল চৌকির দিকে। একটানে

তুলে ফেলল সেখানে পাতা লাল ফুল ফুল ছাপা একটা আধময়লা পুরনো চাদর। প্রমীলা বিছানাটা দেখেই ঠিক করে ফেলেছিল, এদের এই বিছানায় বসাবে না। ওই চাদরের ওপর গত রাত থেকে এরা আসার আগে পর্যন্ত সাত আট জন খদ্দের বসিয়ে বিদায় দিয়েছে। এরা একটু অন্যরকম, একটু ভদ্রলোক, তাই বিনয়বাবুর রাখা চাদরটা পেতেই ওদের প্রমীলা বসাবে। ওর সুবিধা হল, বিনয়বাবু তিনদিন কলকাতায় থাকবে না, তাই প্রমীলার কাছে আসারও প্রশ্ন নেই। আর বিনয়বাবু কলকাতায় থাকলে তো এত তাড়াতাড়ি এদের ওর ঘরে ঢোকার প্রশ্নই নেই। বিনয়বাবু ন'টা সাড়ে ন'টার আগে বিদায় নেয় না। তারপর সে অন্য লোক বসায়।

প্রমীলা সাদা চাদরটা সুন্দর করে চৌকির ওপর পেতে ধীরেনদের বলল, "এবার বসো।"

গোপেশ্বর কাগজে মোড়া মদের বোতলটা চৌকির ওপর রেখে বলল, "তিনটে গ্লাস আর জল আনো, তার আগে আলনায় যে লুঙ্গিটা আছে সেটা দাও, আমি কাপড়টা পাল্টে ওটা পরি।"

প্রমীলা একবার গোপেশ্বরের দিকে তাকাল, কিছু বলল না। সে লুঙ্গিটা আলনা থেকে নিয়ে গোপেশ্বরের হাতে দিল। গোপেশ্বর তার ধুতিটা পাল্টে লুঙ্গিটা জুত করে পরে খাটে উঠে বসল। ধীরেন তার আগেই খাটে উঠে পা গুটিয়ে বসে গেছে।

প্রমীলা তিনটে কাচের গ্লাস চৌকির তলা থেকে টেনে বার করে একটা বালতি থেকে এক ঘটি জল নিল। সেগুলো বিছানার ওপর রাখার আগে একটা কাগজ পেতে তাতে একটা কাঠের পিঁড়ি রাখল। তারপর পিঁড়ির ওপর গ্লাস আর জলের ঘটি রাখল।

গোপেশ্বর প্রমীলাকে বলল, একটা তাসের বান্ডিল নিয়ে ওপরে উঠে এসো। প্রমীলা তার বিছানার একটা কোণ বাঁ হাত দিয়ে তুলে ডান হাত গলিয়ে একটা তাসের প্যাকেট বার করে সেটা নিয়ে চৌকির ওপর উঠে এল। তিনজনে ত্রিভুজ আকারে বসল। ধীরেন হুইস্কির বোতলটা টেনে ছিপি খুলে গ্লাসে মদ ঢালল, জল মেশাল। গোপেশ্বর তাস বেটে দিল। গ্লাসে টান দিয়ে ওরা তাস তুলে নিল।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ওদের মদ্যপান ও তাস জমে উঠল। ধীরেন গ্লাসে মদ ঢালার সময় ইচ্ছে করে নিজেরা কম নিয়ে প্রমীলাকে একটু বেশি দিচ্ছে। যাতে প্রমীলার নেশাটা তাড়াতাড়ি জমে ওঠে। প্রমীলা বহুদিন মদ খাচ্ছে। তিন চার পেগের পর এক এক টানে গ্লাস উড়িয়ে দিয়ে তাসে মন দিচ্ছে।

ধীরেন প্রমীলার দিকে সরে গিয়ে ওর বাঁ হাত দিয়ে প্রমীলার শরীরের এদিক ওদিক ঘাঁটাঘাঁটি করছে। করুক। ওতে প্রমীলার কিছু যায় আসে না। কোনও অনুভূতি হয় না। প্রমীলা জানে, বাবুরা ওগুলো করতেই যখন এসেছে, তাতে আপত্তি চলে না।

বোতলে মদ শেষ হয়ে আসছে, গোপেশ্বর প্রমীলাকে বলল, "কি গো ঘরে কিছু আছে নাকি?"

প্রমীলা অনেকটা উচ্ছল। সে বলে উঠল, "থাকবে না? তোমাদের মতো লোকেদের জন্য কিছু রাখতে হয়, তবে বাংলা।" ধীরেন বলল, "ওতেই চলবে।"

প্রতিদিন রাত বারোটা নাগাদ বাড়িওয়ালি শুতে যাওয়ার আগে সব ঘরগুলোতে একবার করে উঁকি মেরে যায়। দরজায় দরজায় উঁকি মেরে দেখার জন্য তেমন ব্যবস্থা আছে। বাড়িওয়ালি দেখে ভেতরে কোনও ঝুট ঝামেলা হচ্ছে কি না। কতরকমের লোক এই হাটে আসে, তার হদিশ তো আর আগের থেকে করা যায় না। তাই ওর এই বিশেষ সতর্কতা। এতে সে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে। কোনও রকম সন্দেহ হলে, তেমন প্রয়োজনে সে জেগে থেকে, মেয়েদের ঘর থেকে খদ্দের বার করে তবে ঘুমোতে যায়।

বাড়িওয়ালি প্রতিদিনের মতো প্রমীলার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল। প্রমীলার ঘরের বাবুরা

রাত কাটাবে। ওরা প্রমীলার সঙ্গে বসে তাস খেলছে আর মদ খাচ্ছে। সে নিশ্চিন্ত হয়ে পাশের ঘরে উঁকি দেওয়ার জন্য গেল।

হুইস্কির বোতল শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রমীলা চৌকি থেকে নেমে চৌকির নিচে অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে একটা বাংলা মদের বোতল বার করল। বোতলের ধাক্কা লেগে সাজানো বাসন দু'একটা এদিক ওদিক ছিটকে গিয়ে একটা ঝনঝন আওয়াজ হল। বাড়িওয়ালি ফিরে এসে প্রমীলাকে বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করল, “কি হল রে পমী।” প্রমীলা বলে উঠল, “কিছু হয়নি গো মাসি, পা লেগে দুটো বাটি পড়ে গেছে।”

বাড়িওয়ালির মুখ দিয়ে খালি আওয়াজ বার হলো, “অ।” সব ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বাড়িওয়ালি ঘুমতে চলে গেল।

বাংলা মদের বোতল প্রমীলা চৌকির ওপর রাখতেই ধীরেন হুইস্কির বোতলের অবশিষ্ট মদটুকু গ্লাশে গ্লাশে ঢেলে দিল। প্রমীলা ঘটিতে জল ভরে উপরে উঠে এল। হুইস্কির সঙ্গে জল মিশিয়ে একটানে শেষ করে তার দিকের উল্টে রাখা তাস তুলে খিলখিল করে হেসে তাসগুলো গুছিয়ে নিতে লাগল। দু'একটা তাস মাঝে মাঝে ওর হাত থেকে খসে পড়তে সে আবার হাতের চুড়িগুলোর ঝনঝন আওয়াজ তুলে হেসে সাজাতে লাগল। ওর আজকের রাতটা খুব ভাল লাগছে, নেশাটাও জম্পেশ জমেছে। বেশভূষা আলুথালু করে দিয়েছে ধীরেন। দিক। ওগুলো খেলার মধ্যেই পড়ে।

গোপেশ্বর সমস্ত পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। ধীরেন তাস খেলা ও মদ্যপানের মাঝে মাঝে প্রমীলাকে জাপটে জড়িয়ে ওর উত্তেজনা প্রকাশ করছে। প্রমীলা তাতে আরও হেসে ধীরেনকে ছোবল মারছে। কখনও সখনও গোপেশ্বরকেও উস্কে দিচ্ছে। এভাবেই রাত গভীর থেকে আরও গভীরের দিকে ঢলে যাচ্ছে। গলির বাইরে থেকে কুকুরের ডাক, মাঝেমধ্যে কেওড়াতলা অভিমুখী শ্মশানযাত্রীদের “বল হরি” আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

বাংলা মদের বোতল গোপেশ্বর খুলল। তীব্র স্পিরিটের গন্ধ ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। তিনজনেরই এই গন্ধের সঙ্গে সন্ধি আছে। তাই কোনও বিকার নেই। গোপেশ্বর এবার গ্লাসে গ্লাসে বাংলা মদ ঢেলে দিয়ে অল্প করে জল মেশাল। তাস খেলতে খেলতে মদটা শেষ করে দিল প্রমীলা। ওর চোখ ঢুল ঢুল করছে।

রাত দুটো। মদ শেষ হয়ে এসেছে। গোপেশ্বর তিনটে গ্লাসেই ঢেলে দিল। প্রমীলার গ্লাসে বেশ খানিকটা বেশি। প্রমীলা গ্লাসগুলোর দিকে তাকিয়ে জড়ানো গলায় বলে উঠল, “আর নেই কিন্তু!” ধীরেন প্রমীলার উত্তরে একই ধরনের গলায় উত্তর দিল, “আর দরকার নেই, এরপর অন্য কাজ।”

প্রমীলা আলতো করে ধীরেনকে চাঁটি মেরে হেসে উঠল। গোপেশ্বর তাস বাটছে।

হঠাৎ ধীরেন প্রমীলাকে জড়িয়ে ওর মাথা নিজের বুকের কাছে নিয়ে মুখের থেকে গোঁ গোঁ শব্দ বার করতে করতে ওকে আদর করতে লাগল। প্রমীলাও ধীরেনের বুকের ভেতর মাথা গুঁজে ছলাকলা করতে করতে হাসতে লাগল।

গোপেশ্বর তার পাঞ্জাবির ডান পকেট থেকে একটা ছোট্ট শিশি বের করে তার ভেতরে রাখা সাদা রঙের পাউডার প্রমীলার গ্লাসের মদে বেশ খানিকটা ঝপ করে ঢেলে দিল। পাউডারের গুঁড়োগুলো মদের সঙ্গে মিশতে মিশতে গ্লাসের তলায় তলিয়ে যেতে লাগল। গোপেশ্বর চট করে প্রমীলার গ্লাসটা তুলে দুবার নেড়ে দিয়ে গ্লাসটা যথাস্থানে রেখে দিল। মদটা গোল হয়ে ঘুরতে লাগল, যাতে সাদা পাউডারটা মদের সঙ্গে ভাল ভাবে মিশে যায়।

প্রমীলা গোপেশ্বরের কাজ কিছুই দেখতে পেল না। ও তখন ধীরেনের আলিঙ্গনে এত বছরের শিক্ষায় শিক্ষিত, অভ্যস্ত হাতে ওর পাঞ্জাবি ও ধুতির খাঁজে খাঁজে হাত খেলাতে ব্যস্ত।

প্রমীলার মদের গ্লাসের মদ আস্তে আস্তে ঘুরতে ঘুরতে স্থির হয়ে যেতে গোপেশ্বর ধীরেনের পাছায় একটা চিমটি কেটে বলে উঠল, “এই তোরা কী করছিস, তাস বেটেছি,

আর দু’দান পরে যা করার করিস।”

চিমটি খেয়ে ধীরেন প্রমীলাকে আস্তে আস্তে তার হাত আলগা করে ছেড়ে দিয়ে বলল, “ঠিক বলেছিস।”

প্রমীলাও ধীরেনের শরীর থেকে হাত সরিয়ে ওর সামনে উল্টে পড়ে থাকা তাসগুলো তুলে নিয়ে সাজাতে সাজাতে বলল, “আজ ভালই জমেছে।” তারপর তাসে ডাক দিল, “তিনটে হরতন।”

ধীরেন উত্তরে কী বলল, নেশাগ্রস্ত প্রমীলা ভাল করে শুনতে পেল না। ও তাই ধীরেনকে বলল, “শুনিনি।” তারপর ওর জন্য রাখা মদের গ্লাসটা এক চুমুকে ঢকঢক করে টেনে খেয়ে নিল।

গোপেশ্বর ও ধীরেন প্রমীলার মদ খাওয়ার দিকে এক পলকে তাকিয়ে রইল। এক নিঃশ্বাসে খাওয়ার জন্য গ্লাসে আর মদ অবশিষ্ট রইল না। তারপর প্রমীলার শরীরে একটা ঝটকা। ওর দিকে তাকিয়ে ধীরেন ও গোপেশ্বর দৃষ্টি বিনিময় করে নিজেদের মধ্যে কিছু একটা ইশারা করল।

প্রমীলার শরীরটা দুলতে লাগল। হাতে ধরা গ্লাসটা নিয়ে বিছানায় কাত হয়ে পড়ল। ওর মাথাটা ডান কাঁধে ঝুলে পড়ল। ওকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, শুধু মদের ক্রিয়ায় নয়, অন্য কোনও জিনিসের জন্য ওর শরীরের ভেতর প্রচণ্ড তোলপাড় আর সেই ঝড়কে সামলাতে ওর নিদারুণ চেষ্টা চলছে। প্রমীলা বাঁ হাত দিয়ে বিছানার চাদরটা খামচে ধরেছে, খোলা মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। হাঁপাতে হাঁপাতে গ্যাঁজলা উঠছে মুখ দিয়ে। না, প্রমীলা আর বসে থাকতে পারল না। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ও উপুড় হয়ে বিছানায় ঝপাং করে পড়ে গেল। ওর শরীরে নড়াচড়া করার শক্তি যে অন্তর্হিত তা ওর বিছানায় উপুড় হয়ে পড়া থেকেই বোঝা গেল। ও কোনও শব্দই মুখ থেকে বার করতে পারল না।

গোপেশ্বরের ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা গেল। ধীরেনের ঠোঁটেও একই উল্লাসের অনুচ্চ অভিব্যক্তি। ও আলতো করে প্রমীলার লুটিয়ে পরা বাঁ হাতটা তুলে নাড়ী টিপে প্রমীলার জীবনীশক্তির হাঁটা চলা আন্দাজ করার চেষ্টা করতে লাগল। না। কোনও সাড়াশব্দ নেই।

ব্যস, গোপেশ্বর আর ধীরেন দ্রুত তাদের পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু করল। ধীরেন প্রমীলার উপুড় হয়ে থাকা গলার পেছন থেকে নেকলেশের হুক খুলে নিয়ে নেকলেশটা টান মেরে ডান হাতে নিয়ে ওর ওজনটা পরিমাপ করার জন্য দু'বার হাত দুলিয়ে সেটা নিজের পাঞ্জাবির পকেটে পুরে দিল। গোপেশ্বর ততক্ষণে খুলতে শুরু করেছে হাতের চুড়িগুলো। মেয়েদের হাত থেকে বহুদিন ধরে ব্যবহৃত চুড়ি চট করে খোলা যায় না। কব্জির কাছে এসে আটকে যায়। তারপর চেটোতে চেপে চেপে সেটা বার করতে হয়। এক্ষেত্রেও গোপেশ্বরকে সেই পন্থা নিতে হল। ধীরেন খুলে ফেলেছে দু'কানের দুল। তারপর প্রমীলার বাঁ হাতের অনামিকা নিয়ে পড়ল। সেই অনামিকায় বহুদিন ধরে রয়েছে রায়বাবুর দেওয়া একটা বেশ মোটাসোটা আংটি। যদিও ব্যবহারে সেটার অনেকটা সোনা ক্ষয়ে গেছে, কিন্তু একেবারে পাতলা বা ঠুনকো হয়ে যায়নি। প্রমীলা ওই আংটিটা হাতছাড়া করেনি, ওর নথ ভাঙ্গার সাক্ষী হিসাবে সেটা রেখে দিয়েছে। এমনভাবে আংটিটা আঙুলে যত্নে রেখেছিল যেন সেটা ও বাসরঘরে স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছে।

গোপেশ্বর গায়ের জোরে প্রমীলার চুড়িগুলো টেনে টেনে খুলছে, প্রমীলার মুখে কোনও ব্যথার অনুভূতি নেই। নেই কোনও ‘আঃ, উঃ' আওয়াজ। সে সব রকম অনুভবের বাইরে।

ধীরেন নেকলেশ, আংটি আর দুল পকেটে রেখে চৌকি থেকে নেমে দাঁড়াল। গোপেশ্বর নামল- চুড়ি চারটে নিয়ে। এবার ওদের পালাবার পালা। গোপেশ্বর দরজা খুলে প্রমীলার ঘরের লম্বা গলির দুদিক গলা বার করে ভাল করে নিরীক্ষণ করে নিল। না, গলির এ

প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত কোনও মানুষের ছায়াছবি নেই। শুধু দেখল কালীঘাট রোডের ওপর দু'তিনটে কুকুর নিশ্চিন্তে মুখ গুঁজে ঘুমচ্ছে। গোপেশ্বর খুশি হল, ওদের কেউ দেখবে না।

গোপেশ্বর ওর পেছনে দাঁড়ানো ধীরেনের পাঞ্জাবি ধরে টান মারল। অর্থাৎ, চল। গোপেশ্বর প্রমীলার ঘরের চৌকাঠ পার হয়ে গলিতে পা রাখল, পেছনে ধীরেন। গোপেশ্বর প্রমীলার ঘরের বাইরের ছিটকিনিটা তুলে দিতে ওরা কালীঘাট রোডের দিকে সন্তর্পণে হাঁটা দিল। ওদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কাজ সমাধা। এখন শুধু ভালয় ভালয় কালীঘাট থেকে উধাও হয়ে গেলেই হল। ওরা প্রায় পা টিপে টিপে গলি পার হতে লাগল। গলির সব ঘরই ভেতর থেকে বন্ধ। ঘরে ঘরে কোন দৃশ্যের কাজ চলছে তা নিয়ে ওদের কোনও মাথাব্যথা নেই। ওরা কালীঘাট রোডে পড়তেই ঘুমন্ত কুকুরগুলো জেগে উঠল। চোখ খুলে দু একজন ওদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে শুয়েই "ঘেউউ" করে আবদারের সুরে ডাকল। একজন অতি উৎসাহী হয়ে আড়মোড়া ভেঙে একটু উঁচু গলায় ডেকে উঠল। এর বেশি ওরা আর কিছু করতে লাফাল না, কারণ এ তো ওদের কাছে নিত্যরাতের দৃশ্য। কত রকমরকম লোকের ওই গলির ভেতর যাওয়া আসা। তাই ওরা আর ওদের কাজে অতি সতর্ক নয়।

গোপেশ্বররা কুকুরদের ভদ্রতা দেখে আশ্বস্ত হল। ওরা দক্ষিণ দিকে কালী মন্দিরের দিকে মুখ করে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করে পুব দিকে হাজরা মোড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

কিছুটা এগিয়ে চলার পর হরিশ মুখার্জি রোডের মোড়ে আসতেই গোপেশ্বর ধীরেনকে বলল, "বাঁ দিকে চল।"

ধীরেন একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, "এদিক দিয়ে যাবি?"

গোপেশ্বর উত্তরদিকে হরিশ মুখার্জি রোডে ঢুকতে ঢুকতে বলল, "হ্যাঁ। ওদিকে সামনেই ভবানীপুর থানা। এদিকে পুলিশের আনাগোনা কম। তবু এসে গেলে বলবি আমরা পি জি হাসপাতালে যাচ্ছি, ওখানে আমাদের পেশেন্ট আছে।"

ধীরেন আস্তে বলল, "ঠিক আছে।" তারপর ডান পকেটে রাখা গহনাগুলোর ঝনঝন আওয়াজটা ডান চেটো দিয়ে চেপে গোপেশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। খানিকটা চলার পর গোপেশ্বর ধীরেনকে প্রশ্ন করল, "রুমাল আছে তো?"

ধীরেন বলল, "আছে।" গোপেশ্বর সামনের দিকে তাকিয়েই একটু নির্দেশের

ভঙ্গিতে বলল, "তাহলে রুমালটা দিয়ে ওগুলো জড়িয়ে পকেটে রাখ। আর আওয়াজ হবে না। আমিও ওভাবে রেখেছি।"

ধীরেন গোপেশ্বরের নির্দেশ মতো রুমালটা বার করে বাঁ হাতের তালুর ওপর মেলে রাখল। তারপর রাস্তার চারপাশটা একবার চোখ বুলিয়ে কোনও লোকজনের হদিশ মেলে কি না তা দেখে নিল। কাউকে দেখতে পেল না। সে পকেট থেকে সোনার জিনিস বার করে সেগুলো বাঁ হাতের তালুতে রাখা রুমালে রেখে জড়িয়ে নিয়ে পকেটস্থ করল। না, আর আওয়াজ হচ্ছে না। ওরা নিঃসাড় হয়ে প্রমীলার মতো রুমালের ভেতর ঘুমচ্ছে।

গোপেশ্বর লুঙ্গি পরে ফাঁকা রাস্তায় উত্তরমুখী হনহন করে হাঁটছে। ধীরেন অল্প একটু পেছনেই। ধীরেন গোপেশ্বরের লুঙ্গিটা অনেক আগেই খেয়াল করেছে। যেটা সে প্রমীলার ঘরে ধুতি ছেড়ে পরেছিল। ধীরেন তাই গোপেশ্বরকে বলল, "লুঙ্গিটা পরেই চলে এলি?"

গোপেশ্বর হাঁটতে হাঁটতেই উত্তর দিল, "তাড়াহুড়োয় এটাই ভুল হয়ে গেল। তুই তো আমার পেছনে ছিলি, তখন বলতে পারলি না?"

ধীরেন একইভাবে গলা নামিয়ে বলল, "আমিও শালা তখন খেয়াল করিনি। করলে কি আর বলতাম না? ফালতু ওখানে ধুতিটা রেখে এলি।"

তারপর একটু থেমে বলল, "এখন গিয়ে আর নিয়ে আসা যায় না?" গোপেশ্বর

অন্ধকার রাস্তায় ধীরেনের দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে তারপর সোজা হাঁটতে হাঁটতে বলল, "তোর কি আজ মাথা খারাপ হয়েছে?" ধীরেন আমতা আমতা করে উত্তর দিল, "না, মানে, মনে হয়, এখনও জানাজানি হয়নি। কেউ ওখানে ঢোকেনি।"

গোপেশ্বর প্রশ্ন করল, "কী করে জানলি? হয়ত হয়নি, ' হয়ত হয়েছে, ওভাবে কি চান্স নেওয়া যায়? এখন সোজা চল, আর ও নিয়ে কথা বাড়াস না, যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে, আমরা কে, কেউ জানে না। ধুতিটা ভাল ছিল, এই যা। নয়ত লুঙ্গিটাও খারাপ না।"

ওরা দুজন কথা বলতে বলতে মিনিট দশেকের মধ্যে শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালের পুব দক্ষিণ দিকের গেটের সামনে পৌঁছে গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে হাসপাতাল চত্বরে ঢুকে গেল।

তখনও রাত তিনটে বাজেনি। অন্ধকারের চাদর সরিয়ে আলো ফুটতে ঘণ্টা দুয়েক দেরি আছে। বাতাসে রয়েছে একটা ঘুম ঘুম স্নিগ্ধ আমেজ। ওরা সোজা পশ্চিমমুখী হাঁটতে লাগল। যেন কত ব্যস্ততা। এখানে গোপেশ্বরের লুঙ্গিটা বেশ মানানসই হয়ে গেল, কারণ হাসপাতালে যারা অসুস্থদের জন্য রাত কাটায় তারা অধিকাংশই লুঙ্গি পরে থাকে, গোপেশ্বরও যেন তাদেরই একজন। ওরা হাসপাতালের মাঝারি মাপের দীঘিটা ডানপাশে রেখে উডবার্ন ওয়ার্ডের দিকে হাঁটতে লাগল। খানিকটা এগোলেই বাঁ দিকে একটা বেশ বড় মাঠ। ডানদিকে একটা ঘেরা ফুলের বাগান। ওখানে তখনও শীতের কিছু মরসুমী ফুল ফুটে আছে। ডালিয়া আছে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, একটু দূরে ফ্লকসের ঝাড় আগোছালো, একটার সঙ্গে আরেকটা জড়িয়ে শিশিরে ভিজছে। খানিকটা দূরে পর পর দুটো প্যানজির গোলাকার বেড। মরসুমের প্রথম স্মার্টনেস আর তাদের নরম শরীরে নেই। তবে অসংখ্য ফুল যে এখনও ফুটে আছে তা বোঝা যায়। অন্ধকারে কোনও ফুলেরই রঙ দেখা যাচ্ছে না। ওরা বাগানটা ছাড়িয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। কেউ কোথাও নেই। ওরা আবার পুবমুখী ফিরে হাঁটতে শুরু করল। তারপর দীঘির পশ্চিমপারে দুটো কাঠের বেঞ্চিতে দুজনে বসে পড়ল। বসতেই ওদের শরীরে ক্লান্তি নেমে এল। এতক্ষণের টানটান উত্তেজনায় ওরা এক দমে হেঁটেছে, কিন্তু ফাল্গুনের শেষ প্রহরের হাওয়ায় প্রমীলার ঘরে খাওয়া পেট ভর্তি মদ ওদের শরীরের পেশিতে টান মারতেই ওরা ঝিমতে শুরু করল।

ওদের ঘুম ভাঙল দীঘির চারপাশে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য বড় বড় গাছের ডালপালায় রাতের আস্তানায় ছড়িয়ে থাকা পাখিগুলো ঘুম থেকে জেগে উঠে নিজেদের বিভিন্ন স্বরের রাগ ধরতে। ধীরেন আর গোপেশ্বর নিজেদের পকেটগুলো একবার বাইরে থেকে টিপে দেখল তাদের গতরাতের অভিযানের ফলগুলো ঠিক আছে কিনা। ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে হাসপাতাল চত্বর থেকে বেরিয়ে আবার উত্তরমুখী হেঁটে ভিক্টোরিয়ার পুবদিকের মাঠের পাশে এল। প্রাতঃভ্রমণকারীদের সঙ্গে মিশে শেক্সপিয়র সরণির মুখে এসে একটা ধর্মতলাগামী ট্রাম ধরে ধর্মতলায় এসে কলকাতার আরও লোকের সঙ্গে আর একটা নতুন রবিবার শুরু করার জন্য মিশে গেল।

তখন ঘড়িতে ভোর ছ'টা। কালীঘাটে প্রমীলার ঘরের সামনে প্রতিদিনের মতো লক্ষ্মী সেদিন ভোরেও এল। লক্ষ্মী প্রমীলাদের ওখানে চার পাঁচ ঘরে পরিষ্কারের কাজ করে। প্রমীলারা সবাই কাজের লোক রাখতে পারে না। যাদের নিজের পেট চালানোই দায় হয়ে ওঠে তারা লক্ষ্মীদের কাজে বহাল করার কথা চিন্তাও করতে পারে না। প্রমীলার রোজগার ভাল ছিল, সে কাজের লোক রাখতে পেরেছিল।

লক্ষ্মী প্রথমেই প্রমীলার ঘর পরিষ্কার করে। সে এসে দেখল, প্রমীলার ঘরের দরজায় উপরে বাইরে থেকে শিকল দেওয়া। আশ্চর্য হয়ে গেল। এমনটা তো হওয়ার কথা নয়। কোনও দিন হয়নি। ভাবল, রাতের কোনও বাবুর আবদারে প্রমীলা বোধহয় তাদের মনোরঞ্জন করতে বাইরে কোথাও হাওয়া খেতে গেছে। সে ঠিক করল, শিকল খুলে সে ঘরটা পরিষ্কার করেই যাবে। ভাবল, হয়ত ওর আসার কথা চিন্তা করেই প্রমীলা তালা না লাগিয়ে চলে গেছে। লক্ষ্মী শিকল খুলে এক ঠেলায় দরজার কপাট হাট করে দিতেই দিনের

আলো এক লাফ দিয়ে প্রমীলার ঘরে উঁকি দিতে ঢুকল। লক্ষ্মীও ঘরের ভেতর পা রেখেই ভ্রু কুঁচকাল। দেখল, প্রমীলা চৌকির ওপরেই উপুড় হয়ে আশ্চর্যরকমভাবে শুয়ে আছে। এদিকে বাইরের শিকল ছিল তোলা। তাছাড়া ঘরটা অস্বাভাবিক রকম এলোমেলো। দেখল, গতরাতে প্রমীলা দুটো হ্যারিকেন জ্বালিয়েছিল, একটা নিভে গেছে, অন্যটা তখন ও কোনওমতে টিপ টিপ করে জ্বলছে। দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, ওটারও আয়ু আর বেশিক্ষণ নেই। ওটা না নিভিয়েই প্রমীলা ঘুমিয়ে পড়েছে। লক্ষ্মী ভাবল, খদ্দেররা কখন চলে গেছে প্রমীলার উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা থেকেই বোঝা যায়, সে টেরও পায়নি। তাছাড়া বিছানায় পড়ে আছে তিনটে খালি গ্লাস। চৌকির তলায় দুটো মদের বড় বোতল, অর্থাৎ মদ্যপান খুব জোর চলেছে। সেই মদের ঠেলা প্রমীলা সামলাতে পারেনি। বিছানার ওপরেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে তাস। প্রমীলার হাতেও ধরা আছে কয়েকটা। সেটাই লক্ষ্মীকে আশ্চর্য করে দিল।

সে এগিয়ে গিয়ে প্রমীলাকে জাগানোর জন্য প্রমীলার খোলা হাঁটুর কাছটায় একটা ঠেলা দিয়ে ডাকল, "ও দিদি, ওঠ।" বলেই লক্ষ্মী ক'পা পিছিয়ে এল।

প্রমীলার শরীর একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা। লক্ষ্মী ভয় পেয়ে গেল। সে প্রায় চিৎকার করে, "ও মাসী গো, ও মাসী গো" বলে ডাকতে ডাকতে বাড়িওয়ালির ঘরের দিকে দৌড় লাগাল। বাড়িওয়ালি অনেক আগেই ঘুম থেকে জেগে নিজের জন্য চা বানাচ্ছিল। সে লক্ষ্মীর তীক্ষ্ণ চিৎকারে ঘর থেকে বেরিয়ে লক্ষ্মীর ওইভাবে ধেয়ে আসার দিকে তাকিয়ে একটু বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠে প্রশ্ন করল, "কী হয়েছে কী, এমন করে নাচার কী হল?" লক্ষ্মী বাড়িওয়ালির কথায় কর্ণপাত না করে তাকে বলল, "এদিকে এসো, কী হয়েছে দেখ।" বাড়িওয়ালি তার এ জীবনে বহু কিছু দেখেছে, সে একটুও না ঘাবড়ে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, "কী হয়েছে, বল না?" লক্ষ্মীর এত কথা বলার সময় নেই, সে বাড়িওয়ালির বাঁ হাতটা চেপে ধরে প্রমীলার ঘরের দিকে হিড়হিড়িয়ে টেনে নিয়ে চলল। বাড়িওয়ালি তখনও বলে চলেছে, "আরে কী হয়েছে বল না।" লক্ষ্মী কোনও উত্তর না দিয়ে টেনে নিয়ে গেল প্রমীলার ঘরের খোলা দরজার সামনে। তারপর বলল, "ঘরের ভেতরে গিয়ে দেখ কী হয়েছে।" বাড়িওয়ালি ঘরে ঢুকে দেখল,

প্রমীলা উপুড় হয়ে চৌকির ওপর পড়ে আছে। চারদিকে জিনিসপত্র ছড়ানো ছিটনো। গতরাতের দুই বাবু খদ্দের কখন চলে গেছে সে জানেও না। তাদেরই একজনের ধপধপে একটা সাদা ধুতি প্রমীলার আলনায় ঝুলছে। প্রমীলার সর্বক্ষণের সঙ্গী গহনাগুলো একটাও শরীরে নেই। বাড়িওয়ালির একটা খটকা লাগল। তবু সে একটু চাপা স্বরে গম্ভীরভাবে ডাকল, "প্রমীলা, এই প্রমীলা।" উল্টোদিক থেকে কোনও সাড়া শব্দ নেই। বাড়িওয়ালি চৌকির কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রমীলার কপালে তার ডান তালুটা ঠেকাল। বরফ। হাতটা সরিয়ে এনে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের খোলা দরজার দিকে তাকাতেই দেখল অনেক মুখ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ঘটনার পরিণাম শুনতে চাইছে। এই পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কীভাবে কাজ করতে হয় তা সে জানে৷ নয়ত সে বাড়িওয়ালি হয়েছে কি করতে? ঘরে উঁকি মারার দলে তিন চারটে পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক ছিল, ওরা সবাই বাড়িওয়ালি ও অন্যান যৌনকর্মীদের পয়সাতে জীবন ধারণ করে, বিনিময়ে তাদের রক্ষা করে একমাত্র বাড়িওয়ালিই। জানে এদের মাতৃ পরিচয়, কিন্তু পিতৃ পরিচয় বলতে পারবে না। ওদের দিকে তাকিয়ে বাড়িওয়ালি নির্দেশ দিল, "থানায় খবর দে।"

দর্শককুল যা বোঝার ওই একটা ঘোষণাতেই বুঝে গেল। তাদের মধ্যে একটা মৃদু আলোচনা শুরু হয়ে গেল। বাড়িওয়ালি ওদের কথাবার্তার মধ্যেই ধমকে উঠে ভিড়ের উদ্দেশে হুকুম করল, "চুপ, শোন, কেউ পুলিশ আসার আগে এই ঘরে ঢুকবি না, কোনও জিনিসে হাত দিবি না।" তারপর যুবকদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোদের দুজন থানায় চলে যা, আর বাকিরা এই ঘরের সামনে পাহারায় থাক, দেখিস কেউ যেন ঘরে না ঢোকে, আমি বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়ে যাচ্ছি।" যুবকেরা নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। বাড়িওয়ালি

লক্ষ্মীকে নিয়ে প্রমীলার ঘর থেকে বেরিয়ে দরজার কপাট দুটো টেনে শিকল তুলে নিজের ঘরের দিকে চলল, ওখানে স্টোভে চায়ের জল বসানো আছে, সবটা বোধহয় এতক্ষণে শুকিয়ে গেল !

বাড়িওয়ালি ঘরে এসে দেখল, তার আশঙ্কাই ঠিক, জল প্রায় শুকিয়ে এসেছে, সে তাড়াতাড়ি একটা ঘটি থেকে খানিকটা জল ঢেলে দিয়ে পরবর্তী কাজগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করল। প্রমীলা মেয়েটা ভালই ছিল। ও আসাতে ওর বাড়ির কদরও বেশ বেড়ে গিয়েছিল। টাকাপয়সার আমদানিটা ভালই হচ্ছিল। কিন্তু কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল! যে লোক দুটো গতরাতে এসেছিল তাদের মুখ দুটো চিন্তা করতে শুরু করল, সে চিন্তা করে দেখল, তাদের দেখলে সে চিনতে পারবে কিন্তু ওরা কোথাকার লোক তা ও জানে না। এখানে কে কোথা থেকে আসে তার হদিশ কি আর বলা সম্ভব? কেউ সত্যি কথা বলে না। কেউ জিজ্ঞেসও করে না। জিজ্ঞেস করার নিয়মও নেই। তারা আসে, কাজ করে চলে যায়। এইই চিরন্তন নিয়ম। শুধু যারা বাঁধা নিয়ম করে কোনও ঘরে আসে তাদেরই কিছুটা হদিশ পাওয়া যায়, অন্যরা তো মরসুমী পাখি, কখন কোথায় কোন ঘরে যায় একমাত্র তারাই বলতে পারে। আজ এ ডালে, কাল ও ডালে। কোথাও স্থির নেই। সে ভাবল, কী আর করা যাবে? প্রমীলা গেল, আর একটা মেয়েকে ওই ঘরটা দিয়ে দেবে। শুধু একটাই ওর আফসোস, প্রমীলার মতো কাজের মেয়ে পাওয়া একটু মুশকিল।

দুটো ছেলে ভবানীপুর থানায় খবর দিতে চলে গেছে। গলির ভেতর লক্ষ্মীকে ঘিরে অন্যান্য যৌনকর্মীদের ভিড়। সেখানে একটাই আলোচ্য বিষয়। প্রমীলা মারা গেল কীভাবে। লক্ষ্মীকে প্রশ্ন, সে দরজা খুলে কী দেখেছে?

এভাবে প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ কেটে গেল। ইতিমধ্যে ভবানীপুর থানাতে খবর দিয়ে ছেলে দুটোও ফিরে এসেছে। লক্ষ্মী চলে গেছে অন্য ঘরে তার কাজে। সে জানে সারাক্ষণ ওই এক কথা নিয়ে পড়ে থাকলে তার চলবে না। তাকে এখানে কাজ করে খেতে হবে। তার ওপর বাড়িওয়ালি বলে গেছে, পুলিশ না আসা পর্যন্ত যেন সে এই গলি ছেড়ে না যায়, কারণ সেই প্রথম প্রমীলার দরজাটা খুলেছিল।

সাড়ে আটটা নাগাদ ভবানীপুর থানার অফিসার-ইন-চার্জ সহ দুজন অফিসার ও তিনজন কনস্টেবল প্রমীলাদের গলিতে জিপ নিয়ে হাজির। তারা থানা থেকেই লালবাজারের গোয়েন্দা দফতরে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল। ভবানীপুর থানার অফিসাররা প্রমীলার উপুড় হয়ে থাকা শরীর সামান্য পরীক্ষা করেই বুঝল, এটা অস্বাভাবিক মৃত্যু। তারা বাড়িওয়ালি সমেত অন্যান্য যৌনকর্মীদের ও লক্ষ্মীকে জেরা করে আগের রাতের খবরাখবর নিতে শুরু করল। তাতে একটা ধারণা হল যে, রাতের দুই অভিযাত্রীই সম্ভবত প্রমীলাকে খুন করেছে। এছাড়াও জানতে পারল, ধুতির রহস্য। তাদেরই একজনের যে ওই ধুতিটা তাতে ওখানকার কারও মনে কোনও সন্দেহ নেই। তাছাড়া প্রমীলার বাঁধাবাবু বিনয়ের লুঙ্গিটা আলনায় নেই। অর্থাৎ ধুতি ছেড়ে ওই দুজনের যে কোনও একজন যে ওই লুঙ্গিটা ব্যবহার করেছিল, আর সে তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে আর নিজের ধুতিটা পাল্টে নেয়নি। অফিসার-ইন-চার্জ ধুতিটা হাতে নিয়ে দেখল তাতে একটা লম্বা চুল। সে সেটা একটা কাগজে মুড়ে পকেটে রাখল।

ভবানীপুর থানার অফিসাররা প্রমীলার ঘরে পৌঁছনোর প্রায় আধঘণ্টা পরে লালবাজারের গোয়েন্দার দলও সেখানে পৌঁছে গেল। রুটিন তদন্ত যা করার তারাও শুরু করল। প্রমীলার দেহ পোস্টমর্টেমের জন্য মর্গে পাঠিয়ে দিয়ে, মদের গ্লাস, বোতল, ধুতি সব ফরেনসিক পরীক্ষা করার জন্য বাজেয়াপ্ত করে ফিরে এল লালবাজারে।

এখন অপেক্ষা করতে হবে। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পেলেই বোঝা যাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ। তবে আপাতভাবে প্রমীলার মৃত্যুটা যে নিছক আত্মহত্যা নয়, সেটা হত্যা, তা প্রাথমিক তদন্তেই ধরা গেছে। মূল তদন্তের ভার দেওয়া হল শম্ভু দাস সরকারের ওপর। সাহায্যকারী হিসাবে রইলেন শিশুরঞ্জন দাস মানে আমাদের কাকু আর বিধুবাবু।

পাঁচের দশকের শেষদিকে তো কলকাতায় পরবর্তী যুগের মতো মুড়ি মুড়কির মতো খুন হতো না। বিশেষ করে সত্তর ও তার পরবর্তী যুগে যা শুরু হয়েছিল। তখন কলকাতায় একটা খুন হলেই তা নিয়ে বেশ হইচই শুরু হয়ে যেত এবং যেই খুনের তদন্তের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ত আমাদের গোয়েন্দা দফতর। যতক্ষণ না সেই রহস্যের কিনারা করতে পারত ততক্ষণ পর্যন্ত তার পেছনে লেগে পড়ে থাকার মাঝে কোনও বিরাম ও থাকত না। আর এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য আমাদের বাহিনীর প্রত্যেকেই হাত বাড়িয়ে রাখত। নিজেদের ভেতর খেয়োখেয়ি বা নোংরা রাজনীতির চক্করে পড়ে খুনী ডাকাত ছেড়ে দিত না তদন্তকারী অফিসার। তেমন কোনও কাজের কথা কেউ চিন্তাও করতে পারত না। এমন চিন্তার আমদানির শুরু আশির দশকের প্রথম ভাগ থেকে, যখন বাহিনীর শীর্ষ নেতৃত্বই বাহিনীর বাইরের লোকের কথাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে সেই মতেরই অনুসারী হয়ে বাহিনীকে চালাতে লাগলেন। এতে বাহিনীর মধ্যে কাজের পরিবেশের বদলে অকাজের, বিশেষ করে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির খেলার মাঠ তৈরি হতে শুরু করল। আর অবিশ্বাস? কে যে কখন কার পেছনে ছুরি মেরে যাত্রা ভঙ্গ করবে তাই ভেবে ধীরে ধীরে সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। এই পরিস্থিতিতে কী পুলিশের মতো একটা সদাসতর্ক বাহিনীতে সুস্থভাবে কাজ চলে? অসম্ভব। তাই ধীরে ধীরে কাণ্ড শুকিয়ে যেতে লাগল। কাণ্ড শুকিয়ে গেলে তার শাখাপ্রশাখা কী করে তাজা থাকবে? আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে সেটা এগিয়ে যাবেই। আর সে জন্য ভুগতে হবে কলকাতার সাধারণ নাগরিকদের।

এ ব্যাপারে একজন সি.পি. তো ছিলেন সবচেয়ে চ্যাম্পিয়ান। তিনি সারাদিন লালবাজারে তাঁর অফিস ঘরে বসে সাহিত্য নিয়ে নিজের গোষ্ঠীর লোকজনের সঙ্গে আড্ডা জমাতেন। সন্ধের পরে চলে যেতেন বালিগঞ্জ প্লেসের একটা ফ্ল্যাটে। সেই ফ্ল্যাটটা ছিল সব পেয়েছির আসর। যখন যা চাই হাতের কাছে মজুত। সান্ধ্য আসরের মজলিসের জন্য ওই ফ্ল্যাটটা সাজিয়েছিল মিঃ সেন নামে দক্ষিণ কলকাতার এক প্রোমোটার। সে তার একান্ত অনুগত সিদ্ধার্থকে দিয়ে প্রায় জোর করে ফ্ল্যাট কিনিয়ে সেটা নিজে হস্তগত করে কলকাতার বেশ কিছু প্রভাবশালী আই এ এস ও আই পি এস আর ধনী ব্যবসায়ীর আড্ডা ও লুকনো ব্যবসার কেন্দ্রস্থল হিসাবে গড়ে তুলেছিল।

যেমন নাম করা সাধুসন্তদের বিলাসবহুল আশ্রমে গিয়ে ভারতবর্ষের উঁচু নিচু স্তরের আমলা ও ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে সাধুবাবাদের মাধ্যমে আলাপ-পরিচয় করে ব্যবসা গড়ে তোলে ও সমস্যার সমাধান করে ঠিক তেমনি মিঃ সেনও বালিগঞ্জ প্লেসের ওই ফ্ল্যাটে গড়ে তুলেছিল সর্বকর্ম ও দুষ্কর্মের কেন্দ্রস্থল, সেখানে শুধু ছিল না ধর্মের নামে আশ্রমের কোনও সাইনবোর্ড। ছিল না যার তার অবাধ গতি। ক্ষমতা কিংবা কোটি কোটি টাকার মালিক ছাড়া ওই ফ্ল্যাটের সভ্য হওয়া যেত না। মনোরঞ্জনের সর্বস্তরের ব্যবস্থা যখন তাৎক্ষণিক হস্তগত তখন সেখানে সাধারণ লোকেরা কী করবে? খুব জোর ওই সব ভোগবিলাসীদের খিদমতগিরি করতে পারে। লেনিনবাদী সি.পি. সারাদিন লেনিন আউড়ে সন্ধের বিপ্লব করতে চলে যেতেন ওই ফ্ল্যাটে। মদ্যপানের মাঝে ক্লান্ত হয়ে সেখানে বলে উঠতেন, "মনে হয় আমিই লেনিন !'

মদ্যপানের জন্য সুসজ্জিত সেলার। সেই সেলারে রাখা থাকত সারা বিশ্বের বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন স্বাদের সুরা। যার যেদিন যেটা মনপসন্দ সেদিন সে সেটা পান করত। রান্নার জন্য ছিল স্পেশাল বাবুর্চি। যার যা ইচ্ছা তাই হাজির করত সে। কারও জন্য চাইনিজ, কারও জন্য মোগলাই কিংবা ফরাসী, ইংলিশ, ইতালীয়, আফগান বা স্রেফ পাঞ্জাবী।

মদ্যপানের মৌজের জন্য কারও চাই নীল ছবি। তার জন্য হাতের কাছেই রয়েছে ক্যাসেট। শুধু চালানোর অপেক্ষা। কারও চাই তাজা কিছু, তারও আছে ব্যবস্থা। মুখ থেকে শুধু ইচ্ছা প্রকাশের অপেক্ষা, মিঃ সেনের পরিচালনায় প্রতিটি জিনিস তার লোকেরা হাজির করে দেবে। শুধু মুখ দিয়ে হুকুমটুকু বলার পরিশ্রম করলেই চলবে।

বছরের পর বছর মিঃ গুপ্ত, মিঃ চৌধুরি, মিঃ জহুরি, মিঃ চাকলাদার, মিঃ তালুকদার,

মিঃ কানোরিয়া, মিঃ চুড়িওয়ালা, মিঃ গুপ্তা প্রভৃতি সমাজের মহামান্য ব্যক্তিরা মিঃ সেনের ওই ফ্ল্যাটে সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত কাটিয়ে যে যার বাড়ি ফিরেছেন পরদিন সমাজের মহান কর্তব্য পালন করার জন্য মানসিক শক্তি সঞ্চয় করে। সবাই একসঙ্গে যেতেন তা নয়। মিঃ সেন প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে ওই ফ্ল্যাটে ডাকতেন। যাতে ঠিক মতো প্রত্যেকের দেখভাল করা যায়। যাতে, একে অন্যের ব্যাপার না জানতে পারে। তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

সি.পি. আবার নিজের বাড়ির জন্য বাবুর্চিও ওইখান থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওই বাবুর্চি গদা ও তপনের মাইনে কে দেবে? সেটা দেবে সিদ্ধার্থ। তার রাত দুটোর সময় খাওয়ার ইচ্ছা হল বৌবাজারের গোপাল মুখোপাধ্যায়ের দোকানের কচি পাঁঠার মাংস। খবর দাও। ছুটল গাড়ি। সিদ্ধার্থ গোপালবাবুকে ঘুম থেকে তুলে সি.পি.র ইচ্ছার কথা জানাতে বিস্মিত হয়ে বললেন, “সেকি, এত রাতে মাংস? এখন তাহলে আমার বা ছেলের মাংস কাটতে হবে।” সিদ্ধার্থ সে কথা শুনে অনেক অনুরোধ উপরাধে তাকে রাজি করিয়ে দু কেজি মাংস নিয়ে ফিরল। গদা রান্না করল। সিপি খেলেন। তারপর ঘুমলেন।

মিঃ সেন ও অন্যান্যরা ওখানে বসে কী ব্যবসা করত? মিঃ সেনের মাধ্যমে সুদে টাকা খাটাত। সেই সুদের হার কত? যখন যেমন মুরগী পাওয়া যেত তখন তেমন। তবে অবশ্যই তা কমপক্ষে বাৎসরিক পঁয়ত্রিশ শতাংশের নীচে নয়। কখনও বা প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ। বিনিয়োগের প্রথম ধাপেই মিঃ সেন তার কমিশন হিসাবে মূল টাকার থেকে অন্তত পাঁচ বা সাত শতাংশ কেটে নিজের পকেটে ঢুকয়ে রাখত। এর ফলে যে টাকা নিত সে কখনই পুরো টাকা হাতে পেত না, যদিও কাগজপত্রে পুরো টাকা ‘বুঝে নিলাম' বলে সইসাবুদ করে নিতে হত। বিপুল পরিমাণে অনেক কোটি টাকা এভাবে চক্রাকারে ওই ফ্ল্যাট থেকেই বাজারে খাটানো হতো। যারা ওই টাকা নিয়ে নিজের ব্যবসায় খাটাতো অবশ্যই তাদের গলা টিপে সুদ আদায় করা হতো শুধু তাই, তাদের ওরা প্রায় চাকরবাকরের মতো খাটাতো। মিঃ সেনের মাধ্যমে আই.পি.এস, আই.এসরা টাকা খাটাতো, তারা ছাড়াও বেশ কিছু গুণ্ডা তার হাতে ছিল টাকা আদায়কারী হিসাবে। এইভাবে মিঃ সেন সিদ্ধার্থকেও প্রায় তিন কোটি টাকা সুদে ধার দিয়ে তার কাছ থেকে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা আদায় করার পরও আরও চাপ দিতে লাগল, টাকা দেওয়ার। সিদ্ধার্থের ততদিনে নাভীশ্বাস উঠে গেছে। সে মিঃ সেনকে বলল, “আরও টাকা দিতে সে অপারগ। কারণ তার টাকা সুদ সমেত ফেরৎ দিতে দিতে সে দেউলিয়া হয়ে গেছে।' সে মুক্তি চাইল।

মিঃ সেন সিদ্ধার্থের সে নিবেদন শুনবে কেন? তার ব্যবসাই তো ওটা। লোকের গলায় পা তুলে টাকা আদায় করা।সেই জন্যই তো সে টলি ক্লাব, সাউথ ক্লাব, সি.সি.এফ.সির সদস্য হয়েছে। যেখান থেকে সে কলকাতার ক্ষমতাবান লোকেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়, তারপর নিয়ে আসে তার ফ্ল্যাটে। তাঁদের ছেলেদের মদ, নারী যোগান দিয়ে বাউণ্ডুলে বানিয়ে বাপ ছেলে দুইয়েরই টিকি নিজের তালুতে ধরে রাখে। যাতে তাঁরা তার কথায় সিদ্ধার্থদের মতো ছেলেদের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে দেয়। সে তাই সিদ্ধার্থের কথা মুচকি হেসে উড়িয়ে দেয়। সে জানে এমন কত সিদ্ধার্থকে সে কতবার গোলা জল খাইয়েছে, দক্ষিণ কলকাতার কত উঠতি প্রোমোটার তার দাবী মতো তাকে নজরানা দিতে অস্বীকার করার ফলে সি.পি.র মাধ্যমে শ্রীঘরে পাঠিয়েছে। এবং দাবী মতো টাকা দেওয়ার পরই তাদের চার দেওয়ালের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়েছে। সেখানে সিদ্ধার্থ তো একটা বাচ্চা ছেলে। সে তাই সিদ্ধার্থ ও তার লোক পদ্মকে খুনের হুমকি দিতে লাগল।

নিরুপায় সিদ্ধার্থ একদিন বাধ্য হল সমস্ত ঘটনা লিখিতভাবে কলকাতার পুলিশকে জানাতে। কিন্তু সেই অভিযোগের তদন্ত দূরে থাক, সবই ধামাচাপা পড়ে গেল। সিদ্ধার্থ আবার অথৈ জলে যেমন ভাসছিল তেমনই সংশয় নিয়ে ভাসতে লাগল। সিদ্ধার্থ জানে মিঃ সেন কী ভাবে বাংলা ছবির এক তরুণ নায়কের থেকে টাকা আদায় করেছিল। সেই নায়ক তার নিজের প্রযোজনা ও পরিচালনায় একটা ছবির জন্য মিঃ সেনের কাছ থেকে পনেরো

লক্ষ টাকা নিয়েছিল। ছ'মাসে সেই টাকা সুধ সমেত দাঁড়াল সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা। মিঃ সেন সেই তরুণ নায়কের বালিগঞ্জ প্লেসের ফ্ল্যাট দখল করে নিল। নায়ক তার নব পরিণীতা নায়িকা বধূকে নিয়ে পথে এসে দাঁড়াল। সে নায়ক, তার হাতে অনেক কাজ। সে কাজ করে নতুন করে বাঁচল। কিন্তু সিদ্ধার্থরা বাঁচবে কী ভাবে? মিঃ সেনের অক্টোপাশ তো তাদের আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রেখেছে। তাই মিঃ সেন সিদ্ধার্থের কথায় হাসে।

তা ছাড়া কলকাতা পুরসভার প্রশাসনের শীর্ষ অধিকর্তাই যখন ছিল মিঃ সেনের ওই ফ্ল্যাটের এক সদস্য তখন সে কলকাতায় তাড়াতাড়ি বানিয়ে ফেলল প্রায় খান কুড়ি ফ্ল্যাট বাড়ি। ওই সব ফ্ল্যাটবাড়ির প্ল্যান সে পেয়ে যেত এত দ্রুত যে তা কলকাতা এলাকায় খুব সম্ভবত রেকর্ড।

মিঃ সেন প্রায় আটান্ন বছর পর্যন্ত ছিল অবিবাহিত। যদিও গড়িয়াহাট ও লেক গার্ডেন্সের দুটো ফ্ল্যাটে তার দুটো রক্ষিতা রাখা ছিল। তাছাড়া বালিগঞ্জ প্লেসের এক মিত্র পরিবারের সম্পত্তি শুধু করায়ত্তই করেনি, তাদের এক গৃহবধূকেও তার যৌন লালসার সঙ্গী হতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু দুহাতে গুচ্ছ গুচ্ছ টাকা আসতে তার বাসনা হল বিয়ে করার। তাও তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট এক বিবাহিতা মহিলাকে। কামনার তাড়নায় জর্জরিত হয়ে সে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করল। তারপর একদিন মধ্য কলকাতার এক হোটেল ব্যবসায়ীর পুত্রবধূকে বিবাহবিচ্ছেদ করাতে সফল হল এবং তাকে সে বিয়ে করল। লেনিন সি.পি.র অন্তরঙ্গ বন্ধু যে, সে কেন পারবে না একটা তুচ্ছ বাধা অতিক্রম করে অন্য লোকের স্ত্রীকে ভাঙিয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসতে? পারল। আর কলকাতা পুলিশের সি.পি. সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে ভুঁড়ি উড়িয়ে খেয়ে বাড়ি ফিরলেন।

এই যদি হয় কলকাতা পুলিশের কোনও এক সি.পি.র দৈনন্দিন কাজ, তবে তার অধীনে কর্মরত বাহিনীর কাছে জনসাধারণ কী আশা করতে পারেন? কিন্তু এমনটা তো ছিল না। কোনও অপরাধ সংঘটিত হলে অপরাধীকে খুঁজে বার করে তাকে যথাযথ শাস্তি দেওয়ার জন্য দাঁতে দাঁত চেপে তদন্তে লেগে পড়ে থাকার জন্যই কলকাতা পুলিশের এত সুনাম এবং সেই সুনামের সিঁড়ি বেয়ে দক্ষতার ঐতিহ্য। সেই সিঁড়ি তো আর একদিনে তৈরি হয়নি। বহুদিনের ধারাবাহিক নিষ্ঠা ও একাগ্রতা, যার পেছনে সেইসব দিনগুলোর অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারীদের নিরলস প্রচেষ্টার ইতিহাস লুকিয়ে আছে।

প্রমীলার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা জরুরি ছিল। সেটা হাতে আসার পরই শম্ভুবাবুরা তদন্তে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ছিল, হাইড্রোসাইনয়েড বিষে প্রমীলা মারা গেছে। তার শরীরে বিষ প্রবেশ করেছে মৃত্যুর দিন রাত দু'টো নাগাদ। ফরেনসিক রিপোর্ট থেকে পাওয়া গেল, একটা মদের গ্লাসে বাংলা মদের সঙ্গে হাইড্রোসাইনয়েড মেশানো হয়েছিল। তিনটে গ্লাসের মধ্যে একটাতে যখন পাওয়া গেল হাইড্রোসাইনয়েড অর্থাৎ বাকি দুজন ওই গ্লাসে ইচ্ছে করে সেটা মিশিয়ে প্রমীলাকে হত্যা করেছে।

শুরু হল সেই দুজন আততায়ীকে খুঁজে বার করার জন্য কলকাতার লোকারণ্যে তল্লাস। কিন্তু কোথা থেকে করা হবে শুরু? লোক দুটোর চেহারার যা বিবরণ পাওয়া গেছে তা দিয়ে সত্যিকারের কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না। একটা লোকের লম্বা চুল, ধুতিতে তার চুলই জড়িয়ে ছিল। কারণ ফরেনসিক পরীক্ষায় বলা হয়েছে ওই চুলটা প্রমীলার চুল নয়। অর্থাৎ ওই চুলটা ওই লোক দুটোর কোনও একজনের। এটা একটা চিহ্ন। কিন্তু এটা কোনও বিশেষ কার্যকরী চিহ্ন হতে পারে না। প্রথমত বহু লোকেরই লম্বা চুল আছে, দ্বিতীয়ত সেই লোকটা যদি চুল কেটে ছোট করে দেয় তবে তার আর চুল লম্বা থাকবে না। চিহ্নও মুছে যাবে।

এবং সে সেটা করতেই পারে। গ্লাসে যে হাতের ছাপ পাওয়া গেছে লালবাজারে পুরনো রেকর্ডে ওই ছাপের সঙ্গে অন্য কোনও ছাপের মিল পাওয়া গেল না।

তবে কোথা দিয়ে শুরু করা যাবে নিরুদ্দেশ ওই আসামী দুটোর খোঁজ? ধুতির মধ্যে লন্ড্রির একটা চিহ্ন পাওয়া গেল, চিনা কালি দিয়ে আঁকা এবং সঙ্গে বিল নম্বর। শুরু হল লন্ড্রিতে লন্ড্রিতে ওই ধোবি চিহ্ন খোঁজা ৷ দিনের পর দিন খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে স্কট লেনে একটা লন্ড্রি পাওয়া গেল যারা ওই চিহ্নটা ব্যবহার করে। বার করা হল ধুতিতে লেখা নম্বরের ডুপ্লিকেট বিলটা। সেই বিলে খদ্দেরের নাম ও ঠিকানাও পাওয়া গেল। লেখা আছে, জি দাস, তেতাল্লিশ নম্বর, বৈঠকখানা রোড। আর ওই ডুপ্লিকেট বিলে দেখা যাচ্ছে ওই ধুতির সঙ্গে স্বনামধন্য জি দাস একটা করে শার্ট, আন্ডারওয়ার, রুমাল ও গেঞ্জিও দিয়েছিল। তার মানে দাস মহাশয় খুব শৌখিন লোক। লন্ড্রি থেকে সমস্ত রকম অন্তর্বাস ও রুমাল পরিষ্কার করায়। কিংবা ভবঘুরে বা কর্মব্যস্ত, যে নিজের দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসগুলো ধোওয়ার জায়গা পায় না বা সময় পায় না। যাই হোক না কেন, ঠিকানা যখন পাওয়া গেছে তখন গ্রেফতার করেই বোঝা যাবে সে কোন ডালের কোন পাখি। সুতরাং যেদিন দুপুরে ওর হদিশ পাওয়া গেল তার কিছুক্ষণ পরেই বৈঠকখানা রোডের ওই বাড়ি ঘিরে ফেলে উৎফুল্ল শম্ভুবাবুরা হানা দিলেন।

পুরনো দিনের বাড়ি। মাঝখানে একটা বড় চাতাল ঘিরে অনেকগুলো ঘর। সূর্য যখন মাথায় থাকে তখনই একবার সারাদিনে তার উত্তাপ ওই উঠোনে বিলিয়ে যায়, তারপর আবার উধাও গোটা চব্বিশ ঘণ্টার জন্য। বাড়ির সদর দরজা সবসময় মুক্ত, এ আসছে, সে যাচ্ছে, সুতরাং কে সারাক্ষণ খুলবে আর বন্ধ করবে? গভীর রাতেই একবারে বন্ধ হয় ভোরে আবার মুক্ত হওয়ার জন্য। সদর দরজায় পাহারা রেখে শম্ভুবাবুরা সদলবলে জি দাসকে গ্রেফতারের জন্য ওই বাড়ির মাঝখানের চাতালে গিয়ে দাঁড়ালেন। পুলিশ দেখে বাড়ির বিভিন্ন বয়সী বাসিন্দারা ভয়মিশ্রিত চোখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। শম্ভুবাবুরা অনুসন্ধান শুরু করলেন।

প্রায় আধঘণ্টা পর তাঁরা বেরিয়ে এলেন। তাঁদের মুখ শুকনো। যে প্রফুল্লতা আর উৎসাহ নিয়ে তাঁরা ওই বাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন, তার ছিটেফোঁটাও আর তাঁদের চলনে অবশিষ্ট নেই। কারণ তাঁরা ব্যাপকভাবে ওই বাড়ির বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছেন, জি দাস নামের কোনও লোক কোনও কালে ওই বাড়িতে ছিল না, এমনকি ওই নামের

কোনও লোককেও তাঁরা চেনেন না। অর্থাৎ সূত্র একটানে কেটে গেছে। কারণ জি দাস লন্ড্রিতে যে ঠিকানাটা দিয়েছে, ওর ক্ষেত্রে সেটা মিথ্যে। তাই শম্ভুবাবুদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে নিদারুণ হতাশা।

কিন্তু হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলে তো আর চলবে না। শম্ভুবাবু কাকুকে নিয়ে গেলেন স্কট লেনের ওই লন্ড্রিতে। যদি অন্য কোনও সূত্র পাওয়া যায় এই আশায়। কারণ ওই ধুতির মালিক ওই লন্ড্রিতে আসে এটা প্রমাণিত লন্ড্রির মালিক জানালেন, ওই দোকানে ওই জি দাস নামের ব্যক্তি বহুদিন ধরে জামা কাপড় কাচাচ্ছে। তিনি আরও বললেন, এখনও বেশ কিছু কাপড়-চোপড় লন্ড্রিতে আছে। একথা শুনে শম্ভুবাবুরা উৎসাহিত হয়ে সেখানে নজরদারীর ব্যাপক বন্দোবস্ত করলেন, যাতে জি দাস নামধারী ওই লোকটা লন্ড্রিতে এলে তাকে গ্রেফতার করা যায় ৷

একদিন গেল, দুদিনও চলে গেল, কিন্তু কোথায় শ্রীমান জি দাস? তার কোনও ছায়াও ওই লন্ড্রির আশেপাশে উঁকি মারেনি। লন্ড্রির মালিক ও কর্মচারী নাজেহাল কারণ তারাও যে আমাদের গোয়েন্দাদের নজরদারির ঘেরাওয়ের মধ্যে, যাতে তারা কেউ জি দাসকে কোনও খবর পাচার করতে না পারে। তারা দু'জন প্রত্যক্ষভাবে ওই ব্যক্তিকে চেনে, ওদের দরকার, যাতে চিহ্নিতকরণটা শম্ভুবাবুদের পক্ষে সহজ হতে পারে।

স্কট লেনের লন্ড্রির ওপর থেকে নজরদারি না সরিয়ে অন্য লন্ড্রিতেও ওই ধোবি চিহ্ন খোঁজা অব্যাহত রাখা হল। অবশেষে আরও একটা লন্ড্রিতে ওই একই চিহ্ন পাওয়া গেল। এবং আশ্চর্যজনকভাবে ওইখানে ক'টা ডুপ্লিকেট বিলে জি দাসের নাম পাওয়া গেল, কিন্তু

ঠিকানাটা আর বৈঠকখানা রোডের নয়। এবার ঠিকানাটা মধ্য কলকাতার তেইশ নম্বর, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের।

অন্য একটা ঠিকানা যখন পাওয়া গেছে, তখন সেখানকার ঢাকনি খুলেও দেখা যাক গহ্বরে জি দাসকে পাওয়া যায় কিনা। তবে একটা ব্যাপারে শম্ভুবাবুরা সিদ্ধান্তে এলেন যে, লোকটি ধূর্ত এবং বহুদিন ধরে অপরাধ জগতে বিচরণ করছে, নয়ত কোনও ব্যক্তি তার নামধাম অযথা মিথ্যা লেখাবে কেন?

শম্ভুবাবুরা এবার রাত্রিবেলা প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের ওই ঠিকানায় হানা দিলেন, তবে তাঁদের মধ্যে বৈঠকখানার বাড়িটাতে তল্লাসী করতে যাওয়ার সময় যে উদ্দীপনা ছিল তা আর এবার দেখা গেল না। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন যে, এখানেও তাঁদের খালি হাতে লালবাজারে ফিরে আসতে হতে পারে। তবু 'চাষার' মতো 'আশার' পেছনে তো ছুটতে হবে।

প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের একটা অংশ জুড়ে বহুবছর ধরে অনেকগুলো পতিতালয় আছে। ওই তেইশ নম্বর বাড়িটাও যৌনকর্মীদের একটা আস্তানা। রাতে হানা দেওয়ার ফলে যৌনকর্মীদের ঘরে ঘরে তাদের বেশ কিছু অতিথিকে পাওয়া গেলেও জি দাসের পাত্তা পাওয়া গেল না। শুধু একটা কথা জানতে পারলেন শম্ভুবাবুরা যে, জি দাস নামের একটা লোক ওইখানে এক যৌনকর্মীর ঘরে বেশ কিছুদিন বসবাস করেছিল। শম্ভুবাবুরা সেই যৌনকর্মীর খোঁজ করে জানতে পারলেন ওই যৌনকর্মীও উধাও। কোনখানে ঘাঁটি গেড়েছে তা কেউ বলতে পারল না। তবে একটা ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিত হলেন যে, প্রমীলা হত্যাকারীদের একজন, সেই ধুতির মালিক এবং স্কট লেনের লন্ড্রির খদ্দের এবং প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের সাময়িক বাসিন্দা লোকটা একই। তার চেহারার বিবরণ প্রত্যেকে যা দিয়েছে, তাতে মোটামুটি মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। আর একটা ব্যাপার শম্ভুবাবুদের কাছে পরিষ্কার, লোকটা একেবারে লম্পট। নিয়মিত ভাবে প্রতি রাতে, যৌনকর্মীর সংস্পর্শ ছাড়া সে থাকতে পারে না।

এই অবস্থায় কী করা যায়? দু দুটো লন্ড্রির ওপর সারাদিন নজর অব্যাহত রেখে অফিসাররা যৌনকর্মীদের ঘাঁটিগুলোর ওপর কড়া নজর রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। কলকাতার তেমন ঘাঁটি তো আর খুব কম নেই, তবু প্রতিটি ছোট বড় ঘাঁটিতে জি দাসের খবরের জন্য জাল ছড়িয়ে দেওয়া হল। মাছ এলেই যাতে গুটিয়ে নেওয়া যায়।

কিন্তু তার ফাঁকেই হয়ে গেল আর একটা যৌনকর্মী খুন! এবার দক্ষিণ কলকাতা ছেড়ে উত্তর কলকাতার দশ নম্বর সোনাগাছি লেনে। এখানেও খুন হয়েছে গভীর রাতে।

পরদিন ভোরবেলায় গোয়েন্দা দফতর থেকে সোনাগাছি ছুটলেন অফিসাররা। সেখানে গিয়ে তাঁরা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, প্রমীলাকে যেভাবে খুন করা হয়েছিল ঠিক একইভাবে মদ খেতে খেতে এখানে যৌনকর্মীকে খুন করা হয়েছে। তবে এর বয়েস প্রমীলার থেকে কম। আর কিছুটা রোগা পাতলা। ওটা কোনও বিচার্য বিষয় নয়। তাঁরা জানতে পারলেন, যৌনকর্মীর শরীরে যত গহনা ছিল সবই খুনীরা নিয়ে গেছে। আর এখানেও খুনী ছিল দু জন এবং তারা ধুতি পাঞ্জাবি পরে, ওই মঞ্জু নামের যৌনকর্মীর ঘরে সন্ধের খানিক বাদে ঢুকেছিল।

শম্ভুবাবুরা আরও জানতে পারলেন, মঞ্জুর সারা শরীর জুড়ে অনেক গহনা ছিল। তবে সবই নকল। অর্থাৎ মঞ্জু অন্য যৌনকর্মীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য ওই ঝুটা সোনার অলংকারগুলো তার শরীরে চাপিয়েছিল। কারণ তার রোজগার এমন কিছু ছিল না যে, অন্য সব দায় মিটিয়ে সে আসল সোনার জিনিস পরে যৌনায়নের পরিকাঠামোগত দাবী মেটাতে পারে। তাই সে বাধ্য হয়ে নকল অলংকারে নিজেকে সজ্জিত করেছিল। গোয়েন্দা অফিসাররা যা বোঝার বুঝে গেছেন। অর্থাৎ এখানেও খুনীরা মঞ্জুর ওই গহনগুলোর ওপরই নজর দিয়েছিল, বস্তুর গুণাগুণ নির্ধারণের কথা ভাবেনি। তাছাড়া মাতাল খুনীর বিচারশক্তির তীক্ষ্ণতা মদ্যপানে নিশ্চয়ই ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। হয়ত তারা সেটা খুনের আগে জানতে

পারলে খুনটা করত না। কিন্তু লোভ এমনই একটা জিনিস যার তাড়নায় মানুষ দিশেহারা হয়ে কী কাণ্ড ঘটাতে পারে তা মানুষ নিজেই জানে না। কাণ্ডজ্ঞানহীন অবিবেচক মানুষ যে কোনও বন্য জন্তুর থেকেও হীন কাজে নিজেকে অনায়াসে নিযুক্ত করতে সামান্যতম দ্বিধা করে না।

সোনাগাছি থেকে তদন্ত সেরে লালবাজারে ফিরে এল পুরো দল। নিয়মমাফিক যা যা করার সেসবই তাঁরা করলেন। একটা দলকে পাঠানো হল উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাটের এক নিকটবর্তী গ্রামে। সোনাগাছি থেকেই জানা গেছে, মঞ্জুর আসল গ্রামের ঠিকানা। সেখানে গিয়ে খুনীদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় কিনা তারই আশায়। যদি তার কোনও প্রাক্তন প্রেমিক বা স্বামী কোনও প্রতিশোধের জ্বালায় তাকে খুন করে থাকে তার কোনও সূত্র পাওয়ার ইচ্ছায়। এমন তো হতে পারে, পত্রিকায় প্রমীলার খুনের ব্যাপারে যে সব খবর প্রকাশিত হয়েছে, তা পড়ে সেই খুনের ঢঙে মঞ্জুকে খুন করে খুনী প্রমীলার খুনীদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে পুলিশকে বিভ্রান্তিতে ঠেলে দিয়ে বাঁচার প্রচেষ্টায় ষড়যন্ত্র করে নিজের কার্যসিদ্ধি করে গেছে এবং সেইজন্যই মঞ্জুর নকল সোনার গহনাগুলো সে মঞ্জুর শরীর থেকে জেনেশুনেই খুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। তবে সেই রকম সম্ভাবনা যে ক্ষীণ সেটা শম্ভুবাবুরা প্রাথমিক তদন্ত করেই বুঝেছিলেন।

প্রমীলার খুনীদের গ্রেফতার করার আগেই মঞ্জুও খুন হয়ে যাওয়াতে, যৌনকর্মীদের আস্তানাগুলোর ওপর নজরদারি আরও বাড়িয়ে দেওয়া হল। এবং সেইসব জায়গায় যারা সোর্স ছিল তাদের আরও সজাগ থাকতে বলা হল।

বসিরহাট থেকে দল শূন্য হাতে ফিরে এল। মঞ্জুর কোনও প্রাক্তন স্বামী বা প্রেমিক জাতীয় কেউ ছিল না। মঞ্জু কলকাতা থেকে টাকা পাঠাত তার দুঃস্থ বাবা, মা আর ছোট ছোট ভাইবোনের জন্য, এটুকুই যা তার বাড়ির লোক জানে। সে যে কী কাজ করে, কোথায় কাজ করে তাও তারা জানে না। উল্টে মঞ্জু মারা যাওয়ার খবর শুনে চোখে অন্ধকার দেখছে এবং মঞ্জুর জন্য যত না দুঃখ তার চেয়ে টাকা যে আর আসবে না সেই শোকেই অস্থির হয়ে আকাশ ফাটিয়ে কান্না জুড়ে দিয়েছে।

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে পাওয়া গেল যে, প্রমীলাকে যে বিষ প্রয়োগে খুন করা হয়েছিল সেই হাইড্রোসাইনয়েড প্রয়োগেই মঞ্জুকেও খুন করা হয়েছে। অর্থাৎ খুনী সম্ভবত একই।

কিন্তু সেই খুনীরা কই? কারা তারা? যারা বেছে বেছে শুধু যৌনকর্মীদেরই আক্রমণ করছে। আসলে যৌনকর্মীদের খুন করার পর তাদের লুঠ করে পালিয়ে যাওয়াটা অনেক সহজ। কারণ তাদের দ্বার খোলা। সেই অবারিত দ্বার দিয়ে খুনীরা অনায়াসে ঢুকতে এবং বেরিয়ে যেতে পারে। সেইজন্যই এই খুনী দুজন তাদের শরীরে যে সামান্য দু চারটে গহনা থাকে সেগুলোকে হাতিয়ে নেওয়াটা তাদের লক্ষ্য করে নিয়েছে। তার থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার, এরা খুন করে বেড়ানো কোনও 'উচ্চমার্গীয়' খুনী নয়, বরং ছিঁচকে খুনী এবং ওদের পকেটে টাকা পয়সা খুবই কম।

মঞ্জু খুন হওয়ার সপ্তাহখানেক বাদে সন্ধেবেলায় শম্ভুবাবুর কাছে সোনাগাছি অঞ্চল থেকেই একটা ফোন এল। ফোন করেছে এক নজরদার। ফোনে জানাল, চার নম্বর শেঠ বাগান লেনের এক যৌনকর্মীর ঘরে ধুতি পাঞ্জাবি পরা দুটো লোক ঢুকেছে। একজনের বাবরী করা চুল। আর চেহারায় প্রমীলা ও মঞ্জুর হত্যাকারীদের সঙ্গে মিল আছে অনেকটা। ফোনের রিসিভারটা শুধু যথাস্থানে নামিয়ে রাখতে যা সময়, শম্ভুবাবু, বিধুবাবু, কাকু ফোর্স নিয়ে ছুটলেন শেঠ বাগান লেনে। ওরা গাড়ি থেকে নামতেই নজরদার দেখিয়ে দিল ঘর। দেখাল, ভেতর থেকে বন্ধ। অল্প আলো দরজা আর ছোট একটা জানালার আনাচে কানাচে থেকে কোনমতে কষ্ট করে বাইরে ছিটকে বার হচ্ছে।

অফিসাররা প্রায় লাফ দিয়ে সেই বন্ধ দরজার সামনে হাজির। এবং যথারীতি দরজায়

বেশ জোরে জোরে ধাক্কা। ধাক্কার উত্তরে ভেতর থেকে মহিলা কণ্ঠের ঝনঝনানির বান এল, "এ ভর সন্ধেয় কোন শালা মাতাল রে, এ ঘরে নয়, অন্য ঘরে যা, এখানে লোক আছে।"

শম্ভুবাবু তার গম্ভীর গলায় হাঁক পাড়লেন, "দরজা খোলো।" আবার সেই নারীকণ্ঠের উত্তর, "এ আবার কোন মিনসে, যত সব আপদ, বলছি তো অন্যঘরে যাও বাপু। লোক আছে।" শম্ভুবাবুদের দলবল দেখেই বাড়িওয়ালি সমেত দালাল ও এলাকার রক্ষী, গুণ্ডারা জমায়েত হয়ে গিয়েছে। বাড়িওয়ালিই এবার ভেতরের মহিলার কথার উত্তরে জবাব দিল, "এই দুর্গা দরজা খোল তাড়াতাড়ি, দরকার আছে।" এবার কাজ হল, দুর্গা নামধারী মহিলা দরজা খুলে দিতে অফিসাররা মুহূর্তে ঢুকে গেলেন সেই ঘরে।

দুর্গার ঘরে দুটো লোক। একজনের পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। অন্য জনের শরীরে শুধু আন্ডারওয়ার ও গেঞ্জি। তারা শম্ভুবাবুদের হঠাৎ আক্রমণে কী করবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। শম্ভুবাবুদের ধূর্ত চোখ ঘরে ঢুকেই তাদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে ঠাউরে নিল যে পটুয়াপাড়ায়, স্কট লেনে, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটে, সোনাগাছি লেনে যে লোক দুটোর চেহারার বর্ণনা তারা এ পর্যন্ত মৌখিকভাবে পেয়েছেন, তার সঙ্গে এদের মিল প্রায় সম্পূর্ণ। তাদের আন্দাজ করতে কষ্ট হল না যে, এদেরই প্রায় দু মাস ধরে সারা কলকাতায়, বিশেষ করে যৌনকর্মীদের আস্তানায় তাঁরা হন্যে হয়ে খুঁজে চলেছেন। এরাই যে প্রমীলা ও মঞ্জুকে খুন করেছে তা বুঝতে পারলেও প্রমাণ যোগাড় করার জন্য দুর্গার ঘর তল্লাসি শুরু করল আমাদের পুলিশ বাহিনী।

ততক্ষণে লোকদুটোকে জেরা করে ওদের জানা হয়ে গেছে যে, তাদের একজনের নাম ধীরেন সেন এবং তার ডাকনাম পোদা, আর অপরজনের নাম গোপেশ্বর দাস। অর্থাৎ ইংরাজিতে ওর নাম লিখতে গেলে আদ্যক্ষরে 'জি' লিখতে হবে। আর দুর্গা হল ধীরেনের রক্ষিতা।

তল্লাসি করে প্রথমে পাওয়া গেল দুটো লুঙ্গি, একটা সাদা শার্ট, একটা বড় রুমাল। শার্ট আর রুমালে যে ধোবিচিহ্ন পাওয়া গেল তা প্রমীলার ঘরে ছেড়ে আসা ধুতি ও স্কট লেনের লন্ড্রির সঙ্গে মিলে গেল। কাকু ধীরেনের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার পরণের আন্ডারওয়ারটায় এক হ্যাঁচকা টান মারলেন। ধীরেন দু হাত দিয়ে চেপে ধরল। কাকু আন্ডারওয়ারে ধোবিচিহ্ন খুঁজে দেখতে লাগলেন। পেলেন। ধীরেনকে বললেন, "অ্যাই এটা খুলে দে।" ধীরেন দুর্গার খাটে পড়ে থাকা সদ্য তারই খুলে রাখা ধুতিটা জড়িয়ে আন্ডারওয়ার খুলে এক কনস্টেবলের হাতে দিল। ঘরে পুরুষের ব্যবহার্য আর কোনও জিনিস পাওয়া গেল না। তবু শম্ভুবাবুর নির্দেশে কনস্টেবলরা ব্যাপকভাবে তল্লাসি চালিয়ে যেতে লাগল। ছোট ঘর। বিছানা, আলনা আর ক'টা বাসনকোসনেই ঘর ঠাসা।

কত সময় আর তল্লাসি করতে লাগবে? একটা দেওয়ালে দুটো ঠাকুর দেবতার সিঁদুর মাখা ফটো ঝুলছে। এক কনস্টেবল সেই ফটো দুটোর পেছনে হাত ঢুকিয়ে দিল। বার করে আনল দু'টো ছোট শিশি। শিশি দুটোর ভেতর সাদা পাউডার জাতীয় কিছু রাখা আছে। একটা শিশি প্রায় ভর্তি, অন্যটায় অর্ধেক। আমাদের অফিসারদের ভ্রূ কুচকে উঠল। শম্ভুবাবু শিশি দুটো হাতে নিয়ে পাউডারটা চেনা যায় কিনা তা ভাল করে দেখতে লাগলেন। চিনতে পারলেন না। সন্দেহ হল। কারণ ওইখানেই এই দুটো লুকিয়ে রাখার কারণ কী? সাধারণ ভোগ্যপণ্য হলে আড়াল করার এত দরকার কী? তিনি দুর্গাকে জিজ্ঞেস করলেন, "অ্যাই, এগুলোর মধ্যে কী রেখেছিস?" দুর্গার যা বোঝার পরিস্থিতির চাপে সে ততক্ষণে সবই বুঝে গেছে। সে জেনে গেছে তার বাঁধাকর্তাকে খুনের দায়ে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে, কবে ফিরবে, আদৌ ফিরবে কিনা তার ঠিক নেই। অর্থাৎ তাকে আবার নতুন বাবু ধরতে হবে। সুতরাং ধীরেনের ওপর মায়া করে মিথ্যা বলার কোনও প্রয়োজন নেই। ধীরেন ওর কাছে মৃত। সে তাই ধীরেনকে দেখিয়ে বলল, "ওগুলো আমি রাখিনি বাবু, এই মিনসেটা রেখেছে। ওসব পাউডারে আমার কী কাজ?"

দুর্গার উত্তর শুনে শম্ভুবাবু একটা শিশি খুলে ফেললেন, "তারপর আলতো করে গন্ধ

শুঁকে ধীরেনকে বললেন, "অ্যাই হাঁ কর, একটু খা।"

শম্ভুবাবুর নির্দেশ শুনে ধীরেন চমকিয়ে উঠে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে, "না না" বলে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। শম্ভুবাবু একটু হাসলেন। শিশির মুখটা বন্ধ করলেন। সন্দেহটা যে সঠিক সেটা ধীরেনের আচরণেই প্রমাণিত। এরপর অফিসারের বাজেয়াপ্ত করা জিনিসগুলোর সাক্ষী সাবুদ যথারীতি নিয়মমাফিক সেরে, ধীরেন আর গোপেশ্বরকে গ্রেফতার করে সোজা নিয়ে এলেন লালবাজার।

তারপর বিরাশি সিক্কার দুটো চড়। সেই ধাক্কায় দু'জনেই স্বীকার করল, খুন তারাই করেছে। এবং গ্রেফতার হওয়ার পরদিন সকালে ধীরেন ও গোপেশ্বর বিধান সরণির একটা জুয়েলারির দোকানে তদন্তকারী অফিসারকে নিয়ে গেল। সেই দোকানে ওরা প্রমীলার অলংকারগুলো বিক্রি করেছে। সেখানে দোকানের খাতা পরীক্ষা করে দেখা গেল ছেচল্লিশ নম্বর, মানিকতলা স্ট্রিটের জনৈক গিরিধারী সাহা উনিশে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ প্রমীলাকে হত্যা করার পরদিন একটা নেকলেশ ও দুটো দুল মাত্র একশ তেইশ টাকায় বিক্রি করেছে।

গোপেশ্বর অস্বীকার করার সাহস পেল না যে সেই গিরিধারী সাহা নামে ওইগুলো বিক্রি করে গেছে। কিন্তু ওই দোকান থেকে জিনিসগুলো উদ্ধার করা গেল না কারণ দোকানদার ওই গহনাগুলো ততদিনে গলিয়ে ফেলে অন্য গহনা বানিয়ে ফেলেছেন। অর্থাৎ প্রমীলার সোনা অন্য কোনও গৃহিণীর শরীরে ঝলমল করে খুশিতে নাচছে। সোনার আর দোষ কী, যে যখন যেমন আকারে তাকে গড়ে সে তেমনভাবেই নাচে।

প্রমীলার অলংকারগুলোর হদিশ পাওয়া গেল। কিন্তু মঞ্জুর নকল সোনার গহনাগুলো নিয়ে ওরা কী করেছিল তা জানবার জন্য শম্ভুবাবুদের কৌতূহল হল। বিধান সরণি থেকে ধীরেনদের লালবাজারে ফিরিয়ে নিয়ে এসে সেই প্রশ্নটাই ওদের শম্ভুবাবু করলেন। কিন্তু দুজনেই বোবা। কেউ কোনও উত্তর দিচ্ছে না। দু'তিন মিনিট এভাবে কেটে গেল। অফিসাররা এমনভাব দেখালেন যে মঞ্জুর গহনাগুলো আসল না নকল ছিল সে ব্যাপারে তারা তো কিছু জানেনেই না বরং মঞ্জুর ওগুলো যে সোনারই ছিল সেটা নিশ্চিত জেনেই যেন প্রশ্ন করলেন, "কী রে তোরা যে কেউ উত্তর দিচ্ছিস না? কোথায় বিক্রি করেছিস? না কি এখনও ওগুলো বিক্রি করিস নি?"

ধমক খেয়ে গোপেশ্বর আমতা আমতা করে কোনও মতে বলল, "ওগুলো স্যার সোনার ছিল না।"

শম্ভুবাবু ধমকে উঠে প্রশ্ন করলেন, "সোনার ছিল না তো কিসের ছিল?" গোপেশ্বর বলল, "সব নকল ছিল, ধীরেন ফেলে দিয়েছে।" ধীরেন মাথা নীচু করে ছিল, সে মাথা নীচু করেই বলল, "মানিকতলার একটা হাইড্রেনের মুখ খুলে ওগুলো ফেলে দিয়েছি।"

"ফেলে দিলি? অথচ ওগুলোর জন্যই তোরা মেয়েটাকে খুন করেছিলি। তোদের কোথায় জায়গা হবে বল?" শম্ভুবাবুর কথায় ওরা চুপ করে রইল। ফরেনসিক পরীক্ষায় পাওয়া গেল, দুর্গাবালার ঘর থেকে যে দু শিশি পাউডার পাওয়া গেছে তা হল হাইড্রোসাইনয়েড অ্যাসিডের সোডিয়াম ও পটাশিয়াম সল্টের একটা মিশ্রিত বিষ, অর্থাৎ যে বিষের প্রয়োগে প্রমীলা ও মঞ্জু দুজনেই খুন হয়েছে।

কলকাতা নগর ও দায়রা আদালতে মঞ্জু হত্যার বিচার শুরু হল, কিন্তু সাক্ষী ও অন্যান্য প্রমাণের ছোটখাট ফাঁক থেকে আসামী দু'জন বেকসুর খালাস পেয়ে গেল।

কিন্তু আলিপুরের দায়রা আদালতে প্রমীলা হত্যা মামলায় তা হল না। সেখানে মামলায় সাক্ষী ও অন্যান্য প্রমাণ এত জোরালো ছিল যে বিচারক ও জুরিরা সর্বসম্মতিক্রমে গোপেশ্বর ও ধীরেনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন।

উচ্চ আদালতও সেই রায় বহাল রাখলেন। ওরা দু'জন কারাগারে যাবজ্জীবন দণ্ড খাটতে লাগল। কিন্তু তাতে তো আর প্রমীলা আর দুঃস্থ যৌনকর্মী মঞ্জু ফিরে আসবে না। তাদের রোজগারে তাদের গ্রামে পরিবারের লোকেদের মুখেও জুটবে না ভাত।

গোপেশ্বর আর ধীরেন শুধু অতি নীচ সামাজিক কীটই না। চরম বিকৃতরুচির ধারক ও বাহক ছিল।

মানুষের রুচি মানুষই ঠিক করেছে। তারাই ঠিক করেছে কোন কাজটা তাকে মানায় কোন কাজটা মানায় না। তবু সব মানুষ কি সেই বিভেদরেখা মেনে জীবনধারণ করে? করে না। বেশির ভাগ মানুষই করে না। করলে, আর যা কিছুরই দরকার হতো সমাজে তবু পুলিশের কোনও প্রয়োজন হতো না। মানুষ তার তৈরি রুচিরেখা অতিক্রম না করলে পুলিশের আর কিসের প্রয়োজন? একটা উৎপাদনহীন বিরাট বাহিনীকে সমাজের আর পুষতে হতো না।

কিন্তু মানুষ তার রুচির কাঠামোর লক্ষণরেখা পার হয়ে সৃষ্টি করে হাজারো সমস্যা। আর সেই সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে যেতে হয় সমাজের রক্ষক পুলিশবাহিনীকে। কখনও সেটা ছোট আকারে, কখনও বা বিরাট আকারে, এমনকি প্রায় যুদ্ধের রূপে। কখনও সে সমাধানে জয়যুক্ত হয় কখনও বা হয় না। নিয়ম ও নিয়মের বাইরে গিয়ে তাকে খুঁজতে হয় সমাধানের পথ। কখনও সে অনায়াসে ছাড়াতে পারে জট, কখনও বা গোলকধাঁধায় পড়ে হারিয়ে ফেলে পথ। কখনও আসে চমক, কখনও নয়।

তিরাশি সালের সেপ্টেম্বরের চব্বিশ তারিখ শনিবার সন্ধেবেলা বেলঘরিয়া থানা থেকে একটা চমকে যাওয়ার মতো খবর আমাদের কাছে এল। খবরটা হচ্ছে, নামকরা অভিযাত্রী, কলকাতার বিজ্ঞান কলেজের শারীরবিদ্যার অধ্যাপক, পিনাকী চট্টোপাধ্যায় সেদিন দুপুরে বালি ব্রিজের খানিকটা উত্তরে গঙ্গাবক্ষে নৌকা উল্টে জলে ডুবে মারা গেছেন। কিন্তু ওই নৌকার অন্য যাত্রীরা সবাই বেঁচে গেছেন। তাদের উদ্ধার করেছে আশেপাশে গঙ্গায় চলমান মাছ ধরতে ব্যস্ত অন্যান্য নৌকার মাঝিমাল্লারা।

খবরটা শুনেই আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কারণ যে মাত্র তেইশ চব্বিশ বছর বয়সে কনৌজী আংরে নামে একটা ছোট নৌকা নিয়ে মুম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ অভিযাত্রী জর্জ ডিউকের সহযাত্রী হিসাবে উনসত্তর সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ওই গঙ্গার বুকের ম্যান-ও-ওয়ার জেটি থেকে প্রচণ্ড উত্তেজনা, অভিনন্দন আর তোপধ্বনির মাঝে উত্তাল বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে এক মাস চারদিন পর মার্চ মাসের পাঁচ তারিখে দেড় হাজার মাইল অতিক্রম করে আন্দামানে পৌঁছেছেন এবং যার সেই অভিযানের স্বীকৃতি হিসাবে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাকে পুরস্কৃত করেছেন সে কিনা আমাদের ঘরের গঙ্গার জলে ডুবে মারা গেলেন, অথচ অন্য যাত্রীরা, যারা কিনা তার তুলনায় জলযুদ্ধে অতি নগণ্য, তাঁরা বেঁচে গেলেন। এই খবরে শুধু আমরা কেন সাধারণ যে কোনও মানুষই আশ্চর্য হয়ে যাবেন।

শুনলাম খবরের গুরুত্ব ও সত্যাসত্য যাচাই করতে লালবাজার থেকে আমরা একটা গাড়ি নিয়ে ছুটলাম বেলঘরিয়া থানায়। আমি, দীপক রায়, স্বদেশ রায় চৌধুরী ও সরোজ ভট্টাচার্য যখন ওই থানায় পৌঁছলাম তখন সন্ধে অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। কিন্তু তখনও রয়েছেন নৌকার অন্যান্য যাত্রীরা, যাঁরা বেঁচে ফিরে এসেছেন। আমরা দেখলাম এক ভদ্রমহিলাকে, তাঁর নাম অমৃতা মৈত্র, তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ওই শারীরবিদ্যারই অধ্যাপনা করেন। কিন্তু আমরা যখন তাঁকে দেখলাম, তিনি সম্পূর্ণভাবে মদের নেশায় আত্মসমর্পণ করে বসে আছেন। সুন্দর, অসম্ভব ভাল শারীরিক গঠনের অধিকারিণী অমৃতা এমন আচ্ছন্ন যে তাঁর নিজের পরনের ভেজা শাড়ি ও ব্লাউজ তাঁর শরীরে যে ঠিক ঠিক জায়গা মতো নেই, এমনকি অন্তর্বাসগুলো বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, সেই বোধও তাঁর নেই। তিনি খালি বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছেন, “আমি কিছু বলতে পারব না, আমি কিছু জানি না। আমি, আমিও তলিয়ে যাচ্ছিলাম।” ওঁর পাশে বসে আছেন ভিজে জামাপ্যান্ট পরে ওঁর স্বামী দেবব্রত মৈত্র। তিনি কোনও কথাই বলছেন না। ফ্যালফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছেন। বোঝাই যাচ্ছে তাঁর ভেতরেও মদ ক্রিয়া করছে। অন্য একটি লোক,

তিনিও ভেজা জামা কাপড়ে বসে আছেন। অর্থাৎ তিনিও পিনাকীদের সহযাত্রী ছিলেন। নাম জানা গেল রঞ্জিত রায়, তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সজনেখালি ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি রেঞ্জার। এছাড়া আরও দুজন আছে ভেজা শরীরে, তারা হলো ওই অভিশপ্ত নৌকার মাঝি 'শেখ সুলেমান ও তার চৌদ্দ বছরের ছেলে শেখ সাহাদাত।

এছাড়া আরও অনেক ভিড়। সবই দেবব্রত বা অমৃতাদের বন্ধুবান্ধব বা পিনাকীর পরিচিত জন। তাঁরা এই রকম একটা আকস্মিক খবর পেয়ে হকচকিয়ে ছুটে চলে এসেছেন। কেউই বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, পিনাকী ওইভাবে জলের গভীরে হারিয়ে গেছেন। সবার চোখে মুখে একই প্রশ্ন, কী ভাবে নৌকা উল্টে গেল? নৌকা উল্টে যাওয়ার সময় পিনাকী কোথায় বসেছিলেন? উল্টে যাওয়ার মুহূর্তে পিনাকীর মাথায় কি কোনও রকম চোট লেগেছিল যাতে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন? ফলে সাঁতার কাটতে বা গঙ্গার স্রোতের উপরে মাথা তুলতে পারেননি? সঠিক উত্তর তাঁর সহযাত্রী কিংবা মাঝিদের কাছ থেকে পাওয়া গেল না। তাঁরা একটা কথাই বারবার আউড়ে যাচ্ছেন যে নৌকাটা একদিকে অতিরিক্ত ভারী হয়ে যাওয়াতে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ডান দিকে কাত হয়ে উল্টে গেল এবং সবাই নিজের নিজের জীবন বাঁচাতে গঙ্গার মাঝদরিয়ায় স্রোতের সঙ্গে লড়াই করতে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, কেউ বুঝতে পারেননি কখন পিনাকী তলিয়ে গেছেন। মাছ ধরার যে সব নৌকাগুলো আশেপাশে ছিল। তারা ছুটে এসে যখন তাদের নৌকায় এঁদের তুলল, তখন ওঁরা দেখলেন, সবাই উদ্ধার হয়েছেন, কিন্তু পিনাকী নেই। এমনকি পিনাকীর কোনও চিহ্ন তাঁরা আশেপাশে দেখতে পেলেন না।

ওই সব মাঝিরা তাদের নৌকা নিয়ে এল দক্ষিণেশ্বরের পাশে গঙ্গার পুব দিকে দেওয়ান দাতারাম মণ্ডল বা মোড়ার ঘাটে। সেই ঘাটেই ওরা ওই নৌকাটাও টেনে নিয়ে এসেছে যেটাতে পিনাকীরা ছিলেন। ওদের দেওয়া ঘটনার পূর্বাপর আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। শুনলামই, কিন্তু সম্পূর্ণ বিবরণটা আমরা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলাম না। এত সরলভাবে পিনাকী চট্টোপাধ্যায়ের মতো একটা সুস্থ, সবল, অত্যন্ত সাহসী ও রোমান্টিক মানুষ জলের তলায় তলিয়ে যাবে তা বিশ্বাস করা অন্তত আমাদের মতো বহুধরনের মৃত্যু দেখা লোকের পক্ষে খুবই শক্ত। তার মধ্যে একমাত্র সুলেমান ও তার ছেলে ছাড়া প্রত্যেকেই নেশায় আচ্ছন্ন। তাদের কাছ থেকে সত্য ঘটনার চিহ্ন পাওয়া মুশকিল। নৌকা ভারে একদিকে কাৎ হয়ে যাবে এবং যে নৌকায় দুজন নৌকাচালক ও পিনাকীর মতো ওস্তাদ সওয়ারী, তাঁদের অজ্ঞাতে নৌকাটা পট করে কাগজের নৌকার মতো ব্যবহার করবে এটা আমরা ভাবতেই পারছি না। তাছাড়া আরও জানা গেল পিনাকী ওই নৌকা নিয়ে সেই বছরেরই ডিসেম্বর মাসের কোনও একদিন ইন্দোনেশিয়া পাড়ি দেওয়ার পরিকল্পনা প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন। অর্থাৎ যেটা নিয়ে তিনি এত বড় অভিযানে যাওয়ার চিন্তা করেছিলেন, যেখানে মহাসমুদ্রের বিশাল বিশাল স্রোতের উথাল পাথাল সামলে তাঁকে এগিয়ে যেতে হতো, সেটা কিনা আমাদের পরিচিত গঙ্গার ভদ্র ঢেউয়ের মাথায় চলতে চলতে একদিকে সামান্য বেশি ভারের জন্য উপুড় হয়ে যাবে এটাও কোনমতে বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা কোনও রকম মুখ খুললাম না।

দেবব্রত ও অমৃতার বন্ধুবান্ধবরা বেলঘরিয়া থানা থেকে ওঁদের ছাড়িয়ে নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। আমরা সুলেমান ও তার ছেলেকে নিয়ে দেওয়ান দাতারাম মণ্ডল ঘাটে যেখানে পিনাকীর নৌকাটা বাঁধা আছে সেটা দেখতে গেলাম। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। ছোট নৌকাটা গঙ্গার নিরীহ ঢেউয়ের মাথায় টুকটুক করে নাচছে। নৌকার ভেতরে একটা কেবিন আছে। ভিতরটা অন্ধকার। নাচার আনন্দে সে নেচে যাচ্ছে, যেন ওইভাবে নাচার জন্যই তার জন্ম। কী হয়ে গেছে, কী হবে, কে এল কে গেল তাতে তার কিছু যায় আসে না। সে জানে মানুষ তাকে জন্ম দিয়েছে, মানুষই তাকে নিয়ে যায় দেশ থেকে দেশান্তরে। সে জানে জলেই তার আনন্দ, জলেই তার জীবন, জলেই সে সুখী। ডাঙ্গা তার কাছে অপরিচিত, ডাঙ্গায় সে মৃত।

যখন অন্ধকারে আমরা দাঁড়িয়ে নৌকার নাচন দেখছি, মনে হল, যেন আমাদের বলছে, ওহে মানুষের দল তোমরা নির্বোধ, তোমরা কি জান না, আমি মূক। আমি জানাতে পারি না তোমাদের প্রয়োজনীয় কোনও তথ্য, তাহলে কেন এভাবে আমাকে পরখ করছ? যাও তোমরা চলে যাও, আমি সারাদিনরাত এভাবে নেচে যাব। তোমরা বড় অহংকারী, সেই অহংকারের বিষেই তোমরা মর। তাই তোমরা আমার মতো নির্বিকার চিত্তে নাচতে জান না।

আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল দীপক। ও তখন মার্ডার সেকসনের ওসি। আমি ডাকাতির। হঠাৎ ওর দীর্ঘনিঃশ্বাস ঝরে পড়ল। ও ওইরকমই। ওপরটা অসম্ভব শক্ত, ভেতরটা একেবারে নরম। ওই নরম মাটি উপড়ে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস। আমি জানি, ওটা কিছুটা আর্দ্র।

আমি অন্ধকার গঙ্গার দিকে তাকিয়ে ওকে বললাম, “চল, কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না।” দীপক আস্তে বলল, “হ্যাঁ চল, এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।” ,

বেলঘরিয়া থানা থেকে যে দুজন কনস্টেবল দেওয়া হয়েছে ওই নৌকাটা পাহারা দেওয়ার জন্য, তাদের বলে আমরা ফিরতে লাগলাম। যেসব ডুবুরী নামান হয়েছিল, তারাও পিনাকীর দেহের কোনও সন্ধান না পেয়ে অনেক আগেই ফিরে গেছে। যদিও টহল চলছে। আশেপাশের মাঝিমাল্লারা, যারা তাদের নৌকায় রাতের খাবার বানানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, তারাও আমাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারল না যাতে বোঝা যায় আসল ঘটনাটা কী হয়েছিল। তারা যা বলল তাতে দেবব্রতদের কথার সঙ্গে প্রায় মিলে যাচ্ছে। তারা শুধু দেখেছিল একটা নৌকা হঠাৎ মাঝ গঙ্গায় উল্টে গেল।

নৌকার যাত্রীরা সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিল এবং সেই চিৎকারে সাড়া দিয়ে ওরা ওদের উদ্ধার করেছে।

আমরা একটা বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন নিয়ে লালবাজারে যখন ফিরলাম তখন রাত প্রায় এগারোটা। সঠিক উত্তর না পাওয়ার খটকায় আমরা প্রায় প্রত্যেকেই যে যার বাড়িতে জেগে রইলাম। আমাদের কাজই তো এই, সত্যের অনুসন্ধান। সত্যের অনুসন্ধানে একটাই জিনিস জরুরি, সেটা হল, প্রশ্নের উত্তর।

সেই উত্তর খোঁজার জন্য আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই। সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটা আমাদের মনে ঝুলে আছে, তা হল, নৌকাটা চলতে চলতে কীভাবে উল্টে গেল? কোন আলো ফেললে সেই রহস্যের অন্ধকারের উত্তর পাওয়া যাবে?

পরদিন পঁচিশে সেপ্টেম্বরেও গঙ্গা নীরব। তার নিত্য কাজের চলন বলনে কোনও নতুন কথা নেই। জোয়ার ভাঁটার যাওয়া আসায় বুক চিতিয়ে সে দিব্যি নির্বিকার। কোথাকার কোন পিনাকীরঞ্জন তার শরীরের কোন গভীরে হারিয়ে গেছে তা নিয়ে তার কোনও চিন্তা নেই। সে বুক খুলে রেখেছে। বলছে “ওহে, তোমরা যে কেউ আসতে পার। পাপ কর কি পুণ্যি কর সে সব তোমাদের ব্যাপার। কে হিন্দু, কে মুসলিম, কে খ্রিস্টান সেসবই তোমাদের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। আমি শুধু আদিম যুগ থেকে একইভাবে বয়ে চলেছি। তাতে কত শত পিনাকী হারিয়ে গেছে জানি না। যেমন চলেছি, তেমনই চলব। তোমরা যুগ থেকে যুগান্তরে আমাকে একইভাবে দেখবে। তোমরা শুধু তাকিয়ে থাক।” অথচ সেদিন রাত থেকেই পিনাকীকে খোঁজার জন্য আমাদের লঞ্চ, অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের দুটো স্পিডবোট, কলকাতা বন্দরের ‘ড্রাইভিং ক্রাফট' গঙ্গার দু পারে টহল দিয়ে দিয়ে চষে ফেলেছে, তবু পিনাকীর কোনও হদিশ নেই।

ছাব্বিশ তারিখ আর গঙ্গা নীরব রইল না। পিনাকীকে নিয়ে তার লুকোচুরি খেলা ছেড়ে অন্য খেলায় মেতে উঠল। সেদিন সকালবেলা হাওড়া ব্রিজের কাছে গঙ্গার পুব দিক ঘেঁষে একটা পুরুষের মৃত শরীর ভাসতে দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কলকাতা পুলিশের নর্থপোর্ট থানা থেকে সেই ভাসমান দেহকে উদ্ধার করে পাড়ে নিয়ে আসা হল কয়লাঘাটা জেটিতে, কিন্তু সেই মৃতদেহটা কার তা চিহ্নিত করা আগে প্রয়োজন। এমনিতে মৃতদেহ কখনও সখনও গঙ্গায় ভেসে আসে, সেগুলো উদ্ধার করে সনাক্ত করতে না পারলে বিনা

সনাক্তকরণেই ফটো তুলে পোস্টমর্টেম করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর পোস্টমর্টেম শেষে সেই সব বেওয়ারিশ দেহকে দাহ করে দেওয়া হয়।

সাধারণভাবে বেশিরভাগ দেহের, জলে কাদায় পচে এবং জলের তলায় থাকা হাঙর বা ওই জাতীয় জীবেদের ছোবলে এমন অবস্থা হয় যে তা চেনাই প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই দেহটার অবস্থাও তথৈবচ। তবে আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হচ্ছে, লোকটা ছিল বলিষ্ঠ ও দীর্ঘদেহী। তার পরণে শর্টস এবং হাতে রয়েছে একটা দামী ঘড়ি, যে ঘড়িটা তার মনিবের হৃদপিণ্ডের মতো স্তব্ধ হয়ে যায়নি, টিকটিক করে সময় জানান দিয়ে চলেছে।

যেহেতু আমরা পাগলের মতো গঙ্গার বুকে পিনাকীর দেহ খুঁজে বেড়াচ্ছি, সেহেতু প্রথমেই ওই দেহটাকে সনাক্ত করার জন্য পিনাকীর দক্ষিণ কলকাতার আটষট্টি নম্বর সদানন্দ রোডের বাড়িতে খবর পাঠানো হল। সনাক্ত করতে এলেন ওর ভগ্নিপতি নামজাদা ফুটবলার সুভাষ ভৌমিক। তিনি মৃতদেহের হাতের ঘড়ি ও পরনের শর্টস দেখে সনাক্ত করলেন যে মৃতদেহটি দুদিন আগে গঙ্গাবক্ষে তলিয়ে যাওয়া ডক্টরেট পিনাকীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের, অন্য কারও নয়।

সনাক্তকরণের পরে পিনাকীর দেহ সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হল পোস্টমর্টেম করাতে। যার ভিত্তিতে জানতে পারা যাবে পিনাকীর মৃত্যুর সত্যিকারের কারণ। পোস্টমর্টেম করলেন অধ্যাপক ডাক্তার জগবন্ধু মুখোপাধ্যায়। পোস্টমর্টেম হওয়ার পর মর্গ থেকে পিনাকীর দেহ সৎকার করতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মর্গের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন সুভাষ ভৌমিক। তিনি ধরা গলায় বললেন, "পিনাকীকে আমি এত ভাল করে চিনি যে, ওর শুধু কাঁধের মাসল আর বুক পিঠ দেখেই ওকে আমি আইডেনটিফাই করতে পারি। তবে ও যে বেঁচে নেই তা আমার আগেই মনে হয়েছিল। যদি ও বেঁচে থাকত তবে ওই প্রথমে সাঁতরে উঠে নৌকাডুবির খবর পুলিশকে দিত।" কিছুক্ষণ পর ফুল মালায় সাজিয়ে পিনাকীর দেহ নিয়ে সুভাষরা চলে গেলেন সদানন্দ রোডের বাড়ির দিকে।

পোস্টমর্টেম পরীক্ষা হওয়ার পর জানতে পারা গেল, পিনাকীর গলার কাছে হোইড়বোন ভাঙা এবং থাইরয়েড কার্টিলেজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন এবং অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত অভিমত যে এসবই হয়েছে খুন করার উদ্দেশে। অর্থাৎ পিনাকী চট্টোপাধ্যায় খুন হয়েছেন। নৌকা উল্টে জলে ডুবে যাওয়ার যে কাহিনী বলা হয়েছিল তা নিছকই বানানো। মানুষের থুতনির ঠিক তলায় কণ্ঠনালী ও শ্বাসনালীর দুপাশে হোইড়বোন থাকে যা আসলে বোন নয়। তাতে সামান্য চাপ লাগলেই মানুষের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

অর্থাৎ পিনাকীর হোইড়বোন চেপে ধরা হয়েছিল এবং তাতেই ওর মৃত্যু হয়। আমাদের নর্থপোর্ট থানার অধীনে গঙ্গাবক্ষে যখন খুন হয়েছে তখন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতরকে দেওয়া হল খুনের তদন্তের দায়িত্ব।

খুনের তদন্তে প্রাথমিক ও প্রধান প্রশ্ন হল, কে খুন করল এবং কেন খুন করল? এই দুটো প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া গেলে বাকিগুলো একে একে সামনে এসে যায়। তারপর প্রয়োজন সাক্ষী, পরিবেশীয় প্রমাণ, এবং প্রামাণ্য জিনিস দিয়ে একে একে মালা গেঁথে মামলা সাজানো। প্রতিটা কাজেই নিপুণ দক্ষতা ছাড়া, না ধরা যায় প্রকৃত আসামী, না সাজানো যায় মামলা, যার দ্বারা আসামীর যথাযথ সাজা সম্ভব।

এখানে আসামী কে? নৌকাবিহারে ছিলেন মোট ছ'জন। তার মধ্যে খুন হয়েছেন একজন। তাহলে বাকি পাঁচজনের মধ্যেই রয়েছেন সেই আসামী। সেই পাঁচজনের মধ্যে দুজন মাঝি শেখ সুলেমান ও তার নাবালক ছেলে সাহাদাত।

একটা জিনিস পরিষ্কার যে, খুন হয়তো সবাই মিলে করেনি, কিন্তু খুনের প্রমাণ লোপ করার জন্য প্রত্যেকেই এককাট্টা হয়েছিল। কিন্তু কেন? কী সেই কারণ? সেই কারণ খুঁজতে কোনও আন্দাজের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। গ্রেফতার করে নিয়ে আসতে হবে উপস্থিত প্রত্যেককে।

ছ দিন বাদে, তিরিশে সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হল দেবব্রত, অমৃতা, রঞ্জিতকে। আনা হল সুলেমান ও তার ছেলেকেও।

আমাদের সামনে সেই চিরাচরিত প্রশ্ন, কে খুনী এবং কী অভিপ্রায়ে খুন। তল্লাসি করা হয়েছে নৌকা। সেই নৌকার কেবিনে পাওয়া গেছে বেশ ক'টা খালি মদের বোতল। এবং দু একটা প্রয়োজনীয় টুকিটাকি। মদের বোতলগুলো পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ফরেনসিক বিভাগে।

জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে কেউ কোনও কথাই স্বীকার করছেন না। এমন কি সুলেমান ও তার ছেলেও নিরুত্তর। তারা বলছে, তারা কিছু দেখেনি। সাহাদাত ধরেছিল হাল আর সুলেমান টানছিল দাঁড়। হঠাৎ নৌকাটা কাৎ হয়ে গিয়ে প্রত্যেকেই জলে পড়ে যায়।

কিন্তু এই সরল উত্তর তো আমরা সেই চব্বিশ তারিখ থেকে শুনছি। তিরিশ তারিখে যখন আমরা জেনে গেছি যে পিনাকীর হোইডবোনে চাপ দিয়ে তাকে খুন করা হয়েছে, তখন আমরা কেন সেই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি শুনে যাব? আর এমন তো নয় যে ওই পাঁচজন ছাড়া অন্য কোনও লোক নৌকাবিহারে গঙ্গার বুকে হঠাৎ উদয় হয়ে পিনাকীকে খুন করে হাওয়ায় লীন হয়ে গেছে? যা কিছু হয়েছে, তা উপস্থিত লোকদের মধ্যেই। সুতরাং একে একে আলাদা আলাদা নিরবচ্ছিন্নভাবে জেরার পর জেরা চলতেই লাগল।

একটা ব্যাপারে আমরা পরিষ্কার যে, মাঝের পাঁচ ছ'দিনের মধ্যে অমৃতা, দেবব্রত ও রঞ্জিতের ভেতর ঝড় বয়ে গেছে। হতে পারে তা তাদের প্রিয়বন্ধুর অকাল প্রয়াণের জন্য, আবার এও হতে পারে ঘটনার গোপনীয়তা রক্ষার তাগিদে দারুণ দুশ্চিন্তায়। কারণ তাঁদের চেহারায় অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার লক্ষণগুলি পরিষ্কার, চোখের তলায় গভীর চিন্তার কালো দাগ। অমৃতার আবার মুখটা অতিরিক্ত ফোলা। কান্নার চিহ্ন। তবে সুলেমান ও সাহাদাতের চেহারায় কোনও নতুন লক্ষণ নেই। তারা স্বাভাবিক। তাদের মনে কি কোনও গোপন করার লুকোচুরি খেলার ছাপ পড়েনি?

আমাদের কাজই সন্দেহভাজন লোকের শরীরের ভাষা পলকে পড়ে ফেলা। বিশেষ করে জেরার সময়। একদিকে ধৃত ব্যক্তির মনঃসংযোগ নষ্ট করার জন্য প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে তার পেট থেকে হঠাৎ করে সত্য বার করা, অন্যদিকে অসংলগ্নতা ও কথার ধারাবাহিকতার ছিন্ন সূত্রের দিকে লক্ষ্য রাখা। এব্যাপারে তুখোড় প্রখরতা আমাদের সবার মধ্যে সমান ছিল না। থাকেও না। আসামীর মানসিক অবস্থান বুঝে ক্রমাগত প্রশ্নের তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাকে বিদ্ধ করে টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গা, একটা প্রচণ্ড দক্ষতার কাজ। সঠিকভাবে আলোকপাত করে তার চেতন ও অবচেতন মনের গুহা থেকে আসল সম্পদ বার করা একটা কঠিন প্রক্রিয়া।

প্রথম ভাঙল সাহাদাত। সেই পুরো নাটক করে দেখিয়ে দিল কীভাবে খুন হয়েছিলেন পিনাকী। ছোট্ট ছেলে, সে এত মারপ্যাঁচ বোঝে না, সরল ভাবে বারবার করে ঘটনার পূর্বাপর সে হেঁটে চলে, কথপোকথন করে আমাদের জানিয়ে দিল। দীপকের মুখে একগাল হাসি। কারণ সে রয়েছে তদন্তের মূল দায়িত্বে এবং সে সেই কাজের মূলটা জেনে গেছে। সরোজের মুখেও হাসি, তাকে দেওয়া হয়েছে মামলা পরিচালনার তদন্তকারী অফিসারের দায়িত্ব। সাহাদাতের কাছে যা পাওয়া গেল, তা দিয়ে মামলার মঞ্চ সাজানো অনেকটাই সহজ হয়ে গেল। এখন দরকার পুরো চিত্রনাট্যটা ঠিকভাবে উপস্থিত করে মঞ্চস্থ করা।

সাহাদাত যখন পুরো ঘটনাটা জানায়, তখন দফতরে আমাদের অফিসার রবি কর ছিল না। সে এসে শুনল সাহাদাতের ব্যাখ্যা। শুনে রবি তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিয়ে বলল, “দূর, এভাবে কি মরতে পারে?”

দীপক বলল, “পারে।” তারপর সাহাদাতকে বলল, “দেখিয়ে দে তো।”

সাহাদাত দীপকের আদেশ পেয়ে আর কোনও কথা না বলে সোজা বসে থাকা রবির থুতনির তলাটা চেপে ধরতেই রবি গ্যাগ, গ্যাগ, খ্যাঁক, খ্যাঁক করে প্রায় চোখ উল্টে

ফেলতেই সাহাদাত হাত সরিয়ে নিল। রবি নিজের গলায় হাত বোলাতে বোলাতে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "পারে।"

গাট্টাগোট্টা শক্তিধর রবির শক্তির কাছে সাহাদাতের শক্তি তুচ্ছের চেয়েও তুচ্ছ। সেখানে সাহাদাতের একটা আপাত নিরীহ চাপে, তার মৃত্যুর দশা দেখে সে স্বীকার করতে বাধ্য হল, "পারে।"

সাহাদাতের বিবরণের পর আমাদের কাছে পরিষ্কার কে পিনাকীর হোইডবোনে চাপ দিয়ে তাকে খুন করেছে। কিন্তু কেন? সেটা কি ঘটনার তৎক্ষণিক আকস্মিকতায় না কি কোনও পূর্ব পরিকল্পনা ছিল? অনুসন্ধান করে দেখতে হবে সেই ইতিহাস।

উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত সমাজে পরিচিত চারটে নারী পুরুষ হঠাৎ নৌকাবিহারে গেলেন এবং সেই বিহারের অধিনায়ক খুন হয়ে গেলেন অদ্ভুতভাবে। সেই খুনকে একটা সাধারণ জলে ডুবে মৃত্যু বলে বিবৃতি দিয়ে প্রকৃত ঘটনাকে চাপা দেওয়ার পেছনে পরিকল্পনার ও ষড়যন্ত্রের কতটা বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা ছিল তা বার করে তার গুরুত্ব অনুযায়ী তৈরি করতে হবে মামলা। সুতরাং নেমে পড়া হল আমাদের কাজে। একদিকে লালবাজারে বন্দী অমৃতা, দেবব্রত ও রঞ্জিতকে নিয়ে, অন্যদিকে ওদের ও পিনাকীর পরিচিতজনেদের সঙ্গে কথা বলে।

আমাদের চিরায়ত একটা মুশকিল হল, বেশির ভাগ মানুষই আমাদের তদন্তের কাজে প্রাণ খুলে সহায়তা করেন না। তাদের মনে একটা বদ্ধমূল প্রবাদ হিমালয়ের মতো গেঁথে আছে যে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আর পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। এই প্রবাদের ধারণা থেকে কিছুটা সরিয়ে আমরা প্রেম বিতরণ করে যাদের আনতে পারি তাদের কাছেই পাই কিছু তথ্য। আসলে সাধারণ মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনধারণের কাজের বাইরে কোনও ঝুট ঝামেলায় যেতে চান না। তাই আমাদের সন্ধানের বাইরে থেকে সাক্ষী হওয়ার দায়িত্ব এড়িয়ে থাকতে চান। তাঁরা কখনই মনে করেন না, একটা অপরাধকে প্রমাণ করার জন্য তাঁদের কাঁধে যদি কোনও দায়িত্ব এসে পড়ে, সেটা পালন করা সামাজিক কর্তব্য। তাঁরা এটাও মনে করেন না, আজ এটা অন্যের হয়েছে, কাল নিজের ঘরেও হতে পারে, তখন কোথায় পালাবেন? তাই অনেক মামলায় আমাদের বাধ্য হয়ে নকল সাক্ষী যোগাড় করতে হতো। অবশ্য সেটা তখনই আমরা করতাম যখন সঠিক আসামী গ্রেফতার করে, তার স্বীকারোক্তি পেয়ে মামলা সাজানোর প্রয়োজনে আসল সাক্ষী পেতাম না।

একবার তো মধ্য কলকাতার এক মহিলা হোস্টেলের ভেতর রাতের অন্ধকারে খুনের পর আমি ও দীপক আসল আসামীকে গ্রেফতার করে, তার অকপট স্বীকারোক্তি পেয়েও, প্রত্যক্ষ সাক্ষী যোগাড় করতে অপারগ হয়ে, বাধ্য হলাম আবাসিকের বাইরে রাস্তার ওপর একটা নকল চায়ের দোকান বানাতে। এবং তার পাশে কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের লম্বা মই কাৎ করে শুইয়ে রাখতে। উদ্দেশ্য, ওই চায়ের দোকানের মালিক ও কর্মচারী ওই আসামীকে খুনের রাতে ওই মই চড়ে প্রাচীর টপকে ভেতরে ঢুকতে ও কিছুক্ষণ পর উত্তেজিতভাবে বার হতে দেখেছিল। এই বয়ানটা আদালতে পেশ করানো। হ্যাঁ, ওই সাজানো দোকানের মালিক ও কর্মচারীর মিথ্যা বয়ানে ওই আসামীর যাবজ্জীবন সাজা হয়েছিল। ওটা না করলে সে প্রকৃত খুনী হয়েও বহাল তবিয়তে আদালত থেকে খালাস পেয়ে আবার সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে যেত।

এখন অনেক পণ্ডিত বলেন, এভাবে মিথ্যা সাক্ষী সাজিয়ে আদালতে পেশ করে আসামীকে সাজা দেওয়াটা অনৈতিক কাজ। ঠিক কথা, অনৈতিক কাজ। কিন্তু প্রশ্ন ওই অনৈতিক কাজটা যদি আমরা না করতাম এবং প্রকৃত খুনের আসামী আমাদের চোখের সামনে দিয়ে আদালত থেকে ধিতাং ধিতাং নাচতে নাচতে বেরিয়ে যেত, তবে সেটা সামাজিক ক্ষেত্রে কি ভাল হতো? না কি আমরা যে ওই সাজানো দোকানের সাক্ষী দিয়ে তাকে আদালত থেকে সাজা পাইয়ে জেলে পাঠালাম সেটা সঠিক কাজ হল? কোনটা? জানি, এ সম্পর্কে অনেকে অনেক রকম বলবেন। যেমন, এ সব পণ্ডিতরা বইয়ের পাতার

মধ্যে যে নৈতিকতা বা অনৈতিকতার বাণী লিপিবদ্ধ করা আছে তাই আউড়ে যাবেন। যাদের বাস্তবের পেশাখানায় নৈতিকতা ও অনৈতিকতার সীমারেখা সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। এরা হচ্ছেন ডগমাটিস্ট, অন্ধবিশ্বাসী। যদি খুনী সুচতুর কৌশলে খুন করে খুনের যাবতীয় সাক্ষ্য প্রমাণ লোপ করে পালিয়ে যায় এবং গ্রেফতার হওয়ার পরে সাজা দেওয়ার মত বাস্তবিক কোনও প্রমাণ আদালতে হাজির করা না যায়, খুনীকে টেক্কা দেওয়া কোনও সুকৌশল নিয়ে তাকে সাজা দেওয়াটা কি অন্যায়? না, এটা কোনও অন্যায় বা অনৈতিক নয়। তবে অবশ্যই সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি সঠিকভাবে খুনী হিসাবে চিহ্নিত হলেই এমনটা করা উচিত, নচেৎ কখনই নয়।

আবার এই সব পণ্ডিতেরই কিছু অংশীদার, অল্পসংখ্যক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী হঠাৎ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত, পশ্চিমবঙ্গের জেলে বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য মায়াকান্না জুড়ে দিয়েছেন। তাঁরা কি জানেন, সেই সব বন্দীদের মধ্যে অনেকেই ধর্ষণকারী এবং ধর্ষিতাকে খুন করে জেলে গেছে। এখন সেই সব বুদ্ধিজীবীদের কাছে একটাই প্রশ্ন, যাদের জন্য তাঁরা মায়াকান্না জুড়েছেন, তারা যদি তাঁদের বাড়ির কন্যা বা অন্য আত্মীয়াকে ধর্ষণ করার পর খুন করে জেলে সাজা খাটত তবে তাঁরা কি ওইভাবে মায়াকান্না জুড়তেন? একবারের জন্যও কি ধর্ষিতা এবং মৃত কন্যার বা বধূর অসহায় মুখটা মনে পড়তো না? মনে পড়তো না কি খুনের সময় তাদের কাতর আবেদন এই পৃথিবীর বাকি সুস্থ লোকেদের কাছে, তোমরা এই ধর্ষণকারী ও খুনীকে ক্ষমা কর না।

এই সব বুদ্ধিজীবীরা কি জানেন, তাঁদের দাবি বিশ্লেষণ না করে কার্যকরী করার অর্থ কী দাঁড়ায়? পুলিশকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রচুর বুদ্ধি খরচ, সরকারের কোষাগারের অর্থ ব্যয় করে একটা খুনীকে সাজা দিয়ে জেলে পাঠানোর পর সেই খুনীকে যদি অল্প ক'দিনের মধ্যে মুক্তি দেওয়া হয়, তবে পুলিশকর্মীদের পরিশ্রম করার মানসিকতা থাকবে কি, কারণ তারা তো জানেই খুনী সাজা পেলেও অল্পদিনের মধ্যেই বেরিয়ে আসবে। অন্যদিকে, খুনীরা জানে খুন করে ধরা পড়ার পর সাজা হয়ে গেলেও তাদের জন্য আছেন কিছু বুদ্ধিজীবী যাঁরা হইচই করে তাদের বার করে আনবেন জেল থেকে, সুতরাং ভয় কী?

হ্যাঁ, কেউ জেলে যাবজ্জীবন থাকুক সেটা আমিও চাই না। আমিও চাই তারা সুস্থ মানসিকতা নিয়ে সামাজিক জীবনে ফিরে আসুক। কিন্তু, জেলের ভেতরে ক'জন যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদির সুস্থ মানসিকতা গড়ে ওঠে? শতাংশের হিসেবে খুবই কম, কারণ এ পোড়া দেশের জেলখানার আমলারাই তা হতে দেয় না। তারা তাদের আপন আপন স্বার্থে এইসব কয়েদিদের নিয়ে জেলের ভেতরে সবরকম দুষ্কর্ম করার একটা বাহিনী তৈরী করে, সে বাহিনী দ্বারা তারা অর্থ রোজগার করা ছাড়াও দমনমূলক কাজ চালায়। ফলে যেসব কয়েদি মানসিকভাবে সুস্থ হওয়ার প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক লোক হিসাবে নিজেকে ফিরে পেতে পারত তারা আরও গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে যে দুষ্কৃতী ছিল তেমনই রয়ে গেল। সুতরাং এদের জন্য মায়াকান্নার অর্থ নির্বুদ্ধিতা।

আমরা পিনাকী হত্যার রহস্যের পেছনের ইতিহাসের পর্দা একটু একটু করে উন্মোচন করতে করতে বিস্ময়ের ধাক্কা খেতে খেতে একেবারে থ বনে গেলাম।

পিনাকীরঞ্জনের বাবা ছিলেন ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানির খুবই উচ্চপদস্থ কর্মচারী। মা ছিলেন হাওড়ার এক অতি সম্ভ্রান্ত, অভিজাত ও নামী বাড়ির মেয়ে। পিনাকী তাঁদেরই বড় ছেলে, ছোটবেলা থেকে তিনি খুবই আদর আর যত্নে বড় হয়ে উঠেছেন। তাঁদের সদানন্দ রোডের বাড়ি ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পৈলানের বাগানবাড়ি তাঁর ছুটন্ত দাপটে সবসময়ই মুখর হয়ে থাকত।

মেধাবী, দুঃসাহসী, অ্যাডভেঞ্চারাস, রোমান্টিক ও সুপুরুষ পিনাকী ছিলেন বাঙালী যুবকদের মধ্যে একটা ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। বাকচাতুর্যে ও ক্লান্তিহীন পরিশ্রমে তিনি যে কোনও

লোককেই তাঁর অনুগামী করে নিতে পারতেন। সমাজের সব স্তরেই তাঁর ছিল অবাধ গতি।

এ হেন পিনাকীর চরিত্রে দুর্বলতা ছিল দুটো। শুধু দুর্বলতাই নয়, সেই দুটো ছিল তাঁর নেশা, এমনকি বলা যায় তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ডের মূল সারবস্তু। এই দুটো হল সুরা ও নারীর শরীর। এবং এ দুটো পেতে তিনি যতদূর যাওয়া যায় ততদূর যেতেন। তাতে কে কী বলল কে কী ভাবল তাঁর কিছু যেত আসত না।

সাতাত্তরের লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতার আসনে কংগ্রেসের প্রার্থীকে পরাজিত করার জন্য তখনকার কংগ্রেসেরই এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ দিল্লীর যুবনেতা পশ্চিমবঙ্গের এক নেতাকে বললেন, "দক্ষিণ কলকাতায় এমন একটা লোক ঠিক করুন যে আমাদের ভোট কেটে ওই আসনে আমাদের অফিসিয়াল প্রার্থীর পরাজয় নিশ্চিত করতে পারে।"

পশ্চিমবঙ্গের সেই নেতা পিনাকীর কথা বলতে দিল্লীর যুবনেতা রাজি হলেন এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পিনাকীকে দক্ষিণ কলকাতার লোকসভা আসনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানো হলো। যুবনেতা দিল্লী থেকে তাঁরই এক অনুগত নেতার মাধ্যমে নির্বাচনী লড়াইতে খরচ করার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা পিনাকীর কাছে পাঠালেন। পিনাকী সেই টাকা হস্তগত করার পর কিছু বেকার ছেলেকে যোগাড় করে তাদের কিছু টাকা দিয়ে, তাঁর হয়ে প্রচার করার জন্য দেওয়াল লিখতে বলে দু'দিন পর চলে গেলেন দার্জিলিং। সঙ্গে অবশ্যই দুজন মহিলা ও সুরার বোতল। সেখানে থেকে চূড়ান্ত ফূর্তিফার্তা করে যখন তিনি কলকাতায় ফিরলেন তখন নির্বাচন হতে আর পাঁচ ছ'দিন বাকি। ফল কী হবে? জামানত জব্দ। তাতে পিনাকীর কী এল গেল? তিনি তো আর রাজনৈতিক লোক নন, যা পাওয়ার সেটা তো দার্জিলিংয়ের শীতল শরীরের মাঝে আরামে কাটিয়ে পেয়ে গেছেন এবং তার জন্য তাঁর পকেট থেকে একটা পয়সাও খরচ হয়নি, সবই এসেছে দিল্লী থেকে নির্বাচনের খেলার জন্য।

কোলি, লিলি, দীপা নামের তিনটি অবিবাহিত সুন্দরী তরুণী ছিল তাঁর নিত্যদিনের সঙ্গী। নতুন কোনও মহিলা তিনি যোগাড় করতে না পারলে এদের নিয়ে তিনি চলে যেতেন বিভিন্ন হোটেলে কিংবা বন্ধুর ফাঁকা ঘরে। বিশেষ করে তিনি যেতেন হাওড়া স্টেশনের আশেপাশের হোটেলে। তারপর সেখানে মদ্যপান সহযোগে চলত উদ্দাম যৌনক্রিয়া। একেক সময় তিনি একসঙ্গে ওই তিনজনকে নিয়ে যেতেন, বিকৃত যৌন খেলায় তিনি ছিলেন ওস্তাদ।

অথচ বাড়িতে আছেন বিদূষী প্রকৃত সুন্দরী স্ত্রী। তাতে কী? পিনাকীর যৌন ক্ষুধা লেলিহান আগ্নেয়গিরির মতো, প্রতি মুহূর্তে তা ফেটে বেরিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে চাইত। তাকে দমন করার কায়দা শিক্ষিত পিনাকীর জানা ছিল না বা সেরকম ইচ্ছাও ছিল না। সেজন্য তিনি প্রতিনিয়ত শিকারীর চোখ আর তূণ নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন এঘর থেকে ও ঘরে, যেখানে পাওয়া যাবে সুন্দরী গৃহবধূ যারা যৌনজীবনে ক্ষুধার্ত কিংবা লালায়িত। তাদের নিজের তুখোড় বাচনভঙ্গি ও পুরুষকারের অভিনয়ের বাণে করায়ত্ত করতে তাঁর বিশেষ পরিশ্রম করতে হতো না। দু'একদিনের চেষ্টাতেই নিজের বিছানায় তাদের তুলে আনতে পারতেন। এ খেলায় তিনি ছিলেন অসম্ভব পারদর্শী। এ কায়দায় তিনি ছিলেন একেবারে অনন্য।

অ্যাডভেঞ্চারাস পিনাকী শুধু সমুদ্র অভিযানেই যেতেন না। তাঁকে মাঝেমধ্যে গভীর জঙ্গলও টানত। সঙ্গীদের নিয়ে গাড়িতে বেরিয়ে পড়তেন। একবার গেলেন পালামৌর জঙ্গলে। সঙ্গে ছিলেন শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কের এক আত্মীয় ও এক বন্ধু। রাত কাটানোর জন্য তাঁরা উঠলেন কেড় ডাকবাংলোয়। যে ডাকবাংলোয় ক্যাম্প করে সত্যজিৎবাবু তাঁর 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র শ্যুটিং করেছিলেন। সঙ্গে সবই আছে, কিন্তু কোনও নারী নেই। নারী ছাড়া এই জঙ্গলে পিনাকীর কাটে কী করে? আনন্দটাই তো মাটি। বন্ধুকে বললেন ব্যবস্থা করতে। বন্ধুও একই প্রজাতির, কিন্তু এই গভীর জঙ্গলে নারী পাবেন কোথায়? উপায়ান্তর না দেখে ডাকবাংলোর কেয়ারটেকারের শরণাপন্ন হলেন, বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে! কারণ

স্থানীয় লোকের মদত ছাড়া এ নদী পার হওয়া যাবে না। কেয়ারটেকার পিনাকীর বন্ধুর কাতর আবদার শুনে একবার হাসল, তারপর বলল, "ঠিক হ্যায়, রাত মে কৌই মিল যায়েগা।"

কেয়ারটেকার কথা রাখল। রাতে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাবুদের সেবায় পাঠিয়ে দিল। পিনাকী ও তার আত্মীয় কেয়ারটেকারের স্ত্রীকে নিয়ে সারারাত কাটিয়ে দিলেন। অবশ্য পরদিন সকালবেলায় ওখান থেকে ফিরে আসার সময় ভাল বকশিস দিলেন, খাতির যত্ন ও সেবার জন্য।

সেখান থেকে ওঁরা গেলেন মহুয়াদার গভীর জঙ্গলে। জঙ্গলের আশেপাশে আছে পাহাড় ঘেরা আদিবাসীদের গ্রাম। এখানেও তাঁরা উঠলেন বনবিভাগের বাংলোয়। বাংলোয় তাঁরা ছাড়া অন্য কোনও পর্যটক নেই। দিনের বেলায় ওঁরা জঙ্গল ঘুরে বেড়ালেন। পিনাকীর কাছে মারকনি রাইফেল। ভয়হীন পিনাকী বাঘের গুহা থেকে হরিণের কাঁচা পা টেনে নিয়ে এলেন। সারাদিন কাটালেন হৈ হুল্লোড় করে।

কিন্তু রাতের বেলায় কী হবে? যখন গভীর জঙ্গলে নেমে আসবে আদিম যুগের অন্ধকার, চারদিক থেকে ডাক আসবে পোকামাকড় কিংবা জাগ্রত জন্তুর, তখন ওঁরা কী করবেন? ওঁরা তো সভ্য জগত থেকে জঙ্গল আর জানোয়ার দেখতে এসেছেন। নিজেদের জন্য তো চাই কিছু ব্যবস্থা। ওঁরা তো আর সূর্য অস্ত গেলেই ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারেন না। কিন্তু কী হবে ব্যবস্থা? গতরাতে সুখের টানে কিছুটা অপ্রতুলতা ছিল, তবু 'যেমন দেশে তেমন' এই বাক্য মেনে মানিয়ে নেওয়া গেছে, কিন্তু এখানে? পিনাকী আবারও শরণাপন্ন হলেন বন্ধুর। ঠিক হল, রাতে যদি আদিবাসী মহিলাদের দলবাঁধা উলঙ্গ নৃত্যের ব্যবস্থা করা যায় তবে সেটাই হবে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। সম্ভোগ তো রোজই আছে।

বন্ধু এখানেও পৌঁছে গেলেন কেয়ারটেকারের কাছে। সেও আদিবাসী এবং আশেপাশের সব গ্রামের সব মুলুক তার হাতের তালুতে। বন্ধুটি প্রথমেই তাকে টাকার লোভ দেখালেন। কেয়ারটেকার কাৎ। সে বিকেলবেলা বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বিকেল থেকে সন্ধে গড়িয়ে যায়, তার দেখা নেই। পিনাকীদের মুখ শুকনো হয়ে এল। তাঁরা আলোচনা করতে লাগলেন, তাঁদের আশা কি পূর্ণ হবে না? কেয়ারটেকার লোকটা কি ব্যবস্থা করতে পারবে না? সে কি এক দঙ্গল আদিবাসী মহিলা যোগাড় করতে পারছে না? এক দঙ্গল না পারুক, অন্তত তিন চারজন পারলেও তাঁদের আশা পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে না।

ওঁরা যখন ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছেন, কেয়ারটেকারের মুখটা দেখার জন্য উত্তেজনায় এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বাংলোর বারান্দায়, তখন হঠাৎই অন্ধকারের মধ্যে বাংলোর সদর গেটের কাছে মনুষ্যমূর্তি দেখে তাঁরা এগিয়ে গেলেন। হ্যাঁ, কেয়ারটেকারই ফিরে এসেছে। তার মুখ দিয়ে ভকভক করে বার হচ্ছে মহুয়ার মদের গন্ধ। যার সঙ্গে ওঁরাও ভালভাবেই পরিচিত।

কেয়ারটেকার অনুচ্চ স্বরে বলল, "হোগা, তব রাত থোড়া জাদা হোনে সে।"

পিনাকী বলে উঠলেন, "কেতনা রাত মে?"

কেয়ারটেকার তার লাল ঘোলাটে চোখটা তুলে পিটপিটিয়ে বলল, "এই ধরিয়ে ন, সাড়ে নমে, গাঁও কা আদমী শো জায়েগা, তব।"

পিনাকী ওর কথা শুনে মনে মনে বললেন, "দূর শালা, রাত ন'টা আবার এটা রাত হল নাকি, কলকাতায় তো তখন সবে সন্ধে।" মুখে বললেন, "ঠিক হ্যায়, রাতমেই আচ্ছা হোগা।"

কেয়ারটেকার তার ঘরের দিকে ফিরতে ফিরতে ওঁদের জিজ্ঞেস করল, "ক্যায়া খানা পাকায় গা।"

পিনাকীর আত্মীয় ভদ্রলোক চিৎকার করে বলে উঠলেন, "মোরগা মারো।" "ঠিক হ্যায় বাবু" বলে কেয়ারটেকার তার রাস্তা ধরল।

পিনাকী আহ্লাদে আটখানা। তাঁদের শুকনো মুখগুলি আবার আনন্দে উচ্ছল। হাতের

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন সবে সন্ধে সাতটা। তার মানে, তাঁদের আশা পূর্ণ হতে আর মাত্র দু'ঘণ্টা দেরি। ইতিমধ্যে মদ্যপানের আয়োজন সম্পূর্ণ করে নিতে হবে। কেয়ারটেকার তাঁদের দুটো ঘরে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রেখে চলে গেল। তারও এখন অনেক কাজ। মোরগা মারতে হবে। বাবুরা খাবে। তারপর নাচ দেখাতে হবে। সব দায়িত্ব তো তারই। তবে মদ ও টাকা অনেক মিলবে। এতেই তার আনন্দ।

পিনাকীরা বাংলোর বারান্দায় হ্যারিকেনের আলোয় মদের আসর সাজিয়ে পান শুরু করলেন। তবে ধীরে। কারণ রাতভর আদিবাসী মহিলাদের আদিম নাচ তো আর শুখা গলায় উপভোগ করা যাবে না। গলা ভেজাতেই হবে।

ওঁরা মদ্যপান করছেন আর মাঝে মাঝে হাতের ঘড়ির দিকে দেখছেন, কখন ন'টা বাজে। ওঁরা অদ্ভুতভাবে মদ খাচ্ছেন। হুইস্কির সঙ্গে মহুয়ার মদ মিশিয়ে। কেয়ারটেকারকে দিয়ে কয়েক হাঁড়ি মহুয়ার মদ আনিয়ে রেখেছেন, নাচের আগে নাচনিরাও খাবে, তেমনই কথা আছে।

ন'টার অল্প আগেই ওঁরা বাংলোর গেটের আওয়াজ পেলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন, দু'জন লোক বাংলোয় ঢুকল, তাদের পিঠে ছোট ছোট দুটো পুঁটলি বাঁধা। তারা সোজা কেয়ারটেকারের ঘরের দিকে চলে গেল। পিনাকীরা ভাবলেন, এরা আবার কারা, তবে কি নাচতে কেউ আসবে না সেই খবরই দিতে এসেছে? ওঁদের বুক ধড়াস ধড়াস করে নাচতে লাগল, কী খারাপ বার্তা এনেছে সেই আশঙ্কায়।

না। একটু পরেই ওঁদের মুখে একেবারে সকালের সূর্যের মতো হাসি ফুটে উঠল, ওঁরা হ্যারিকেনের ছিটকে পড়া আলোয় গেটের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, এক দঙ্গল আদিবাসী যুবতী হাসতে হাসতে ওঁদের বাংলোর ভেতর ঢুকল। তার মানে, এরাই তাঁদের পিপাসা মেটানোর জল। দঙ্গলটাও কেয়ারটেকারের ঘরের দিকে চলে গেল। ওদের খিলখিলানি হাসির আওয়াজে পিনাকীদের বুকের ভার নেমে গেল। ওদের দলটা পিনাকীদের তিনজনকে ফিরে ফিরে দেখছে আর নিজেদের ভাষায় কী সব আলোচনা করছে তা পিনাকীরা দূর থেকে বুঝতে পারলেন না।

যুবতীদের দঙ্গলটা কেয়ারটেকারের ঘরের দিকে চলে যাওয়ার পর পিনাকীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন তারা কাছে আসে। চার পাঁচ পেগ করে পেটে সুরা পড়ে গেছে, নেশা খানিকটা জমেছে। চারদিকে জঙ্গলের অন্ধকার, দূরে দূরে কালো পাহাড়ের ছোট বড় ঢেউ খেলানো মাথা। কত লক্ষ বছর ধরে ওরা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ধ্যান করছে কে জানে? তাদের পাদদেশে কত রকমের জন্তু জানোয়ারেরা কত ধরনের জীবন ও মরণের খেলায় মত্ত তা তারা অবজ্ঞায় দেখেও দেখে না। এসব নিরর্থক ছোটাছুটি যে কিসের টানে, কিসের বেগে, তা জেনে অযথা সময় নষ্ট করার ইচ্ছে তাদের নেই। তারা দাঁড়িয়ে আছে, আরও লক্ষ লক্ষ বছর ওই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে যদি না দানবেরা তাদের বুক ফুটো করে আগুন জ্বালিয়ে মিশিয়ে দেয় তাদের খেলার মাঠের জন্য।

পিনাকীরা ওই সব দেখছেন না। ওঁদের ধ্যান কেয়ারটেকারের ঘরের দিকে, কখন শুরু হবে নৃত্য। তিতিক্ষায় মন যে চাতক পাখির মতো শুকিয়ে যাচ্ছে। হাতের কাছে রং তুলি, অথচ ওঁরা ইচ্ছে মতো আঁচড় টানতে পারছেন না। শিল্পী কেয়ারটেকারের নির্দেশনার জন্য বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। কেয়ারটেকার ওখানে কী করছে কে জানে।

কেয়ারটেকার এল, যুবতীদের আগমনের প্রায় পনেরো মিনিট পর। বলল, "বাবু ও নটিয়ারা সব দারু পিয়ে- "

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই পিনাকীরা বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছাসে দেও।"

কেয়ারটেকার বলল, "আধাঘণ্টা বাদ শুরু করবিক।"

উত্তরে ওঁরা আর কী বলবেন? মেনে নিলেন। ঠিক হল নাচটা হবে বাংলোর পেছন দিকে। ওদিকটা সামান্য প্রাচীর দিয়ে তারপর কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। যাতে বন্য জন্তু চট করে

বাংলোর ভেতরে না ঢুকতে পারে। কাঁটাতারের বাইরে কিছুটা ফাঁকা খোলা মাঠ মতন আছে। তারপর জঙ্গল শুরু। রাতে পুরোটাই অন্ধকার। এমন কি পূর্ণিমার খোলা চাঁদও তার আবেশ করা স্নিগ্ধতার রূপ নিয়ে জঙ্গলে খেলতে পারে না এমনই, গাছে গাছে ভরা ঘন বন। গাছের মাথায় মাথায় আলো বুলিয়ে ফিরে যায় সে এক মাসের জন্য।

বাংলোর পেছন দিকে নৃত্য মঞ্চস্থ করার প্রধান কারণ ওদিকে রাতের দিকে কেউ আসে না। সামনের গেটে ও গেটের দিকের রাস্তায় হঠাৎ করে কেউ এসে পড়তে পারে। তখন লজ্জার সীমা থাকবে না।

কেয়ারটেকার বেশ কিছু শুকনো কাঠ বাংলোর পিছনদিকে নিয়ে গেল। তারপর ফিরে গেল তার ঘরে। সেখানে রাতের রান্না হচ্ছে। লোকটি. খুবই আন্তরিক ও কর্মঠ। সব দিকেই খেয়াল রাখে। অতিথিদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখে না।

ঠিক আধ ঘণ্টা পর সে নর্তকীদের নিয়ে এল বাংলোর পেছনের ঘেরা উঠোনে। ওরা দলে সাতজন। উত্তেজিত তিন দর্শক মদ্যপানের সরঞ্জাম নিয়ে বসল জায়গা মতো। নর্তকীদের দুই পুরুষ সঙ্গী তাদের কাপড়ে বাঁধা পুঁটলি খুলে বার করল ঢোলক। তারপর ডুগু ডুগু শব্দ তুলে ভাঙতে লাগল জঙ্গলের নৈঃশব্দ। কেয়ারটেকার উঠোনের দু'পাশে শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে পুরো মঞ্চ আলোকময় করে দিয়েছে।

নর্তকীরা সবাই বেশ ভালই নেশা করেছে, তা তাদের চলনে ঢলনে বেশ বোঝা যাচ্ছে। তাদের পরনে শুধু একটা করে শাড়ি। তাও হাঁটু ছাড়িয়ে বেশি নিচে নামেনি। সেই শাড়িও তাদের অঙ্গে আর বেশিক্ষণ থাকবে না, সেই আনন্দে দর্শককুল খুশী।

ডুগু ডুডুগু ডুগুর তালে তালে নর্তকীরা দলবদ্ধভাবে নাচতে লাগল। পিনাকীরা কেয়ারটেকারের দিকে তাকালেন। কেয়ারটেকার নর্তকীদের ইশারায় নাচ থামাতে বলে কাছে ডাকল।

ব্যস, তারা মিনিট খানেকের মধ্যে জঙ্গলের মতো আবরণহীন হয়ে গেল। শাড়িগুলো সব বারান্দার এক কোণে দলা পাকিয়ে পড়ে রইল। তারপর শুরু হল কাঙ্ক্ষিত নাচ। মাঝে মাঝে সাময়িক বিশ্রাম।

রাত একটায় নাচ শেষ। তারপর আবার মহুয়া পান, সঙ্গে মুরগির মাংস। ভোজনপর্ব শেষে ঘরের ভেতর দর্শক ও নর্তকীরা মিলে মিশে একাকার। ভোরবেলায় কেয়ারটেকারের ডাকে হুঁশ এবং ভাল বকশিস নিয়ে নর্তকীদের গ্রামের পথে বিদায়।

পিনাকীরাও আর মহুয়াদারে রইলেন না। গাড়ি ছোটালেন কলকাতার দিকে। তাঁর উদ্বেলিত জীবনে এক জায়গায় স্থির হওয়া নেই। শুধু জায়গা নয়, কোনও নারীতেই নিষ্ঠ হওয়া ধাতে নেই।

তবে অমৃতার কথাটা কিছুটা আলাদা। অমৃতার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় এক নামজাদা জুয়েলারি ব্যবসায়ীর দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে। সেই বাড়ির গৃহবধূর সঙ্গেও পিনাকীর গভীর থেকে গভীরতর সম্পর্ক। আর তারই সূত্রে দু'জনের প্রথম সাক্ষাৎ।

প্রথম আলাপেই পিনাকী অমৃতাকে বললেন, "আরে আপনার তো গ্রীসে জন্মানো উচিত ছিল, এদেশের বাঙালী মহিলাদের এরকম শরীরের কাঠামো যে হয় তা আপনাকে দেখেই প্রথম জানলাম।"

"হ্যাঁ, সেই শুরু।" অমৃতা লালবাজারে দীপককে বললেন।

দীপক প্রশ্ন করল, "তারপর?"

অমৃতা বললেন, "তারপর আর কী, আমি পিনাকীর ঝড়ে উড়ে গেলাম। প্রথম দিনের কথা আমার এখনও মনে আছে। আমাকে দুপুরবেলা ও একটা ট্যাক্সিতে চাপিয়ে নিয়ে গেল হাওড়ার অশোকা হোটেলে। সেখানে ও আগেই একটা ঘর বুক করে রেখেছিল। দেখলাম, হোটেলের সবাই ওকে চেনে, তার মানে ওখানে ওর খুবই যাতায়াত। আমাকে নিয়ে ও গেল সেই ঘরে। সঙ্গের একটা ব্যাগ থেকে ও বার করল হুইস্কির বোতল। দু'টো গ্লাসে ঢালল।

আমাকে দিল, নিজেও নিল। গ্লাসের পর গ্লাস আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যেতে লাগল। ঘণ্টাখানেক বাদে আমি দেখলাম আমার শরীরে একটিও সুতো নেই। কখন ও মদ খেতে খেতে আমার শরীর থেকে সব সরিয়ে নিয়েছে।”

দীপক জানতে চাইল, “আপনি বাধা দেননি?”

অমৃতা দীপকের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে বললেন, “না, পারিনি, ওর আকর্ষণের কাছে আমি কেমন করে যেন আত্মসমর্পণ করে বসলাম। এরপর ঘণ্টা তিনেক ধরে চলল আমাকে নিয়ে ওর খেলা। যখন শেষ হল, তখন আর আমার উঠে দাঁড়ানোরও শক্তি নেই। তবে আমি, বিশ্বাস করুন, দারুণ দারুণ পরিতৃপ্ত।” ,

দীপক বলল, “আপনার তো দুটো বাচ্চা বাচ্চা ছেলে আছে, তাদের কথাও কি মনে পড়েনি?”

অমৃতা অপকটে স্বীকার করলেন, “পড়েছিল, কিন্তু পিনাকীর আলিঙ্গনে সব ভুলে গেলাম। সেদিন উপলব্ধি করলাম, শারীরিক তৃপ্তি কাকে বলে। ওর সঙ্গে না মিললে হয়তো এ জীবনে তা জানাই হতো না।”

দীপক প্রশ্ন করল, “কেন, আপনার স্বামী দেবব্রতবাবু কি অক্ষম?” অমৃতা বললেন, “না, না অক্ষম নয়, সাধারণ। পিনাকীর কাছে কিছুই না। পিনাকী যদি হিমালয় হয় দেবব্রত হচ্ছে একটা টিলা।”

দীপক জানতে চাইল, “আপনারা তো প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন?”

অমৃতা উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ। এমনিতে আমরা পরস্পরকে ভালই বাসতাম। কিন্তু ওই যে বললাম, পিনাকীর সান্নিধ্যে আসার পর সে সব ভালবাসা কেমন যেন শুকিয়ে গেল। এমনকি আমাদের বাড়িতেও আর পরস্পরের শারীরিক মিলন হতো না। আমি আর ওই ব্যাপারটায় দেবব্রতর কোনও প্রয়োজনই বোধ করতাম না।”

দীপক আবার জানতে চাইল, “আপনি আর পিনাকী এভাবে কতবার মিলেছেন?”

অমৃতা একটু চুপ করে ভাবলেন, তারপর বললেন, “সত্তর পঁচাত্তর বার তো হবেই।”

দীপক বলল, “প্রতিবারই কি হাওড়ার ওই অশোকা হোটেলে?”

অমৃতা চট করে উত্তর দিলেন, “না, না, তা কেন? কলকাতার বিভিন্ন জায়গায়, হাওড়ার হোটেলেও অনেকবার। আসলে ওর ডাকে সাড়া না দিয়ে পারতাম না। ওর ডাকের অপেক্ষাতেই আমি থাকতাম। আসলে কি জানেন, ও যদি আমাকে ময়দানেও উলঙ্গ হয়ে শুতে বলত, আমি তাতেও রাজী ছিলাম। ওর জন্য আমি কাঙাল।”

দীপক জানতে চাইল, “এই সব মিলন কি সব দিনের বেলাতেই হত?” অমৃতা বললেন, “হ্যাঁ, দিনের বেলাতেই। আগের থেকে ঠিক থাকলে আমি কলেজে যেতামই না কিংবা কোনও অজুহাত দিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। পিনাকী ঠিক প্রস্তুত থাকত।”

দীপক প্রশ্ন করলেন, “এ ব্যাপার দেবব্রতবাবু কি কোনও দিন টের পাননি?” অমৃতা বললেন, “কিছুটা পেয়েছিল। কিন্তু আমাকে বাধা দেবে কী করে? আমি তো ওর জন্য নরকে যেতেও প্রস্তুত। সেখানে কি কোনও বাধা মানি?” তারপর দীপকের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, “সে আপনি বুঝবেন না। আমি নারী। বুঝি, আমি জানি, কোনও মেয়ে যদি ওর সঙ্গে একবার ওই খেলায় মাতে তবে সে চিরদিনের জন্য ওর দাসী হয়ে যাবে। না হয়ে উপায় নেই। বাধা-টাধা তুচ্ছ।”

এরপর দীপকের প্রশ্নে অমৃতা যা বললেন, তাতে পরিষ্কার বোঝা গেল বাৎসায়নের কামশাস্ত্রের যত রকম ছলাকলা আছে তার প্রতিটা স্বাদই পিনাকী ও অমৃতা মিলে উপভোগ করেছেন। অমৃতা একেবারে খোলাখুলি তার দু’একটা বর্ণনা দিলেন। আসলে অমৃতা পিনাকীকে হারিয়ে এতই ভেঙে পড়েছিলেন যে তিনি ওইসব পূর্ব সুখস্মৃতি অন্যকে বলে নিজেকেও কিছুটা হাল্কা করছেন। একবার যখন মুখ খুলেছেন, তখন লজ্জাটজ্জা বিসর্জন দিয়ে সব কিছু স্বীকার করে নিলেন।

অমৃতার বর্ণনার পর দীপক তাঁকে প্রশ্ন করল, “আচ্ছা আপনি তো ওর দৈহিক প্রেমে পাগল ছিলেন, আপনার কি মনে হয় আপনাকে পেয়ে তিনি অন্য নারীর দিকে আর তাকাননি?”

অমৃতা দীপকের প্রশ্ন শুনে একটু করুণভাবে হাসলেন, বললেন, “না, তেমন কখনও মনে হয়নি। আমার তো মনেই হতো ও জন্মেছে শুধু নারীদেহ সম্ভোগ করার জন্য। তাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য। সুতরাং সে একজনে কেন আটকে থাকবে?” তারপর সরাসরি তিনি দীপককে আক্রমণ করে বললেন, “আপনারা পুরুষরা এমনিতেই পলিগামিস্ট, আর পিনাকী হলেই দোষের ছিল? ওর যা চাহিদা ছিল তাতে ও পলিগামিস্ট না হয়ে পারে না।”

উপস্থিত পুরুষরা ওঁর আক্রমণ সহ্য করলাম। তাও একজন পলিগামিস্ট মহিলার কাছ থেকে। সহ্য করতেই হবে। কিন্তু পিনাকীর চরিত্রের পলিগামিকে যুক্তি দিয়ে নৈতিক সাজানোটাই সহ্য করা যায় না। তবু চুপ। অমৃতাকে তার বুকের গরল উগরে দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

অমৃতা উচ্চবিত্ত ডাক্তারের মেয়ে। উচ্চশিক্ষিতা, সুন্দরী, অধ্যাপিকা, ছোটবেলা থেকে নাক উঁচু করে চলেছেন। ওঁর কাছে মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে দেবব্রত চিরদিনই কিছুটা ম্রিয়মান। তবু তিনি ঘর বেঁধেছিলেন। সেই ঘরে পিনাকী দাবানল জ্বালিয়ে দিয়ে ছারখার করে দিয়েছিলেন। আর সেই দাবানলের কাহিনীই অমৃতার মুখ থেকে শুনতে হচ্ছে। কতটা আঘাত পেলে, কতটা অসহায় ও দুঃস্থ বোধ করলে ওই ভাবে তিনি তাঁর গোপন অভিসারের কাহিনীগুলো বলতে পারেন।

রঞ্জিতের সঙ্গে কী সূত্রে পিনাকীর আলাপ? দক্ষিণ কলকাতার এক বড় নামকরা সিনেমা হলের মালিকের স্ত্রী বন্যপ্রাণীর উপর একটা তথ্যচিত্র তুলতে সজনেখালি গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন পিনাকী। সেখানেই পিনাকীর সঙ্গে ব্যাঘ্রপ্রকল্পের ডেপুটি রেঞ্জার রঞ্জিত রায়ের আলাপ। আড্ডাবাজ রঞ্জিতের সঙ্গে পিনাকীর জমে যেতে বেশি সময় লাগেনি। মদ্যপানের আসরে দু'জনেই তুখোড়। যদিও চাকরির ক্ষেত্রে, রঞ্জিত অধিকাংশ বছর জুড়েই ছিলেন সাসপেন্ড। এমনই তাঁর কীর্তি। সেই রঞ্জিতের হাতে বেশ কিছু টাকা জমেছিল। সেই টাকা সে কোনও ব্যবসায় খাটাতে চায়। প্রস্তাব দেয় পিনাকীকে। পিনাকী তার প্রস্তাব লুফে নেন। আর সেই সূত্র ধরেই রঞ্জিত সজনেখালি থেকে কলকাতায় এসে পিনাকীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ব্যবসা কিছু না হলেও তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বের বাঁধনটা প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল। তবে পিনাকীর হাত ধরে রঞ্জিত কোনও নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেনি। সেখানে পিনাকীর ছিল একনায়কতন্ত্র। এটা ঠিকই পিনাকীর জীবনে বহু মহিলার আগমনের আসরেও অমৃতা ছিল বহুলাংশে আলাদা, যেটা পিনাকীকে একটু বেশি মাত্রায় নাড়া দিয়েছিল হয়তো। দু'জনেই একই বিষয়ের অধ্যাপনা করেন, একই ভাবধারায় ভাবেন। সেজন্যই দু'জনের জুটি হয়েছিল আরও দৃঢ়।

আর এ জুটির জোটও ভাঙল অবিশ্বাস্যভাবে। চব্বিশে সেপ্টেম্বর যেদিন ভাঙল ওদের জুটি, সেদিনের অভিযানও ছিল নির্ধারিত। যে ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে পিনাকী বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর পার হয়ে যাবেন ইন্দোনেশিয়ার গাঙে সেটাতেই ওরা দল বেঁধে সারাদিন গঙ্গার বুকে ভাসবেন, সেটাই ছিল ঠিক। কেমন হলো তাঁর অভিযানের রথ তা দেখাবেন না তাঁর প্রেমিকাকে, তা কি হয়?

নৌকাটা তিনি কিনেছিলেন কোকরাহাটি থেকে, তারপর নিজের পরিকল্পনা মতো সেটা গড়ে নিয়েছিলেন। বানিয়েছিলেন একটা ছোট্ট কেবিন, তাতে কাচ লাগান জানালা। কেবিনের এক দিকের ছাদটা একটু নামানো। কেবিনের সামনেই পাল খাটানোর ব্যবস্থা। ছোট্ট ডিঙ্গিটা নিজের মতো করে সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়েছিলেন।

গিয়েছিলেন বিধানসভা ভবনে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে দেখা করে অভিযানের জন্য সাহায্য চাইতে। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, সাহায্য ও সহযোগিতার।

শেষ লগ্নে তিনি আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন একবার অমৃতাকে ওই ডিঙ্গির প্রস্তুতিটা দেখাতে। আর সেই বিহারে তিনি আমন্ত্রণ করেছিলেন রঞ্জিতকেও। রঞ্জিত তাঁর বাড়িতে এলে তাঁরা দুজনে ট্যাক্সি নিয়ে যান বালিগঞ্জে অমৃতাদের সপ্তপর্ণীর ফ্ল্যাটে। অমৃতা ও দেবব্রত তাঁদের এগিয়ে যেতে বলেন।

পিনাকীরা অমৃতাদের কথা শুনে সোজা ট্যাক্সি নিয়ে আসেন শেক্সপিয়ার সরণির একটা দোকানে। সেখান থেকে তাঁরা কেনেন একটা হুইস্কি ও একটা বড় ভদকার বোতল। ভদকার সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ার জন্য অরেঞ্জ স্কোয়াশ, তাছাড়া জ্যাম ও পাঁউরুটি। তারপর সোজা চলে আসেন রিভার ট্রাফিক জেটিতে, যেখানে সুলেমান ও সাহাদাত পিনাকীর ডিঙ্গি নিয়ে অপেক্ষা করছে তাঁদের গঙ্গাবক্ষে ঘুরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু পিনাকী তো আর শুধুমাত্র রঞ্জিতকে সঙ্গী করে বেড়াতে যাবেন না, অপেক্ষা করবেন তাঁর অন্যতমা প্রিয়ার জন্য। তিনিই তো প্রধান অতিথি।

অমৃতা ও দেবব্রত এলেন দুপুর একটা নাগাদ। তাঁদের নিয়ে পিনাকী ও রঞ্জিত উঠে বসলেন ডিঙ্গিতে। সুলেমান অপেক্ষা করতে লাগল পিনাকীর ইঙ্গিতের। যে ইঙ্গিতে তিনি সুলেমানকে বলবেন ভাসাতে ভেলা। সুলেমানকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। পিনাকী ইঙ্গিত দিতেই সুলেমান জেটিতে বাধা ডিঙ্গির রশি খুলে ভেলা মুক্ত করে দিল। সে কি স্বপ্নেও ভেবেছিল সেই সঙ্গে সে খুলে দিচ্ছে পিনাকীর জীবনের রশি? সে কি জানত পিনাকীর সঙ্গে ডাঙার সম্পর্ক সেখানেই শেষ, পিনাকী আর দু'পায়ে ভর দিয়ে কোনওদিন ডাঙায় হাঁটবেন না।

সুলেমান যখন রশি খুলল তখন দুপুর দেড়টা। গঙ্গায় ভরা জোয়ার। সাহাদাত ধরল হাল, সুলেমান টানতে লাগল দাঁড়। নৌকা আস্তে আস্তে গঙ্গার জোয়ার কেটে কেটে চলতে শুরু করল মাঝদরিয়ায়। সুলেমান ওস্তাদ, মাঝি, তাই পিনাকী তাকে বেছেছেন। সুলেমানের ছেলে সাহাদাতও তার বাবার সঙ্গে আস্তে আস্তে হয়ে উঠছে পাকা মাঝি। জলের উপরেই তাদের জন্ম, জলের ধর্ম তাদের নিখুঁতভাবে জানা। জলে কান পেতে তারা শুনতে পায় তার ভাষা, তার কথা।

মাঝ গঙ্গায় নৌকা পৌঁছে চলতে শুরু করল উজানে, উত্তর দিকে। পিনাকী, অমৃতারা প্রত্যেকেই এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন কেবিন ঘিরে। আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহের ভরা গঙ্গার হাওয়া বুক ভরে নিচ্ছিলেন আর আবোলতাবোল কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে বলে নিজেদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিলেন। অমৃতা বারবার ডিঙ্গি দেখে ভয় পাচ্ছিলেন এই ভেবে যে, “এই ডিঙ্গি নিয়ে তাঁর প্রিয়তম যাবে সেই সুদূর ইন্দোনেশিয়া? ফিরবে তো? না ফিরলে তাঁর কী হবে? কাকে নিয়ে কাটবে বাকি জীবন?' কিন্তু মুখে তাঁর দুশ্চিন্তার কোনও অভিব্যক্তি নেই, বরং ভরা গঙ্গার মতো কিশোরীর ছটফটানি ঝরে পড়ছিল। পিনাকী ভাবছিলেন, “কী কেমন দেখছ প্রিয়া আমার ছোট ডিঙ্গিটা? হ্যাঁ, এই ডিঙ্গি নিয়েই আমি পার হয়ে যাব বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর এবং পৌঁছে যাব ইন্দোনেশিয়ার মাটিতে, কেমন বীর আমি বুঝেছ? তারপর সেখান থেকে ফিরে এসে প্রথমেই আমার বুকের ডিঙ্গিতে স্থান দেব তোমায়, তুমি পাড়ি দিও। এখন চল, আজকের দিনটা আমরা উপভোগ করে নিই।'

পিনাকী খুলে ফেললেন জামা প্যান্ট, তাঁর পরনে রইল শুধু একটা শর্টস। তিনি কেবিনের ভেতর ঢুকতে আহ্বান করলেন প্রত্যেককে। তাঁর পেছন পেছন ঢুকলেন রঞ্জিত, অমৃতা ও দেবব্রত। গোল হয়ে চারজনে বসলেন কেবিনের ভেতর।

থিতু হয়ে বসার পর রঞ্জিত খুলে ফেললেন ভদকার বোতল। পিনাকী বার করলেন গ্লাস, সবই মজুত। গ্লাসে গ্লাসে ঢালা হল ভদকা ও অরেঞ্জ স্কোয়াশ। চারজনেই মুখে তুললেন ‘অমৃতের' পাত্র। একে একে খালি হতে লাগল সেই পাত্র। সুলেমান যেমন দাঁড় টানছিল তেমনই টানতে লাগল। নৌকার গতি ধীর, যেন উজানে যেতে সে লজ্জা পাচ্ছে। তবু সে ছোট ছোট পায়ে টলটলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

অল্প কিছুক্ষণ পরই দেবব্রত কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে কেবিনের গায়ে ঠেস দিয়ে নৌকার কোলে বসে পড়লেন। তিনি মাত্র দু'পাত্র খেয়েছেন। তাঁর আর ভাল লাগছিল না। ভেতরটাও গরম, গুমোট লাগছিল। মদ্যপানে তিনি খুব বেশি আসক্ত নন। হলে হলো, না হলে কিছু যায় আসে না, অনেকটা অনুরোধে গেলা। বাকি তিনজন তখনও পান করে যেতে লাগল পাত্রের পর পাত্র।

দেবব্রত কেবিন থেকে বার হওয়ার খানিকটা পরে আরও বড় একপাত্র পান করে অমৃতা কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে সামনে পাল খাটানোর খুঁটিটা ধরে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ মুখ মদ্যপান ও প্রেমিকের সঙ্গে নৌকাবিহারে উজ্জ্বল, রোমান্টিকতায় ভরা। হাওয়ায় উড়ছে কাঁধ থেকে খসতে ইচ্ছুক লম্বা আঁচল। উপরে শরতের খোলা নীল আকাশ, নিচে গঙ্গার টলটলে খোলা বুক। ডিঙ্গি সেই বুকের ওপর টুকটুক করে নেচে নেচে চলেছে উত্তর দিকে।

অমৃতা রবীন্দ্রনাথের গান ধরলেন, "আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো/ তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই কিছু নাই গো।" অমৃতার গানের গলাটা সুন্দর, সুরার প্রভাবে খোলা প্রকৃতির মাঝে গলা ছেড়ে গাইছেনও খুব ভাল। সেই গান শুনে পিনাকী কি কেবিনের ভেতর বসে থাকতে পারেন? অত রসকষহীন নিরেট নন পিনাকী। তিনিও হামাগুড়ি দিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে কেবিনের ছাদে অমৃতার কাছাকাছি বসে পড়লেন। অমৃতা তখন গানের স্থায়ী ছেড়ে অন্তরায় ঢুকে পড়েছেন, "তুমি সুখ যদি নাই পাও যাও সুখের সন্ধানে যাও/আমি ছিলেম তোমার হৃদয় মাঝে/আর কিছু নাহি চাই গো।"

গান শুনতে শুনতে পিনাকীর মনে হল, অমৃতার গানের 'তুমি'টা তিনি নিজে। পিনাকী চার পেগ ভদকা খেয়ে বাইরে রোদ মাথায় নিয়ে বসেছিলেন।

নেশাও চড়চড় করে বাড়ছিল। পরিবেশ পরিস্থিতি ভুলে আবেগে তিনি প্রেমিকার কোমরটা চট করে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নিয়ে এসে তাঁর উন্মুক্ত জঙ্ঘার ওপর অমৃতাকে বসিয়ে দিলেন।

তিনি ভুলে গেলেন অমৃতার স্বামী তার ঠিক দু'তিন হাত দূরে কেবিনে পিঠ ঠেকিয়ে বসে স্ত্রীর গান শুনছেন।

পিনাকীর কাণ্ড দেখে দেবব্রত প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন, তারপর গলা ফুলিয়ে গালাগালি দিয়ে উঠলেন। পিনাকী উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। অমৃতা গান থামিয়ে দিয়েছেন। তিনি পিনাকীর বেষ্টন ছাড়িয়ে মুক্ত হতে চাইছেন, কিন্তু পিনাকী জোর করে তাঁকে ধরে বসিয়ে রেখেছেন। দেবব্রত ও পিনাকী তর্ক জুড়ে দিয়েছেন। ওঁদের তর্ক শুনে রঞ্জিত মদ খাওয়া থামিয়ে কেবিনের মুখ দিয়ে বাইরে উঁকি মারলেন। হঠাৎ দেবব্রত উঠে দাঁড়ালেন এবং চোখের পলকে পিনাকীর গলাটা দু'হাতে চেপে ধরলেন। পিনাকী তাঁর গলা থেকে দেবব্রতর হাত ছাড়ানোর কোনও চেষ্টাই করতে পারলেন না। তিনি উঃ উঃ করে নেতিয়ে যেতে লাগলেন। অমৃতাকে জড়িয়ে রাখা তাঁর বাঁ হাতটা ধীরে ধীরে চাপমুক্ত হয়ে খুলে গেল। আধ মিনিটের মধ্যে তিনি কেবিনের ছাদে একেবারে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। দেবব্রত ওঁর গলা থেকে হাত সরিয়ে নিলেন।

নৌকা ততক্ষণে বালির বিবেকানন্দ সেতুটা ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়েছে। পিনাকী ওই ভাবে কাটা গাছের মতো চিৎ হয়ে যেতে উদ্বিগ্ন অমৃতা পিনাকীর জঙ্ঘা থেকে ডিঙ্গির পাটাতনে নেমে পিনাকীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "কী হল। এমন করছে কেন?" কিন্তু পিনাকী অসাড়, তাঁর মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বার হচ্ছে।

রঞ্জিত কেবিন থেকে চোখ লাল করে উৎকণ্ঠায় বেরিয়ে এসেছেন। তিনি একবার দেবব্রত ও একবার অমৃতার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "কী হল ব্যাপারটা? ও শুয়ে পড়ল কেন?"

দেবব্রত তখনও মুখ থমথমে করে গজগজ করছেন, তারপর অমৃতার দিকে একবার তাকিয়ে রঞ্জিতের দিকে ফিরে বললেন, "এই এর জন্য।"

অমৃতা একবার ঝট করে দেবব্রতর দিকে দেখলেন, তারপর পিনাকীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে পিনাকীর অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করলেন। তাঁর মুখটা ঝুলে গেল। তিনি পিনাকীর ডানহাতটা তাড়াতাড়ি নিজের দু'হাতে তুলে নাড়ী টিপে হৃদপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা করলেন মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন দেবব্রত ও রঞ্জিত। অমৃতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিজিওলোজির অধ্যাপিকা, তাই শরীরের অবস্থা বুঝতে পারদর্শী। মিনিট খানেক ওইভাবে পিনাকীর ডান হাতটা ধরে ছেড়ে দিলেন, পিনাকীর হাতটা ঝপ করে কেবিনের গায়ে পড়ে গেল।

হাত ছেড়ে অমৃতা বসে পড়ে পিনাকীর বাঁ পায়ের পাতার পেছন দিকে নাড়ী খুঁজতে লাগলেন। নেই। পিনাকীর নাড়ীর কোনও খোঁজ নেই। তিনি টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করে বললেন, "এ তুমি কী করলে? ওকে একেবারে মেরে ফেললে।" ঘটনার আকস্মিকতায় দেবব্রতর মুখটা কিছুটা পাংশুটে হয়ে গেছে। তিনি চিৎকার করে বললেন, "চুপ, একদম চুপ।"

রঞ্জিত অমৃতার ঘোষণা শুনে অবাক হয়ে কী করবেন ভেবে না পেয়ে পিনাকীর হাত ধরে নাড়ী দেখে ছেড়ে দিলেন, মুখটা পিনাকীর খোলা বুকের ওপর নিয়ে গিয়ে ডান কানটা পিনাকীর বুকের বাঁ দিকে চেপে হৃদপিণ্ডের আওয়াজ শোনার চেষ্টা করলেন। তারপর হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। অর্থাৎ অমৃতার কথাটাই সত্যি। পিনাকী আর উঠে দাঁড়াবেন না।

অমৃতা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ডুকরে উঠলেন। দেবব্রত বলে উঠলেন, "চোপ, আর ন্যাকামি করতে হবে না, এখন নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা কর।"

রঞ্জিত মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, সেই চেষ্টাই করতে হবে।"

সুলেমান ও সাহাদাত এতক্ষণ ওদের কর্মকাণ্ড অবাক হয়ে দেখছিল। আর ডিঙ্গি চালাচ্ছিল। যেই বুঝল ওদের সাহেব মারা গেছেন, সুলেমানের দাঁড় টানা বন্ধ হয়ে গেল। ওরা এই পরিস্থিতিতে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। সাহাদাত তার বাবার দিকে দেখছে, ভাবছে, আব্বা কিছু বলছে না কেন? সুলেমান দাঁড় ছেড়ে দেবব্রতর দিকে তাকিয়ে কান্না জড়ানো গলায় বলে উঠল, "এটা আপনি কী করলেন বাবু?" দেবব্রত সুলেমানের কথা শুনে ওর দিকে কটমট করে তাকালেন, তারপর মুখ ঘুরিয়ে সাহাদাতের দিকে দেখলেন। বাচ্চা ছেলে সাহাদাত সব কিছুই দেখেছে। সে যেমন হাল ধরে বসেছিল তেমনভাবেই বসে আছে। দেবব্রত সুলেমানকে ধমকে বলে উঠলেন, "যা হয়েছে তা হয়েছে, এখন তো আর তোমার সাহেব ফিরবে না। এখন আমি যা বলছি তাই কর, না করলে আমরা তোমাদের ফাঁসিয়ে দেব, বলব তোমরাই পিনাকীকে খুন করেছ।"

সুলেমান দেবব্রতের কথা শুনে ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "আপনি কী যে বলেন, সাহেবকে আমরা খুন করতে যাব?" দেবব্রত রেগে বলে উঠল, "হ্যাঁ, আমরা তিনজনে তাই বলব, পুলিশ আমাদের কথাই বিশ্বাস করবে, তোমাদের কথা নয়। আর আমার কথা শুনে চললে, তোমরাও বাঁচবে, আমরাও বাঁচব। আর আমি তোমাদের অনেক টাকা দেব।"

সুলেমান দেবব্রতর ধমকানি খেয়ে চুপ করে রইল। নৌকা তখন গঙ্গার মাঝদরিয়ায় আপন খেয়ালে নেচে চলেছে। জোয়ার থেমে গেছে, চলছে ভাঁটার টান। দুপুর আড়াইটার খোলা আকাশের তলায় ডিঙ্গির কেবিনের ছাদে পিনাকী চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। পা দুটো নিচে। দুটো হাত দু'দিকে ছড়ানো। যেন আকাশকে বলছেন, আমি এখন তোমার মতই উন্মুক্ত।

ডিঙ্গিটা বিবেকানন্দ সেতুর উত্তর দিকে প্রায় সাতশ সাড়ে সাতশ মিটার ছাড়িয়ে সারদা ঘাটের কাছে চলে এসেছে। তার চলনে এখন কোনও তাড়াহুড়ো নেই, দিশা নেই। সুলেমান দাঁড় টানা বন্ধ করে দিয়েছে, তার হাত নিঃসাড়। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না, কী করা উচিত তাও তার চিন্তার বাইরে। এমন পরিস্থিতিতে সে কোনও দিন পড়েনি। সাহেব মারা গেছে, তাকে খুন করা হয়েছে। আর যারা খুন করেছে তারা তাকেই ধমকিয়ে বলছে চুপ করে

থাকতে, নয়ত ওরই বিপদ আছে। সে ভাবছে, এই সব লোকেরা সব পারে, ওরা বড়লোক, ওর মত গরীবদের ওরা কুকুর ছাগলের চেয়ে বেশি উঁচু ভাবে না। সে তাই চুপ করে আছে, দেবব্রতর কথার কোনও উত্তর দিতে পারছে না। সে নিজের মনে দেবব্রতর হুকুম তামিল করার কোনও সায় পাচ্ছে না। কিন্তু উপায়ান্তর ওর হাতে নেই। ও পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে। এবং দেবব্রতর আদেশের অপেক্ষা করছে।

দেবব্রত তখন রঞ্জিত আর অমৃতার সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি তাঁদের বলছেন, "শোন, আমি নৌকা উল্টে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। আমরা সাঁতরে উঠে যাব। পিনাকী তলিয়ে যাবে। আমরা বলব, নৌকা উল্টে গেছে, পিনাকী কোথায় হারিয়ে গেছে আমরা জানি না। এ ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই।"

অমৃতা বলে উঠলেন, "তাই কর।" রঞ্জিত চুপ করে মেনে নিলেন। দেবব্রত আবার বললেন, "তোমাদের নেশা হয়েছে, সামলে নাও।" রঞ্জিত বললেন, "আমি ঠিক আছি।"

, দেবব্রত এবার সুলেমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শোন মাঝি, নৌকা উল্টে দাও। আমরা সবাই সাঁতার কেটে পাড়ে যাব। বুঝেছ? পাড়ে গিয়ে সবাইকে বলবে নৌকার মুখ ঘোরাতে গিয়ে উল্টে গেছে, তোমার সাহেব কী করে হারিয়ে গেল তা জানো না।"

সুলেমান চুপ করে শুনল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "এখানেই উল্টাবেন বাবু?"

দেবব্রত গঙ্গার চারদিকটা দেখে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, এখানেই।" তাঁর আর তর সইছে না। সামনে পিনাকীর মৃতদেহটা ওই ভাবে পড়ে আছে, ওটাকে তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। যত তাড়াতাড়ি বিদায় দিতে পারেন তত তাড়াতাড়ি তাঁর উৎকণ্ঠা কমবে। তিনি ভাবছেন, লাশ অতলে তলিয়ে গেলে তিনি মুক্ত, তার হাত পরিষ্কার, তিনি তখন ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কে জানবে যে তিনি পিনাকীকে খুন করেছেন? তাই সুলেমানের প্রশ্নের জবাবে উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, এখানেই।"

তিনি একবারের জন্যও ভাবলেন না তাঁর স্ত্রী এই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মাঝগঙ্গা থেকে সাঁতার কেটে পাড়ের মাটি স্পর্শ করতে পারবেন কি না? যে স্ত্রী সাঁতার জানলেও কোনওদিন গঙ্গায় সাঁতার কাটেননি। সাধারণ পাতলা স্থির জলে সাঁতার কাটা আর গঙ্গার ভারি ও অস্থির জলে সাঁতার কাটা এক নয়। দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ, গঙ্গায় সাঁতার কাটা বিশেষ পারদর্শী ছাড়া সম্ভব নয়। অল্প সময়েই সাঁতারের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হাত আর পা অবশ হয়ে আসে। কিন্তু দেবব্রতর তখন এত কথা চিন্তা করার মানসিকতা ছিল না। তার প্রধান কারণ, একদিকে তিনি নিজে বেঁচে থাকাটা জরুরি বলে ভাবছিলেন তাঁর দুই সন্তানের ভবিষ্যতের চিন্তায়, অন্যদিকে অমৃতাকে তিনি ঘৃণা করতে শুরু করেছিলেন। সুতরাং অমৃতা বাঁচল কি মরল সেটা তাঁর চিন্তায় প্রাধান্য পায়নি।

অন্যদিকে অমৃতা ও রঞ্জিত মদ্যপানের ক্রিয়ার ফলে চিন্তাশক্তি প্রায় বিসর্জন দিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একটাই চিন্তা কাজ করছিল যে, এই ঝামেলা থেকে নিজেদের বাঁচাতে হবে। তাই তাঁরাও দেবব্রতের "হ্যাঁ, এখানেই নৌকা উল্টানোর" প্রতিবাদ না করে নীরবে সম্মতি দিয়ে দিয়েছিলেন।

দেবব্রত আর দেরি করতে রাজি নন, ডিঙ্গিটা নিয়ে কিছুটা পাড়ের দিকে এগিয়ে যেতেই চাইছেন না। তাড়াতাড়ি সুলেমানকে ডেকে ডিঙ্গির পুব দিকে সবাইকে জড়ো করে লাফাতে লাগলেন। একদিকে বেশি ভারি হয়ে যাওয়াতে ও এতগুলো লোক লাফানোর জন্য ডিঙ্গিটা দু'তিনবার দোল খেয়ে পুব দিকে কাৎ হয়ে উল্টে গেল। ওঁরা পাঁচজন ওই মুহূর্তটার জন্য প্রস্তুতই ছিলেন, সবাই সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিলেন।

ওঁরা ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ার পরে পিনাকীর মৃতদেহটাও ঝপ করে জলে পড়ে গেল। সে দিকে কেউ ফিরেও তাকালেন না। অমৃতা কি একবার ফিরে তাকিয়েছিলেন? কে জানে? 'সবাই তখন নিজের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত। সুলেমান আর সাহাদাতের গঙ্গায় সাঁতার কাটাটা বিশেষ কষ্টের না হলেও বাকি তিনজনের কাছে সেটা মোটেই আরামদায়ক নয়। বিশেষ

করে শাড়ি পরিহিতা অমৃতার কাছে। শাড়ি পরে সাঁতার কাটা খুবই কষ্টকর, কারণ শাড়ি বারবার পায়ে জড়িয়ে যায়, ফলে পা দিয়ে জল কেটে এগিয়ে যাওয়া মুশকিল।

পিনাকীর দেহটা আস্তে আস্তে তলিয়ে যেতে লাগল। যে জলকে তিনি খুব ভালবেসেছিলেন, যে জলের সঙ্গে তিনি প্রেম করেছিলেন, সেই জলেই তিনি হারিয়ে গেলেন। একে কি বলা যায় সার্থক প্রেম? এর উত্তর একমাত্র পিনাকীই দিতে পারতেন। কিন্তু নিস্পন্দ পিনাকীর শরীর যখন গঙ্গার তল স্পর্শ করল, তার অনেক আগেই তিনি সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বাইরে। ঊনসত্তর সালে আন্দামান অভিযানের পথে কলকাতা থেকে একশ পঁচিশ মাইল অতিক্রম করার পর তিনি বার্তা পাঠিয়েছিলেন, “নদী শেষ হয়ে গেছে। আকাশের গায়ে মিশে গেছে শেষ তটরেখা। শুধু জল আর জল। কেমন যেন মনে হচ্ছে। অনেক পেরিয়ে এসেছি, হয়ত এমনিভাবেই পেরিয়ে যাব—-দূরের সকলকে। ”

হ্যাঁ, তিনি চব্বিশে সেপ্টেম্বরের সেই শনিবারের দুপুরে কাছের দূরের সবাইকে পেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর রাস্তা পার হওয়ার পেছনের নাটক তখনও অজানা।

ডিঙ্গি উল্টে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার চারদিক থেকে একটা হই হই রব উঠল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জেলে-ডিঙ্গির মাঝিমাল্লারা চিৎকার করে উঠল। শুধু চিৎকার করেই তারা থেমে থাকল না। থেমে থাকায় তারা বিশ্বাসী নয়, তাদের জলজীবনের ধর্মে নেই। তারা তাদের নৌকা নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল উল্টে যাওয়া ডিঙ্গির আরোহীদের উদ্ধার করার জন্য।

দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটি ঘাটের কাছে নিজেদের নৌকার ছইয়ের ভেতর সবে দুপুরের ভাত খেতে বসেছিল কালীচরণ ও শোভনাথ। হইহই চিৎকারের উৎস খুঁজতে তারা ছইয়ের বাইরে উঁকি দিয়ে দেখল, গঙ্গায় একটা ডিঙ্গি উল্টে তার আরোহীরা জলে পড়ে গেছে। দেরি নয়, ওরা ভাত ফেলে নৌকার বাঁধন খুলে ছুটিয়ে দিল উদ্ধারের উদ্দেশে। ভাত পড়ে রইল ভাতের মতো। আগে মানুষের জীবন, তারপর বাকি সব কিছু।

যত দ্রুত পারল মাঝিরা তাদের নৌকা নিয়ে পৌঁছে গেল, খাবি খাওয়া অমৃতাদের কাছে। সুলেমান আর সাহাদাত ছাড়া বাকি প্রত্যেকেই খাবি খাচ্ছেন। বিশেষ করে অমৃতা।

উদ্ধারকারীর দল ওঁদের পাঁচজনকে উদ্ধার করে নিজেদের চার পাঁচটা নৌকায় তুলে নিল। তারপর উল্টে যাওয়া পিনাকীর ডিঙ্গিটাও সোজা করে নিয়ে কালীচরণ তার নৌকার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলল পাড়ের দিকে। তরী এসে ভিড়ল মাড়ার ঘাটে সেখানে পিনাকীর ডিঙ্গি ওরা ঘাটের রশির সঙ্গে বেঁধে দিল। ওটা আবার যথারীতি ঢেউয়ের তালে তালে যেমন নাচার নাচতে লাগল। ওর মনিব যে গঙ্গার মাঝবুকে তলিয়ে গেছে, সেটা উদ্ধারকারী দলের কাউকে অমৃতারা জানাল না। মাঝিরা যে যার কাজে চলে গেল। পাড়ে তুলে দিয়েছে, ওদের কাজ শেষ।

দেবব্রত পাড়ে সমবেত জনতার কাছ থেকে জেনে নিলেন, ওই পাড়ের অঞ্চলটা বেলঘরিয়া থানার অধীনে। তিনি রঞ্জিতকে ডিঙ্গি পাহারায় রেখে অমৃতাকে নিয়ে একটা টানা রিক্সায় ছুটলেন বেলঘরিয়া থানার দিকে।

আলুথালু বেশে ভেজা কাপড়ে ওঁদের দেখে বেলঘরিয়া থানার উপস্থিত সবাই প্রথমে থ। তারপর ওঁদের কাছে পিনাকীর নিখোঁজ হওয়ার বার্তা শুনে আরও আশ্চর্য হয়ে গেল। ভাবল, পিনাকীর মতো ওস্তাদ সাঁতারু কীভাবে জলের তলায় নিখোঁজ হয়ে যাবেন? যেখানে অর্বাচীনেরা বেঁচে ফিরে এসেছেন? নিশ্চয়ই উল্টে যাওয়ার সময় তাঁর ঘাড়ে, বুকে বা মাথায় কোনও আঘাত লেগে তিনি সাময়িকভাবে জ্ঞান হারিয়েছেন আর তাতেই বিপত্তি। থানা থেকে লোক ছুটল গঙ্গার তীরে। অন্ধকার। গঙ্গার বুক জুড়ে তখন অন্ধকার। শুধু দু'পাশে এলোমেলো ছড়ানো ছেটানো নৌকাগুলোর ছইয়ের ভেতরের ছোট ছোট লণ্ঠন থেকে যেটুকু আলো দয়া করে গঙ্গার জলে ছিটকে পড়েছে, তাতেই যা কিছু দেখার দেখ। তাতে কি হয়?

বেলঘরিয়া থানার লোকজন তাদের সঙ্গে আনা বড় বড় টর্চ জ্বালিয়ে গঙ্গার বুকের

এদিক ওদিক দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু কোথায় কী? কোনও মানুষের চিহ্নই তাদের আলোর রেখায় ধরা দিল না। ক্রমাগত তারা হতাশ হতে থাকল। উদ্ধারকারী মাঝিমাল্লারা ততক্ষণে জেনে গেছে, তারা পাঁচজনকে উদ্ধার করলেও একজন নাকি তলিয়ে গেছে। তিনি না কি ওস্তাদ লোক ছিলেন। তারাই বেলঘরিয়া থানার লোকজনকে বলল, "না বাবু, আর কোনও লোককে আমরা দেখি নাই। দেখলে, এতক্ষণে আমরা লইয়া আইতাম।"

তাদের বক্তব্য শুনে থানার লোকজন হতাশ হল। তারা রঞ্জিত, সুলেমান ও সাহাদাতকে নিয়ে থানায় ফিরে এল।

পিনাকীর বাড়ির লোকজনকে ততক্ষণে খবর দেওয়া হয়ে গেছে। বাড়ি থেকে এসেছেন আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব। তাঁরাও ভেবে পেলেন না, কী করে পিনাকীর মতো একজন সাহসী অভিযাত্রী এভাবে ডুবে যান। নিশ্চয়ই তিনি ডিঙ্গি উল্টে যাওয়ার সময় এমন আঘাত পেয়েছেন যে তিনি সংজ্ঞা হারিয়েছেন, ফলে আর উঠতে পারেননি। সেটা খেয়াল করার মতো অবস্থা তাঁর সঙ্গীদের নিশ্চয়ই ছিল না।

সুলেমান জানাল, কলকাতায় ফিরে যাওয়ার জন্য নৌকার মুখ দক্ষিণ দিকে ঘোরানোর সময় হঠাৎ টাল খেয়ে নৌকাটা উল্টে যায়। তখন সাহেবের কোনও আঘাত লেগেছে কিনা সে সেটা দেখতে পায়নি। সে চেষ্টা করছিল নৌকা ঠিক রাখার, কিন্তু সেটা হঠাৎ দুলে উঠে উল্টে গেল। বাড়ির লোকজন অমৃতাদের নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। তারপর আমাদের পালা।

কলকাতা মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন পুলিশ মর্গে ডাঃ মুখোপাধ্যায় পোস্টমর্টেমের যে রিপোর্ট দিলেন, তাতে তিনি পরিষ্কার করে বললেন, হোইডবোনে চাপ দেওয়াতেই পিনাকীর মৃত্যু হয়। এর একটাই অর্থ, তাঁকে খুন করা হয়েছে এবং খুনের প্রমাণ লোপাট করার জন্যই খুনী তার মৃতদেহটাকে গঙ্গার বুকে ডুবিয়ে দেওয়ার উদ্দেশে নৌকা উল্টানোর সাজানো নাটকটা করেছে।

তিরিশে সেপ্টেম্বর দেবব্রতদের গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে আসার পর প্রথমে সাহাদাতের কাছ থেকে জানা গেল সেই নাটকের পরপর দৃশ্যগুলো । এবং সাহাদাতের বিবৃতি ও ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্ট এর সাথে মিলে গেল।

ফরেনসিক দপ্তরে পিনাকীর ডিঙ্গির কেবিন থেকে পাওয়া খালি যে মদের বোতলগুলো পরীক্ষার জন্য পাওয়া গেল, সেই সব বোতলের মধ্যে দুটো বোতলে ঘুমের ওষুধের নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। অর্থাৎ পিনাকীরা মদের সঙ্গে নেশার ঘোর আরও তীব্র করার জন্য মাঝে মধ্যে ঘুমের বড়ি মিশিয়ে খেতেন। তবে সেদিন তাঁরা খেয়েছিলেন কি না তা জানা গেল না। আর রঞ্জিত গ্লাসে গ্লাসে মদ ঢেলে দিয়েছিলেন, যদি অমৃতাদের মদে ওঁদের অজান্তে ঘুমের বড়ি ভদকার সঙ্গে মিশিয়ে থাকেন, তবে তা পিনাকীরও অজানা থাকার কথা নয়। কারণ ওঁরা দুজনে মিলে বাজার সেরেছিলেন এবং ওঁরা দুজনেই প্রথম মদ্যপানের উদ্দেশে কেবিনের ভেতরে প্রবেশ করেন। যদি তাই হয় পিনাকী ভাল মতোই জানতেন যে, অমৃতা ও দেবব্রতকে মদের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং নিজেও একই মদ পান করছেন।

তিরাশি সালের ছাব্বিশে ডিসেম্বর দেবব্রত, অমৃতা ও রঞ্জিতের বিরুদ্ধে আমাদের তরফ থেকে ওই মামলার তদন্তকারী অফিসার সরোজ ভট্টাচার্য আদালতে চার্জশিট দাখিল করল।

অনেক টানা হেঁচড়ার পর পঁচাশি সালের নয়ই মে নগর দায়রা আদালতের তৃতীয় বেঞ্চে মামলা শুরু হল। কিন্তু দেবব্রতর তরফে নামকরা দুঁদে আইনজীবীরাও চোদ্দ দিন ধরে টানা জেরা করে আমাদের সাক্ষী সাহাদাতের মুখ থেকে কোনও অসংলগ্ন কথা বার করতে পারলেন না।

আদালত ছিয়াশি সালের আটাশে ফেব্রুয়ারি দেবব্রতকে পিনাকী খুনের দায়ে আট বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন। কিন্তু আইনের ফাঁক দিয়ে খুনের সাক্ষ্য প্রমাণ লোপাট করার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত অমৃতা ও রঞ্জিত গলে গেলেন। তাঁদের কোনও সাজা হল না।

অবশ্য আদালত থেকে অমৃতার সাজা না হলেও অন্যভাবে সাজা হয়েছিল তাঁর দুই সন্তানের। অমৃতাদের গ্রেফতারের পর পত্রপত্রিকায় পিনাকী হত্যার পেছনের দৃশ্যাবলি উল্লেখ করতে গিয়ে পিনাকীর ও অমৃতার সম্পর্কের কথা বহুভাবে লেখা হয়েছিল। আর সেইসব খবর গিলে খেয়েছিল প্রত্যেকেই, তার মধ্যে অমৃতার দুই সন্তানের বন্ধুবান্ধবরাও ছিল। তারা সেই খবরের ভিত্তিতে ওই শিশু দুটোর উদ্দেশে প্রতি মুহূর্তেই টীকাটিপ্পনী ও তির্যক মন্তব্য ছুঁড়ে দিত। অবস্থা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে তারা স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হল।

এই সাজাটা কি তাদের প্রাপ্য ছিল? চরম মানসিক যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা ওই শিশুদের পাওয়ার কথা ছিল? মোটেই নয়। দোষ যা করেছেন তা তাদের বাবা এবং মা, বিশেষ করে মা। সন্তানের মা হয়ে তাঁর যে সংযমের প্রয়োজন ছিল তা তিনি দেখাতে পারেননি। আর তাঁর সেই বাঁধ ভাঙার জন্যই অসহায় শিশু দুটোকে অসহ্য মানসিক কষ্টের মধ্যে দিন গুজরান করতে হয়েছে। যারা ওই শিশুদের যন্ত্রণা দিয়েছিল, এটা তাদেরও বোঝা উচিত ছিল।

হয়তো দেখা যাবে যারা ওই শিশু দুটোকে উদ্দেশ্য করে টিপ্পনী কাটত তাদের পিতামাতারাও একই দোষে দুষ্ট, কিন্তু কোনও ঘটনা বা দুর্ঘটনার মাধ্যমে তাদের চরিত্রের অন্ধকার দিকটা উলঙ্গ হয়ে পড়েনি। তাই তারা অবাধে ওদের যন্ত্রণা দিয়ে যেতে পেরেছে। অমৃতাও কি আগে বুঝেছিলেন, তাঁর গোপন অভিসার ওইভাবে অতর্কিতে সমাজের কাছে প্রকাশ পেয়ে যাবে? যদি ক্ষণিকের জন্যও বুঝতে পারতেন তিনি অবশ্যই সতর্ক হয়ে যেতেন। অন্তত সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে।

অথচ কত হাজার অমৃতা, পিনাকী আমাদের সমাজের প্রতি কোণে কোণে লুকিয়ে তাদের বিকৃত যৌন ক্ষুধার তাড়নায় প্রতিনিয়ত ছুটছে, কে তার সংখ্যা নির্ধারণ করতে পারবে? কেউ না, যতক্ষণ না কোন দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে সেই গোপনীয়তা সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, ততক্ষণ সেটা পর্দার আড়ালেই থেকে যায়।

দুর্ঘটনার সংখ্যাই বা কত? অতি নগণ্য। আর কত অদ্ভুতভাবেই না দুর্ঘটনাগুলো ঘটে। আমি তখন বড়বাজার থানায়। রাতের ডিউটি। থানায় বসে আছি। রাত তখন প্রায় দেড়টা দু'টো হবে। হঠাৎ বেশ হই হই করে দশ বারজন লোক একটা পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের অবাঙ্গালী যুবককে ধরে নিয়ে এসেছে। ছেলেটার নাক মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। একটা চোখ আঘাতের চোটে ফোলা। যারা ধরে নিয়ে এসেছে তারাও অবাঙ্গালী। দেখে ভাবলাম, বোধহয় কোনও ছিঁচকে চোর ওদের হাতে ধরা পড়ে মার খেয়েছে, তারপর লোকগুলো থানায় ওকে জমা দিতে এসেছে। ধৃত ছেলেটার রক্তমাখা মুখের দিকে তাকিয়ে চেনার চেষ্টা করলাম। বহু চোর তো ধরা পড়ে, সেইরকম এই যুবকটি কি না। না, ওকে চিনতে পারলাম না। বোধহয় নতুন এই লাইনে।

ততক্ষণে ওই লোকগুলো বেশ গলা উঁচিয়ে যুবকটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শুরু করেছে। অভিযোগ চুরির নয়। অভিযোগ, যুবকটি এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাকে বলাৎকারের চেষ্টা করেছিল।

লোকগুলো বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে আনেনি। অথচ তার বয়ানটাই এই ক্ষেত্রে আসল। বললাম, “ওই ভদ্রমহিলাকে কাল সকালে নিয়ে আসবেন, তার বিবৃতিটা দরকার।” লোকগুলো ছেলেটাকে রেখে চলে গেল। আমি ধৃত যুবকটির দিকে তাকালাম। যুবকটি ততক্ষণে হাঁপাতে হাঁপাতে আমার টেবিলের সামনে মেঝেতে বসে পড়েছে। এক বৃদ্ধাকে বলাৎকার করতে গিয়েছিল বলে আমার মনেও ওর প্রতি একটা ঘৃণা ততক্ষণে জন্মে

গিয়েছিল। আমি তাই ওকে প্রাথমিক চিকিৎসা করার আগেই খেঁকিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, "এই কী করতে গিয়েছিলি, বল?" যুবকটা আমার খেঁকিয়ে ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলে হিন্দিতে বলল, "বিশ্বাস করুন, আমি ওকে কিছু করতে যাইনি।" আমি আবার খেঁকিয়েই বললাম, "তবে কাকে করতে গিয়েছিলি?"

সে চুপ করে গেল আর মাথা নিচু করে কাঁদতে লাগল। আমি ততক্ষণে ধৈর্য হারাচ্ছি। চিৎকার করে বললাম, "এটা কান্নার জায়গা নয়, সত্যি কথা বল, সত্যি না বললে তোকে শালা আমি আবার মারব।"

ভয় পেয়ে যুবকটা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "বলছি স্যার।"

আমি অপেক্ষা করলাম। তারপর সে আমাকে একটা বয়ান দিল।

পরদিন সকালে ওই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার বিবৃতি শুনলাম। যার ওপর যুবকটি বলাৎকার করতে উদ্যত হয়েছিল বলে অভিযোগ। এবং সেই জায়গায় গিয়ে পরিদর্শন করে এলাম, যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে।

তদন্ত শেষে বুঝলাম, যুবকটি আমাকে মিথ্যা বয়ান দেয়নি। ঘটনাটা যেখানে ঘটেছিল, সেটা একটা বড় বাড়ির বিরাট ছাদ। সেই ছাদের একদিকে আড়াআড়িভাবে তিন ইঞ্চির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছোট পরিসর। সেই পরিসরের নিচের একটা ঘরে একটা পরিবার থাকে। স্বামী, স্ত্রী ও তাদের একমাত্র ছোট্ট ছেলে। ঘরের সামনে এক ফালি বারান্দা। বারান্দার এক কোণে তাদের রান্নাঘর এবং অন্যদিকে বারান্দার বাইরে একটা সিঁড়ি ছাদে উঠে গেছে। যেটা দিয়ে ছাদের ওই ছোট ঘেরা পরিসরেই যাওয়া যায়। সেখানে ওই পরিবারের গৃহবধূ তার বাড়ির কাপড় চোপড় শুকাতে দেয়। তার জন্য অনেকগুলো দড়ি টাঙানো আছে।

আর ওই পরিসরে ওই বাড়ির গৃহবধূ গরমকালে রাত্রিবেলা বিছানা সাজিয়ে শোয়। রাতে ছাদে উঠে সে ছাদের দিক থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়। যাতে নিচ থেকে কোন অবাঞ্ছিত লোক ছাদে উঠে তার ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটাতে পারে। তার স্বামী তাদের ছেলেকে নিয়ে ঘরেই রাত্রিযাপন করে। এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হয়নি গত দু'তিন বছর ধরে।

গৃহবধূ তার বিছানা সাজিয়ে শোওয়ার পর পাশের সংলগ্ন ছাদ থেকে কার্নিশ বেয়ে উঠে আসে ওই ধৃত যুবকটি। এবং ওই গৃহবধূর সঙ্গে একই বিছানায় রাত প্রায় তিনটে পর্যন্ত যৌনক্ষুধা মেটানোর পর যুবকটি ফিরে যায় নিজের ঘরে। এভাবে চলছিল ভালই। কেউ টের পায়নি।

কিন্তু ধরা পড়ার দিন ঘটল অন্য ঘটনা। সেদিনই সন্ধেবেলা গৃহবধূর মা তার দেশের বাড়ি থেকে এসেছেন মেয়ের বাড়িতে। তিনি ক'দিন ওই বাড়িতেই থাকবেন। রাতে যখন শোওয়ার পর্বের আয়োজন শুরু হল, বৃদ্ধা তাঁর মেয়েকে বললেন, তিনি রাতে ছাদে শোবেন, মেয়ে ঘরে স্বামীর সঙ্গেই থাক। তিনি মেয়ের মৃদু আপত্তি না শুনে ছাদে উঠে গিয়ে বিছানা সাজিয়ে শুয়ে পড়লেন। দরজার ছিটকিনি আটকানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না। গৃহবধূটি তার প্রেমিককে সাবধান করার কোনও সুযোগই পেল না।

যুবকটির নাম গান্ধী। সেই গান্ধী এই পরিবর্তনের কিছুই জানতে পারল না। সে যথারীতি ঠিক সময়ে কার্নিশ বেয়ে ওই পরিসরে হাজির। কোনও কিছু না দেখেই সে নিদ্রিত বৃদ্ধাকে অন্ধকারে তার প্রেমিকা ভেবে তার শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘুমন্ত বৃদ্ধা এই রকম অতর্কিত আক্রমণের জন্য বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলেন। তাঁর তারস্বর চিৎকারে যুবকটি বুঝল সে একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে। সে পালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা যুবকটিকে জাপটে ধরে চিৎকার করতে লাগলেন।

বৃদ্ধার চিৎকারে প্রথমে তাঁর জামাই, তারপর বাড়ির অন্য লোক খোলা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। গান্ধী ধরা পড়ে গেল। তারপর মার এবং থানায় জমা।

অর্থাৎ সেই রাতের ওই অসতর্ক ঘটনা না ঘটলে যুবক ও তার প্রেমিকার রাতের লীলা

কেউ জানতে পারত না। অথচ পরদিনই গৃহবধূটি তার প্রেমিককে সাবধান করে দিত, এবং সেও আর অভিসারে আসত না। এমনই হয়।

যেমন ঘটেছিল অমৃতা ও পিনাকীর জীবনে। নেশাগ্রস্ত পিনাকী যদি অমৃতাকে টেনে তাঁর জঙঘায় না বসাতেন, দেবব্রতও সাহস পেতেন না পিনাকীর গলা টিপে ধরার এবং পরিণতিতে পিনাকীর মৃত্যু ঘটানোর। আর সেই দুর্ঘটনা না ঘটলে পিনাকী ও অমৃতার গোপন প্রেমও আলোতে না এসে চির অন্ধকার বৃত্তেই ঘুরপাক খেত। আর তার ফলে দুটো সংসার ছারখারও হয়ে যেত না এবং অমৃতার সন্তানদের তীরবিদ্ধ পাখির মতো যন্ত্রণায় কাতর হতে হতো না।

সাজা পাওয়ার পর দেবব্রত ওই রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতার উচ্চ আদালতে আপিল করলেন। তিনি উচ্চ আদালত থেকে জামিনও পেয়ে গেলেন। কিন্তু এমনই পরিহাস, তাঁর আপিলের শুনানীর আগেই জামিনে মুক্ত থাকা অবস্থাতেই তিনি অকালে মারা গেলেন।

অমৃতার জীবনে চারদিকে হাহাকার। তিনি তাঁর সপ্তপর্ণীর ফ্ল্যাট বিক্রি করে অন্যত্র চলে গেলেন। পালিয়ে গেলেন। কিন্তু পরিচিত জনের গণ্ডি ছাড়িয়ে চলে গেলেই কি তিনি শান্তিতে বাঁচতে পারবেন? কী করে তিনি নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচবেন? কার কাছে চাইবেন নিজের এই পরিণতির কৈফিয়ত? কাকে তিনি দায়ী করবেন? নিজেকে ছাড়া কাউকে না। নিজের মিঠে জীবনের নদী ছেড়ে তিক্ত তরীতে ভেসে তিক্ত বাকি দিনগুলো তাঁকে অতিক্রম করতে হবে।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেও তিক্ত তরীতে ভেসে সত্তর দশকের দিনগুলো কাটাতে হয়েছিল। সেই তেতো ছিল সন্ত্রাসবাদীদের তেতো। সব সন্ত্রাসবাদী দলের মতো তারাও মিঠে জীবনের আশ্বাস দিয়ে শুরু করেছিল নিখাদ সন্ত্রাসবাদ। সেই সন্ত্রাসবাদের তীব্রতা সত্তর থেকে বাহাত্তর সাল পর্যন্ত অতিমাত্রায় থাকলেও তার রেশ প্রায় পুরো দশকটা ছিল। কমিউনিস্ট আদর্শের ঝাণ্ডা ওড়ানো সেই সন্ত্রাসের দিনগুলো পরবর্তী প্রজন্মের নাগরিকদের কারও পক্ষে অনুভব করা বোধহয় সম্ভবও নয়।

আদর্শ এক জিনিস আর সেই আদর্শকে সঠিক পথে দীর্ঘ দিন পরিচালনা করা একেবারে অন্য জিনিস। তার জন্য যে প্রস্তুতি, ধৈর্য, পারদর্শিতা, দক্ষতা, নমনীয় কৌশল, সুচিন্তিত নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা, সংগঠন তৈরী, এবং আদর্শ ও নীতিতে অবিচলিত থেকে তাকে পরিচালনার দৃঢ়তা থাকার দরকার, তার কোনটাই নকশালপন্থী পার্টির নেতাদের করায়ত্ত ছিল না। ফলে, এত ঘাটতি নিয়ে যা হওয়ার সেই পরিণতিই হয়েছে, তা হল সন্ত্রাসবাদ।

অবশ্য অন্ধ, ভাবালু পথের পথিকরা সেটা মানবে না। না মানুক, তাতে অবশ্য ইতিহাসের কিছু যায় আসে না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সত্তর বাহাত্তরের নকশালপন্থীদের কার্যকলাপ কিন্তু সন্ত্রাসবাদী ইতিহাস হিসাবেই চিহ্নিত থাকবে, খুব জোর তার আগে লেখা হতে পারে 'কমিউনিস্ট পার্টির' সাইনবোর্ড লাগানো আর একটি সন্ত্রাসবাদী নেতিবাচক প্রয়াস।

নির্ভেজাল সন্ত্রাসবাদী প্রয়াসের সেই কালো দিন ও তার কার্যকলাপগুলো বর্তমানে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু লোক ভুলে যেতেই শুরু করেছে শুধু নয়, তাকে গৌরবান্বিত করতে সচেষ্ট হয়েছে।

তারা এমন ভাব করছে যেন সাধারণ কিছু মানুষ ও পুলিশ খুন করে তারা কি মহান কাজটাই না করেছে, ভারতবর্ষকে আলোর পথে কত না আলোকবর্ষ এগিয়ে দিয়েছে।

সেই মহান প্রচেষ্টার কার্যকলাপের দৃষ্টান্ত আগামী দিনের ইতিহাসবিদদের জন্য আগে কিছুটা লিপিবদ্ধ করেছি, আরও কিছু জানিয়ে রাখছি। পরবর্তী যুগের কোনও সত্যানুসন্ধানী গবেষকের ওই ঘটনার বিবরণগুলো গবেষণার কাজে আসতে পারে।

তবে স্কুল কলেজ আক্রমণ, মনীষীদের মূর্তি ভাঙা, বই পোড়ানো কিংবা সাধারণ বোমাবাজির নিত্যদিনের ঘটনার বিবরণ আর দিচ্ছি না। শুধু এটুকু খেয়াল রাখলেই চলবে যে, চারুবাবুর শিক্ষায় শিক্ষিত বিপ্লবীদের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মত্ততায় পশ্চিমবাংলায়, বিশেষ করে কলকাতার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল, কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই তাদের আক্রমণের হাত থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে, স্বাভাবিক কাজকর্ম চালাতে পারেনি। ছাত্রছাত্রীদের স্বভাবতই দিশাহারা উদভ্রান্তের মতো তাদের শিক্ষার লক্ষ্যে এদিক ওদিক ছুটতে হয়েছে।

এখানে শুধু সেই ঘটনা ক'টি বলব যেসব ঘটনায় রক্তপাত এবং অযথা জীবনহানি হয়েছে। প্রশ্ন একটাই, কোন অভীষ্টে আমরা এই রক্তহানির পর পৌঁছেছি? এটা ঠিকই, ভারতবর্ষের ঘুমপাড়ানি কমিউনিস্ট এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে সামন্ততন্ত্র ও বিদেশী পুঁজি এবং তাদের রাজনৈতিক পার্টির দালালরা সমাজ, দেশ ও সাধারণ মানুষের অবস্থান সবদিক দিয়েই একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন এবং ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। এবং সেই সামাজিক অবস্থানই সার্বিকভাবে দায়ী সমস্যার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। আশু পথ-সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টির। কিন্তু তার অর্থ এই নয়, সেই সন্ত্রাসবাদের তত্ত্বকে প্রত্যেকে মাথায় নিয়ে নাচার।

এমনকি আগামী দিনেও যখন সন্ত্রাসবাদ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, তখনও তাকে

মদত দেওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে না। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে কোথাও, কোনও দেশে মুক্তি আসেনি, আসবেও না। আর আমাদের দেশে আরও ব্যাপকভাবে যে সন্ত্রাসবাদ বিভিন্ন আকার, বর্ম এবং আদর্শের নামাবলী চাপিয়ে আক্রমণ হানবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো এবং সেই সব দলের নেতারা দেশটাকে সেদিকেই নিয়ে যাচ্ছে।

অন্ধকার, হতাশা, নৈরাশ্য, আদর্শহীনতা, জাল, চুরি-জোচ্চুরি, কালোবাজারী, শোষণ ছাড়া আমাদের আর আছে কী? আর এখানেই বারবার জন্ম নেয় সন্ত্রাস। হতে পারে সেখানে নেতৃত্বে থাকবেন কোনও রণদিভে কিংবা চারু মজুমদার বা ভিন্দ্রেনওয়ালা, প্রভাকরণ অথবা গোলাপ বরুয়া, ব্যাপারটা একই। আর সেজন্য যে দেশের ভোগী নেতা নেত্রীরা একশ ভাগ দায়ী, সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই।

উনিশশো সত্তর সালের পর একাত্তরে চারুবাবুর দল যে সন্ত্রাসের নমুনা রেখেছিল, তারই আংশিক কিছু বিবরণ এবার আঁকছি, শুধুমাত্র একাত্তরের কলকাতা শহরের ক্যানভাসটা কেমন হয়েছিল তাঁর একটা ধারণা দেওয়ার জন্য।

একাত্তরের সাতই জানুয়ারির শীতের সকাল। নকশাল আন্দোলনের অন্য শীতের সকালের মতো সেদিনও ছিল আর একটা ভয় জড়ানো, সন্ত্রস্ত, সন্দেহবাতিকগ্রস্ত সকাল।

রাতের আলো সরে ভোর হলেই যে গভীর জঙ্গলের বন্যরা নিজ নিজ গুহায় গিয়ে রাতের খাটাখাটনির জন্য ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেবে, এমন কোনও নির্দেশ কোনও ধর্মগ্রন্থে দেওয়া নেই। সুতরাং সুযোগ পেলেই তারা তাদের খাদ্যবস্তু বা লক্ষ্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই দুর্বলেরা সবসময়ই সজাগ থাকে নিজের জীবন রক্ষার জন্য। কিন্তু কেউ কেউ থাকে যারা প্রতিনিয়ত সাবধানতার আড়াল বজায় রাখতে পারে না, আলস্যে কিছুটা আলগা হয়ে যায়। আর ঠিক সেই সময়ই আসে বিপদ।

শ্যামপুকুরের সি.পি.আই.(এম) পার্টির কর্মী বাবলু দাস ছিল নকশালদের লক্ষ্য। ওর একটাই দোষ, এলাকার কিছু নকশালদের বিরুদ্ধে ও ওর বিদ্বেষ অযথা খোলাখুলি ঘোষণা করত। এবং সে নকশালদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার সি.পি.আই.(এম) পার্টির 'বিপ্লবী' সংঘর্ষে অংশ নিয়েছিল।

সেদিন সকাল এগারটা নাগাদ, বাবলু গালিফ স্ট্রিট ট্রাম ডিপোর কাছে প্রতিদিনের মতো আড্ডা মারতে এল। বেলগাছিয়া আঞ্চলিক কমিটির নকশালরা ওঁর জন্য আগের থেকেই যে ওঁত পেতে আছে ও তা টেরও পেল না। বাবলু আসার সঙ্গে সঙ্গে নকশালরা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে ট্রাম ডিপোর পাশের এক গলিতে টানতে টানতে নিয়ে গেল। বাবলু নিজেকে বাঁচাবার জন্য ত্রাহি স্বরে চেঁচাতে লাগল, কিন্তু কোনও দুঃসাহসী সাহায্যকারীই ওকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে এল না। নকশালরা ওকে টেনে নিয়ে ওর বুকে পেটে ছুরি মেরে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে স্লোগান দিতে দিতে চলে গেল। শ্যামপুকুর থানার পুলিশ গিয়ে বাবলুকে তুলে আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করে দিল।

দশই জানুয়ারি ইন্টালির কামারডাঙ্গার সাত নম্বর রেলওয়ে কোয়ার্টারের সুইপারদের একটা ঘর থেকে সকাল আটটা নাগাদ বোমার বিকট আওয়াজ এল। খবর পেয়ে ইন্টালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখল, ফেরার নকশাল খোকন ওরফে অরুণ হালদার বোমা বানাতে গিয়ে অসতর্কতায় ফাটিয়ে ফেলেছে আর ওর দুটো হাত শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ওর তিন সঙ্গীর শরীরেও বোমার টুকরো ঢুকেছে, কিন্তু তারা কোনও মতে ওকে ফেলেই ওই ঘর থেকে পালিয়ে গেছে। বোমার ধাক্কায় ঘরের দরজা জানালা উড়ে চলে গিয়েছিল, তখন যাতায়াতের অবাধ গতি। কিন্তু আশেপাশের কোনও লোক ভয়ে ওকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। নকশালরা যতই ভাবুক তারা জনগণের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করছে, ঘটনা কিন্তু তা নয়, তাহলে তো তারা খোকনকে উদ্ধার

করত। কিন্তু করল না।

সেই আমাদেরই পুলিশ খোকনকে এবং তার উড়ে যাওয়া দুটো হাতের অংশ নিয়ে ছুটল চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে।

সেখানে শুয়ে শুয়ে হয়ত খোকন ভাবত, তার আর পুলিশকে বোমা মেরে বিপ্লব করা এ জীবনে হল না।

চৌদ্দ তারিখে গোপন খবর পেয়ে লালবাজারের নকশাল দমন শাখার অফিসাররা রাত দু'টো নাগাদ হানা দিলাম চিৎপুর থানার শ্রীশ চৌধুরি লেনের সতের নম্বর বাড়িতে। সেখানে নকশালদের উত্তর কলকাতার শাখার একটা বৈঠক ছিল। গলির মুখে গাড়ির আলো নিভিয়ে আমরা অফিসার ও কনস্টেবল মিলে দশ বার জন নামলাম। প্রত্যেকেই সাধারণ পোশাকে, সোয়েটার মাফলার জড়িয়ে। গলিটা অন্ধকার। যা নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শীতের মধ্যেও কয়েকটা রাস্তার কুকুর গা ঝাড়া দিয়ে অপরিচিত লোক দেখে চিৎকার করে নিজেদের অবস্থান ও প্রতাপ প্রদর্শন করতে লাগল। এগুলো আমাদের গা সওয়া। আমরা জানি, ওদের বীরত্ব ওই গলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শুধু আশঙ্কা, ওদের অন্ধকার চিড় ধরা চিৎকারে নকশালরা না সতর্ক হয়ে পালিয়ে যায়। তাছাড়া নকশালরা রাতে যেখানে আত্মগোপন করে থাকে, সেখানে সাধারণ একজনকে পাহারাদার রেখে দেয় এবং সে গোপন জায়গায় বসে অনেকদূর পর্যন্ত নজর রাখে, সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই তার ঘুমন্ত কমরেডদের জাগিয়ে দেয়।

অনেক সময় সেই পাহারাদারও বেশি রাতে পাহারা দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু হঠাৎ রাস্তার কুকুরের চিৎকারে ওদের আধা জাগরণ আধা ঘুমটা ভেঙে যেতে পারে। ওরা সজাগ হয়ে উঠে সতর্ক নজর দেবে এবং সন্দেহ হলেই নিজের কাজে ব্রতী হবে। তাই কুকুরের চিৎকারের জন্য আমাদের ভয়টা ছিল কুকুরের জন্য নয়, ব্যর্থতার আশঙ্কায়।

সতের নম্বর শ্রীশ চৌধুরি লেনের বাড়িটা আমরা ঘিরে ফেললাম। আশেপাশে কোনও পাহারাদারকে দেখলাম না। বাড়িটা পুরনো এবং পরিত্যক্ত। ভেতরটা অন্ধকার। মোটা মোটা কাঠের কপাটের ফাঁক দিয়ে আলোর কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। শীতের রাতে সব কপাটই বন্ধ। বাইরের শিকের তলায় অনেক জায়গায় পলেস্তারা খসে গিয়ে দাঁত বার করে শিকগুলো দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে কয়েকটা উধাও। নিশ্চয়ই সেগুলোর জায়গা হয়েছে কোনও কালোয়ারের গুদামে। বাড়ির সদর দরজায় কোনও কপাট নেই। হাঁ করে খোলা, ছোট্ট একটু উঠোন। সেটা পেরিয়ে ঘরে ঢোকার দরজায় আমি হাত দিলাম।

আমার খবরদাতার খবরের সঙ্গে হুবহু মিল। মনে মনে ওর তারিফ করলাম। এবার আসামীদের গ্রেফতার করলেই আমাদের সিদ্ধিলাভ। অন্ধকারে দরজায় হাত দিয়ে আমি চাপ দিলাম। আমার থেকে তিন চার হাত দূরত্বে কনস্টেবল অসিত দাস। ওর বাঁ হাতে একট বড় টর্চ। ডান হাতে রিভলবার। আমার বাঁ হাতটা ফাঁকা। ডান হাতে যথারীতি রিভলবার।

দরজাটা আমাদের দুজনকে অবাক করে ক্যাচক্যাচ শব্দে খুলে গেল। দরজাটা খুলে যেতেই আমি দরজা থেকে সরে দেওয়ালের দিকে পিঠ করে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এক হাত খোলা একটা লম্বা ছুরি সাঁই করে দরজা দিয়ে বাইরে বার হয়ে এল।

আমি যদি সরে না আসতাম, তবে নির্ঘাৎ সেটা সরাসরি আমার পেটের মধ্যে জায়গা করে নিত। অসিত বেশ খানিকটা দূরে, দরজা খোলার সঙ্গেই সে টর্চ জ্বেলে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিয়ে দিয়েছে। টর্চের তীব্র আলোয় সে খোলা ছুরির লম্বা ফলা সমেত অর্ধেক খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে একটা লম্বা হাতার সোয়েটার পরা অল্পবয়সী তরুণের শরীরের খানিকটা অংশ দেখে নিয়েছে। হাতটা নিশানায় ব্যর্থ হয়ে ভেতরে টেনে নিয়েছে। এবং তারপরেই একটা তীব্র গলায় সতর্ক নির্দেশ শুনতে পেলাম, "কমরেডস, পালাও, পালাও।" দরজাটা বিকট আওয়াজ করে বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরে ছুটে পালানোর জুতোর আওয়াজ। আওয়াজটা বাড়ির উত্তর দিক থেকে পশ্চিমমুখী।

আমার কেমন যেন মনে হল, এদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র নেই। আগ্নেয়াস্ত্র থাকলে ওরা দরজা জানালা দিয়ে আমাদের লক্ষ্য করে সেগুলো ব্যবহার করত।

আমি আর অপেক্ষা না করে দরজাটা আবার বাঁ হাতে ঠেলে পুরো হাঁ করে খুলে দিলাম। অসিত টর্চের আলো ফেলল। না, যে হাতটা ছুরি দিয়ে আক্রমণ করার নিষ্ফল চেষ্টা করেছিল, তার অধীশ্বর আর দরজার পাশে নেই। সে তার চেষ্টা ব্যর্থ হতেই বাড়ির ভেতর দিকে ঢুকে কোনও নিরাপদ কোটরে আশ্রয় নিয়েছে।

আমি আর অসিত ভেতরে ঢুকে গেলাম। ঠিক সেই সময়ই বাড়ির পশ্চিমদিকে পরপর তিন-চারটে গুম গুম করে বোমা ফাটার আওয়াজ। সরু গলিতে সেই আওয়াজ বাতাসে দ্রুত মিলিয়ে যেতে না পেরে আশপাশের সব বাড়ির দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে মরছে। তাতে বোমার তীব্রতা তার ওজনের থেকে বেশি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। বোমার আওয়াজে চারপাশের কুকুরগুলো আরও জোরে চিৎকার দিতে শুরু করেছে। মধ্যরাতের নৈঃশব্দ চিরে দু'ফাঁক। বোমার তীব্রতায় বাড়িটার এখান সেখান থেকে চাপ চাপ পলেস্তারা ঝুপঝুপ করে খসে পড়ল। কিন্তু আশ্চর্য, আশপাশের প্রতিবেশী বাড়ির বাসিন্দারা একেবারে নীরব। তাদের মধ্যে কোনও আলোড়ন নেই।

আমরা জানি, প্রতিক্রিয়া ঠিকই হয়েছে। ঘুম ঠিকই ভেঙে গেছে। কিন্তু অশান্তি আর মৃত্যুভয়ে কেউ উঁকি মারছে না। শুধু একটা শিশুর কান্না দূর থেকে ভেসে আসছে। তার কাছে এসব অপার্থিব। তার জন্যই 'সুন্দর পৃথিবী' সাজানোর স্বপ্ন নিয়ে নকশালরা যে বোমা ফাটাচ্ছে তাও তার জানা নেই। সে তাই ঘুম ভেঙে যেতে তার নিজস্ব কান্নার ভাষায় প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

বোমার আওয়াজ থেমে যাওয়ার আগেই ছুটন্ত শিশার আওয়াজ। ওগুলো যে আমাদের লোকেদের খোলা রিভলবার থেকে বার হয়েছে, তা আর আমাদের বোঝাতে হবে না।

আমি আর অসিত সামনে কোনও নকশালকে দেখতে না পেয়ে বাড়ির ভেতরে পশ্চিমদিকের ঘরগুলোর দিকে ছুটলাম। ওদিকে ওদের ছুটে যাওয়ার এবং বোমা ফাটার আওয়াজ পেয়েছি। সুতরাং ওদিকেই যে ওরা পালিয়েছে সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত। দুটো ঘর পার হতেই সামনে দেখলাম একটা খোলা দরজা, দরজার পাশে একটা শিকহীন খোলা জানালা। অর্থাৎ এদিক দিয়েই পালিয়েছে। আমার খবরদাতার খবরে এই জায়গাটায় একটু ফাঁক ছিল।

একটা আমি আর অসিত ওই দরজা দিয়ে বাইরে বার হলাম। সামনে এ ছোট্ট চাতাল। চাতাল পার হলেই পশ্চিমদিকে বাড়ির বাইরে যাওয়ার একটা দরজা, সেটা খোলা। ওদিক থেকে আমাদের লোকজনদের গলার আওয়াজ পেলাম। আমরা দ্রুত চাতাল পার হয়ে সেদিকে গেলাম। একটা খুব সরু গলি দু'পাশে বাড়ির ফাঁক দিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

চারদিক সম্পূর্ণ কালো। বিন্দুমাত্র আলোর মুখ নেই। বাড়ির বাইরেই গলির ওপর আমাদের অফিসার উমাশংকর লাহিড়ী, শচী মজুমদার, সমীর গঙ্গোপাধ্যায় আর ক'জন কনস্টেবল এক জায়গায় নীচু হয়ে, কিছু দেখছে। আমরা এগিয়ে গিয়ে টর্চের আলোয় দেখতে পেলাম, একটা ছেলে, ফুলহাতা সোয়েটার পরা, উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, পিঠের দিকের সোয়েটার দু'জায়গায় ফাঁক, রক্ত বেরিয়ে একেবারে লাল। ডানহাতটা রাস্তায় লম্বা করে শোয়ানো। ওই হাতে একটা বড় খোলা ছুরি ধরা। আমি আর অসিত বুঝতে পারলাম, এই সেই হাত, আমরা যখন বাড়ির দরজা খুলি, তখন ওর ছুরি কোনও শরীর খুঁজেছিল। তারপর সবশেষে পালাতে গিয়ে আমাদের কারও রিভলবারের দুটো গুলি পিঠে লাগিয়ে রাস্তায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে। সম্ভবত শেষ।

ছেলেটাকে আমরা গাড়িতে তুলে নিয়ে গেলাম আর জি কর মেডিকেল কলেজে।

না, বেঁচে নেই। ছেলেটার নাম বিশ্বনাথ মণ্ডল। বিশু নামেই ওকে সবাই ডাকত।

কলকাতা পুলিশ, বিশেষ করে উত্তর কলকাতার আমাদের বাহিনী ওকে বেশ ক'মাস ধরে খুঁজছিল ক'টি খুন ও দাঙ্গার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে। ও ফেরার ছিল। অবশেষে বেঘোরে মারা গেল। অথচ আমাদের হাতে ধরা পড়লে জেলে গিয়ে বেঁচে যেত এবং সাতাত্তর সালে রাজনৈতিক বন্দি মুক্তির সময় জেল থেকে ছাড়া পেয়ে 'খাঁটি' বিপ্লবী সেজে জ্ঞান বিতরণ করে এলাকা মাৎ করতে পারত। চারুবাবুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্য তা আর হল না।

পরদিন সকাল সোয়া ন'টা নাগাদ দমদম রোডে হোমগার্ড প্রদীপ চক্রবর্তীকে নকশালরা পাইপগান ও রিভলবারের গুলিতে ঝাঁঝরা করে খুন করে গেল। এবং ওই সংঘর্ষের সময় অসীম ভৌমিক নামে এক পথচারী নকশালদের এলোপাথাড়ি গুলি চালনায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালের বিছানায় স্থান নিলেন। হোমগার্ড হত্যা করে নকশালরা উল্লাসের সঙ্গে বিপ্লবের জয়ধ্বনি দিতে দিতে গোপন আস্তানায় চলে গেল।

সতের তারিখে সন্ধেবেলা কালীঘাট সেতুর ওপর আমাদের কর্তব্যরত ট্রাফিক কনস্টেবলের রিভলবার ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে একদল নকশাল তরুণ ভোজালী ও বোমা নিয়ে আক্রমণ করল। কনস্টেবল একটু পিছিয়ে গিয়ে রিভলবার বার করে পরপর আক্রমণকারীদের দিকে তাক করে গুলি করল। সন্ধেবেলায় অফিসফেরত ট্রাম বাসের যাত্রীরা রাস্তা আটকে যেতে ট্রাম বাস থেকে নেমে এদিক ওদিক দৌড়ে পালাতে লাগল।

কনস্টেবলের গুলিতে দু'জন নকশাল তরুণ সেতুর ওপরই লুটিয়ে পড়ল। অন্য নকশাল সঙ্গীরা তখন কনস্টেবলের ওপর আক্রমণ থামিয়ে একজন আহত তরুণকে টেনে নিয়ে চেতলার দিকে পালিয়ে গেল, অপরজন রাস্তায় শুয়েই রইল। কাছেই আলিপুর থানা থেকে আমাদের ফোর্স গিয়ে সেই তরুণকে হাসপাতালে ভর্তি করল, কিন্তু কোনও কাজ হল না। সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল।

সেদিনই সকালবেলা পৌনে ন'টার সময় দমদম রোডে যেখানে হোমগার্ড প্রদীপকে নকশালরা খুন করেছিল, তার অদূরে হিমালয় পেপার মিলের কন্টাক্টর রামবিলাস সিংকে তার গাড়ির মধ্যে গুলি করে সন্তু সরকার ও গোল্লা নামে দুজন নকশাল খুন করে গেল।

কুড়ি তারিখে চিৎপুরে মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজের অধ্যাপক অশোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে ওই কলেজেরই ভাইস প্রিন্সিপাল অনিল বরণ দাসকে চারজন নকশাল যুবক পেটে পিঠে ছুরি বসিয়ে চলে গেল।

কী জন্য অধ্যাপক দাস ওদের রোষের কারণ, তা একমাত্র নকশালরাই ভাল জানে। সম্ভবত, তিনি 'বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থায়' তখনও ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে ক্লাস করিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর কলেজে, এই 'দোষে' তিনি 'দুষ্ট' ছিলেন। অথবা নকশালদের মধ্যে 'একটা' কিছু করার জন্য যে মানসিকতা ও প্রবণতা ছিল সে জন্যও তাঁকে তারা ছুরি মেরে তাদের 'কাজ' দেখিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ পাগলামিটা এত অতিরিক্ত মাত্রায় তাদের মস্তিষ্কে ঢুকে গিয়েছিল যে, কাকে খুন করছি, কেন খুন করছি, সে ভাবনাও প্রাধান্য পেত না। 'একটা কাজ' করলেই হলো। পার্টিতে তো সেই 'কাজের' জন্য হাততালি ও বাহবা পাওয়া যাবে।

তিরিশ তারিখে ষাট নম্বর টালিগঞ্জ রোডের সামনে রাত ন'টার সময় সি.পি.আই.(এম) সমর্থক গণেশ চন্দ্র বসুকে অন্ধকারে ঘিরে ধরল ওই এলাকার নকশালরা। গণেশবাবু তড়িৎ গতিতে বুঝে গেলেন ব্যাপারটা কী হতে যাচ্ছে। অন্ধকারেই তিনি দেখে নিলেন ওরা দলে আছে ছ'সাত জন। তিনি দৌড় লাগালেন। নকশালরা ওঁকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়ে মারল। তিনি মুখ থুবড়ে রাস্তার ওপর আছড়ে পড়লেন। উঠে পালানোর চেষ্টা করলেন। পারলেন না। 'নকশালরা ছুটে এসে তাঁকে আবার ঘিরে ফেলেছে। ওরা তারপর ক্ষুর দিয়ে গণেশবাবুর গলার ওপর মারল টান। ফিনকি দিয়ে রক্ত। সেই কাটা গলায় আবার ক্ষুরের পোচ। পুরো ফাঁক। গণেশবাবু স্থির, তাঁর হৃদপিণ্ড বন্ধ। নকশালরা ধীর পায়ে ওখান থেকে হেঁটে চলে গেল। ওদের হাঁটা দেখে মনে হতে পারে, ভারতবর্ষের জনগণের স্বার্থে গণেশবাবুর মৃত্যুটা

জরুরি ছিল।

ওই রাতেই দশটার সময় কুড়ি একুশ বছরের যুব কংগ্রেস কর্মী অশোক কুমার ঘোষকে রাজা রামমোহন সরণি ও মহাত্মা গান্ধী রোডের সংযোগস্থলের কাছে চার পাঁচ জন নকশাল তরুণ ঘিরে ধরল, কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে পরপর ছুরির আঘাতে পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বার করে রাস্তায় ফেলে রেখে পালাল। থানা থেকে পুলিশ গিয়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করল। কিন্তু বৃথা। ছুরির অব্যর্থ লক্ষ্য তাকে বাঁচতে দিল না। কংগ্রেস দলকে সমর্থন করার অপরাধে তাকে মৃত্যু বরণ করতে হলো।

পরদিন পয়লা ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা এলাকাতেই মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রিট ও কালু ঘোষ লেনের সংযোগস্থলে যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে অশোক হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাতে লাগল এলাকার কিছু কর্মী। নকশালদের বিরুদ্ধে কিছু স্লোগানও দিতে লাগল যুব কংগ্রেসীরা। নকশালরা বসে থাকবে কেন? চার পাঁচজন নকশাল যুবক বোমা নিয়ে ওই সমাবেশ আক্রমণ করল। সেই আক্রমণে অজয় গুপ্ত ও চিরঞ্জিত মুখোপাধ্যায় নামে দুই যুবনেতা আহত হল। বোমার সিপ্লন্টার তাদের শরীরের বেশ কিছু জায়গায় ঢুকে গেল। তাদের ভর্তি করানো হল হাসপাতালে।

অশোককে যেখানে নকশালরা খুন করেছিল, তার পাশে এক বাড়ির দেওয়ালে ভোরবেলায় দেখা গেল নকশালরা লিখে গেছে 'ইতিহাসের এক নিয়ম'। তারা লিখেছে, "ভারতবর্ষের এই হত্যাকাণ্ড মানুষের ক্রোধ ও ঘৃণা বাড়িয়ে তুলবে এবং হত্যাকারী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে নতুন ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে—এটাই ইতিহাসের নিয়ম। প্রতিটি হত্যাকাণ্ড যে রক্তের ঋণ জমা করেছে সে ঋণ প্রতিক্রিয়াশীলদের শোধ করতে হবে রক্ত দিয়েই—— শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড চারু মজুমদার।"

এখন প্রশ্ন, প্রদীপের মতো একটা নিরীহ হোমগার্ড কিংবা গণেশবাবু ও অশোকের মতো সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীদের হত্যা করে ভারতবর্ষের কোন মানুষের ক্রোধ ও ঘৃণা চারুবাবুরা বাড়াতে চেয়েছিলেন? এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের পরিণতিতে কি ক্রোধ ও ঘৃণা উল্টে তাঁদের দিকেই ধায় না?

দ্বিতীয় প্রশ্ন, কোন রক্তের ঋণ অশোকরা শোধ করল? কতটা প্রতিক্রিয়াশীল ছিল গরিব প্রদীপের মতো হোমগার্ডরা? প্রতিক্রিয়াশীলের কার্যকরী দালাল কি এরা নয় যারা অতি সাধারণ মানুষদের খুন করে অগ্রগতির সমস্ত সম্ভাব্য বীজকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করার কাজে মদত দেয় এবং সরাসরি তাতে অংশগ্রহণ করে?

এদেরই একটা দল ফেব্রুয়ারির চার তারিখে সন্ধে ছ'টা সোয়া ছ'টা নাগাদ রবীন্দ্র সরণি ও গরাণহাটা স্ট্রিটের মোড়ে ওঁত পেতে বসেছিল তাদের বিরোধী দুজনকে খুন করে মানুষের ক্রোধ ও ঘৃণা বাড়িয়ে তোলার জন্য ! বিরোধী দুজন হলো পাঁচ নম্বর বৃন্দাবন বসাক লেনের স্বপন কুমার রায় ও এক নম্বর রমেশ দত্ত স্ট্রিটের শিবশঙ্কর সিং। ওরা পরস্পরের বন্ধু ছিল। এবং প্রায় প্রতিদিনই সন্ধের সময় ওরা গল্পগুজব করতে গরাণহাটার মোড়ে আসত।

সেদিনও যথাসময়ে এল। ব্যস। স্বপনের মাথার পেছনদিকে সঙ্গে সঙ্গে লাগল একটা ভারী আঘাত। ওটা একটা মোটা হাতুড়ির আঘাত। স্বপন চোখে হলুদ হলুদ নক্ষত্রের মতো কিছু আলোর ফুলকি দেখতে দেখতে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। ওর মাথা থেকে থকথকে রক্ত বেরিয়ে রাস্তা ভিজতে শুরু করল। আবার পরপর দুটো আঘাত। ওই মাথাতেই। খট খট করে মাথার খুলি ভাঙার আওয়াজ। মাথার ভেতর থেকে হলদে রঙের ঘিলু বেরিয়ে এল সামনে। স্বপনের শরীরের ছটফটানি থেমে গেল।

অন্যদিকে শিবশংকরকে হাত দশেক দূরে নকশালরা রাস্তায় ফেলে ছুরি আর ভোজালী দিয়ে কুপিয়েই চলেছে। স্বপনের মাথায় প্রথম হাতুড়ির আঘাত লাগতেই শিবশংকর পেছন ফিরে নকশালদের আক্রমণ দেখে ছুটে পালাতে গিয়েছিল। কিন্তু হাত দশেকের বেশি

এগিয়ে যেতে পারেনি। ল্যাং খেয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল। তারপর ওর পেটে বুকে গলায় পড়তে লাগল ছুরি ও ভোজালীর ক্রমাগত কোপ। নিজের গরম রক্তে ভিজতে ভিজতে ওর শরীরও চুপ করে গেল। নকশালরা মহান দায়িত্ব পালন করে ওখান থেকে পালাল।

মিনিট কুড়ি পরে আমাদের বাহিনী গিয়ে অবশ্য ওদের হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বেকার। ওরা দুজন 'রক্তের ঋণ শোধ' করতে মৃত্যুবরণ করল।

স্বপন ও শিবশংকরকে নকশাল একটা গ্রুপ যখন গরাণহাটায় খুন করে দেশকে 'এগিয়ে' নিয়ে গেল তাঁর ঘণ্টা দেড়েক পরই ওদের আর একটা গ্রুপ তালতলা থানা এলাকার ডাক্তার লেনে বৃদ্ধ ব্যবসায়ী মহাদেব সাউকে তার বাড়ির সামনে অন্ধকারে চেপে ধরে মোটা টাকা চাইল। মহাদেববাবু ওই এলাকায় বহু বছরের বাসিন্দা, যে সব নকশাল যুবক তাঁকে ঘিরে ধরে টাকা চাইছে তাদের তিনি বড় হতে দেখেছেন। তাই ওদের দাবির কাছে নত না হয়ে তিনি টাকা দিতে অস্বীকার করলেন। নকশাল ছেলেরা হুমকি দিয়ে বলল, "ওই টাকা আমরা খাব না, চন্দন সিংকে দেব।" চন্দন ওই এলাকার নকশাল নেতা ছিল। সেটা মহাদেববাবু ভালই জানেন। তবু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল থাকলেন। সময়ের আর অপচয় নয়, একটা ছুরির লকলকে ফণা প্রথমে তাঁর পেটে ঢুকে গেল। তারপর ক্রমাগত। মহাদেববাবু আগেই তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তার ওপর শুয়ে পড়েছিলেন। নকশালরা বুকে পেটে ছুরি চালিয়ে ওখান থেকে উধাও হয়ে গেল।

বাড়ির ভেতর থেকে মহাদেববাবুর পরিবারের অন্য লোকেরা চিৎকার চেঁচামেচি শুনেছিলেন। তাঁরা ছুটে এসে দেখলেন মহাদেববাবু রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার ওপর শুয়ে কাতরাচ্ছেন। আততায়ীরা ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। তাঁরা ভয়ে তাদের পিছু না নিয়ে মহাদেববাবুকে শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। কিন্তু পরদিন ভোরবেলায় নকশালদের ইচ্ছাপূরণের জন্য মহাদেববাবু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সেদিন রাত থেকে পরদিন ভোর হওয়ার আগেই আরও একটা ঘটনা ঘটল। চার তারিখ থেকে পাঁচ তারিখে পৃথিবী সবে পা দিয়ে দু'ঘণ্টা মাত্র বয়স অতিক্রান্ত করেছে। টালিগঞ্জ থানার পুলিশ গোপন খবর পেয়ে চুয়াত্তর নম্বর টালিগঞ্জ রোডে নকশাল মানবেন্দ্র কুণ্ডুকে গ্রেফতার করতে যায়। মানবেন্দ্র তার সঙ্গীদের নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছিল।

পুলিশ তাদের আস্তানা ঘিরে ফেলেছে বুঝতে পেরে তারা জানালার ফাঁক দিয়ে এলোপাথাড়ি বোমা ছুঁড়তে শুরু করল বাইরে দাঁড়ান পুলিশকে লক্ষ্য করে। একজন কনস্টেবল সেই বোমার ঘায়ে আহত হয়ে মাটিতে শুয়ে কাতরাতে লাগল। তাকে দু'জন ধরাধরি করে তুলে নিল অপেক্ষমান ভ্যানে। ভ্যান ছুটল হাসপাতালের দিকে।

মানবেন্দ্রদের আস্তানা তখনও ঘেরা। টালিগঞ্জ থানার পুলিশ গুলি চালাল। সোয়া দু'টো নাগাদ বাড়ির ভেতর থেকে আর কোনও আওয়াজ বা বোমার আক্রমণ এল না। থানার লোকেরা দরজা ভেঙে একটা ঘরে ঢুকল। ঘরে গুলিতে আহত হয়ে শুয়ে ছিল শুধু মানবেন্দ্র। ওর সঙ্গীরা পেছনের দরজা দিতে পলাতক। মানবেন্দ্রকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছল পুরো দল। ডাক্তারবাবু বললেন, মানবেন্দ্র মৃত।

টালিগঞ্জ থানার অধীনে পঁচানব্বই নম্বর মতিলাল নেহরু রোডের প্রাচীরে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য রাসবিহারী কেন্দ্রের প্রার্থী প্রজাতান্ত্রিক সোশালিস্ট পার্টির দক্ষিণ কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক সুধাংশু কুমার কুণ্ডু আরও দু'তিনজন কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধে ছ'টা নাগাদ স্লোগান লিখছিলেন।

ছ'সাতজন নকশাল যুবক সেখানে হঠাৎ হাজির। প্রথমেই দেওয়াল লেখার সরঞ্জামগুলোকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে সুধাংশুবাবুকে লেখা বন্ধ করতে নির্দেশ দিল। সুধাংশুবাবু লেখার সরঞ্জামগুলোকে ওইভাবে ফেলে দেওয়ার জন্য প্রচণ্ড রেগে গেলেন। এবং তিনি প্রতিবাদ করে নকশালদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বললেন, লেখা তাঁরা বন্ধ করবেন না। তর্কাতর্কি চলল মিনিট দশেক। চারুবাবুর দলের লোকের কাছে এত সময় নেই।

তারা তাদের নির্দেশ অমান্য করলে একটাই দণ্ড দিতে জানে। তা হলো, মৃত্যু। ছুরি বার হলো, সোজাসুজি ঢুকে গেল সুধাংশুবাবুর তলপেটে। সুধাংশুবাবু ওই বাড়ির দেওয়াল ধরে আস্তে আস্তে রাস্তায় বসে গেলেন। আবার ছুরি। শেষ। হাসপাতালে অবশ্য তাঁকে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সেটা নিছকই নিয়মের খাতিরে।

ওই দিনই সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় উল্টোডাঙার তিন নম্বর কুণ্ডু লেনের সামনে জ্ঞান মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নকশালরা ঘিরে ধরল তিরিশ বত্রিশ বছরের সি.পি.আই. (এম) সমর্থক অনিল মোদককে। অনিলের একটা কানফাটা চিৎকার খালি শোনা গেল। বোঝা গেল তার পেটে দশ বারো ইঞ্চি লম্বা ছুরির ফলা অনায়াসে ঘোরাফেরা করছে। দু থেকে তিন মিনিট। অনিল নকশালদের হুমকিকে অগ্রাহ্য করার পরিণতিতে সুধাংশুবাবুর মতো রক্তের ঋণ শোধ করতে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে কুণ্ডু লেনে রক্তের স্রোতের ওপর পড়ে রইল।

চারুবাবু তাঁর পার্টির তরুণ সদস্যদের শুনিয়েছিলেন, "বিশ্ব বিপ্লবের এক পবিত্রতম আন্তর্জাতিক দায়িত্ব আমাদের মাথায় এবং আমরা এই দায়িত্ব পালন করবই। মূল্য দিতে হবে অনেক, কিন্তু মূল্য দিতে ভয় পায় না বিপ্লবীরা।"

এখন প্রশ্ন, কী মহান আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের জন্য, কোন বিশ্ব বিপ্লবের খাতিরে সুধাংশু বা অনিলের মতো অতি সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করা হলো? হত্যা করে কী উদ্দেশ্য সাধন হলো? সোজা কথায়, কতদূর এগিয়ে গেল বিশ্ব বিপ্লব? চারুবাবুর উত্তরসূরীদের কাছে কি এই প্রশ্নের জবাব আছে? তারা কি এই সাধারণ কথা জানে, কোনও ব্যক্তি, সে যে কোনও মাপেরই হোক না কেন, সে 'মুক্তির' পথে সমস্যা হতে পারে না। সমস্যা হচ্ছে সিস্টেমের। পাল্টাতে হয় সিস্টেমকে। সেই সিস্টেমকে পাল্টাতে গেলে চাই যুদ্ধ। খাঁটি যুদ্ধ। গোপনে ক'টা ব্যক্তিহত্যা নয়। কিংবা অযথা শিকড়বাকড়হীন কিছু আপ্তবাক্য আউড়ে যাওয়া নয়। এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী। তার জন্য চাই দেশের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও অকৃপণ সাহায্য। লেনিন কিংবা হো চি মিনের মতো গালে দাড়ি নিয়ে, কাঁধে একটা কাপড়ের ধুলো মাখা ঝুলি ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ালেই কেউ লেনিন বা হো চি মিন হয়ে যায় না। বা সে 'খাঁটি বিপ্লবী ও হয় না। মঞ্চে উঠে পৃথিবীর সবাইকে গালাগালি দিলেই যদি বিপ্লব সমাধা হয়ে যেত তাহলে আমাদের দেশে অনেকদিন আগেই তা হতো। তার জন্য এতদিন অপেক্ষা করতে হতো না। কারণ 'বুলি' আওড়ানোর ও ভুল রাজনীতির ওকালতি করার লোক আমাদের দেশে ভুরি ভুরি জন্মেছে এবং আরও জন্মাবে। তাতে আর যাই হোক আমাদের দেশের বিন্দুমাত্র অগ্রগতি হয়নি, হবেও না। আর এদের নিয়ে কিছু মানুষের বালখিল্যের মতো আদিখ্যেতা কেন এবং কোন যুক্তিতে, তার ব্যাখ্যা কোনও সুস্থ মানুষের মাথায় ঢোকে না। আর সেই না ঢোকাতেই ওরা নির্বিঘ্নে যাকে তাকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' আখ্যা দিয়ে বসে। মোট কথা, নির্বিচারে খুনের দ্বিধাহীন সমর্থন না করলেই সে 'প্রতিক্রিয়াশীল'।

ছ' তারিখ সন্ধেবেলা আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা অঞ্চলে নকশালরা ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা সমর রুদ্রের গাড়ির ড্রাইভার লালচাঁদ গুপ্তকে ভোজালী ও বোমা নিয়ে আক্রমণ করে খুন করে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করে চলে গেল।

ন' তারিখে ওই থানার অধীনে এক নম্বর পটুয়াতলা লেনের বাসিন্দা তিরিশ বছরের যুবক সি.পি.আই.(এম) কর্মী গোপাল বসু ওরফে শংকরকে সকাল ন'টা নাগাদ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট ও সূর্য সেন স্ট্রিটের সংযোগস্থলে "বিশ্ব বিপ্লবের মহান হোতা' চারুবাবুর সৈনিকরা ছুরি ও ভোজালী নিয়ে ঘিরে ধরল। শংকরকে কোনও সুযোগ না দিয়ে তার রক্তে নিজেদের হাত রঞ্জিত করে, তাকে হকার্স কর্নারের ওই মোড়ে ফেলে দিয়ে খুন করার আনন্দে হৈ হৈ করতে করতে নকশাল শেখর বসু, অশোক ও গেরিলারা স্থান ত্যাগ করল।

সেদিনই সন্ধেবেলা সাতটার সময় দশ নম্বর দেবেন্দ্র চন্দ্র দে রোডের রেশন দোকানে নকশালরা জোর করে ঢুকে ওই দোকানের মালিক হীরালাল সাউয়ের কাছে পাঁচ হাজার টাকা চাইল। অথচ ওরাই চিনা মুক্তি ফৌজকে দেওয়া মাও সে তুঙের নির্দেশ নিজেরাও

মেনে চলার কথা সদম্ভে বারবার ঘোষণা করত। সেই নির্দেশের মধ্যে একটা ছিল, "জনসাধারণের কাছ থেকে একটা সূচ কিংবা সুতোও নেবেন না।" আর চারুবাবুর বাহিনী মুখে মাও সে তুঙের কথা বললেও কার্যত কখনই তা মানেনি। সেটা মানতে গেলে যে দীর্ঘ রাজনৈতিক ও আদর্শগত পরিক্রমার প্রয়োজন, যে পদ্ধতিতে একটা কমিউনিস্ট পার্টি তাঁরা গড়ে তুলতেন, তার ধারে কাছেও চারুবাবু তার পার্টির ছেলেদের গড়ে তোলেননি। তার ফলস্বরূপই নকশালরা হীরালালের দোকানে ঢুকে তোলা আদায় করতে গেল। হীরালাল তার অক্ষমতার কথা জানালে নকশালরা ছুরি বার করে তাকে খুন করার ভয় দেখাল।

হীরালালের দোকানের কর্মচারী, দু'চারজন অবশিষ্ট অপেক্ষমান রেশনপ্রার্থীকে নকশাল যুবকরা দোকানের এক ধারে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল। আলো প্রায় সব নিভিয়ে দিল। ক্যাশ বাক্সটার চাবি যখন খুঁজতে শুরু করেছে, তখন হীরালাল চাবিটা চাল গমের বস্তার ভেতরে ছুঁড়ে দিল। অবাধ্য হীরালাল এরপর কী সৌজন্য তাদের কাছে আশা করে? মুহূর্তের মধ্যেই সেই আশা হীরালালের পূর্ণ হল। তার পেটের মধ্যে ঢুকে গেল ছুরি। হীরালাল একটা চৌকির ওপর পেটে হাত দিয়ে শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের মধ্যে ছুরি। তার চিৎকার প্রথমবার যতটা শোনা গিয়েছিল, দ্বিতীয়বার ততটা শোনা গেল না। আবার বুকে সে তীরের তীব্র খোঁচা অনুভব করল। আর চিৎকার নেই, ক্ষীণ একটা "মাঈ" শব্দ কোনও মতে শোনা গেল, তারপর কাদামাটি। যে আলোটা জ্বলছিল, সেটা নিভিয়ে দিয়ে নকশালরা পালাল। একে একে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা হীরালালের কর্মচারীরা এগিয়ে এল। পুলিশ এল, হীরালালের ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া দেহটা অযথা টেনেটুনে নিয়ে গেল হাসপাতালে, সম্ভবত ডাক্তারবাবুদের ঘোষণাটা শোনার জন্য। একটা কথা, "মৃত"।

তেরো তারিখে ওই দেবেন্দ্র চন্দ্র দে রোডের কাছে পঞ্চাননতলায় একটা বাড়ির প্রাচীরে সকাল ন'টার সময় মনমোহন বিশ্বাস তার পার্টির স্লোগান লিখছিল। নকশালদের ভাষায় 'সংশোধনবাদী চিন্তাধারা' প্রচার করে বিপ্লব পিছিয়ে দিচ্ছে, এতবড় সাহস! বিপ্লবের ঠিকেদার চারুবাবুর নীতির অনুগামীরা তো আর সেটা দেখে, চোখ বুজে থাকতে পারে না। তারা বোমা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এবং টিপ করে ছুঁড়ে দিল মনমোহনের মাথায়। মনমোহনের মাথাটা হাঁ হয়ে গেল। সেখান থেকে ঝরতে লাগল থকথকে রক্ত। প্রথমেই মনমোহন শুয়ে পড়েছে বোমার আঘাতে। ধোঁয়ার অন্ধকার খানিকটা সরলে মৃত মনমোহনকে দেখা গেল। তাকে নীলরতন সরকার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল পোস্টমর্টেমের জন্য!

সতেরো তারিখ সকাল থেকে সি.পি.আই.(এম) কর্মী বিজন দে তার তিনজন সহকর্মী সমেত মুচিপাড়া থানা এলাকায় ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখার জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরছিল। নকশালরা খেয়াল রেখেছিল। "সংসদীয় গণতন্ত্রের' আফিঙের বীজ এমনভাবে ছড়ানো তাদের না-পছন্দ। বিজনরা চুনাপুকুর লেনে ভোটার তালিকা হাতে নিয়ে ঢুকল। ছ'সাতজন নকশালও ওই গলিতে ঢুকল। বিজনরা যখন ওই গলির চারের বি বাড়ির সামনে, ঠিক সে সময় নকশালরা সি.পি.আই.(এম) কর্মীদের ঘিরে ধরল। বিজন ছাড়া সবাই ভোটার তালিকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালাতে পারল। বিজন পারল না। সে ধরা পড়ল। এবং সংশোধনবাদী রাজনীতি করার শাস্তি পেল। পেটে পিঠে ছ'টা ছুরির কামড় খেয়ে জীবন আর মৃত্যুর এক সুতোর ওপর ঝুলতে ঝুলতে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হল। কিন্তু তার জীবনের সুতো ছিঁড়ে গেল। বিপ্লবের অগ্রগতি কতটা হল, তার সাক্ষী হতে আর কোনও দিন তাকে বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডের ভিড়ে দেখা যাবে না।

উনিশ তারিখ ভোরবেলা প্রতিদিনের মতো দেশবন্ধু পার্কে প্রাতঃভ্রমণে এসেছেন সত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধ প্রভাসবাবু। পার্কে তাঁর পরিচিত আরও অনেক বৃদ্ধ আসেন। অনেকেই তখনও এসে পৌঁছননি। কিন্তু প্রভাসবাবুর সামনে হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে হাজির তিনজন নকশাল যুবক। তাদের কী উদ্দেশ্যে উপস্থিতি, প্রভাসবাবু কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি তাদের প্রায় অবজ্ঞা করে হাতের ছড়িটা বাঁ হাত থেকে ডান হাতে নিয়ে আবার হাঁটার উদ্যোগ

করতেই নকশালদের একজন বলে উঠল, "বুড়োর তেজ আছে দেখছি।" প্রভাসবাবু অপমানিত বোধ করে বলে উঠলেন, "কে তোমরা? তোমাদের তো কোনওদিন দেখিনি।"

"এই শেষ দেখা দেখে নে" বলে একজন প্রভাসবাবুর মাথায় মারল লোহার রডের এক বাড়ি। প্রভাসবাবুর চশমা ছিটকে বহু দূরে। হাত থেকে খসে পড়েছে ছড়ি। মাথা থেকে রক্ত মুখ গলা হয়ে নীচের দিকে বইছে। তিনি কাঁপতে কাঁপতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। তার পেটে বুকে পড়ল ভোজালীর কোপ।

ভোরের আলো ভাল করে ফোটার আগেই নকশালরা 'কাজ' শেষ করে পার্ক থেকে উধাও। প্রভাসবাবুর প্রাতঃভ্রমণের ক'জন সঙ্গী হাজির। তারা অবাক। তারপর তাঁকে নিয়ে হাসপাতাল।

না। প্রভাসবাবুর জীবনে আর ভোর এল না। তিনি মৃত্যুর মিছিলে সামিল হয়েছেন। কেন যে হলেন, তিনি জানতে পারলেন না। এমন কি আমরাও বুঝতে পারিনি নকশালরা কী কারণে প্রভাসবাবুকে খুন করল। তিনি বিশ্ব বিপ্লবের কোন পথটা আটকে রেখেছিলেন, কে জানে।

পঁচিশ তারিখ সকালবেলা বি.টি. রোডের ওপর একটা বালিকা স্কুলের সামনে ট্রাফিক কনস্টেবল প্রেমচাঁদ রবিদাস ও রামধর মিশির ট্রাফিক ডিউটি দিচ্ছিল। বিপ্লবের মহান কর্তব্য সাধন করার জন্য ওদের দিকে এগিয়ে আসছে যে আটজন নকশাল যুবক, তা তারা বুঝতেই পারেনি।

যখন ওরা বুঝতে পারল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওরা ততক্ষণে ওই আটজনের ঘেরাওয়ের ব্যূহের মধ্যে পড়ে গেছে। ওদের দুজনের কোমরেই আছে রিভলবার, আত্মরক্ষার জন্য হাত দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে প্রেমচাঁদের মাথায় পড়ল লোহার রডের বিরাশি সিক্কার মার। প্রেমচাঁদ "মা" বলে চিৎকার করে কোমর থেকে হাত মাথায় তুলে রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে লাগল। রামধরের ডান হাতে একই ভাবে বাড়ি।

প্রেমচাঁদ রাস্তায় পড়ে গেলেও কোমরের রিভলবারটা চেপে রাখার চেষ্টা করল। তলপেটে ছুরি। তারপর বুকে আর গলায়। তার গায়ের জোর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণ হতে হতে নিঃশেষ হয়ে গেল। তার রিভলবারটা নকশালরা নিয়ে নিল। রামধরের রিভলবারও নিয়ে নিয়েছে। রামধর ছুটতে শুরু করেছে। চারজন নকশাল যুবক ওর পিছনে কিছুটা তাড়া করে থেমে গেল। বাকি চারজন প্রেমচাঁদকে খতম করে গলা ফাটিয়ে চারুবাবুর আর মাও সে তুঙের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে চলে গেল।

এমনভাবে মাও সে তুঙের নামে 'চিনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান' শ্লোগান দিল, মনে হতে লাগল যেন মাও সে তুঙ ওদের পার্টির দায়িত্ব নিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন প্রেমচাঁদকে খুন করে 'বিপ্লবের পথ পরিষ্কার করতে। ট্রাফিক কনস্টেবলরা খুন না হলে কী করে সেই পথে বিপ্লবীরা বিপ্লব করতে যাবে?

বিপ্লবের পথ পরিষ্কার করার জন্য, ছাব্বিশ তারিখ সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ দমদম রোডে ঘুঘুডাঙা পোস্ট অফিসের কাছে সি.পি.আই. (এম) সমর্থক ও নকশালদের তুমুল সংঘর্ষ শুরু হল। সংঘর্ষে খোলাখুলি ভাবে দু'পক্ষই বোমা, পাইপগান, রিভলবার, পিস্তল ব্যবহার করল। দু'পক্ষেই পনের-কুড়ি জন করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। আশেপাশের জনসাধারণ ভয়ে বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ করে জীবন হাতে নিয়ে বোধহয় জপ করছে কোনও এক অজানা জীবনযাত্রার মন্ত্র। কেউ পালিয়ে গেল। কারণ তারা যুদ্ধ শেষের পরিণতি জানতেও চায় না। পরিণতি সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা যুদ্ধে রত দু'পক্ষের থেকে কম নয়।

নকশালরা নাকি মাও সে তুঙের পথ অনুসরণ করত। তা সেই মাও সে তুঙই বারবার বলেছেন, 'জনগণ থেকে শেখার' কথা। কিন্তু নকশালরা কি কোনদিনও 'জনগণ থেকে শিক্ষা' নিয়েছে? বরং সবসময়ই জনসাধারণের ওপর নিজেদের মতবাদ চাপিয়ে দেওয়ার

জন্য জোর করে মাস্টারি করেছে। সেই চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়েছে, তখনই তারা উগ্রমূর্তি ধারণ করে গালাগালি দিয়েছে, খুন করেছে। জনগণকে নির্বোধ ভেবেছে।

যুদ্ধ চলল পাক্কা এক ঘণ্টা। যুদ্ধ শেষে দু'পক্ষই ক্লান্ত হয়ে দু'দিকে সরে পড়ল। তারপর দেখা গেল, ফাঁকা যুদ্ধক্ষেত্রে দু'জন পথচারী বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে অকালে প্রাণ হারিয়ে পড়ে আছেন। কোনও রঙের শহীদের তালিকাতেই তাঁদের নাম উঠবে না। দুই উন্মুক্ত যুযুধান পক্ষের যাঁতার মাঝে পড়ে তারা পিষে মরেছেন। শহীদ হবেন কেন? তাঁরা তো বোকা। তাঁরা তো 'বিপ্লবী' নন।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁদের একজনের পরিচয় জানতে পারল, তিনি হচ্ছেন তেত্রিশ নম্বর নর্দার্ন অ্যাভিনিয়ুর বেচুলাল হালদার। অন্যজনের পরিচয় জানা গেল না। তিনি হয়ে রইলেন শুধুই 'মানুষ'। মৃত মানুষ। যিনি বোকা ছিলেন। তাই পক্ষ নেননি। তাই মরেও 'শহীদ' হল না। তাঁর রক্তের কোনও মূল্য নেই। তাঁর রক্ত দিয়ে কোনও ঋণ ও শোধ হবে না। তাঁর জন্য কোনও বেদীও তৈরি হবে না। তাঁর জীবনের মূল্য শূন্য।

পয়লা মার্চ দুপুর আড়াইটা নাগাদ উল্টোডাঙার দুগ্ধ প্রকল্পের একটা ভ্যানগাড়িকে বেলগাছিয়া রোডে আক্রমণ করল নকশালরা। আক্রমণের যুক্তি হিসাবে তারা স্লোগান দিতে লাগল যে এই আক্রমণ নাকি বারাসাতে যে আট যুবকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল, তার প্রতিশোধ। কারণ আড়িয়াদহের ওই যুবকদের হত্যা করে দুগ্ধপ্রকল্পের ভ্যানেই চাপিয়ে বারাসাতে নিয়ে যশোহর রোডে ফেলা হয়েছে।

গাড়িতে ছিলেন একজন অফিসার ও ড্রাইভার। ভ্যানটা বোমা মেরে দাঁড় করিয়ে তারা ড্রাইভারকে ছুরি দিয়ে মারল। তার অপরাধ গাড়ি আক্রান্ত হওয়ার পর সে কেন ভয় পেয়ে ভ্যান নিয়ে পালাতে চেয়েছিল? ড্রাইভার হরি বাহাদুর বোমার সিপ্লন্টার ও ছুরির আঘাতে আর জি কর হাসপাতালে মারা গেল। ভ্যানটা আগুনে আধপোড়া ও বিধ্বস্ত হল। অফিসার আহত হয়ে প্রাণে বেঁচে গেলেন। নকশালদের প্রতিশোধ নেওয়া হল।

রক্তের বদলে রক্তের খিদে বোধহয় মানুষের মিটবে না। যুদ্ধ ও শেষ হবে না। কারণ তার সবচেয়ে বড় মদতদাতা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং তার উৎস রাজনীতি। সেটা বন্ধ হলে তো নিজেদের শক্তির দম্ভ ও সেই দম্ভের জোরে শাসনও চলবে না। সুতরাং নির্বিচারে হত্যার খেলা তা চলবেই।

পরদিন দোসরা মার্চ সকাল পৌনে ন'টা নাগাদ রামকান্ত বসু লেনের বাসিন্দা, কংগ্রেস পার্টির সমর্থক কুড়ি একুশ বছরের দীপঙ্কর দত্ত ওরফে বাবলুকে রবীন্দ্র সরণিতে গদাই, পাগলা ও বিষ্টুর নেতৃত্বে আট দশ জন নকশাল ভোজালী, পাইপগান, বোমা হাতে ঘিরে ধরল। দীপঙ্কর একা কী ভাবে এদের প্রতিরোধ করবে? সে আসন্ন মৃত্যু চোখের সামনে দেখতে পেয়ে ছুটে পালাতে গেল। গদাইয়ের ছোঁড়া বোমার ঘায়ে মুখ থুবড়ে পড়ল রবীন্দ্র সরণির ওপর। নকশালরা ধরল এবং টানতে টানতে তাকে নিয়ে গেল লক্ষ্মী দত্ত লেনে।

তারপর কোপ। নকশালরা চলে গেল তাদের পরবর্তী কর্মসূচী পালন করার জন্য। দীপঙ্করকে শ্যামপুকুর থানার পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করল। দীপঙ্কর মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লড়তে ষোলই মার্চ হেরে গেল। মৃত্যুদূতেরই জয় হল। চারুবাবুর খতমের তালিকায় আর একটা নাম যোগ হল। দীপঙ্কর নিশ্চয়ই তাঁর সাধের বিপ্লব ঠেকিয়ে রেখেছিল।

ওই দোসরা মার্চ বেলা পৌনে বারটা নাগাদ সাত নম্বর কৃষ্ণদাস রোডের বাসিন্দা বাইশ তেইশ বছরের যুবক সি.পি.আই.(এম) কর্মী শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় বত্রিশ নম্বর বাসে চড়ে যাচ্ছিল। বাস যখন জোড়াবাগানের বি কে পাল অ্যাভিনিয়ু দিয়ে ছুটছে, তখন সাত-আট জন নকশাল ছেলে ওই বাসে উঠে শ্যামলকে টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় নামিয়ে নিল। বাস ড্রাইভার বা কন্ডাকটর ও শ্যামলের সহযাত্রীরা কেউ কোনও প্রতিবাদ করার সুযোগই পেল না। নকশালরা খোলা তলোয়ার, ভোজালী আর পাইপগান দেখিয়ে তাদের চুপ করিয়ে বসিয়ে রাখল। ড্রাইভারও বাস ছুটিয়ে পালাতে পারল না। শ্যামলকে রাস্তায় নামানোর পর নকশালরা

তাকে পালাতে বললে, সে পাগলের মতো বাস ছুটিয়ে দিল।

বি কে পাল অ্যাভিনিয়ু সবসময় মানুষের যাতায়াতে ব্যস্ত ও গমগম করে। আর সকালে ওই সময় তো একেবারে সমাবেশের পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়। সেই সব পথচারী মানুষেরা দেখল, একটা ছেলেকে নকশালরা টানতে টানতে নিমু গোস্বামী লেনের ভেতর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটা রাস্তায় পড়ে গেছে আর অপহরণকারীদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলে যাচ্ছে, "আমি পার্টি ফার্টি ছেড়ে দেব, আমাকে তোরা ছেড়ে দে, আমাকে মারিস না।" কিন্তু নকশালদের কানে তার আবেদন কোনও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারছে না।

একজন পাল্টা চিৎকার করে শ্যামলকে বলল, "চোপ শালা, তোরা আমাদের কমরেডদের মেরেছিস, তোদের কাউকে বাঁচতে দেব না।"

কিছুক্ষণ পর নিমু গোস্বামী লেন থেকে শ্যামলের শেষ চিৎকারগুলো আকাশে ভেসে বি কে পাল অ্যাভিনিউ অঞ্চলের ঘন ঘন বাড়ির সারির দেওয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

শ্যামলকে মেয়ো হাসপাতালে অবশ্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ছুরি আর তরোয়ালের কোপে সে নিমু গোস্বামী লেনেই চিরতরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। যে ঘুম আর কোনও হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা ভাঙাতে পারবেন না।

এভাবে কত দীপঙ্কর ও শ্যামলের জীবনের প্রদীপ নিভে গেছে, তার হিসেব কোনও পরিসংখ্যানবিদ সঠিক ভাবে দিতে পারবেন বলে মনে হয় না। 'সন্ত্রাসবাদের বলি' নামে কোনও আলাদা পরিসংখ্যানের অভিধান ও নেই। থাকলে জানা যেত কতজন শ্যামল এভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিমু গোস্বামী লেনে বা মাঠে, প্রান্তরে হারিয়ে গেছে শুধু রাজনৈতিক নেতাদের ইচ্ছায়।

চার তারিখ দুপুর একটা নাগাদ মদনমোহন বর্মণ স্ট্রিটের তরুণ যুব কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী রামনাথ বিশ্বাস লেন দিয়ে রিক্সায় চড়ে যাচ্ছিল। নকশালরা ওকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিল, চিত্তরঞ্জনের বাঁচার অধিকার নেই। কারণ সে 'বুর্জোয়া' কংগ্রেস পার্টির কর্মী। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আর বসে থেকে লাভ কী, ওরা ছুরি ভোজালী নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে মহান দায়িত্ব পালনের জন্য ছুটে গেল। রিক্সায় বসে থাকা চিত্তরঞ্জনের তলপেটে প্রথমেই ঢুকিয়ে দিল ছুরি। চিত্তরঞ্জনের গলা দিয়ে ঘড়ঘড় করে আওয়াজ বের হল।

রিক্সাচালক রিক্সা ছেড়ে ভয়ে পালাল। চিত্তরঞ্জনকে রাস্তায় শুইয়ে, চারুবাবুর মন্ত্রশিষ্যরা স্লোগান দিতে দিতে ছুরি আর ভোজালীর কোপ দিয়ে 'শত্রুর' রক্তে নিজেদের হাত রঞ্জিত করে 'বিপ্লবের' সঙ্গে আরও 'একাত্ম' হল। মৃত চিত্তরঞ্জনকে হাসপাতালে পাঠিয়ে তার বাড়িতে খবর পাঠানো হল, "তাদের প্রতিবিপ্লবী ছেলে মৃত!"

ছয়ই মার্চ বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সি.পি.আই. (এম) ও সি.পি.আই. (এম.এল) নামধারী দুই কমিউনিস্ট পার্টির ক্যাডারদের মধ্যে মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট ও অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিটের সংযোগস্থলে বিপ্লবের জন্য যুদ্ধ আবার শুরু হল।

বোমা, গ্রেনেড দু'পক্ষই যথেচ্ছভাবে একে অপরের উদ্দেশে ছুঁড়ল। যখন দু'পক্ষ ক্ষান্ত হল, দেখা গেল, একশ পাঁচের এ, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটের বাসিন্দা পরেশনাথ রক্ষিত যুদ্ধস্থলে বোমার আঘাতের ক্ষত নিয়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে। উনিশ তারিখে হাসপাতালের শয্যায় তার সব যন্ত্রণার অবসান হল।

সাত তারিখ সকাল সাড়ে এগারটা নাগাদ ভগবান ব্যানার্জি লেনে সি.পি.আই. (এম) সমর্থক সরোজ কুমার হালদারের বাড়িতে বোমা ও পাইপগান হাতে জোর করে নকশালরা ঢুকে পড়ল। সরোজ তখন স্নান সেরে দুপুরের খাওয়া খেতে প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু তার আর ভাত খাওয়া হল না। অনেকটা হিন্দি ছবির কায়দায় নকশালদের পাইপগানের গুলি খেল। নকশালরা সরোজকে গুলি খাইয়ে ওর বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। সরোজকে মেয়ো

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু সন্ধের সময় নকশালদের গুলি হজম করতে না পেরে সরোজ মারা গেল।

আট তারিখ সকাল এগারোটা নাগাদ মুরারিপুকুর রোডে কাশীপুর থানার সঙ্গে যুক্ত আমাদের কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল অনিল কুমার চক্রবর্তীকে নকশালরা ছুরি ও ভোজালী দিয়ে কুপিয়ে পালাল। তাকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হল, কিন্তু সন্ধেবেলা সে সব চিকিৎসার ঊর্ধ্বে চলে গেল।

সেদিন রাতেই অনিলকে হত্যার দায়ে পঞ্চানন চক্রবর্তী নামে এক নকশালকে তাদের গোপন আস্তানা থেকে গ্রেফতার করা হল। এবং অনিলের ছিনতাই হওয়া হাতঘড়িটা পঞ্চাননের থেকে উদ্ধার করা হল।

চারুবাবুর পতাকাবাহীরা পঞ্চাননের ঘড়ি চুরিকে কী আদর্শ ও নীতি দিয়ে আড়াল করবে? মৃত অনিলরা আর ফিরে আসবে না, কিন্তু এখনও বড় বড় কথা বলে পঞ্চাননরা বুক ফুলিয়ে সমাজ আলো করে বেঁচে আছে!

ন'তারিখ সকাল সাড়ে আটটার সময় শ্যামপুকুর থানার তিপান্নর বি শোভাবাজার স্ট্রিটের বাড়িতে নকশালরা কোনও এক অজ্ঞাত কারণে আগুন ধরিয়ে দিল।

খবর পেয়ে আগুন নেভাতে ছুটল সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে শ্যামপুকুর থানার পুলিশ ও ফায়ার ব্রিগেডের দল। নকশালরা এর জন্যই অপেক্ষা করছিল। তারা আগুন নেভানোর কাজে বাধা দিতে সেনা, পুলিশ ও দমকল কর্মীদের দিকে মুহুর্মুহু বোমা ছুঁড়তে শুরু করল।

সেনাবাহিনী পাল্টা রাইফেলের গুলিতে জবাব দিল। নকশালরা মিনিট দশেক পরই পালাল। শুধু একজন ছাড়া। তার গুলি লেগেছে। হাসপাতালে ভর্তি করার অল্প সময়ের মধ্যেই সে মারা গেল। তার মৃত্যু কি সার্থক হল?

দশ তারিখে সকাল দশটা নাগাদ বিধানসভা নির্বাচনের মুখে কাশীপুর বিধানসভার কংগ্রেস দলের প্রার্থী প্রফুল্ল কান্তি ঘোষ, যিনি শত ঘোষ হিসাবেই বেশি পরিচিত ছিলেন, বরাহনগরের কাছে রতনবাবু রোডের ভেতর গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই রাস্তার ছ'নম্বর বাড়ির সামনে যখন তাঁর গাড়ি, সে সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হল বিদেশ কাহার নামে তাঁরই দলের এক কর্মীর। তিনি বিদেশকে গন্তব্যস্থানের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি থামিয়ে তাকে যখন গাড়িতে তুলতে যাবেন, ঠিক সেই সময় নকশালরা বিদেশকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়ে মারল। বিদেশ বোমার আঘাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল প্রফুল্লবাবুর গাড়ির ওপর। প্রফুল্লবাবু বিদেশকে গাড়িতে নিয়ে ছুটলেন হাসপাতালে। কিন্তু বিদেশ বাঁচল না।

বিদেশের জন্য প্রফুল্লবাবুর কতটা শোক হয়েছিল, বোঝা গেল না। তবে ভোটের রাজনীতিতে তিনি একটা মোক্ষম বর পেয়ে গেলেন।

সেই বরকে তিনি আর বোড়ের চালে থাকতে না দিয়ে হাতির চালে নিয়ে এলেন। তিনি তখনকার কমিশনার সাহেবকে একটা লম্বা তালিকা দিয়ে অনুরোধ করলেন, সেই তালিকায় যাদের নাম ঠিকানা লেখা আছে, তাদের যেন সেই রাতেই নকশাল হিসাবে গ্রেফতার করে লালবাজারে আমরা নিয়ে আসি।

বললেন, পরদিন সকালে প্রফুল্লবাবু লালবাজারে এসে তাদের জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন। তাতে তাঁর নির্বাচনে সুবিধা হবে। অবশ্য নির্বাচনের সুবিধার কথাটা মুখে বললেন না, মুখের ভাবভঙ্গি এবং একগাল হেসে সেটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন।

কমিশনার সাহেব রাজী হয়ে আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার সুনীতি সরকারকে ডেকে সেই তালিকাটা দিয়ে বললেন, "এদের আজ রাতেই গ্রেফতারের ব্যবস্থা করুন।" সুনীতিবাবু ছিলেন অসম্ভব ভদ্রলোক। তিনি তালিকাটাকে হাতে নিয়ে আমাদের গোয়েন্দা দফতরের দিকে হাঁটা দিলেন। তিনি জানেন, প্রফুল্লবাবুর ওই কাজটা করতে গেলে কাকে দরকার। সেটা হচ্ছে নকশাল দমন শাখার ভারপ্রাপ্ত অফিসার রুণুকে। অর্থাৎ আমাকে। কিন্তু তিনি এটাও জানতেন, ওই মিথ্যা তালিকা নিয়ে আমি নকশাল হিসাবে কিছু সাধারণ

মানুষকে অকারণে গ্রেফতার করে তাদের হয়রান করব না। অথচ সেটা কমিশনার সাহেবের নির্দেশ। তিনি দ্বিধায় পড়ে গেলেন। একদিকে নির্দেশ, অন্যদিকে আমার মনোভাব। যদিও আমি তাঁর অধীনস্থ, তাঁর নির্দেশ আমি মানতে বাধ্য। কিন্তু তিনি আমার 'গোঁ' জানতেন, যদি "না" বলি তবে "হ্যাঁ" করানো খুব কঠিন। তিনি তাই আমাকে সরাসরি নির্দেশ না দিয়ে কৌশল হিসাবে আমাদেরই শাখার অফিসার উমাশংকর লাহিড়ীকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর হাতে প্রফুল্লবাবুর ওই তালিকাটা গুঁজে দিয়ে কমিশনারের নির্দেশ মতো ওই তালিকাভুক্ত লোকেদের সেদিন রাতেই গ্রেফতার করার কথা জানালেন।

উমাশংকর ফিরে এসে ওই তালিকাটা আমার হাতে দিয়ে কমিশনার সাহেবের নির্দেশ মতো সুনীতিবাবুর কথা বলল। আমি তালিকায় লেখা নাম ঠিকানাগুলো পড়ে তালিকাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উমাশংকরকে বললাম,

"এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়, এর মধ্যে যাদের নাম আছে তারা একজন ও নকশাল নয়, ফালতু এতগুলো লোককে হয়রানি করতে যাব কেন? একটা লোককে নির্বাচনের বৈতরণী পার করার জন্য?"

আমাদের কাছে তখন নকশাল অধ্যুষিত এলাকার, বেশির ভাগ নকশালদের নাম ও বাড়ির ঠিকানা ছিল।

সেই তালিকার সঙ্গে প্রফুল্লবাবুর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত একটা নামেরও মিল ছিল না। তাঁর দেওয়া তালিকায় উল্লেখ করা রতনবাবু রোড ও তার আশেপাশের এলাকাটা ছিল সি.পি.আই. (এম) পার্টির ঘাঁটি। তিনি বিদেশের মৃত্যুকে ক্যাশ করে ওই এলাকার পরপর সারি সারি বাড়ির বাসিন্দাদের গ্রেফতার করে আবার ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের ভোট নিজের বাক্সে টেনে আনার জন্যই যে এই পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাতে কোনও সন্দেহই ছিল না। আর সেই পন্থার সিঁড়ি হিসাবে আমাদের বেছেছেন, এটা আমার রাগের অন্যতম কারণ।

আমার থমথমে মুখ দেখে উমাশংকর আর কী করবে। সে তালিকাটা কুড়িয়ে আবার ছুটল সুনীতিবাবুর কাছে, আমার সিদ্ধান্তের কথা জানাতে। সুনীতিবাবু আমার নেতিবাচক সিদ্ধান্তের কথা শুনে একটু পিছিয়ে গিয়ে উমাশংকরকে বললেন, "যে ভাবেই হোক রুণুকে রাজী করাও, নয়ত কমিশনার সাহেব আমাকে যাচ্ছেতাই বলবেন। তিনি শতবাবুকে কথা দিয়ে দিয়েছেন। তার একটা মর্যাদা দিতে হবে তো।"

উমাশংকর ফিরে এল আবার আমার কাছে। জানাল সুনীতিবাবুর অনুরোধ। আমি তবু নাছোড়বান্দা। উপরওয়ালার নির্দেশ অমান্য করার জন্য যদি চাকরি যায়, যাবে। তবু আমি যাব না। বললাম, "জানিয়ে দাও কাজটা অন্য কাউকে দিয়ে করাতে। আমাদের দিয়ে নয়।" আমি জানতাম, আমি যেটা 'না' করে দিয়েছি সেটা অবজ্ঞা করে আমাদের দফতরের অন্য কোনও অফিসার সেই কাজটা করতে যাবে না। আমাদের মধ্যে এমনই ছিল বাঁধুনি ও পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া। আর বড় বড় অফিসাররা তো আর আমাদের ছাড়া নিজেরা যাবেন না গ্রেফতার করতে। তাঁরা তো নির্দেশ দিয়েই খালাস। সেটা সঠিক না বেঠিক তাও অনেকসময় তলিয়ে দেখেন না। যত জ্বালা সব আমাদের!

উমাশংকর একবার সুনীতিবাবুর কাছে যাচ্ছে, আবার আমার কাছে এসে একই অনুরোধ করছে।

দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলল 'হাঁ' আর 'না'র দড়ি টানাটানি! শেষ পর্যন্ত উমাশংকর আমাকে অনুরোধ করে বলল, "সুনীতিবাবুর জন্য রাজী হয়ে যান। কী আর করবেন?"

আমি উমাশংকরের দিকে তাকিয়ে ওর মুখের মিনতিভরা ভাবটা দেখলাম। আমি ওপরওয়ালার নির্দেশ অমান্য করতে পারলেও নিজের সহকর্মীদের অনুরোধ, 'দূর ছাই' করে দূরে সরিয়ে দিতে পারতাম না। এমন কি তাদের অন্যায় আবদার রাখতাম এবং কোনও কোনও সময় তারা যখন বিপদে পড়ত তখনও আমি আমার শক্তির ছোট কাঁধটা নিয়ে

সাহায্য করে তাদের বিপদমুক্ত করতে বারবার ঝাঁপিয়ে পড়েছি। কিছু কিছু সময় তাদের দিকে তাক করা তীরটা আমার দিকে ঘুরিয়ে তাদের বিপদটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছি। আমার এই কৌশল আমার সহকর্মীরা ভাল ভাবেই জানত।

আর আমিও জানতাম তাদের অনুরোধ অবজ্ঞা করলে এবং তাদের বিপদের সময় পাশে না দাঁড়ালে পরবর্তী সময় তাদের থেকে কাজ আদায় করতে পারব না। তাহলে আমাদের সচল মেশিন অচল হয়ে যাবে। বদনাম হবে আমাদের কলকাতা পুলিশ বাহিনীর। তাই বৃহত্তর স্বার্থে আমি ছোটখাটো আবদারগুলো মেনে নিতাম।

উমাশংকরের মুখটা দেখলাম। তারপর চোখের সামনে ভেসে উঠল আমাদের দফতরের বড়সাহেব সুনীতিবাবুর মুখ। তিনি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একবারও সোজাসুজি আমাকে বলেননি শতবাবুর কাজটা করে দিতে। সুনীতিবাবুর মুখ মনে হতেই আমি বুঝে গেলাম, তিনিও চাইছেন না এই কাজটা আমরা করি, কিন্তু কমিশনার সাহেবের চাপটাও তিনি বইতে পারবেন না। আর সেজন্যই বারবার আমাকে বলে পাঠাচ্ছেন।

ওদের দুজনের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত আমি 'বিষটা' গিলতে বাধ্য হলাম। আমি রাজী হতেই উমাশংকর সুনীতিবাবুর কাছে গিয়ে সেই বার্তা পৌঁছে দিল। সুনীতিবাবু খুব খুশি।

রাগ কমেনি। ভেতরে চেপে রেখে 'হ্যাঁ' বলেছি। 'হ্যাঁ' বলে আমি ওই জায়গায় হানা দেওয়ার জন্য ফোর্সও প্রস্তুত করে রাত ন'টা নাগাদ উমাশংকরকে নিয়ে রাগটা একটু তরল করতে উধাও হয়ে গেছি। আসলে উধাও হইনি। আমাদেরই দফতরের একটা ঘরে দুজনে ঢুকে কনস্টেবল শচীনকে ঘরের বাইরে পাহারায় বসিয়ে ওকে দিয়েই ঘরের বাইরে একটা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছি, যাতে কেউ ওই ঘরের দিকে নজর দিলে বুঝতে না পারে ঘরের ভেতর কেউ আছে।

আসলে আমরা জানি, সুনীতিবাবুই আমাদের খোঁজ করবেন। কারণ আমরা শতবাবুর কাজটা করতে বের হলাম কিনা সেটা না দেখে তিনি বাড়ি ফিরে যাবেন না। তাই তিনি যে আমাদের খোঁজ করবেন সে ব্যাপারে আমরা প্রায় নিশ্চিত। দশটার মধ্যে আমাদের দফতর প্রায় ফাঁকা। সুনীতিবাবু আমাদের না দেখতে পেয়ে এদিক ওদিক দফতরের ভেতর ঘুরে দেখছেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি শচীনকে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করলেন, "কি রে তুই এখানে কেন বসে আছিস?" শচীন দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম ঠুকে বলল, "আমার ডিউটি শেষ হয়নি স্যার।" সুনীতিবাবু জানতেন শচীন আমার গতিবিধির মোটামুটি খবর রাখে। তিনি তাই প্রশ্ন করলেন, "রুণুদের দেখেছিস?" শচীন মাথা দু'দিকে নাড়িয়ে ভালমানুষের মতো মুখ করে উত্তর দিল, "না স্যার।" "হুঁ", সুনীতিবাবুর মুখ থেকে একটা আওয়াজ বার হল। তারপর বললেন, "তুই তো তা জানবিই না!" শচীন সুনীতিবাবুর বক্রোক্তিটা হজম করে চুপ করে রইল। সুনীতিবাবু তারপর হনহন করে অন্যদিকে চলে গেলেন।

বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে আমরা সবই শুনতে পেলাম। তিনি চলে যেতে আমি আর উমাশংকর আবার রাগ তরল করতে কাজে নেমে পড়লাম। আধঘণ্টা পর সুনীতিবাবু আমাদের ঘরের সামনে ফিরে এসে শচীনকে একইভাবে বসে থাকতে দেখে বললেন, "কি রে তোর কি এখানেই ডিউটি?" শচীন মিনমিনিয়ে বলল, "না, স্যার।"

সুনীতিবাবু খেঁকিয়ে বললেন, "তবে তখন থেকে এখানেই বসে আছিস কেন?"

শচীন একইভাবে উত্তর দিল, "এমনিই, কেউ তো নেই স্যার। তাই বারান্দায় বসে দেখছি, কে এল, কে গেল।" সুনীতিবাবুর গলা দিয়ে আবার একটা "হুঁ" শব্দ বার হল, তারপর তিনি বললেন, "তবে তুই কিছু জানিস না?" শচীন অবাক হওয়ার গলায় বলে উঠল, "কী স্যার?" সুনীতিবাবু খেঁকিয়ে বললেন, "জানিস না যখন, তখন আর শুনে কী করবি? তুই তো জানিসই না রুণুরা কোথায় গেছে।" শচীনও উত্তরে বলল, "না স্যার।" সুনীতিবাবু অন্যদিকে যেতে যেতে বললেন, "তুই তো জানবিই না, শালা---।"

আবার তিনি প্রায় এগারোটা নাগাদ ফিরে এসে শচীনকে ধরলেন। আসলে তিনি ফাঁকা

দফতরে আমাদের না দেখতে পেয়ে ছটফট করছেন। এদিকে এগারোটা বেজে যাচ্ছে, আমরা শতবাবুর বাগবাজার অঞ্চলে হানা দেওয়ার জন্য ফোর্স প্রস্তুত রেখেছি কিনা তাও তিনি সঠিকভাবে জানেন না। এদিকে হানা দেওয়ার আগে যে আমাদের একটা 'সাজ সাজ' ভাব থাকে, তাও দেখতে পাচ্ছেন না। ঘড়িতে সময় উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে, তাঁর টেনশন বাড়ছে। তিনি তাই শচীনের কাছে ফিরে আসছেন আমাদের খোঁজের জন্য। শচীন যে আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ কনস্টেবল, তা তিনি খুব ভালভাবেই জানেন। তাই শচীনকেই ধমকে বললেন, "এখনও বসে আছিস?" শচীন কোনও মতে বলল, "এবার যাব স্যার।" "তখন থেকে তো খালি যাব যাব করছিস, যাচ্ছিস তো না, আমি কিছু বুঝি না বুঝি?" সুনীতিবাবুর ধমক আমরা শুনতে পেলাম। শচীন কী বলল ভালভাবে শুনতে পেলাম না। শচীনের উত্তরের পর সুনীতিবাবু আমাদের তালা লাগানো বন্ধ ঘরটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "এই ঘরে কে আছে রে?" শচীন এবার দৃঢ়ভাবে উত্তর দিল, "কেউ নেই তো স্যার। তালা লাগানো দেখতে পাচ্ছেন না স্যার?"

সুনীতিবাবু গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তবে ভেতরে লাইট জ্বলছে কেন? শালা, কনস্টেবল, শালা !" ,

শচীন কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমিই ভেতর থেকে হস্তক্ষেপ করলাম। যেন কিছুই বুঝতে পারিনি, এইভাবে শচীনকে উঁচু গলায় বললাম, "এই শচীন, বাইরে কোন শালারে?"

আমার গলায় খিস্তি শুনে সুনীতিবাবু বলে উঠলেন, "কেউ না, কেউ না।"

তারপর তিনি নিজের মান বাঁচাতে প্রায় দৌড়ে প্রস্থান করলেন। একটা ব্যাপারে তিনি অবশ্য নিশ্চিত হলেন, আমরা দফতরেই আছি এবং আমরা কী করছি সেটাও তিনি বুঝে গেলেন। তাঁর তো এত শত জানার দরকার নেই। তাঁর দরকার কমিশনার সাহেবের নির্দেশমতো কাজটা সম্পূর্ণ হওয়া।

রাত বারোটা নাগাদ সেই কাজটা করতে লালবাজার থেকে বিরাট বাহিনী ও বড় বড় গাড়ি নিয়ে বার হলাম বাগবাজারের উদ্দেশে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা শতবাবুর তালিকায় চিহ্নিত করা সি.পি.আই. (এম) অধ্যুষিত এলাকায় পৌঁছে গেলাম।

তারপর বিরাট বাহিনী দিয়ে এলাকাটা ঘিরে ফেললাম। যেমনভাবে নকশালদের তল্লাশি করার সময় সেনাবাহিনী কিংবা সি আর পি দিয়ে এলাকা ঘিরে থাকি, ঠিক এই কায়দায় ঘিরলাম। তারপর শতবাবুর তালিকা অনুযায়ী বাড়ি বাড়ি গিয়ে অল্পবয়সী, মাঝবয়সী লোকেদের গ্রেফতার করে আমাদের ভানে ও লরিতে তুলে নিলাম। ঘুমন্ত মানুষগুলো অবাক দৃষ্টিতে আমাদের দেখছে।

আমাদের তুলকালাম কাজ দেখে আরও অবাক। পরপর সারিসারি বাড়িতে হানা দিয়ে যাকে পেলাম তাকেই তুলে আনলাম। এমন কি, ওই তালিকায় যাদের নাম নেই তাদেরও দু'চারজনকে গ্রেফতার করলাম। যদি 'মহান' নেতার ভোট তাতে আরও বাড়ে।

শেষ রাতে বাগবাজারের ওই লোকগুলোকে আমরা লালবাজারে নিয়ে এসে সেন্ট্রাল লকআপে ঢুকিয়ে দিলাম। তাদের কাউকে একটা প্রশ্নও করলাম না। এমন কি তাদের মধ্যেই দু'একজন, যাদের বয়স একটু বেশি ছিল, তারা যখন জিজ্ঞেস করল, "আমাদের কী জন্য ধরে আনলেন জানতে পারি কি? আমাদের নামে কি গ্রেফতারি পরোয়ানা আছে?"

উত্তরে প্রায় মৌনতা অবলম্বন করলাম। আমরা তো আর তাদের বলতে পারি না, ওদের নামে শত ঘোষের আদালতের গ্রেফতারী পরোয়ানা আছে। একসময় বাধ্য হয়ে আমরা উত্তর দিলাম, "আগামীকাল সকালেই সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন।"

কারণ আমরা তো জানি ভোরবেলাতেই 'আদালত' স্বয়ং লালবাজারে ওদের 'মুক্তির আদেশ' নিয়ে এসে হাজির হবেন।

হ্যাঁ। সকালবেলাতেই সুন্দরভাবে কংগ্রেসী সাজে মূর্তিমান আদালত শতবাবু গাড়িতে

চড়ে লালবাজারে এসে হাজির। তিনি মোলায়েমভাবে বিশেষ নেতা নেতা কায়দায় মুখে হাসি ছড়িয়ে গাড়ি থেকে নামলেন। তাঁর ওই হাসি দেখে আমাদেরই দলের একজনের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, “শালা —-।” আমি ওর দিকে হাত বাড়িয়ে ইশারায় থামিয়ে দিলাম। তবু সে আমাকে বলল, “না স্যার, এসময় কাজ ছাড়া একটা রাত ফালতু জেগে কাটানোর কোনও মানে হয়?”

আমি ওর জ্বালাটা বুঝি, একই জ্বালায় তো আমরাও জ্বলছি, কিন্তু চাকরির জালে জড়িয়েই তো এদের আবদারের গরল আমাদের জোর করে গিলতে হল। হজম করতে হল।

শতবাবু আমাদের গোয়েন্দা দফতরেরই ওপরে উঠে এসে হাসি হাসি মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “ভাইটি, তোমরা এ কি করেছ? আমায় না জানিয়ে আমার প্রাণ নিয়ে চলে এসেছ?”

তারপর নিচু গলায় বললেন, “ওদের ক'জনকে এখানে নিয়ে এস।” অর্থাৎ উনি যে কতখানি দরদী, কতখানি জনগণের সেবক, কতটা দেশপ্রেমিক সেটার সাক্ষী হওয়ার জন্য ওঁর নির্বাচনী এলাকার ওই নকল বন্দীদের ওইখানে প্রয়োজন। তারা দেখবে, কীভাবে তিনি তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে গেলেন। আর সেটাই তারা বাইরে বেরিয়ে প্রচার করবে। আর সেই প্রচারের ফল হিসাবে তাঁর ভোট বাক্স ফুলে উঠবে। মহান নেতার অনুরোধ মতো সেন্ট্রাল লকআপ থেকে মাঝবয়সী পাঁচ ছ'জনকে আমাদের দফতরে ওঁর সামনে নিয়ে আসা হল। তিনি ওদের দেখে প্রায় কেঁদে ফেলার মতো গলায় বললেন, “ইস, ভাইটি, এদের তোমরা গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছ? ছিঃ ছিঃ, এটা, ভাইটি তোমরা কী করলে?” তারপর তিনি কথা ঘুরিয়ে ওই বন্দী ভদ্রলোকেদের নাম ধরে ধরে জানতে চাইলেন, “কি রে, ওরা তোদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার কিছু করেনি তো?” ওরা কেউ উত্তর দেওয়ার আগেই কারও কারও গাল ধরে বললেন, “ইস, ভাইটি তোর মুখটা তো একেবারে শুকিয়ে কাঠ, কিছু খেতে দেয়নি বুঝি, আর চিন্তা করিস না, আমি তো এসে গেছি। তোদের সবাইকে নিয়ে যাব। কাল রাতে যখন শুনলাম, তোদের সব এখানে নিয়ে এসেছে, তখন থেকেই আমার ঘুম নেই। রাতেই আসতাম, কিন্তু রাতে ওদের কাউকে পাব না বলে আজ সকালবেলাতেই চলে এসেছি, আমার প্রাণটা কেমন করছে।”

আমরা সবাই ওঁর অভিনয় দেখে যাচ্ছি। সম্ভবত ওই ভদ্রলোকগুলোও। তারা বেশিরভাগই তাঁর বিপরীত পার্টির সমর্থক। তারা কে কী বলবে তাই কিছু ভেবে পাচ্ছে না।

মহামান্য নেতা এবার ঘুরে আমাদের বড়সাহেবকে বললেন, “আমার ভাইদের সব ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।” সুনীতিবাবু সাজানো চিত্রনাট্যের কথা অনুযায়ী বললেন, “কিন্তু এরা তো সব নকশাল, এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে।”

শতবাবু একগাল হেসে বললেন, “দূর, এরা আবার কবে থেকে নকশাল হল, এরা সবাই আমার লোক। এদের মা বাবাকে আমি ছোট্টবেলা থেকে চিনি, এদের আমি জন্মাতে দেখেছি।” তারপর ঘাড়টা ঘুরিয়ে বাগবাজারের ওই ধৃত লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, “কি, ঠিক কিনা ভাইটি?”

"উত্তরে ওদের মধ্যে দু'একজন মাথা নাড়ল। শতবাবু আবার বড়সাহেবের দিকে ফিরে বললেন, “দিন, কোন কাগজে সই করতে হবে করে দিচ্ছি, ওদের সবাইকে ছেড়ে দিন।” বড়সাহেব বললেন, “কিন্তু...” নেতা হেসে হেসে বললেন, ‘কোনও কিন্তু নয়, সব আমার জিম্মায় ছেড়ে দিন। এরা সব আমার আপনজন, আমার প্রাণ, এরা এখানে থাকবে আর আমি বাড়িতে নিশ্চিন্তে থাকব, তা কি হয়? কোনও কিন্তু নয়, কথা দিচ্ছি, ওরা কেউ কিচ্ছু করবে না, ওরা নকশালও নয়, যদি কেউ কিছু করে আমাকে বলবেন, আমি মাথা পেতে মেনে নেব।' বক্তৃতার ঢঙে এত কথা বলে তিনি আবার নিরপরাধ ভদ্রলোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, “কি ঠিক কিনা?” সব কথাই যে 'ঠিক', তিনি ওদের একবার করে মাথা নাড়িয়ে ঝালিয়ে নিচ্ছেন।

সবাই মুক্তি পেল। আসলে ওই বন্দীদের কারও নামেই তো আমরা মামলা করিনি। সুতরাং তাদের মুক্তি পেতেও কোনও অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই। নেতা তাদের নিয়ে মিছিল করে বাগবাজারের দিকে বীরদর্পে এগিয়ে গেলেন।

শতবাবুর চমকে চমকিত হওয়া একরাতের মধ্যেই বন্দী থেকে মুক্ত হওয়া লোকগুলোর মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তারা তখনও নাটকের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তবু হই হই করে মিছিলে চলেছে।

এই চমকের রাজনীতির রাহুদশা থেকে আমাদের দেশ মুক্ত হবে না? কেউ চমক দেখান সরাসরি গলা কেটে, কেউ ধর্মঘট, ঘেরাও করে। কেউ ধর্ণা বা হামলা করে। কেউ চমকের রাজনীতি করবেন না বলে প্রতিদিন নতুন নতুন চমকের জন্য রাস্তায় নামেন, প্রশাসনের সব কাজেই বাধা দিয়ে খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় নাম তোলেন কিংবা যখন তখন যেখানে সেখানে রাস্তা অবরোধ করে যার তার মৃত্যুঘণ্টা বাজান। কেউ বা এয়ারকন্ডিশনড 'জেলখানায়' থেকে সেলুলার ফোনে রাজ্য চালান, আবার দরকার হলে ময়দানে নেমে হনুমান নৃত্য দিয়ে থাকেন। কেউ বা বোমা ফাটিয়ে 'জয় বিজ্ঞান' বলে হেসে জনগণকে একগাল হাসি উপহার দেন। কেউ বা চমক খুঁজতে খুঁজতেই সারা দেশ ঘুরে বেড়ান।

আসলে এঁরা তো বোঝেন না, চমকে আর কাজ হচ্ছে না, ওঁদের চমকে ওঁদের ভাইবোনরা ছাড়া আর কেউ উল্লসিত হচ্ছে না। সারাদিন অজস্র গলায় বিভিন্ন ভাষায় ওদের জন্য বর্ষিত হচ্ছে বাছাবাছা খিস্তি খেউড়। ওরা যে এক একটা ভাঁড় তা আর এখন জনসাধারণকে বলে দিতে হয় না।

গত পঞ্চাশ বছর ধরে দেশনেতা নামে দেশ যে কতগুলো অকালকুষ্মাণ্ড, লোভী, ভোগী, শয়তান জন্ম দিয়েছে সেটা ভারতবাসী জেনে গেছে। তবু এই দেশসেবকরা সারা দিনরাত মানুষকে বোকা বানানোর জন্য 'চমক খুঁজে' বেড়ান। দেউলিয়া এসব রাজনৈতিক দাদা দিদিরা এটাও জানেন না, 'চমক' রাস্তায় রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। আর শুধু চমক দিয়ে ভারতবর্ষের কোনও উপকার হবে না। অবশ্য চমক ছাড়া ওঁদের ভাণ্ডারে আর কোনও পুঁজিও নেই।

চারুবাবু ভেবেছিলেন খুনের চমকে তিনি দলে দলে মানুষের সমর্থন ও সদস্য যোগাড় করে তাঁর শক্তি বাড়াতে পারবেন। তাই তিনি খুন করার লাইসেন্স তাঁর পার্টির সদস্যদের মুক্ত হস্তে দিয়ে দিয়েছিলেন।

এগারো তারিখ সকাল সোয়া দশটা নাগাদ মুচিপাড়া থানার বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট ও মদন দত্ত লেনের সংযোগস্থলে সি.পি.আই.(এম) পার্টির ক্যাডারদের সঙ্গে নকশালদের আর একটা খণ্ডযুদ্ধ শুরু হল। দু'পক্ষই খুন করার প্রচণ্ড তাগিদ নিয়ে একে অপরের দিকে তাক করে ছুঁড়তে লাগল বোমা। বৌবাজারের ভীত, সন্ত্রস্ত নাগরিকরা অভ্যস্তভাবে এদিক ওদিক ছুটতে লাগল। কিন্তু সবাই তো আর পালানোয় বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেনি। মদন দত্ত লেনের হরিমতি দাসী বোমার ঘায়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। তার সঙ্গে আরও তিনজন। কিন্তু ক্রুদ্ধ দু'পক্ষের বোমা ও পাইপগানের যুদ্ধের বিরাম নেই। তারা যেন বদ্ধপরিকর পরস্পরকে খতম করার জন্য।

মুচিপাড়া থানার পুলিশ পৌঁছল। সঙ্গে সি.আর.পি. জওয়ানের ফোর্স। তারা যুদ্ধ থামাতে গুলি চালাল। তাদেরও বোমা বৃষ্টির আঘাত সহ্য করতে হল। এভাবে কেটে গেল প্রায় ঘণ্টা খানেক।

আহত চারজনকেই পাঠানো হলো মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সন্ধেবেলায় হরিমতী দাসী মারা গেলেন।

তেরো তারিখ রাত সাড়ে ন'টার সময় আহিরীটোলা স্ট্রিটের কাছে একশ পনের নম্বর

মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডের সামনে বছর পঞ্চাশ বয়সী একজন পুরুষ ছুরির আঘাতে সাংঘাতিকভাবে আহত হল। আহত পুরুষকে উদ্ধার করে মেয়ো হাসপাতালে পাঠানো হল। কিন্তু গভীর রাতেই হাসপাতালের বিছানায় সে মারা গেল। পুরুষের আহত শরীরের সঙ্গে একটা চিরকূট লাগানো ছিল। তাতে লেখা, “এভাবেই প্রতিক্রিয়াশীলদের খতম অভিযান চলছে, চলবে। শ্রদ্ধেয় নেতা আমাদের পথ দেখাচ্ছেন, জয় আমাদের হবেই হবে।”

সেই পুরুষটি আর কেউ নয়। আমাদেরই কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল মহেশ সিং। ‘প্রতিক্রিয়াশীল' মহেশকে খতম করে চারুবাবুর ক্যাডাররা ভারতবর্ষের মুক্তিকে অনেক ত্বরান্বিত করল !

চোদ্দ তারিখে সকাল সাড়ে দশটার সময় বড়তলা থানার অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিট ও তারক চ্যাটার্জি স্ট্রিটের মোড় দিয়ে রামদয়াল বেনিয়া নামে এক যুবক রিক্সা চড়ে যাচ্ছিল। তাকে ওইখানে নামিয়ে নকশালরা টানতে টানতে নিয়ে গেল স্ট্র্যান্ড রোডের বেনিয়াটোলা স্নান ঘাটের কাছে। তারপর ছুরির ফলা দিয়ে তার সর্বাঙ্গ চিরে চিরে তাকে ফেলে দিয়ে চলে গেল। যেন তাড়াতাড়ি গঙ্গাপ্রাপ্তির জন্য রামদয়ালকে স্নান ঘাটের কাছে নিয়ে এসে খুন করা হল।

রামদয়ালের চরিত্র যদিও খুবই নিম্নমানের ছিল। সে বেশ্যাসক্ত ছিল। প্রায় প্রতিদিনই সোনাগাছি অঞ্চলে যাতায়াত করে রাত কাটাত। কিন্তু এটাই যদি অপরাধ হয়ে থাকে, তবে সমগ্র কলকাতায় আরও লক্ষ লক্ষ লোককে খতম করা উচিত এবং সেই খতমের তালিকায় অনেক ‘বিপ্লবীর’ নামও যে উঠে আসবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

নকশালদের ‘শ্রদ্ধেয় নেতার চিন্তাধারার নির্ভুল বিজ্ঞান' এটা বলেছে কি, সমগ্র নারীসক্ত, বেশ্যাসক্ত মানুষকে একদিনে খুন করে দিলেও ভারতবর্ষের ‘মুক্তির’ পথ এক কদমও এগোবে না? হাজার বছরের পরিকাঠামো বিন্দুমাত্র টাল খেয়ে হুমড়ি খেয়ে বিপ্লবীদের পায়ে পড়বে না? সুতরাং একটা রামদয়াল মারা গেল কি না গেল তাতে কিছু যায় আসে না। আসলে খুনের লাইসেন্স পেয়ে যাকে তাকে খুন করার প্রবণতার তাগিদেই রামদয়ালকে নকশালরা খুন করল।

সত্তর একাত্তর সাল জুড়ে আমাদের প্রতিদিনের একটা রুটিন কাজ ছিল। তা হলো সি.পি.আই.(এম) ক্যাডারদের সঙ্গে নকশালদের সংঘর্ষ থামানো। একদল চায় ‘মাকু’ মেরে বিপ্লব এগিয়ে নিয়ে যেতে, অন্যদল চায় ‘উগ্রপন্থী’ শেষ করে বিপ্লবের ক্ষতিগ্রস্ত জীবাণুকে খতম করে ‘বিপ্লবী পথকে' রক্ষা করতে, যাতে ঘণ্টা বাজলেই দলে দলে লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দেয়। দু’টো কমিউনিস্ট সাইনবোর্ডধারী পার্টির ক্যাডাররা রুটিন মাফিক পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিদিন এভাবে যুদ্ধ অন্য কোনও দেশে করেছে কিনা জানি না, তবে আমাদের এখানে আমাদের তা প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে এবং সেই যুদ্ধ থামাতে হস্তক্ষেপ করা আমাদের একটা বিশেষ কাজের মধ্যে পড়ত।

তেইশ তারিখ দুপুর দেড়টার সময় আবার যুযুধান দুই পার্টির ক্যাডাররা বিডন স্ট্রিটের মিনার্ভা থিয়েটার হলের কাছে শুরু করল পরস্পরের বিরুদ্ধে খতম অভিযান। এ যুদ্ধের জন্য তো কোনও স্থান, সময়, নির্দিষ্ট করা নেই। যেখানে খুশী, যখন খুশী শুরু করলেই হল। দু'পক্ষের কাছেই মজুত আছে অজস্র বোমা, পাইপগান, ছুরি, ভোজালী, পিস্তল, রিভলবার সমেত আরো হরেকরকম আগ্নেয়াস্ত্র। ওই সব আগ্নেয়াস্ত্র যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করার জন্যই তো রাখা হয়েছে। রাখা হয়েছে অপরপক্ষকে নিকেশ করার জন্য। সুতরাং লুকিয়ে রেখে লাভ কী।

এখানেও ব্যবহার হল। আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের বাহিনী রুটিন মাফিক যুদ্ধ থামাতে পৌঁছে গেল বিডন স্ট্রিটের রণক্ষেত্রে। বিপ্লবীদের 'বিপ্লব' থামাতে।

যুদ্ধ থামানোর পর দেখা গেল, পাঁচের বি অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিটের দেবী বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে দেবীপ্রসাদ সিং নামে পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের এক সি.পি.আই.(এম)

পার্টির তরুণ সদস্য অসংখ্য ছুরির আঘাত শরীরে নিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় অচৈতন্য শুয়ে পড়ে আছে।

তাড়াতাড়ি দেবীকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হল, কিন্তু ভর্তি হওয়ার কিছুক্ষণ পরই সে জীবনের 'বিপ্লব' সমাধা করে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তার দেহ চলে গেল পোস্টমর্টেম রিপোর্টের জন্য অপেক্ষার লাইনে।

চব্বিশ তারিখ সকাল দশটা নাগাদ আমাদের কলকাতা পুলিশের রিজার্ভ ফোর্সের কনস্টেবল হরিহর অধিকারী কর্মস্থলে হাজিরা দেওয়ার জন্য গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিট দিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে বিধান সরণি অভিমুখে যাচ্ছিল।

কিন্তু ওর জন্যই যে সাত আট জন নকশাল অপেক্ষা করে আছে, তা তো ও জানত না। জানত না ওর রক্তে হোলি খেলে, হাতের তালুতে মেহেন্দির মতো রক্ত মেখে নকশালরা দেশসেবা করবে। হরিহর তাই হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ নকশালরা মাটি ফুঁড়ে ওকে ঘিরে ধরল। হরিহর পালানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ব্যর্থ। তার আগেই ওর তলপেটে ঢুকে গেছে নকশালদের লম্বা ছুরি।

হরিহর তলপেট ধরে 'ওমা' আর্তনাদ করে রাস্তায় বসতে যাচ্ছিল। পারল না। দুজন নকশাল ওর দু'হাতের কনুইয়ের কাছটা ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে রাখল। আর একজন পরপর ছুরি দিয়ে ওর তলপেট ফাঁসাতে লাগল। দু'তিন মিনিট এভাবে একের পর এক ছুরির ফলা হরিহরের পেটে ঢুকিয়ে নকশালরা তাদের প্রিয় স্লোগানগুলো দিতে দিতে চলে গেল।

হরিহর রাস্তায় উপুড় হয়ে শুয়ে রইল। আমাদের বাহিনী পৌঁছে হরিহরকে নিয়ে গেল সেই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ওকে কোনও রকম চিকিৎসা করার আগেই মারা গেল।

সেদিনই সন্ধেবেলা জোড়াবাগানের ছ'নম্বর গোপীমোহন পাল লেনের সামনে নকশালরা এক হোমগার্ডকে ছুরি মারল। সেই হোমগার্ডকে বাঁচাতে ছুটে এলেন তার মা। নকশালরা তাদের বিপ্লবের কাজে বাধা পেয়ে সেই ভদ্রমহিলার তলপেটে ঢুকিয়ে দিল আর একটা ছুরি। তারপর পালাল।

পরদিন ওই জোড়াবাগানেরই মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড ও কারফার্মা রোডের সংযোগস্থলে আবার দুই যুদ্ধরত কমিউনিস্ট পার্টি সন্ধে সোয়া পাঁচটার সময় শুরু করল পরস্পরের বিরুদ্ধে বোমা দাগা।

আধঘণ্টা চলল বোমা যুদ্ধ। জোড়াবাগান থানার পুলিশ যুদ্ধ, থামাতে গুলি চালাল। গুলি লাগল দুই নকশাল তরুণের গায়ে। একজন কোনও চিকিৎসার সুযোগ দিল না ডাক্তারদের। অন্যজনকে তুলে বাকি নকশালরা যুদ্ধে বিরতি দিয়ে পালাল। সে বাঁচল কি মারা গেল, একমাত্র তার কমরেডরাই জানে।

পয়লা এপ্রিল অমৃতবাজার পত্রিকার ডিরেক্টর সুচারু কান্তি ঘোষকে নকশালরা পঞ্চাননতলা লেনে খুন করার পর দোসরা এপ্রিল ওরা বিডন স্ট্রিট পোস্ট অফিসে পাহারারত আমাদের রিজার্ভ ফোর্সের দু'জন কনস্টেবলকে আক্রমণ করল।

দুপুর দু'টোর সময় নকশালরা বিডন স্ট্রিট পোস্ট অফিসের ভেতর ঢুকে কনস্টেবল শ্রীকান্ত দত্ত, বন্ধুশ্যাম বর্মণকে রিভলবার ও পিস্তল দিয়ে আক্রমণ করল। ওরা দুজন পোস্ট অফিসের ক্যাশ বাক্সের নিরাপত্তা দেখার জন্য নিয়োজিত ছিল। নকশালরা প্রথমেই আক্রমণ করল শ্রীকান্তকে। পরপর বুকে দুটো গুলি খেয়ে কিছু বোঝার আগেই শ্রীকান্ত ওইখানে লুটিয়ে পড়ল। নকশালরা ওর রিভলবার নিয়ে নিল।

কনস্টেবল বর্মণ শ্রীকান্তের থেকে হাত কয়েক দূরে পোস্ট অফিসের ভেতরে ছিল। সে তার রিভলবার দিয়ে আক্রমণকারীদের লক্ষ্য করে পরপর পাঁচটা গুলি করল। তাতে একজন তরুণ নকশাল আহত হতে তার কমরেডরা তাকে নিয়ে পোস্ট অফিস ছেড়ে পালিয়ে গেল।

নকশালদের গুলিতে হৃদপিণ্ড ভেদ হয়ে যাওয়া শ্রীকান্তকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ঠিকই। তা শুধু ডাক্তারবাবুদের 'শেষ' ঘোষণা শোনার জন্যই

সেদিন রাতেই আমরা শ্রীকান্তকে হত্যার দায়ে গ্রেফতার করতে সমর্থ হলাম চারুবাবুর পার্টির কর্মী অশোক ভট্টাচার্য, সুনীল রায় ও মঙ্গাকে।

আট তারিখে জোড়াবাগান থানার অফিসার পি ঘোষ রাত পৌনে দশটা নাগাদ আহিরীটোলা স্ট্রিটের দিকে একটা তদন্তের জন্য রবীন্দ্র সরণি দিয়ে আটজন কনস্টেবল ও হোমগার্ড সঙ্গে করে যাচ্ছিলেন। ঠিক আহিরীটোলা স্ট্রিটের মুখে নকশালরা ওদের বোমা নিয়ে আক্রমণ করল। ওরা হঠাৎ আক্রমণে দিশেহারা হয়ে যে যে দিকে পারল পালাল। ওদের প্রত্যেকের গায়ে লেগেছে বোমার স্প্লিন্টার। কিন্তু তখন সে সব দেখার সময় নেই।

বোমার তীব্র ঝলসানো আগুন ও ধোঁয়ার ভেতরেই নিজেদের রক্ষা করার জন্য নিরাপদ জায়গা খুঁজতে লাগল।

তারপর প্রতিআক্রমণ করে তারা যখন নকশালদের হাত থেকে বাঁচল, তখন দেখা গেল হোমগার্ড মোহনলাল গুপ্তার আঘাত সাংঘাতিক। তার মাথায় ঢুকেছে বোমার টুকরো। তাছাড়া আরও তিনজন হোমগার্ড ও দুজন কনস্টেবলও বেশ ভালভাবেই আহত। হাসপাতালে সবাইকে ভর্তি করানো হল। সবাই সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে মুক্তি পেয়ে বার হলেও মোহনলাল আর বার হল না। সে চলে গেল অন্যপারে। যেখানে জীবন আর মৃত্যুর মাঝে কোনও সীমারেখা নেই।

জোড়াবাগান, জোড়াসাঁকো এলাকায় আমাদের প্রায় দিনই হানা দিতে হতো। সেখানকার বস্তি অঞ্চলের ছোট ছোট শিশুরাও বোমা ছুঁড়তে দারুণ পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। চিরুনি তল্লাশির সময় আমাদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর অফিসার ও জওয়ানরা থাকতেন। একদিন সেনাবাহিনীর এক অফিসার আমাকে হিন্দিতে প্রশ্ন করলেন, "আরে দাদা, এখানে বাচ্চারা কি মায়ের পেট থেকেই বোমা হাতে জন্মায়?" আমি তাঁকে আর কী বলব? বললাম, "না। এখানে কলম হাতেও জন্মায়, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান ও তাঁর পূর্বপুরুষদের ভিটে বাড়ি এলাকা। আর এই যে দেখছ বাচ্চাদের বোমাবাজি, এগুলো একান্তই সাময়িক, থেমে যাবে। ওরা এগুলো ভেবেছে খেলা, তাই খেলার ছলেই ছুঁড়ে মারে। অনেকটা দিওয়ালির উৎসবের মতো।"

আমার উত্তর শুনে তিনি কী ভাবলেন, কে জানে, শুধু "অ" করে চুপ করে গেলেন।

বি.কে.পাল অ্যাভেনিয়ুর আশেপাশের অঞ্চলে চোরাগোপ্তা বোমা ছোঁড়ার তীব্রতা ছিল উত্তর কলকাতার মধ্যে সবচেয়ে বেশি। আমাদের সাবধানতা, সতর্কতাও ছিল স্বাভাবিক কারণেই বেশি। ওই অঞ্চলে হানা দেওয়ার জন্য আমাদের দল নির্বাচনও করতাম বাছাই করা সব অফিসার ও অন্য কর্মীদের নিয়ে, যারা শারীরিক দিক থেকে ছিল তুলনামূলকভাবে ক্ষিপ্র।

একরাতে ওই অঞ্চলে আমাদের সঙ্গে হানা দিতে গেলেন তপেনদা তপেনদার হাঁটাচলা এবং স্বাভাবিক চলন একটু ঢিলেঢালা। গাড়ি থেকে নেমে তিনি আগে আগে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তাড়াতাড়ি আমি এগিয়ে গিয়ে তপেনদাকে বললাম, "স্যার, আপনি এভাবে এগিয়ে যাবেন না। আমাদের সামনে যেতে দিন। আপনি আমাদের পেছন পেছন আসুন।"

তপেনদা ডান হাতটা দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে আমার বক্তব্যটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, "দূর, এরা সব শিশু, নাবালক, এসব বালখিল্যদের খেলায় ভয় পাওয়ার কী আছে, এরা কী করবে?" আমি তপেনদাকে ভালভাবে চিনি। বললাম, "স্যার, ওরা সব নাবালক হলেও, ওদের বোমাগুলো কিন্তু নাবালক নয়, একটা যদি সোজা মাথায় এসে লাগে, মাথাটা ঘাড় থেকে আলাদা হয়ে ছিটকে রাস্তার ওপর গিয়ে পড়বে। আপনি জানতেও পারবেন না, নাবালকটার বয়স কত।"

তপেনদা আমার কথা শুনে একটু হাসলেন। কিন্তু আমরা হাসলাম না। আমি,

উমাশংকর, শচী মিলে তপেনদাকে আমাদের পেছনে প্রায় জোর করে পাঠিয়ে দিলাম।

তার ঠিক মিনিট দশেক পরেই আমাদের দলের থেকে হাত তিরিশেক দূরে পরপর তিনটে বোমা প্রচণ্ড শব্দে ফাটল। মেঘের গুরুগুরু ধ্বনির মতো সেই আওয়াজ ধাক্কা খেতে লাগল, এদিক থেকে ওদিকে। তপেনদাকে জিজ্ঞেস করলাম, "স্যার, এ সব কি বালখিল্যদের খেলা?"

এগুলো যে নিছক বালখিল্যদের খেলা নয়, তা যারা বোঝার ঠিকই, বুঝেছে।

দশ তারিখ সকাল ন'টা নাগাদ গ্রে স্ট্রিট এক্সটেনশনে নিজের বাড়িতে হাওড়া জি আর পির ডি.এস.পি. সুবোধ দত্ত নকশালদের আক্রমণের সামনে পড়লেন। তাঁকে এলোপাথাড়ি গুলি করে নকশালরা পালাল।

তেরো তারিখ রাত ন'টার সময় গৌতম রায় ওরফে গৌরকে নকশালরা রাসবিহারী অ্যাভিনিয়ু ও পণ্ডিতিয়া রোডের মোড়ে ধরে গুলি করে হত্যা করল। চারুবাবুর দলের সদস্যরাই একমাত্র বলতে পারবে কেন তারা গৌতমকে খুন করেছিল। তার বিরুদ্ধে ন্যূনতম অভিযোগই বা কী ছিল, যাতে তার রক্তে হাত ভিজিয়ে ওরা 'বিপ্লবের' বিস্ফোরণ ঘটাল?

পনেরো তারিখ সন্ধেবেলা, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড ও ক্যাথিড্রাল রোডের সংযোগস্থলে আমাদের ট্রাফিক কনস্টেবলের কাছ থেকে তার রিভলবার ও ছ'রাউন্ড গুলি ছিনতাই করে নকশালদের একটা অ্যাকশান স্কোয়ার্ড পালাল। সেই কনস্টেবল ছুরির অসংখ্য আঘাত নিয়ে শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে লাগল।

উনিশ তারিখ দুপুর পৌনে একটার সময় মানিকতলার বাগমারী পার্কে সি.পি.আই. (এম) কর্মী নির্মল করকে নকশালরা ঘিরে ধরল। নির্মলের অপরাধ সে 'সংশোধনবাদী' পার্টির কর্মী। সুতরাং তাকে জীবন দিয়ে তার 'ভুল কর্মের' প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তার বুকে পাইপগানের গুলি একটার পর একটা এসে লাগল। নির্মল মাটিতে শুয়ে কাতরাতে লাগল। শেষ গুলিটা তার মাথায়। ওখানেই নির্মল চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়ল। তার প্রায়শ্চিত্ত করা হল !

বাইশ তারিখ সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় চেতলা সেন্ট্রাল রোডে নিত্যানন্দ লাইব্রেরির কাউন্টারে কাজ করছিল ওই লাইব্রেরির কর্মচারী সুকুমার চক্রবর্তী। নকশালরা 'ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে চরম আঘাত' হানতে ছুরি, ভোজালী নিয়ে ঢুকল। তারপর সোজাসুজি কর্মরত সুকুমারের গলার ডানদিকে ভোজালীর এক কোপ। সুকুমারের মাথা ঝুলে গেল। সে কাউন্টারের ওপর পড়ে গেল। তার রক্তে ভাসতে লাগল লাইব্রেরির মেঝে। আরেকটা কোপ। খতম। শেষ।

নকশালরা তাদের শ্রদ্ধেয় নেতার আদর্শ পালন করে উপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আঘাত হেনে স্লোগান দিতে দিতে চলে গেল। মৃত নিত্যানন্দ বুকে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র আগলে শুয়ে রইল মোমিনপুরের মর্গ ঘুরে কেওড়াতলার শ্মশানে যাওয়ার অপেক্ষায়।

চব্বিশ তারিখ রাত আটটার সময় টালিগঞ্জের ভাগীরথী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে শ্যামল চক্রবর্তী নামের এক হোমগার্ড অল্প কিছু মিষ্টি কিনতে ঢুকল। গরীব হোমগার্ড আর কত টাকা মাস মাহিনা পায়। তাই সে এটা সেটা দেখে অবশেষে একটু বোঁদে কিনে, বোঁদের ঠোঙাটা উপুড় করে মুখে ঢেলে চিবোতে লাগল। খানিকটা বোঁদে চিবিয়ে গলায় ঢালল এক চুমুক জল। হঠাৎ তলপেটে ছুরি। শ্যামলের মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল অবশিষ্ট বোঁদে। সে 'মা' ডাক দিয়ে পেটে হাত দিল। কিন্তু তার 'মা' ডাক নকশালদের স্লোগানের আওয়াজের তরঙ্গে ডুবে গেল। আবার ছুরির ফলা তার তলপেটে। শ্যামল কাঁপতে কাঁপতে, চোখের সামনে শুধু অন্ধকার দেখতে দেখতে মিষ্টির দোকানের মেঝেয় ওর মুখ থেকে ছিটকে আসা ছড়ানো বোঁদের ওপর ঝপাৎ করে পড়ে গেল। তার জীবন ঘিরে চিরদিনের জন্য অন্ধকার ঘনিয়ে এল। বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু বেকার। সুকুমার অনেক আগেই মারা

গেছে। চারুবাবুর সশস্ত্র বিপ্লবের প্রক্রিয়ার চাকার তলায় বলিদান দিয়ে সে আর কিছু না হোক ‘প্রতিক্রিয়াশীল' হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারল !

উনত্রিশ তারিখ সকাল পৌনে সাতটার সময় গড়িয়াহাট রোড ও পঞ্চাননতলা রোডের সংযোগস্থলে এক বস্তির মালিক কার্তিক চন্দ্র ঘোষ নামে এক পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধকে, ভোজালী ও লোহার রড দিয়ে কুপিয়ে আর খুঁচিয়ে খুন করে নকশালরা পালাল।

পয়লা মে-র ‘মে দিবসে' আমরা বিশেষভাবে সতর্ক থাকতাম। কারণ নকশালরা শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন শক্তিশালীভাবে কেন, খুব সাধারণভাবেও গড়ে তুলতে না পারলেও, ‘মে’ দিবসে শ্রমিকদের সঙ্গে তাঁদের ‘শ্রেণী সম্পর্ক' বোঝাতে যেখানে সেখানে বোমাবাজি, সংঘর্ষ কিংবা খুন করে ‘বিপ্লবী ঐক্য' প্রতিষ্ঠা করত।

একাত্তরের পয়লা মে কি তার ব্যতিক্রম হতে পারে? সেদিনও সকাল থেকেই বোমাবাজি হতে লাগল। কিন্তু সবচেয়ে বড় সংঘর্ষটা বাঁধল বিবেকানন্দ রোডে। সেখানে সি.পি.আই. (এম) ও নকশালরা দু'পক্ষই 'মে' দিবস পালন করতে একে অপরকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে "শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে' যুদ্ধে নামল। চরম সংঘর্ষ বেলা পৌনে বারোটা নাগাদ। চলল অবিশ্রান্ত বোমাবাজি।

নকশালরা ক্রমাগত বোমাবাজি করতে করতে সি.পি.আই. (এম)-এর ক্যাডারদের কোণঠাসা করে এগিয়ে গেল। সি.পি.আই.(এম)-এর ক্যাডাররা নকশালদের আক্রমণের চাপ সহ্য করতে না পেরে পিছু হটতে লাগল।

আধঘণ্টা এইভাবে চলার পর সি.পি.আই. (এম)-এর সদস্যরা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে পালাল। কিন্তু পালাতে পারল না তাদের দলের উনিশ কুড়ি বছর বয়সের তরুণ সদস্য রামচন্দ্র রায়।

নকশালরা যুদ্ধে জেতার ফসল হিসাবে রামচন্দ্রকে টেনে নিয়ে এল মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের মধ্যে।

তারপর বিজয়োল্লাসের জয়ধ্বনির মাঝে একশ তিপ্পান্ন নম্বর বাড়ির সামনে ওকে কুপিয়ে খুন করে ওর রক্ত পরস্পরের মুখে মাখামাখি করে, 'মে' দিবস পালন করল। ওদের রক্তমাখা লাল লাল মুখগুলো দেখে মনে হতে পারে, ওরা যেন বোঝাতে চাইছে, এই না হলে 'মে দিবসের' আর তাৎপর্য কী রইল?

মে দিবসের শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ ও ঐক্য বোঝাতে চারুবাবুর অনুগামী নকশালরা যে যেমন খুশী পারল স্কুল পোড়ানো থেকে শুরু করে 'খতম' অভিযানপন্থা চালিয়ে যেতে লাগল। অথচ ওদেরই সি.পি.আই. (এম.এল) পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতা সুশীতল রায় চৌধুরী সত্তর সালের নভেম্বর মাসেই ওদের পার্টির ভেতরে 'ভারতবর্ষের বিপ্লবের সমস্যা ও সংকট' নামে একটা নিবন্ধ লিখে প্রচার করলেন। সেই নিবন্ধে তিনি চারুবাবুর নীতির ভুলগুলো খোলাখুলি দেখিয়ে দিলেন। তিনি সেই নিবন্ধে বললেন, "এটা দুঃখের বিষয় যে, আমাদের সফলতার সময়েই মাও সে তুঙের চিন্তাধারার উন্নতি ও প্রয়োগের নামে আমাদের প্রদেশে এমন সব নীতির প্রয়োগ করা হচ্ছে যা কিনা অতিবাম চিন্তা ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং পার্টির সদস্যরা যতক্ষণ না এইসব অতিবাম নীতি ও চিন্তা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন এবং একে না পাল্টানোর চেষ্টা করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত বিপ্লবের গতি ক্ষতিগ্রস্তই হবে। আমাদের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে হঠাৎ প্রচার করা শুরু হলে আমাদের সংগ্রাম খুব দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এবং অনেকটা জ্যোতিষীদের মতো ভবিষ্যৎবাণী করল, বিপ্লবের জয়ের জন্য পঁচাত্তর সালের বেশী অপেক্ষা করতে হবে না। আর এই ধরনের মত প্রকাশ ও কাজের জন্য দ্রুত ফললাভের ইচ্ছারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। যার ফলে যে পার্টি সশস্ত্র সংগ্রামের আদর্শে তৈরী হয়েছিল তা একটা সন্ত্রাসবাদী পার্টিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল।"

সুশীতল বাবু পরিষ্কার ভাবে ওই নিবন্ধে তাঁর পার্টির সদস্যদের মনে করিয়ে দিলেন, "আমাদের প্রদেশে এমন কোনও ঘাঁটি অঞ্চল তৈরী হয়নি, যেখানে প্রয়োজন পড়লে পার্টির সদস্যদের স্থানান্তরিত করা যায়। এই অবস্থায় শহরাঞ্চলে লাল সন্ত্রাস সৃষ্টি করা এবং সেজন্য সদস্যদের উত্তেজিত করা চরম অ্যাডভেঞ্চারিজম ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই উগ্র অতিবাম ঝোঁক, যা আমাদের পার্টির শীর্ষ "থেকে ছড়াচ্ছে তাকে প্রতিরোধ করতেই হবে।"

তিনি তাঁর ওই লেখায় আক্ষেপের সঙ্গে লিখছেন, "কিছু সদস্য চারু মজুমদারকে একটা কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছেন, এমন কি তাঁরা এটা বলেন, এটা চারু মজুমদারের ব্যক্তিগত পার্টি, এখানে চারু মজুমদারকে যাঁরা মানবেন না তাঁরা পার্টিতে থাকতে পারবেন না।"

কিন্তু অতি উৎসাহী চারু মজুমদারের শিষ্যরা সুশীতলবাবুর কথা শুনবে কেন? তারা 'খাঁটি বিপ্লবী প্রক্রিয়া চালিয়ে পঁচাত্তর সালের মধ্যে ভারতবর্ষকে 'মুক্ত' করার কাজে

ভবিষ্যৎদ্রষ্টার বাণী মতো গুপ্ত হত্যা করেই যেতে লাগল।

চার তারিখ সকাল দশটার সময় শ্রীনাথ মুখার্জি লেনে কংগ্রেস সমর্থক বিশ্বনাথ মাইতি ওরফে বিশুকে বুকে গুলি করে হত্যা করল নকশালরা।

সতেরোই মে রাত সাড়ে দশটার সময় উত্তর কলকাতার হাতিবাগানের দর্পণা সিনেমা হলে রাতের শেষ শো দেখার পর আমাদের গোয়েন্দা দফতরের কনস্টেবল রণজিৎ কুমার মজুমদার আমাদেরই কলকাতা পুলিশের আর্মড ফোর্সের অন্য দুজন কনস্টেবলের সঙ্গে হল থেকে বেরিয়ে আসার পরেই ছ'সাতজন নকশাল যুবকের হাতে আক্রান্ত হল।

আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, চোখের পলকে আর্মড ফোর্সের কনস্টেবল দু'জন বিধান সরণি দিয়ে ছুটে পালাল। তাদের নকশালরা ধরতে পারল না। কিন্তু রণজিৎকে ধরে দর্পণা সিনেমা সংলগ্ন মোহনবাগান রোতে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে প্রথমেই ছুরিটা ওর তলপেট লক্ষ্য করে চালিয়ে দিল। ছুরিটা তলপেটের ভেতর বেশি দূর তখনও প্রবেশ করেনি, সে সেই ছুরিটা পেটে চেপে পুবদিকে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোডের দিকে ছুটতে শুরু করল।

সাড়ে দশটাতেই রাত প্রায় নির্জন। মে মাসের গরমেও ঘিঞ্জি মোহনবাগান রোর বাসিন্দারা পরিস্থিতির চাপে যে যার কোটরে ঢুকে গেছেন। উত্তর কলকাতার রকে রকে যে বিখ্যাত আড্ডা বসতো, তাও নকশালদের বিপ্লবী ধাক্কায় বন্ধ হয়ে গেছে। নয়ত বৈশাখ মাসের গরমে উত্তর কলকাতায় সন্ধে সাড়ে দশটার সময় সব বাড়ির জা জানালা বন্ধ থাকবে? রকগুলো থাকবে আড্ডাহীন ফাঁকা?

সিনেমা হল থেকে যে অল্প ক'জন দর্শক বেরিয়েছেন, তাঁরাও সব নিমেষে কোথায় উধাও।

রণজিতের 'বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার বিফলে গেল। রণজিৎ ছুটছে, তার পেছনে হায়নার মতো রক্তের পিপাসায় ছুটছে চারুবাবুর অনুগামীরা। ভারতবর্ষের 'মুক্তির' মহান কর্তবের যে দায় তাদের কাঁধে 'শ্রদ্ধেয় নেতা' দিয়েছেন, তারা কি সেটা পালন না করে হাতছাড়া করবে? তারা রণজিতের মতো এতবড় একটা শ্রেণীশত্রুকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবে? তাহলে তারা আর 'শ্রদ্ধেয় নেতার' আদর্শে বিপ্লবী হল কী করে?

রণজিৎ তলপেটে ছুরি নিয়ে বেশী জোরে ছুটতে পারছে না। তাকে নকশালরা ধরে ফেলল মোহনবাগান রো যেখানটায় এসে মিশেছে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোডে, সেখানটায়। আর কোনও সুযোগ নয়। আর কোনও সুযোগ দেওয়া মানেই নিজেদের 'বিপ্লবী' হওয়ার প্রক্রিয়ায় 'দুর্বলতা' প্রকাশ পাওয়া।

সুতরাং ভোজালীর কোপ। সোজা রণজিতের গলায়। তার চিৎকার বন্ধ। গলগল করে তাজা গরম রক্ত মোহনবাগান রো'র বাঁধানো পিচের ওপর পড়তে লাগল। রণজিৎ সেই রক্তের ওপর আছড়ে পড়ল। তাকে নকশালরা টেনে চিৎ করে আবার গলার ওপর মারল ভোজালীর দ্বিতীয় কোপটা রণজিতের গলা দু'ফাঁক। তার আগেই অবশ্য রণজিতের প্রাণ পাখি উড়ে গেছে। কিন্তু নকশালরা আর কোন দ্বিধায় থাকতে চায় না। 'খতম' হয়েছে নিশ্চিত হয়ে তারা রণজিৎকে মোহনবাগান রো'র সরু রাস্তায় ফেলে নিঃশব্দে চলে গেল।

পরদিন আঠারোই মে সন্ধেবেলায় বিডন স্ট্রিটে ফরওয়ার্ড ব্লক অজিত বিশ্বাসকে গুলি করে হত্যা করল নকশালরা।

বাইশে মে দুপুর সাড়ে বারোটার সময় শ্যামপুকুর থানার অধীনে কেবল কৃষ্ণ সুর স্ট্রিটের ননীগোপাল দে নামে বছর পঁয়ত্রিশ বয়সের কংগ্রেস পার্টির সমর্থককে নকশালরা তার বাড়ির সামনে ঘিরে ধরে ছুরি আর ভোজালী দিয়ে কুপিয়ে পালিয়ে গেল।

আহত ননীগোপালকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হল। পরদিনই ননীগোপাল হাসপাতালে মারা গেল।

বাইশ তারিখেই সন্ধে আটটার সময় কারবালা ট্যাঙ্ক লেনের বাসিন্দা সুকুমার সরকার নামের এক হোমগার্ডকে বড়তলা থানার ঈশ্বর মিল লেনের চারের এ বাড়ির সামনে ঘিরে

ধরে ছুরি বা ভোজালী দিয়ে আঘাত করার আগে স্লোগান দিতে শুরু করল, “শ্রদ্ধেয় নেতা চারু মজুমদার জিন্দাবাদ!” “চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান!” “আমাদের খতম অভিযান চলছে, চলবে।” এমন কায়দায় ওরা স্লোগান দিতে শুরু করল, তাতে মনে হতে লাগল, কালী পুজোর রাতে ছাগ শিশু বলি দেওয়ার আগে ভক্তরা “জয় মা কালী” বলে ধ্বনি দিচ্ছে! ছাগশিশু বলির হাড়িকাঠের ভেতর থেকে যেমন মৃত্যুভয়ে “ম্যা, ম্যা” করে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করে, সুকুমার কিন্তু সেভাবে প্রার্থনা করতে পারল না। সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে যে ‘শ্রদ্ধেয় নেতার' চরণে বলি হতে যাচ্ছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে শুধু বলে উঠল, “আমি খুব গরীব, বাড়িতে আমার মা আছে, বোন আছে।”

এর বেশী কথা সে আর বলার সুযোগ পেল না। ততক্ষণে তার পেটে ঢুকে গেছে ছুরি।

ছুরির আঘাত খেয়ে সুকুমার শুয়ে পড়ল ঈশ্বর মিল লেনের ওপর। রক্ত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। নকশালরা স্থান ত্যাগ করার আগে স্থানীয় বাসিন্দাদের বোমা মেরে জানিয়ে দিয়ে গেল নিজেদের বীরত্বপূর্ণ অস্তিত্ব।

সুকুমারকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান হল। সুকুমার পাঁচদিন ধরে তার মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রেখেছিল, অবশেষে সাতাশ তারিখ হার মানল। চারুবাবুর অলীক স্বপ্নের রথের ঘোড়ার খুরের তলায় পিষ্ট হয়ে ‘রক্তের ঋণ শোধ করতে সে মৃত্যু বরণ করল।

চব্বিশ তারিখ টালিগঞ্জ থানার অধীন মতিলাল নেহরু রোডে সকাল সাড়ে ন'টার সময় আমাদের স্পেশাল ব্রাঞ্চের সাব ইন্সপেক্টর বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নকশালরা গুলি করে পালাল।

সাতাশ তারিখ সন্ধেবেলায় বড়তলা থানার হরি ঘোষ স্ট্রিট দিয়ে সি.পি.আই. (এম) পার্টির তিনজন তরুণ কর্মী গল্প করতে করতে কাশী বসু লেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তারা জানেও না তাদের জন্য অপেক্ষা করছে আরেক ‘বিপ্লবী' দল। জানলে ওরা আর বিনা অস্ত্রে ওই দিকে এগিয়ে যেত না। কারণ ওরা একে অপরের জাতশত্রু। একে অপরকে শেষ না করতে পারলে মহাভারত রচনা হবে না। ওরা কেউ কাউকে সূচ্যগ্র মেদিনী দিতে প্রস্তুত নয়। তারা বিশ্বাস করে সামান্য মেদিনী দান করার অর্থ বিপ্লবে পিছু হঠা।

সরু গলির মধ্যে ওরা নিজেদের খেয়ালে এগিয়ে যেতে লাগল নকশাল দলটার দিকে। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছলে নকশালরা ওদের পথ আগলে দাঁড়াল। ওদের হাতে হাতে পাইপগান, বোমা, রিভলবার। নকশালরা দলে চারজন। কিন্তু সশস্ত্র। সি.পি.আই. (এম)-এর কর্মীরা দলে তিনজন, কিন্তু নিরস্ত্র। দু'পক্ষের হাত খালি হলে, একটা ধস্তাধস্তি, ঘুষোঘুষি, লড়াই হতো। এখানে একপক্ষের হাতে মারণাস্ত্র, অন্যপক্ষের হাতে কিছুই নেই। তাই অসম লড়াইয়ের মধ্যে না গিয়ে সি.পি.আই.(এম) কর্মীরা পালিয়ে যাওয়ার জন্য উল্টো দিকে ছুটতে শুরু করল।

পারল না নব্বুই নম্বর দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটের পঁচিশ বছর বয়সী সলিল দে ওরফে বোগা। সে পেছনে ছিল। তার পিঠে লাগল রিভলবারের গুলি। ছুটতে ছুটতে সে মুখ থুবড়ে পড়ল। ওর অন্য দুজন সহকর্মী ছুটতে লাগল। তারা পেছন ফিরে দেখলও না সলিল পড়ে গেছে। নকশালরা সলিলের দিকে এগিয়ে এসে ওর দিকে তাক করে আরও দুটো গুলি চালাল। সলিল গুলি খেয়ে দু'বার আছড়ে উঠে অসাড় হয়ে গেল।

নকশারা হরি ঘোষ স্ট্রিট কাঁপিয়ে পরপর ক'টা বোমা ফাটিয়ে বোমার ধোঁয়ার আড়ালে কাশী বসু লেনের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে গেল। সলিলকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলে ডাক্তারবাবুরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন।

সাতই জুন দুপুর দু'টোর সময় শ্যামপুকুরের শ্যাম স্কোয়ার (পুব) মনোরঞ্জন পারুই নামে এক প্রাক্তন হোম গার্ডকে নকশালদের চারজনের এক অ্যাকশন স্কোয়াড ঘিরে ধরে প্রথমেই পাইপগানের গুলি চালিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। মাটিতে পড়ে মনোরঞ্জন ছটফট করতে লাগল।

নকশালরা ওকে আর বেশী যন্ত্রণা দিল না। একজন ওর বাঁ দিকের বুকে পাইপগান ঠেকিয়ে আবার গুলি করল। অন্য একজন তার ডান চোখের ওপর ছুরি চালিয়ে চোখটা খুবলে তুলে নিল।

সম্ভবত প্রতিক্রিয়াশীল মনোরঞ্জনের চোখ খুবলে প্রচণ্ড 'শ্রেণী ঘৃণা' প্রকাশ করে তারা যে খুব উঁচুদরের বিপ্লবী সেটা প্রমাণ করল তাদের পার্টির অন্যান্য কমরেডদের কাছে।

ন'তারিখে জোড়াসাঁকোর মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের একটা সরু গলির ভেতর একশ উনপঞ্চাশ নম্বর বাড়ির সামনে সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ হরি ঘোষ স্ট্রিটের বাসিন্দা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি শংকরলাল ভাণ্ডারীকে পুলিশের চর নাম দিয়ে নকশালরা ভোজালী ও তরোয়াল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করল।

কুড়ি একুশ বছরের শংকরলাল কবে পুলিশের চর হয়েছিল তা একমাত্র নকশালরাই বলতে পারবে। এবং পুলিশের 'সোর্স' হলেই তাকে খতমের লাইসেন্স নকশালদের কে দিয়েছে, তাও তারাই ভাল বলতে পারবে।

চারুবাবুর রাজনীতি বিকিয়ে এখনও যারা বাজারে গলা ফাটায়, তারা বলুক না শংকরলালের মতো একটা অতি সাধারণ ইলেকট্রিক মিস্ত্রি কিংবা মনোরঞ্জনের মতো একটা প্রাক্তন হোমগার্ড কতটা প্রতিক্রিয়াশীল ছিল কিংবা দেশের কতটা সর্বনাশ করছিল যে তাদের ওইভাবে খুন করা হল। চারুবাবুর কথা বললে যাদের এখনও জিভে জল আসে, তারা কোনও দিন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। তারা শুধু গলা ফাটিয়ে সাধারণ লোককে বোকা বানানোর জন্য ইতিহাসকে বিকৃত করে সেটাই সত্যে পরিণত করার জন্য বলবে, "পুলিশই নকশালদের বিনা কারণে খুন করেছে।" এমনকি তাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের দোষত্রুটি আড়াল করার জন্য পুলিশ বাহিনীর মধ্যেও বেছে বেছে কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাছা বাছা শব্দ প্রয়োগ করে নিজেদের বীর, বিপ্লবী ও প্রগতির সেবক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে নির্লজ্জ ভাবে ব্যবসা করছে।

গুজবে কান না দিয়ে সাধারণ মানুষ কি সত্য জানার চেষ্টা করবেন? তাঁরা কি প্রশ্ন করবেন কেন শংকরলালদের খুন করা হল? বিপ্লবের নামে কেনই বা খুন করা হল গরীব হোমগার্ড মনোরঞ্জনদের? কেন এবং কোন যুক্তিতে তারা ব্যক্তিহত্যার সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির হয়ে ওকালতি করছে?

তারা কোনও উত্তর না দিয়ে প্রশ্নটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে বলবে, "দেখেছেন, এক প্রাক্তন পুলিশ অফিসার চারুবাবুর নীতির বদলে সুশীতলবাবুর নীতির সপক্ষে বলছে, তার মানে, তোমরা বুঝতে পারছ চারুবাবুর নীতিটা কতটা সঠিক, নয়ত 'শত্রুপক্ষের একজন' সুশীতলবাবুর পক্ষে কথা বলত না।" এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যে তারা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার প্রয়াস করবে তা জানাই কথা। তারা এ কথা কখনও স্বীকার করবে না, চারুবাবুর তথাকথিত 'বিপ্লবী' প্রয়াস ছিল নিছক একটা ছেলেমানুষী সন্ত্রাসবাদ ।

সুশীতলবাবুর হয়ে গান গাওয়ার কোনও প্রচেষ্টা এখানে নেই। এখানে সুশীতলবাবুর বক্তব্য বলার একটাই কারণ। তা হল, ওদের পার্টির মধ্যে ও চারুবাবুর রাজনীতির বিপক্ষে বলেও তা উগ্র অতিবাম অন্ধতার জন্য ধোঁপে টেকেনি। এমনকি পরবর্তী যুগেও, যখন চারুবাবুর গুপ্ত হত্যার নীতি চরম অসার বলে প্রমাণিত, তখনও তারা সুশীতলবাবুর একদা তুলে ধরা সাবধান বাণীকে কোনও গুরুত্ব দেয়নি।

গুরুত্ব দেয়নি বলেই তারা কোনও সদুত্তর দিতে পারবে না, কেন দশই জুন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোডের ওপর রামকৃষ্ণ লেনের শম্ভুনাথ কাহারকে গুলি করে ওরা হত্যা করেছিল? শম্ভু কংগ্রেস সমর্থক ছিল, এটাই কি ওদের চোখে অপরাধ এবং সেই অপরাধে হত্যা?

কেন বারো তারিখ দুপুরে বড়তলার ছাতুবাবুর বাজারে মোহন বার নামে এক মাছবিক্রেতাকে গুলি করে বোমা মেরে ওদের 'খতমের স্কোয়ার্ড' পালিয়েছিল? মোহন

সি.পি.আই. (এম)-এর হয়ে ওদের বিরুদ্ধে লড়াইতে অংশগ্রহণ করত, সেটাই কি ওর মৃত্যুর কারণ? তাহলে বলতে হয়, সি.পি.আই.(এম) নকশালদের যত খুন করেছে, সেটাও সঠিক।

একুশ তারিখে রেনিয়াটোলা স্ট্রিটের কংগ্রেস সমর্থক, বছর চল্লিশ বয়সের পশুপতি কুণ্ডুকে তার বাড়ির কাছেই ছুরি ভোজালী দিয়ে কুপিয়ে দুপুর একটার সময় নকশালদের 'বিপ্লবী বাহিনী' পালাল। তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির জন্য নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু ভর্তি হওয়ার আগেই সে মারা গেল। সন্ত্রাসবাদের বলির তালিকায় পশুপতি নাম লিখিয়ে পোস্টমর্টেম হতে মর্গে চলে গেল।

একাত্তরের জুলাই মাসের চার তারিখে সন্ধেবেলা শোভাবাজারে রাস্তাঘাটের সব আলো নিভিয়ে নকশাল ও সি.পি.আই. (এম)-এর ক্যাডাররা আবার কলকাতা শহর কাঁপানো বিপ্লব শুরু করল বোমা ও পাইপগান নিয়ে। দু'দিক থেকে দু'দলের মুক্তিযোদ্ধারা একে অপরকে ধ্বংস করার শপথ করে নিবিড়ভাবে বোমা ছুঁড়তে লাগল।

শ্যামপুকুর থানা থেকে ওই সংঘর্ষ থামাতে এক বিরাট পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে দু'দিক থেকেই তারা বোমাবাজিতে আক্রান্ত হল। তারা অন্ধকারেই আক্রমণকারীদের উদ্দেশে গুলি ছুঁড়ল। গুলি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল ছোটাছুটির আওয়াজ। কে কোনদিকে পালাচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কে নকশাল, কে সি.পি.আই. (এম) ক্যাডার, তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে যেতে চেনা দায়। এভাবে মিনিট দশেক গুলি ও বোমার লড়াই। তারপর বোমা থেমে গেল। পুলিশ এগিয়ে গেল। দুটো লোক গুলিতে আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে। তার মধ্যে একজন সি.পি.আই. (এম) ক্যাডার প্রণব বসু মল্লিক। অন্যজন রামলক্ষ্মণ সাউ। দু'জনকেই হাসপাতালে ভর্তি করানো হল। প্রণব বাঁচল না। নেতাদের 'লাল সেলাম' জানিয়ে বিদায় নিল !

ওই বছরের জুলাই মাসের সাত তারিখে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের ডাকা সন্ত্রাসের অরাজকতার মোকাবিলার প্রশ্নে সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দিয়ে সি.পি.আই.(এম) পার্টির নেতা জ্যোতি বসু ও হরেকৃষ্ণ কোঙার একটি চিঠি সিদ্ধার্থবাবুকে লিখেছিলেন। তাঁরা সেই চিঠিতে প্রশ্ন তুলেছিলেন, "সন্ত্রাস ও ব্যক্তিহত্যার জন্য দায়ী কে?" সেখানে তাঁরা দায়ী করলেন কংগ্রেস পার্টিকে। সেই চিঠিতে তাঁরা লিখলেন, "গণআন্দোলনের ক্রমবর্ধমান জোয়ারের সামনে ভীত শঙ্কিত হয়ে আপনার দল, শাসক কংগ্রেস জনগণের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করল সি.আর.পি, সীমান্তরক্ষী বাহিনী, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, এমন কি সৈন্যবাহিনীকেও । সব অন্ধকারের জীব, ঠগী, গলাকাটা ও হামলাবাজদের বিরাট বাহিনীকেও শাসক কংগ্রেস জুটিয়ে নিল এবং তাদের পরিচালিত করল গণতান্ত্রিক আন্দোলন, বিশেষ করে তার অগ্রণী শক্তি, আমাদের পার্টি সি.পি.আই. (এম)-এর বিরুদ্ধে। আশ্চর্য হলেও এটা সত্যি যে, যারা ব্যক্তিহত্যাকে তাদের নীতি বলে ঘোষণা করে, সেই নকশালপন্থীদের আশ্রয়, খাদ্য ও অস্ত্র জোগান দিয়েছে পুলিশের একাংশ এবং কোনও কোনও অঞ্চলে, কংগ্রেস ও অন্যান্য কিছু কিছু সি.পি.আই. (এম) বিরোধী দলগুলিও। এদের উসকিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের পার্টির অসংখ্য সদস্য ও সমর্থককে এবং গণ-সংগঠনের কর্মীদের খুন করতে। জনগণ যখন তাদের সমাজবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছেন, এমন অনেক সময় নকশালপন্থীদের রক্ষা করা হয়েছে।" . . . . "নিম্নপদস্থ পুলিশ, যারা অত্যাচারী বলে বিশেষ চিহ্নিত নন, এমন শতাধিক পুলিশকেও যখন হত্যা করা হয়, প্রশাসন তখন নির্বিকার -"অসংখ্যবার আমাদের পার্টি বলেছে যে, পার্টি ব্যক্তিহত্যায় বিশ্বাসী নয়।"

তাঁরা সেই দীর্ঘ চিঠিতে এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কংগ্রেস পার্টিই ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের বুকে আমদানি করেছে। এবং সে জন্য সেই চিঠিতে অভিযোগ করেছেন যে, "সত্তর সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাবার পর থেকেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ হিসাবে ব্যক্তিহত্যার রাস্তা কুৎসিতভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েকটা মৃত্যু ঘটে বটে, কিন্তু তা

ঘটেছিল একমাত্র জমি ও অন্যান্য দাবী নিয়ে জনগণের আন্দোলনের ফলে যেসব সংঘর্ষ বাধে, তার দরুন। অথচ সত্তরে রাষ্ট্রপতি শাসনের আমলে এবং কংগ্রেস-মুসলিম লিগ শাসনে, ব্যক্তিগত হত্যা দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে ওঠে।”

এই অভিযোগ কি সর্বৈবভাবে সত্য, না একপেশে?

প্রথম অভিযোগের উত্তরে বলা যায়, নকশালরা কিন্তু কংগ্রেস পার্টির গর্ভে জন্ম নেয়নি।

জন্ম নিয়েছিল সি.পি.আই. (এম)-এর জঠরে, ' তাদেরই রাজনৈতিক দৈন্যতার ফলে তাদের দলে জন্ম নিয়েছিল উগ্রবাম রাজনীতি এবং তারই ফলস্বরূপ চারুবাবুর উত্থান এবং ব্যক্তিহত্যার বিপ্লবের আমদানী।

একথা ঠিক, নকশালদের হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সংগঠনের মধ্যে বহু পুরনো ক্রিমিনাল অনায়াসে ঢুকে পড়েছিল। যাদের মধ্যে খুনখারাপির লাইসেন্সের আকর্ষণ ছাড়া নকশাল হওয়ার অন্য কোনও ইচ্ছা ছিল না। এবং এরাই আমাদের চাপ সহ্য করতে না পেরে কংগ্রেস পার্টিতে ঢুকে নিজেদের আস্তানা গেড়েছিল। সবাই জানে, কংগ্রেস পার্টিতে ঢুকে পড়তে কোনও অসুবিধাই হয় না। কোনও এক দাদা বা দিদির চেলা হয়ে গেলেই কংগ্রেসী হওয়া যায়। এবং যারা একসময় নকশাল পার্টি করেছে, তারা কংগ্রেসের মতো একটা খোলা মাঠে কীভাবে খেলে উপরে চড়চড়িয়ে ওঠা যায়, খুব তাড়াতাড়িই তা আয়ত্তে আনতে পারে।

অন্যদিকে এই সব নতুন ‘কংগ্রেসীদের’ আমরাও যেমন আমাদের কাজে লাগিয়েছি, তেমনি কংগ্রেসও তাদের ঢাল হিসাবে এখানে সেখানে ব্যবহার করেছে। ফলে তারা যতটা না পরিচিত হয়েছে কংগ্রেসী হিসাবে, তার চেয়ে বেশী নাম কিনেছে মস্তান হিসাবে। এরাই সব নিজ নিজ এলাকায় এলাকায় দাদাগিরি করে দাদার নামেই চালু করেছে কালীপূজা, দুর্গাপূজা কিংবা জগদ্ধাত্রী পূজা। এবং জুলুম করে চাঁদা আদায় করে বিরাট বাজেটের পুজো করার এক একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। পশ্চিমবাংলায় বিশেষ করে কলকাতায় এই চক্র গড়ে তোলার জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী করা যায় সিদ্ধার্থবাবুসহ কংগ্রেসের অনেক তাবড় তাবড় নেতাকেই। এমনকি একথা, বললেও অতিশয়োক্তি হবে না যে, নকশাল আন্দোলনের জন্যই অনেক কংগ্রেস নেতার উৎপত্তি হয়েছে এবং তারই জেরে তারা এ বাজারে ‘কিছু’ করে খাচ্ছে।

কিন্তু কংগ্রেস পার্টিই একা এই দোষে দোষী নয়। সি.পি.আই. (এম) সহ সব পার্টিই নকশালদের আস্তানা দেওয়ার দোষে দোষী। কেউ বেশি, কেউ কম। কেউ খোলাখুলি, কেউ গোপনে। কেউ আদর করে, কেউ আলগোছে বা সন্তর্পণে।

বামফ্রন্টই তো কোলে টেনে নিয়েছে একদা গলাকাটার রাজনীতির অন্যতম ঝাণ্ডাবাহীদের। তাহলে শুধু কংগ্রেস পার্টিই এককভাবে সেই দোষে অপবিত্র নয়।

অভিযোগ অনুযায়ী, কংগ্রেস যদি নকশালপন্থীদের উসকিয়ে দিয়ে সি.পি.আই. (এম) ক্যাডারদের খুন করিয়ে থাকে, তবে বলতে হয়, সি.পি.আই. (এম) পার্টিও ওদের উসকিয়ে দিয়ে কংগ্রেস কর্মীদের খুন করিয়েছে। কারণ নকশালরা সি.পি.আই.(এম) ক্যাডারদের যেমন খুন করেছে, ঠিক তেমন কংগ্রেস ও অন্যান্য পার্টির সমর্থক, নেতা ও কর্মীদের খুন করেছে। আবার বিপরীতভাবে সি.পি.আই.(এম)-এর ক্যাডাররাই নকশালদের গুপ্ত খুন করেছে বেশি। সেখানে কংগ্রেসের সমর্থকরা অনেক পিছিয়ে।

দ্বিতীয় অভিযোগ সম্পর্কে সোজাসুজিই বলা যায়, পার্টি হিসাবে কংগ্রেস কখনই সি.পি.আই.(এম) ক্যাডারদের খুন কর বলে নকশালদের উসকিয়ে দেয়নি।

বরং সি.পি.আই.(এম)-ই নিজেদের ফাঁদে নিজেরা জড়িয়ে নকশালদের সঙ্গে এলাকায় এলাকায় সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে অঞ্চল দখলের নোংরা রাজনীতি করেছে এবং সেই লড়াইয়ে তারা দিন দিন দক্ষ হয়ে উঠেছে। এবং তাদের দেখাদেখি অন্যেরাও দক্ষতা অর্জন করে নিয়েছে।

জ্যোতিবাবুরা ওই চিঠিতে অভিযোগ করেছিলেন যে, "জনগণ যখন তাদের সমাজবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছেন, এমন অনেক সময় নকশালপন্থীদের রক্ষা করা হয়েছে।"

এই জনগণ বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন? সাধারণ মানুষ, যারা কোনও রাজনৈতিক দলাদলির গণ্ডীর মধ্যে নেই, তারা?

তেমন ঘটনা সাধারণত ঘটেনি। তিনি যে জনগণের কথা বলছেন, তারা সি.পি.আই.(এম) পার্টির ক্যাডার। আর প্রতিরোধ নয়, ওটা হবে প্রতিশোধ কিংবা সংঘর্ষ। হয়তো জ্যোতিবাবুদের চোখে সি.পি.আই.(এম) পার্টির ক্যাডাররাই 'জনগণ' এবং তারা যখন প্রতিশোধে লিপ্ত, তখন নেতারা সেটা দেখবেন প্রতিরোধ হিসাবে। সেই হিসাবে তাঁর অভিযোগ সত্য।

অন্যদিকে সেই সংঘর্ষ বন্ধ করতে পুলিশ বাহিনী উপস্থিত হলেই সি.পি.আই.(এম) পার্টির নেতৃবৃন্দ তাঁদের চশমা পরা চোখ দিয়ে দেখেছেন যে, "সংঘর্ষ থামানো নয়, সেটা আদতে নকশালপন্থীদের রক্ষা করা।"

তাঁদের অভিযোগ, "নিম্নপদস্থ পুলিশ, যারা অত্যাচারী বলে বিশেষ চিহ্নিত নন, এমন শতাধিক পুলিশকেও যখন হত্যা করা হয়, প্রশাসন তখন নির্বিকার থাকে।"

অদ্ভুত অভিযোগ। 'অত্যাচারী' পুলিশ আর 'অত্যাচারী নয়', এই চিহ্নিতকরণটা কারা করে? জ্যোতিবাবুরা নির্বিকার চিত্তে বলবেন, "জনগণ।" যাঁরা রাজনীতি করেন তাঁদের একটা সুবিধা হল, নিজেদের সব কথাই তাঁরা জনগণ নামে এক গণেশের মুখে বসিয়ে দেন।

আসলে নিজেদের পছন্দের লোককে তাঁরা ভাল এবং অপছন্দের লোককে খারাপ বলতেই অভ্যস্ত। এবং তার জন্য তাঁরা বিভিন্ন কাল্পনিক কাহিনী ও গুজব বাজারে ছড়িয়ে দেন।

দ্বিতীয়ত, 'অত্যাচারী' ও 'অত্যাচারী নয়' এমন বিভাজন করে তাঁরা পুলিশের মধ্যে একটা হাস্যকরভাবে বিভেদ সৃষ্টি করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। তৃতীয়ত, তাঁদের বক্তব্যে পরিষ্কার, 'অত্যাচারী নয়' এমন পুলিশকে খুন করা অন্যায়, কিন্তু 'অত্যাচারী' পুলিশকে খুন করা অন্যায় নয়। এ ব্যাপারে তাঁরাও লাইসেন্স দিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া তদন্তে ও খুনীদের গ্রেফতার করার ব্যাপারে পুলিশ 'নির্বিকার', এটাও সত্যের বিকৃতি। বরং পুলিশকর্মী খুন হলে বাহিনীতে এমন একটা জেদ আসে যে সেই খুনের তদন্ত ও খুনীকে গ্রেফতার করার জন্য অন্যসব কাজ পিছিয়ে যায়। পুলিশ খুনটাই অগ্রাধিকার পায়। এটা ফেলো ফিলিং, অন্য কিছুই নয়।

অভিযোগ করলেই হল না, অভিযোগের সত্যাসত্যকে দৃঢ় মাটির ওপর দাঁড় করাতে হয়। অবশ্য রাজনৈতিক দলগুলোর এ ব্যাপারে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। একে অন্যের বিরুদ্ধে কামড়াকামড়ি করে কতটা একে অন্যের ভোট ছিনিয়ে আনতে পারবে শুধু সেই চেষ্টাতেই সবাই সক্রিয় এবং সেই সক্রিয়তার নিরিখেই, অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ।

অন্যদিকে পরবর্তীকালে সবাই দেখেছেন জ্যোতিবাবুরাই সাতাত্তর সালে ক্ষমতায় আসার পর ওই 'অত্যাচারী নয়' এমন পুলিশ কর্মী খুনের অভিযোগে ধৃত আসামি সহ হেমন্ত বসুর মতো নেতাদের খুনের আসামিকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছেন। তবে কি এটা বলা যায় যে, জ্যোতিবাবুরা কংগ্রেসীদের থেকে বেশী মদত দিয়েছেন নকশালপন্থীদের?

না, সে কথা বলব না। কারণ সে সময় নকশালরা ছিল জ্যোতিবাবুদের "জাতশত্রু'।

তাঁরা বলবেন, সাতাত্তরের নির্বাচনে আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল রাজনৈতিক বন্দি মুক্তির, সে জন্যই নির্বাচনে জেতার পর প্রতিশ্রুতি মতো তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ঠিক কথা, আবার এ কথাটাও ঠিক, ওই স্লোগানের জন্যই তাঁরা ওই নির্বাচনের বৈতরণীটা অনায়াসে পার হয়েছিলেন, সঙ্গে অবশ্যই ছিল 'জরুরি অবস্থার' বিরুদ্ধে সারা ভারতের সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ। সাতাত্তরের ক্ষমতা লাভটা যে, নকশাল ও জয়প্রকাশ আন্দোলনের

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যে, সেটা কিন্তু জ্যোতিবাবুরা স্বীকার করবেন না। এটা নিশ্চয় তাঁদের মনে আছে, 'জরুরি অবস্থার' সময় তাঁদের পার্টির নেতাদের গায়ে একটাও আঁচড় লাগেনি। কিন্তু লাভটা পুরো পকেটে তুলতে তাঁদের ভুল হয়নি।

তাছাড়া আমরা বারবার প্রত্যক্ষ করেছি যে, যখনই ওই দু'পক্ষ নিজেদের মধ্যে মরণ বাঁচনের সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এবং আমরা সেই সংঘর্ষ থামতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছি, তখনই ওই দুই পক্ষ নিজেদের লড়াই সাময়িকভাবে থামিয়ে আমাদের উপর যৌথভাবে আক্রমণ করেছে। আমরা উপস্থিত হলেই দু'পক্ষের মূল শত্রু হয়ে দাঁড়াতাম আমরা। এবং সেই সব ঘটনায় আমাদের যে সব সহকর্মী আহত বা নিহত হয়েছে, তা নকশালপন্থীদের হাতে না সি.পি.আই.(এম) ক্যাডারদের হাতে, তা নির্দিষ্ট করার কোনও মাপকাঠি আমাদের নেই। সুতরাং খুবই পরিষ্কার করে বলা যায় যে, শুধু নকশালদের হাতে নয় সি.পি.আই.(এম) ক্যাডারদের হাতেও ‘অত্যাচারী নয় এমন পুলিশকর্মী খুন হয়েছে।

আর ‘ব্যক্তিহত্যায় বিশ্বাসী নয়' বলে যে পার্টির ঘোষিত নীতি, সেই পার্টির ক্যাডাররা কেন নকশাল সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে খুন করেছে? শুধু সি.পি.আই.(এম) পার্টিই নয়, প্রত্যেক পার্টির ক্যাডারই তাদের বিরোধী পার্টির কর্মীদের সুযোগ পেলেই গুপ্তহত্যা করেছে।

এ ব্যাপারে কারও হাতই পরিষ্কার নয়। কেউই এক গালে থাপ্পড় খেয়ে অন্য গাল থাপ্পড়ের জন্য এগিয়ে দেয়নি, বরং আরও বেশি জোরে থাপ্পড় মেরে প্রত্যাঘাত করেছে। আর রক্তপাত বেড়েছে। ‘প্রতিরোধের' নামে প্রত্যেকেই 'প্রতিশোধ' নিয়েছে।

সুতরাং ঘোষিত নীতি আর কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে মিলের থেকে অমিলই বেশি। ক্ষমতায় থাকতে গেলে রক্তপাত যে অনিবার্য, তা জ্যোতিবাবুর চেয়ে আর ভাল কে জানে? এবং তার জন্য যে ঘোষিত নীতিকে পায়ে দলে চোখ বুজে থাকা যায়, তার কায়দাও জ্যোতিবাবু সহ সব রাজনৈতিক নেতা ও নেত্রীরা খুব ভালই জানেন।

ঘোষিত নীতি যে একটা রাজনৈতিক ধাপ্পা তা এখন আমাদের দেশের দুধের শিশুরাও জানে। যেমন সি.পি.আই.(এম)-এর ঘোষিত নীতি দেশে সশস্ত্র বিপ্লব করা, তা যে তারা কোনওদিন করবে না, তা যেমন সবাই জানে, তেমনই অন্যান্য পার্টিগুলোরও যেন তেন প্রকারে ক্ষমতা দখল করে তা ভোগ করাই যে একমাত্র উদ্দেশ্য, তাও প্রত্যেকেই জানে। এবং রাজনীতির পেশাটা যে এখন একটা প্রতারণার মাধ্যমে রোজগার করার সহজ পথ, তাও ভারতবাসীর অজানা নয়।

জ্যোতিবাবুরা ওই চিঠিতে লিখলেন, “দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাবার পর থেকেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ হিসাবে ব্যক্তিহত্যার রাস্তা কুৎসিতভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।”

ব্যাপারটা কি সত্যিই তাই? জ্যোতিবাবু ও হরেকৃষ্ণ কি ভুলে গেলেন, প্রথম যুক্তফ্রন্টের সময় তাঁরা যখন ক্ষমতায়, তখনই নকশাল আন্দোলনের শুরু এবং তারই পরিণতিতে চারুবাবুর অতি বাম রাজনীতির আবির্ভাব? তাঁরা কি ভুলে গেলেন, একসময় নকশালদের নেতা ও জঙ্গি কর্মীরা তাঁদেরই পার্টির সদস্য ও সমর্থক ছিল এবং তাদের জঙ্গি আন্দোলনের ফলেই যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতা লাভ আর তাদের ঘোষিত বিপ্লববাদের বদলে সংশোধীয় পথকে আঁকড়ে ধরার ফলে ওই সব জঙ্গি সদস্যদের মোহভঙ্গ এবং অবশেষে বিপ্লবের নামে সন্ত্রাসবাদ গ্রহণ?

এটা পরিষ্কার করে বলা যায়, কিছুই তাঁরা ভুলে যাননি। তাঁরা ওই চিঠিতে নিজেদের দোষ ত্রুটি আড়াল করার উদ্দেশ্যেই কামানের মুখ উল্টো দিকে ঘুরিয়ে কংগ্রেসের দিকে করে দিয়েছেন। এটা রাজনৈতিক দলগুলোর একটা পুরনো খেলা। এ খেলায় তারা এত অভ্যস্ত যে, এসব কথা কেউ গায়েই মাখে না। আর একটা ব্যাপারও আমাদের কাছে পরিষ্কার যে, নকশালদের পয়লা নম্বর শত্রু ছিল কংগ্রেসীরাই, সি.পি.আই.(এম) পার্টির

লোকেরা নয়, যদিও সি.পি.আই.(এম) পার্টির নেতাদের পয়লা নম্বর শত্রু ছিল নকশালরা, কংগ্রেসীরা নয়। কারণ নকশালরা সি.পি.আই.(এম) পার্টির নেতাদের তথাকথিত বিপ্লবী মুখোশ হিঁচড়ে টেনে ফেলে তাদের আসল মুখটা খুলে দিয়েছিল। আর এটাই ছিল তাদের রাগের প্রধান কারণ। আর তারপর থেকে তারা তাদের 'দলিলে' ছাড়া মাঠে ঘাটে আর বিপ্লবের বাণী আওড়ায় না। তার চেয়ে 'নন্দনে' প্রদীপ জ্বালিয়ে ছবির উৎসবে যোগ দিতে বেশি উৎসাহী।

ওই রাগের ফলেই নেতাদের প্ররোচনায় সি.পি.আই.(এম) পার্টির ক্যাডাররা এলাকায় এলাকায় নকশালদের সঙ্গে খুনোখুনিতে জড়িয়ে পড়েছিল। এই প্ররোচনাটা যদি এড়িয়ে যেতে পারত, তবে নকশালদের সঙ্গে এত বেশি সংখ্যায় সংঘর্ষও হতো না এবং এত খুনও হতো না। কারণ নকশালরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করত, 'সি.পি.আই.(এম)-এর নিচুস্তরের কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী বহু ক্যাডার আছে, যারা একসময় তাদের পার্টির নেতাদের কাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নকশাল দলে যোগ দেবে। সুতরাং তাদের সঙ্গে শত্রুতামূলক আচরণ না করে অতীতদিনের মতো বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করাটাই শ্রেয়।'

নকশালদের এই চিন্তার জন্যই ভয় পেয়েছিলেন সি.পি.আই.(এম) পার্টির নেতারা, তাঁরা তাই নকশালদের সঙ্গে বৈরীতাটা একেবারে সংঘর্ষে পরিণত করে তাঁদের পার্টির আরও বড় ভাঙন রুখে নিজেদের অস্তিত্ব কায়েম রাখলেন আর এ ব্যাপারে তাঁদের সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী হিসাবে দেখা দিলেন খোদ চারুবাবু। তিনি 'সংশোধনবাদী'র বিরুদ্ধে কামান দাগতে আহ্বান করে নকশাল ক্যাডারদের উসকিয়ে দিয়ে সি.পি.আই.(এম) পার্টির ক্যাডারদের সঙ্গে সশস্ত্র লড়াইয়ে জড়িয়ে দিলেন। দু'পক্ষের সেই সব সংঘর্ষে কিংবা গুপ্ত খতম অভিযানে নকশালদের কোনও নেতা মারা গেল না, খুন হলো না সি.পি.আই.(এম) পার্টির কোনও নেতা, আধা নেতা, এমন কী কোয়ার্টার নেতা। আর জ্যোতিবাবুরা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন খতম রাজনীতির উৎসাহদাতা হিসাবে, তাদের পার্টির খুব বড় নেতা মারা না গেলেও আধা নেতা, কোয়ার্টার নেতা কিন্তু অনেকেই মারা গেছেন কিংবা আক্রান্ত হয়ে আহত হয়েছেন। এই বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, জ্যোতিবাবুদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদক্ষেপেই চারুবাবুর অতিবাম রাজনীতির বিকাশ ঘটেছিল।

ওই চিঠিতে সি.পি.আই.(এম) পার্টির নেতারা অবশ্য স্বীকার করেছেন, 'যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েকটা মৃত্যু ঘটে বটে, কিন্তু তা ঘটেছিল একমাত্র জমি ও অন্যান্য দাবী নিয়ে জনগণের আন্দোলনের ফলে যে সব সংঘর্ষ বাধে, তার দরুন।'

জ্যোতিবাবুরা যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলের খুন ও সংঘর্ষগুলোকে জনগণের আন্দোলনের ফলস্বরূপ হিসাবে বর্ণনা করে পাশ কাটিয়ে গেছেন। এখন জিজ্ঞাস্য, সাতষট্টি সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে নকশালবাড়িতে যে এগারোজন রমণীকে গুলি করা হয়েছিল, তা কি 'জনগণের আন্দোলনকে' দমন করার জন্য নয়? না কি তা সমর্থনের জন্য? তারা জবাব দেবেন না, নীরব থাকবেন। এবং প্রশ্নটা বালখিল্যের এমন ভাব করে মুখ ঘুরিয়ে অন্যত্র 'জ্ঞান' বিতরণ করবেন।

জ্যোতিবাবুরা যেদিন সিদ্ধার্থবাবুর হাতে অভিযোগপত্র দিলেন, তার পরদিনই বিকেলবেলা সোয়া চারটে নাগাদ একশ উনসত্তর আহিরীটোলা স্ট্রিটের বাসিন্দা ডাল মিলের ব্যবসায়ী শিবশংকর গুপ্তাকে নকশালদের জনা ছয়েক যুবক বি কে পাল অ্যাভিনিয়ু ও আহিরীটোলা স্ট্রিটের যোগাযোগ স্থলে বুকে গুলি করে খুন করল।

দশ তারিখে শিয়ালদহের কাছে ট্রাফিক কনস্টেবল অজিত কুমার পাত্রকে মারাত্মক ভাবে জখম করে তার থেকে রিভলবার ছিনিয়ে নিয়ে গেল নকশালরা। তেরো তারিখ বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ সি.পি.আই.(এম) পার্টির সমর্থক উনিশ কুড়ি বছরের প্রদীপ দে বিডন রো দিয়ে একাই হেঁটে যাচ্ছিল। ওই অঞ্চলের নকশাল নেতা রতন ও ধেলু ওকে দেখে উত্তেজিত হয়ে গেল। এবং 'সংশোধনবাদীকে নিকেশ করার যে ডাক ওদের শ্রদ্ধেয় নেতা দিয়েছেন, তা কার্যকরী করার জন্য তাদের হাত নিশপিশ করে উঠল। ওদের সঙ্গে

সবসময়ই রিভলবার ও পাইপগান থাকে। ওরা উঠে দাঁড়াল এবং প্রদীপের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। দ্রুত পা চালিয়ে ওরা প্রদীপকে ছাড়িয়ে বিডন রো'র পঁচিশ নম্বর বাড়ির সামনে চলে গেল। পথ আটকে প্রদীপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোমর থেকে রিভলবার বার করে শুধু একবার বলল, "তোর মাকু পার্টি করা আজই শেষ !"

প্রদীপ রতনদের চিনত। ওদের রিভলবার হাতে উদ্ধত মূর্তি দেখে ও একেবারে হকচকিয়ে গেল। প্রদীপ একবার ঘুরে পালানোর চেষ্টা করতে গেল, কিন্তু তার আগেই রতনের রিভলবারের গুলি তার বুকে সরাসরি বিঁধে গেল।

প্রদীপ গুলি খেয়ে ছিটকে পড়ল রাস্তায়। রতন আর ধেলুর মুখ উল্লাসে নেচে উঠল। ধেলু বীরদর্পে শুয়ে থাকা প্রদীপের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর ওর শরীরের দু'পাশে নিজের দুটো পা ছড়িয়ে ওর যন্ত্রণাকাতর মুখটার দিকে একবার দেখে একটু হাসল।

পেছন থেকে রতন ধেলুকে বলল, "দেরি করিস না। শালাকে ফিনিশ করে দে।" ধেলু তার ডান হাতে ধরা রিভলবারের নলটা প্রদীপের কপালের মাঝখানটায় বসিয়ে ট্রিগার টিপে দিল।

একটা গুলির শব্দ। প্রদীপ স্থির। রতনরা একবার চারদিকটা দেখে নিয়ে রবীন্দ্র কাননের দিকে এগিয়ে গেল।

ওরা চলে যেতেই শেষ আষাঢ়ের বিকেল কাঁপিয়ে বৃষ্টি ঝরতে করল। প্রদীপের রক্ত সেই বৃষ্টির জলে ধুয়ে যেতে লাগল।

প্রদীপকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। ঠাণ্ডা। প্রদীপের শরীরে তাতে নতুন করে আর উষ্ণতা এল না।

প্রদীপের একশ পঁচিশ নম্বর তারক প্রামাণিক রোডের বাড়িতে খবর পাঠানো হল, লাশকাটা ঘর থেকে প্রদীপের দেহটা নিয়ে যেতে !

ষোলোই জুলাই সন্ধেবেলা শ্যামপুকুর থানা এলাকায় নকশালরা কলকাতার এক কুখ্যাত প্রতারককে খুন করল। প্রতারকটা হল নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ ওরফে বান্টু। বছর পঁয়তাল্লিশ বছরের বান্টু বহু লোককে প্রতারণা করে নিঃস্ব করে ছেড়েছে।

"সেদিন সন্ধেবেলা বান্টু তার পনেরো এ বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের বাড়ির একটা ঘরে বসেছিল। হয়তো ছক কষছিল, কাকে ঠকানো যায়। নকশালদের ছ'সাতজন নকশাল যুবক ওর বাড়ির সদর দরজা দিয়ে সোজা ঢুকে, ও যে ঘরে বসেছিল, সেখানে চলে গেল। ওদের দেখেই বান্টুর প্রাণপাখি 'কু' ডাকতে শুরু করল। কিন্তু প্রতারকরা অত্যন্ত ধূর্ত এবং চটজলদি কথায় ওস্তাদ। সে ওদের উদ্দেশে বলল, "আরে কমরেডস, তোমরা, কী ব্যাপার? এই গরীবের বাড়িতে? খবরাখবর সব ঠিক আছে তো?" ওর কথার কোনও উত্তর দিল না নকশালরা। একজন শুধু কড়া গলায় একেবারে ফৌজি মেজাজে বলল, "তোকে আমরা খতম করতে এসেছি, সে রকম নির্দেশই আমাদের দেওয়া হয়েছে।"

গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম। তিনটে গুলির শব্দ বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের অন্যান্য বাসিন্দারা শুধু শুনল। তারপর তারা দেখল, নকশালদের দল বান্টুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেল। তাদের চোখে মুখে তেমন কোনও উত্তেজনার ছাপ নেই। তারা ধীর পায়ে চলে যেতে, বান্টুর প্রতিবেশিরা জানতে পারল, নকশালরা বান্টুর বুকে ও পেটে গুলি করে গেছে। ওকে আর জি কর হাসপাতালে পাঠানো হল, সেখান থেকে নিমতলা শ্মশানে।

সতেরো তারিখ সকাল সাড়ে ন'টার সময় আমরা লালবাজারে খবর পেলাম, জোড়াসাঁকো থানা এলাকায় চোরবাগান লেন ও কৃষ্ণদাস পাল লেনের সংযোগস্থলের কাছে নকশালদের একটা জঙ্গি স্কোয়াড কোনও এক অভিযানে যাওয়ার জন্য জড়ো হয়েছে।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করলাম, আমরা লালবাজার থেকে ওখানে হানা দিতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। ততক্ষণে তারা অভিযানে বেরিয়ে ওদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে পালিয়ে যাবে। ওদের ওই স্থান ত্যাগ করার আগেই আটকানো দরকার। দ্রুত ওদের কাছে

পৌঁছতে পারে একমাত্র জোড়াসাঁকো থানার ফোর্স। আমরা তাই পরিস্থিতির চাপে কিছুটা বাধ্য হয়ে খবর দিলাম জোড়াসাঁকো থানায় এবং আমাদের উত্তর কলকাতার ডিসি অফিসে।

আমাদের খবর পেয়ে যৌথভাবে আধঘণ্টার মধ্যে একটা বড় বাহিনী নিয়ে ওরা পৌঁছে গেল নকশালদের জমায়েত স্থলে।

পুলিশের বাহিনী দেখেই নকশালরা নিজেদের অভিযান স্থগিত রেখে সামনেই 'শ্রেণীশত্রু' দেখে আমাদের বাহিনীর ওপর বোমা নিয়ে আক্রমণ করল। প্রতি উত্তরে আমাদের বাহিনীও রাইফেল থেকে ওদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগল।

সকালবেলাতে বোমা আর গুলির আওয়াজে চোরবাগান লেনের পরিবেশ থরথর করে কাঁপতে লাগল। একটা বোমা আমাদের বাহিনীর একেবারে মাঝখানে উড়ে এসে পড়ল। বিকট শব্দে ফাটল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার। একটু পাতলা হতে দেখা গেল, আমাদের তিনজন কনস্টেবল বোমার টুকরোর আঘাতে মাটিতে পড়ে গিয়ে ছটফট করছে। তাদের নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশে ছুটল একটা গাড়ি।

মিনিট পনেরো বোমা ও গুলির বিনিময় হওয়ার পর, নকশালরা বোমাবাজি থামিয়ে দিতে আমাদের বাহিনী ওদের সাময়িক ঘাঁটির দিকে রাইফেল উঁচিয়ে এগিয়ে গেল। দেখা গেল, একটা ছেলে রাস্তায় পড়ে আছে, আর সব ফাঁকা। অর্থাৎ নকশালরা ওদের বোমার রসদ ফুরিয়ে যেতে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়েছে। পড়ে থাকা ছেলেটার শরীরে রাইফেলের গুলি লেগেছে।

জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ ছেলেটাকে চিনতে পারল। ছেলেটা সীতানাথ রোডের উঠতি নকশাল নেতা শিশির প্রামাণিক। ওকে হাসপাতালে পাঠানো হল। বাঁচল না। সেদিনই মারা গেল।

নকশালদের কাছে শিশির 'শহীদ' হল। হয়তো হল, হয়তো নয়। সে বিচার ইতিহাস করবে। শিশিররা শহীদ হল, কিন্তু রণজিতের মতো কনস্টেবল এবং সুকুমার ও শ্যামলের মতো হোমগার্ডরা শহীদ হয় না।

চারুবাবু তাঁর পার্টির সদস্যদের বলেছিলেন, "শহীদের রক্তে ভেজা মাটি লোহার প্রাচীর হিসাবে গড়ে ওঠে। শিশিরদের মৃত্যুতে কটা লোহার প্রাচীর গড়ে উঠেছে, কোথায় বা ব্যাপক জনসমর্থন তাদের জন্য অপেক্ষা করেছে, তা একমাত্র চারুবাবুর আদর্শে একনিষ্ঠ নকশালরাই জানে। ভারতবর্ষের সাধারণ জনগণ কিন্তু জানেন না।

ইতিমধ্যে ওদের সি.পি.আই. (এম এল) পার্টি কংগ্রেসের এক বছর পূর্ণ হয়েছে। সেই উপলক্ষে চারুবাবু 'পার্টি কংগ্রেসের পর এক বছর' শিরোনামে এক 'দলিল' লিখে তাঁর কমরেডদের মধ্যে বিলি করলেন। সেখানে প্রতি ছত্রে উগ্রবাম নীতির প্রকাশ ছাড়াও মিথ্যা ও অতিরঞ্জনের ছড়াছড়ি। তিনি লিখেছেন, 'ছাত্র ও যুব কমরেডরা আত্মত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ স্থাপন করেছেন।' শিশিরদের মতো অতি উৎসাহী যুবকরা হঠকারীভাবে পুলিশবাহিনীকে আক্রমণ করে 'আত্মত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ স্থাপন করে' ভারতবর্ষের জনগণের কোন উপকারটা করল? তিনি সেখানে জানালেন, 'শ্রমিকশ্রেণী, মর্যাদার প্রশ্নে ও দমননীতির বিরুদ্ধে বহু সফল সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন।' চারুবাবুর দলের নেতৃত্বে শ্রমিকরা কোথায় সংগঠিত হলেন এবং কোথায় সংগ্রাম পরিচালনা করলেন তা দূরবীন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁরা যা সংগ্রাম করেছেন, তার জন্য চারুবাবু অন্তত কোনও কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন না। 'দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের স্কোয়াড, রাইফেল সংগ্রহের মধ্য দিয়ে গণমুক্তি ফৌজ গড়ার কাজ শুরু হয়েছে। গেরিলা বাহিনীকে সশস্ত্র করার উদ্দেশে ব্যাপকভাবে বন্দুক সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বহু জায়গায় বিপ্লবী কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই বিপ্লবী কমিটি নিহত ও পলাতক জোতদারদের জমি 'দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বণ্টনের কাজে হাত দিয়েছেন।' কত সরল ব্যাখ্যা। কোথায় ক'টা রাইফেল ছিনতাই হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে দিলেন, "গণমুক্তি ফৌজ গড়ার কাজ শুরু

হয়েছে।'

এসব পড়লে মনে হয়, চারুবাবুর মতো এত অপরিণত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে কোনও সন্ত্রাসবাদী দল কেউ পরিচালনা করেনি। কারণ, তর্কের খাতিরেও যদি ধরে নেওয়া যায়, ক'টা রাইফেল ছিনতাইয়ের মধ্যে দিয়ে "তথাকথিত ‘গণমুক্তি ফৌজ' তার গোড়াপত্তন করেছে, তাহলেও প্রথম প্রশ্ন, সেই ফৌজ পরিচালনা করবে কে? ক'টা দিশীহীন, যাযাবরের মতো ছুটন্ত লোক? তাদের যদি নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক নীতি ও কৌশল জানাই না থাকে, তবে ‘তারা কত দিন টিঁকে থাকবে?’ ক'টা কোটেশন দিয়ে যে একটা দেশের বিপ্লব সম্পন্ন হয় না, সেই সাধারণ বুদ্ধি ও জ্ঞানও নকশাল নেতাদের ছিল না?

গোপন আস্তানা থেকে মাঝে মধ্যে একটা অন্তঃসারশূন্য 'দলিল' সদস্যদের হাতে পৌঁছলেই কি বিপ্লব সমাধা হয়ে যাবে? তাঁরা কি এটুকুও বুঝতেন না, একটা সংগ্রাম তা যে কোনও স্তরেই হোক, তার জন্য চাই প্রতি মুহূর্তের চিন্তাভাবনা, কৌশল, পদক্ষেপ এবং মাঠে থেকে নেতৃত্বে দেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা।

বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত কিছু ছেলেকে দিয়ে ক'টা মানুষকে খুন করা যায়, তাতে ওই খুন করাটা ছাড়া আর কিছুই হয় না।

ওই ‘দলিলে’ চারুবাবুর বক্তব্য পড়লেই পরিষ্কার বোঝা যায়, তিনি হয় দিবাস্বপ্ন দেখতেন নয়ত মূর্খের স্বর্গে বাস করতেন। কারণ শ্রমিক ও কৃষকরা যা যা ‘করেছেন' বলে তিনি দাবি করেছেন, বাস্তবে কিন্তু তার একটাও স্থায়ী কিছু নয়। এমন কি সূর্য সেনেরা যতদিন ধরে চট্টগ্রাম শহর কিংবা অজয় মুখোপাধ্যায়রা 'তাম্রলিপ্ত সরকার' যতক্ষণ টিকিয়ে রেখেছিলেন ততদিন পর্যন্তও চারুবাবুর দল কোনও গ্রামে স্থায়ী হতে পারেনি। তার প্রধান কারণ, তাদের কোনও গণভিত্তিই ছিল না।

আঠাশে জুলাই রাত সাড়ে দশটা। আকাশ কালো করে অঝোর ধারায় শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে। কলকাতার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গার্ডেনরিচ থানার অধীনে পাহাড়পুর রোড প্রায় ফাঁকা। মাঝে মধ্যে দু'চারটে ব্যস্ত লরি হেডলাইট জ্বালিয়ে এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে।

ওই অঞ্চলের বহু দিনের পরিচিত বয়স্ক কবিরাজ ধনঞ্জয় দাস অধিকারী তার ফার্মেসি বন্ধ করে পাহাড়পুর রোডেই তার নিজের বাড়িতে ফিরছিল। কবিরাজী পেশা ছাড়াও তার ছিল সুদের কারবার, তা ছাড়া এলাকায় তার বেশ কটা বাড়ি ছিল, তাতে বাস করত অনেক ভাড়াটে।

অন্ধকার রাস্তায়, বৃষ্টির মধ্যে তার পথ আটকে তাকে ঘিরে ধরল ছ’জন নকশাল। তাদের হাতে হাতে খোলা ছুরি, ভোজালী ও রামদা। সেই হাতগুলো মুহূর্তের মধ্যে কাজ শুরু করল।

রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত ধনঞ্জয়বাবুকে পাহাড়পুরের এবড়োখেবড়ো রাস্তায় ফেলে নকশালরা বৃষ্টির পর্দা সরিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল।

মোমিনপুরের মর্গ পাহাড়পুর রোডের কাছেই। ধনঞ্জয়ের শরীর পরদিন সকাল এগারোটার সময় হাসপাতাল ঘুরে ওইখানে চলে এল।

আগস্ট মাসের তিন তারিখ। রাত ন'টার সময় গ্রে স্ট্রিট ও অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রিটের সংযোগকেন্দ্রে নকশাল ও কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে ছুরি ও বোমা নিয়ে শুরু হল মারপিট। বটতলা থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই নকশালদের ছুরির আঘাতে কংগ্রেস কর্মী অমল রায় মারা গেল। তলপেটে ছুরি প্রায় ইঞ্চি দশেক এফোঁড় ওফোঁড় করে দেওয়ার ফলে ওর নাড়িভুঁড়ি শরীরের থেকে বেরিয়ে রাস্তায় শুয়েছিল। বাঁচবে কী করে?

পাঁচ তারিখ বিকেলবেলা শ্যামবাজারের ট্রাফিক গার্ডের কনস্টেবল মহঃ সাগির খান ওই বটতলা থানা এলাকায় হাজি জাকারিয়া লেনের উল্টো দিকে যেখানটায় আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোড ও বিবেকানন্দ রোড মিশেছে, তারই কাছে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কাজে রত ছিল।

তখন সাড়ে পাঁচটার সময় সাগির যখন রাস্তায় গাড়ি পারাপারে ধ্যানস্থ, অতর্কিতে পাঁচজন নকশাল তরুণ ওকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। সাগির আত্মরক্ষার জন্য কোনও কৌশল অবলম্বন করার আগেই ওকে দুজন নকশাল জাপটে ধরল এবং একজন ওর তলপেটে ছুরি ঢুকিয়ে দিল। বাকি দু'জন ওর কোমরে ঝুলনো সার্ভিস রিভলবার টেনে খুলে নিল। সাগির তার পেটে হাত দিয়ে রাস্তায় বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর থেকে ছিনিয়ে নেওয়া রিভলবার দিয়েই ওর বুকে গুলি করে ওরা পালিয়ে গেল। বটতলা থানার পুলিশ সাগিরকে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারবাবুদের মুখে শুনল, 'সাগির মৃত'।

লালবাজারে আমাদের কাছে খবর এল। প্রতিদিনের মতো সেদিনও শুনলাম। এবং খুনির খোঁজ পাওয়ার জন্য নিজস্ব গোপন শাখা প্রশাখায় বার্তা পাঠালাম। বেশি সময় অপেক্ষা করতে হল না। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে সাগির হত্যাকারীদের চিহ্নিত করা গেল। তাদের ঘাঁটির খবর আমরা লালবাজারে বসেই পেয়ে গেলাম। খুনের জায়গা থেকে খুনীদের ঘাঁটির দূরত্ব খুব দূরে নয়। তবু আমাদের অপেক্ষা করতে হল ওদের গ্রেফতার করতে যাওয়ার আগে।

কারণ ওরা ঘাঁটি গড়েছে একটা বস্তির ভেতর। আমরা যদি বস্তিতে রাত ন'টার মধ্যে ঢুকি, তবে ওরা ওদের চরের থেকে আগাম খবর পেয়ে ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে। তখন আমাদের হাত কামড়ানো ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না।

ঠিক করলাম, আমরা একটু অপেক্ষা করে, রাত খানিকটা গভীরের দিকে এগিয়ে গেলে ওদের ঘাঁটিতে হানা দেব। কিন্তু ওদের গতিবিধির ওপর আমার ওই স্থানের চোখকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে বললাম।

ঘড়ির সময় অনুযায়ী রাত একটু তাড়াতাড়িই গভীর হল। কারণটা শ্রাবণের ঘনঘটা। জমকালো আকাশে একটাও নক্ষত্রের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। মেঘের ওপারে ওরা কে কী করছে কে জানে। পর্দা সরিয়ে আমাদের দেখার উপায় নেই।

রাত 'মাত্র দশটা। আকাশ নিজেই পর্দা সরাতে উদ্যোগী হল। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। কলকাতার নাগরিকদের মনে বোধহয় একটু স্বস্তি এল। তারা যে যার নীড়ে বিছানার অন্তরালে গা এলিয়ে হয়তো ভাবলেন, 'যাক, অন্তত আজকের তুমুল বৃষ্টির মাঝে বোমা গুলির আওয়াজ সারারাত ধরে শুনতে হবে না। নকশালরা বিপ্লবে সাময়িক ক্ষান্ত দিয়ে আমাদের একটা নিদ্রিত রাত কাটাতে দেবে।'

আর আমরা ভাবলাম, "ভালই হল, এই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সাগির খানের হত্যাকারীরা তাদের ঘাঁটি ছেড়ে অন্যত্র পালাবে না।'

আমরা বৃষ্টিকে সঙ্গী করে বেরিয়ে পড়লাম। দু'টো ভ্যান আর দু'টো অ্যামবাসেডর গাড়িতে চেপে আমরা ছুটলাম। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। একে নকশাল ও তার পাল্টা পুলিশী হানায় আতঙ্কিত শহরের বাসিন্দারা সন্ধের মধ্যে যে যার বাড়িতে ঢুকে শহর ফাঁকা করে দেয়, তার ওপর প্রখর বৃষ্টিতে রাস্তা জনশূন্য।

আমরা মিনিট কুড়ি পঁচিশের মধ্যে ষোলো নম্বর মুরারি পুকুর রোডের বস্তিতে পৌঁছে গেলাম। ওই বস্তিরই একটা ঘরে সাগির খানের হত্যাকারীরা রাতের আস্তানা গেড়েছে। আমাদের লক্ষ্য তাদের গ্রেফতার করা।

বৃষ্টির প্রবলতা একটু কমেছে। কিন্তু থামেনি। তার মধ্যে আমরা গাড়ি থেকে নেমে প্রথমেই বস্তির রাস্তাগুলো আটকে দিলাম। বস্তির "ঘরে ঘরে লোকজন বেশির ভাগই সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে। সাড়াশব্দ প্রায় নেই। শুধু একটা ঘর থেকে ট্রানজিসটারের আওয়াজ কানে আসছে।' বিবিধ ভারতীতে হিন্দি গান বাজছে। সেই ঘর থেকে কিছু আলো এসে ঘরটায় সামনে বৃষ্টির থমকে থাকা জলে পড়ে ঝিকমিক ঝিকমিক করে গানের তালে তালে নাচছে। বেশ কিছু ঘরের সামনেই ছোট ছোট বারান্দায় দেশি কুকুররা ঠাণ্ডা হাওয়ায় পায়ের ফাঁকে মাথা গুঁজে ঘুমোচ্ছে। আমাদের হঠাৎ আগমনের পায়ের ধ্বনিতে তারা এক এক করে

জেগে উঠে তারস্বরে অনাহূতের প্রবেশের খবর প্রায় রিলে সিস্টেমে বস্তির এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে পৌঁছে দিল।

বৃষ্টির তেজ কমে যেতে বস্তির সরু সরু গলির ভেতর আমাদের দশজনের একসঙ্গে হাঁটার আওয়াজ আমাদের নিজেদেরই কানে বাজছে। আমার স্থানীয় চোখ যেভাবে নির্দেশ দিয়ে নকশালদের আস্তানায় ঘরটা চিহ্নিত করতে বলে দিয়েছে, আমি মোটামুটি সেটা মাথায় রেখে, বাকিটা আন্দাজের ওপর ভর করে আমাদের দলকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছি। কিন্তু একটাই মুশকিল, বস্তির ভেতর চাপা অন্ধকারে বাধ্য হয়েই মাঝে মধ্যে টর্চ জ্বেলে পথের ঠাহর করতে হচ্ছে। এতে আমাদের যে বিপদ বাড়ছে সে সম্পর্কে আমরা সচেতন, কারণ যাদের আমরা গ্রেফতার করতে যাচ্ছি, তাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। তারা আমাদের দেখতে পাবে এবং তাদের গুপ্তঘাঁটি থেকে সেই আগ্নেয়াস্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবে। তাছাড়া কুকুরগুলোর লম্বা লম্বা পরিত্রাহি চিৎকার যে নকশালদের সজাগ করে দেবে, সে ব্যাপারেও আমরা স্থির বিশ্বাসী।

অপরাধী সবসময়ই ধরা পড়ার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে থাকে। সামান্য আওয়াজেই তারা সতর্ক হয়ে আওয়াজের উৎসের সন্ধান করে। আর কুকুরদের হঠাৎ রব কি তাদের জাগ্রত করে দেবে না? তার ওপর আমাদের জোড়া জোড়া বুটের আওয়াজের কোরাস ও বিদ্যুতের মতো মাঝে মধ্যেই টর্চের তীব্র ঝলকানি। এসবই আমাদের আত্মরক্ষার বিরুদ্ধে। যে কোনও সময় বস্তির কোনও এক কোণ থেকে তীব্র শিশের গোলা আমাদের বুক বিদ্ধ করে মাটিতে আছড়ে ফেলতে পারে। কিন্তু কিছু করার নেই, নিজেদের হৃদপিণ্ডকে মৃত্যুর হাতে জমা দিয়ে খুনীদের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। হাঁটাও কি সহজ? রস্তির কাঁচা পাকা নর্দমার জল উপছে পড়ে এদিক ওদিক ছুটছে, তার মধ্যে সরসর করে দিশাহারা ব্যাঙ, ইঁদুরেরা পথ খুঁজে মরছে। সমগ্র ভারতবাসীর মতোই?

বস্তির ভেতর মিনিট সাত আট এভাবে নিশানার দিকে চলার পর হঠাৎ দেখলাম, একটা ঘরের আলো জ্বলতে জ্বলতে নিভে গেল। সন্দেহ হল। মনে মনে আমার স্থানীয় চোখের বিবরণ মিলিয়ে ভাবতে লাগলাম, ওই ঘরটাই কি? ঝট করে ভেতরের আলোটা নিভে গেল কেন? আমাদের দলের পেছনে পেছনে বৃষ্টিতে ভিজে আসা দু'তিনটে কুকুরের সাবধান বাণীর জন্য?

আলোটা যখন নিভল, তখন আমরা ওই ঘরটা থেকে হাত বিশেক দূরে। একচালা ঘরের ভেতরের আলো কোনও এক কেরোসিন বাতির। তীব্রতা দেখেই মালুম হয়েছে। তার অর্থ, বাসিন্দারা ইচ্ছাকৃতভাবে নিভিয়েছে। তাহলে ওরা কি আমাদের দেখেই নিভিয়েছে? তাই যদি হয় তাহলে আমরা ওদের আগ্নেয়াস্ত্রের আওতার মধ্যে পড়ে গেছি।

আমার সঙ্গে অন্যান্য ক'জন আমাদের দলের সদস্যও ব্যাপারটা খেয়াল, করেছে। আমরা সতর্ক হয়ে বস্তির দুটো ঘরের আড়াল নিয়ে মিনিট দুয়েক ' অপেক্ষা করলাম।

দ্রুত ভেবে নিলাম, কীভাবে হানা দেব? কিন্তু ওই ঘরে হানা দেওয়ার আগে নিশ্চিত হওয়া দরকার, ওই ঘরেই নকশালরা আছে কিনা। যদি ভুল হয় তবে ওরা সতর্ক হয়ে তো যাবেই, উপরন্তু বেপরোয়াভাবে ওদের গচ্ছিত রিভলবার, পিস্তল থেকে আমাদের ওপর গুলি চালাতে পারে, তাতে আমাদের ঘায়েল হওয়ার সম্ভাবনা একশো ভাগ। তাই নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে ঘরের দাওয়ায় উঠে আমি আড়াল নিয়েছি, সেই ঘরেই ঘুমন্ত কাউকে ডাকা দরকার।

আমি ওই ঘরের বন্ধ কাঠের দরজায় টোকা দিয়ে ডাকতে লাগলাম, "এই, কে আছিস ভেতরে, ওঠ।"

প্রায় মিনিট পাঁচেক ডাকাডাকির পর ভেতর থেকে ঘুম জড়ানো পুরুষ গলায় উত্তর এল, "কে ডাকছিস বে?" আমি ইয়ার দোস্তের সঙ্গে কথা বলার ঢঙে বললাম, "উঠেই দেখ না, কে? ভয় পেয়ে গেলি না কি?" উত্তর এল, "ভয় পাওয়ার কি আছে, শালা বৃষ্টির বাজারে

ঘুমটা জমেছিল, ভাঙালি, তবু বললি না, কে?” কী নাম বলব? বলা যাবে না। তাই কথাটা ঘুরিয়ে কাজ উদ্ধারের জন্য ভেতরের বাসিন্দাকে একটু তোল্লা দিয়ে বললাম, “তোর নামে মুরারিপুকুর কাঁপে, বস্তির সবাই চমকায়, সেখানে আমি তো চুনোপুঁটি। তুই আমার গলা শুনে বুঝছিস না আমি কে? লোকটা নিজের কৃতিত্বের কথা শুনে বিছানা ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে জানতে চাইল, “কে ভোলা?” আমি বললাম, “এবার চিনেছিস?”

ঘরের ভেতর দেশলাই জ্বলল। সেই দেশলাই কাঠি থেকে কুপিও জ্বলে উঠল।

ভোলার বন্ধু দরজা খুলল। দরজা খুলেই সামনে আমাদের দঙ্গলের ছায়ামূর্তিগুলো দেখে ভূত দেখার মতো ওর চোখ একেবারে ছানাবড়া। ওর পেছনে একজন মোটামুটি বয়স্কা মহিলা।

মাঝবয়সী লোকটাকে বললাম, “ভয় নেই। আমরা শত্রু নই।” তারপর ওকে টেনে ওরই ঘরের বারান্দার সামনে নিয়ে এলাম। ভ্যাবাচাকা খেয়ে লোকটা এমনিতেই ভয়ে কাঠ। তার ওপর আমার টানে আরও ঘাবড়ে গেল।

সেটা অনুমান করে ওকে ভরসা দেওয়ার জন্য ওর কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বললাম, “আমরা লালবাজার থেকে এসেছি, সত্যিকথা বললে কোনও বিপদ হবে না।” লোকটার মুখ থেকে তীব্রভাবে দেশি মদের গন্ধ বার হচ্ছে। গন্ধটা সহ্য করেই আমাদের চিহ্নিত করা ঘরটার দিকে হাত তুলে নির্দিষ্ট করে জানতে চাইলাম, “ওই ঘরটায় কারা আছে?” লোকটা মাতাল, কিন্তু আমাদের ওইভাবে বৃষ্টির রাতে আক্রমণে ও অবাঞ্ছিত প্রশ্নে ওর নেশার পারদ তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। তাই ভয়ে আমার প্রশ্নের উত্তরে সে দু'বার মাথা নাড়ল। অর্থাৎ ‘জানে না।’

ওর মাথা নাড়া দেখেই আমি টের পেলাম, আমার ভেতরের গুহা থেকে কালো রুণু হুম হুম করে জেগে উঠছে। নিজেকে দাবড়ে যতটা পারি শান্ত হয়ে আবার ওর কানের কাছে মুখটা নিয়ে ওর বস্তির সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের লালবাজারীয় ভাষায় বললাম, “জানি না বললে তো চলবে না মাল। বস্তিতে এতদিন ধরে আছো, কোন ঘরে কে থাকে জানো না? আমরা কিছু বুঝি না?”

লোকটা ওর কানের কাছে আমার কর্কশ বজ্রপাতের ধাক্কায় প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, “আমি মরে যাব।”

ব্যস, ওর জবাবেই আমি উত্তর পেয়ে গেলাম। অর্থাৎ ও যদি বলে দেয় ওই ঘরেই নকশালরা আছে, সেটা ওরা জানতে পারলে ওকে খুন করে দেবে, সেই ভয়েই সে শঙ্কিত। ওই শঙ্কার কারণেই ও নির্দিষ্ট করে বলতে ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে যাচ্ছে। ওর ওই ভয়টার মধ্যেই আমি আমার উত্তর পেয়ে গেলাম যে আমাদের আন্দাজই ঠিক। ওই ঘরটাই আমার স্থানীয় চোখ সাগির খানের আততায়ীদের আঞ্চলিক ঘাঁটি হিসাবে চিহ্নিত করে আমাকে খবর পাঠিয়েছিল।

তবু ওই ঘরে হানা দেওয়ার আগে আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমি ওকে একটু ঘুরিয়ে বললাম, “শোন, ওই ঘরটা যদি না হয়, তবে আমি তোকে লালবাজারে নিয়ে যাব।”

লোকটা পরিস্থিতির চাপে এত ভয় পেয়েছে যে, কোনমতে একবার ‘হ্যাঁ’ ও ‘না’-র মাঝখানে মাথা নেড়ে করুণ গলায় আবেদন করল, “আমারে এখন ঘরে যেতে দেন বাবু।”

আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে বললাম, “ঠিক আছে যা, ঘর থেকে বার হবি না।” লোকটা ছাড়া পেয়ে প্রায় লাফ দিয়ে ছোট বারান্দাটা পার হয়ে ঘরে ঢুকে দরজায় খিল তুলে দিল। আমি জানি, লোকটা ঘরের ভেতর এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে আর মনে মনে ঈশ্বরকে দোষারোপ করে বলছে, “এ কোন অবস্থার মধ্যে আমাকে ফেললে প্রভু, এগোলেও মৃত্যু, পিছোলেও মৃত্যু।'

লোকটার কথা ভেবে আর আমাদের সময় নষ্ট করলে চলবে না। আমরা তাই ওই

ঘরটায় হানা দেওয়ার জন্য নিচু গলায় সামান্য আলোচনা করে কৌশল ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ওদিকে আকাশ বৃষ্টির একটু লাগাম টেনেছিল, আমাদের আলোচনার মধ্যেই কী ভেবে কে জানে লাগাম ছেড়ে দিতে আবার ঝমঝমিয়ে অন্ধকারকে আরও ঘন করে তুলল।

আলোচনা শেষ হতেই বৃষ্টির ঝালর সরিয়ে শচী ও রাজকুমার ওই ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল।

আমি, উমাশংকর, সমীরসহ বাকি আমাদের কনস্টেবলরা একটু পিছিয়ে। শচী ও রাজকুমার ওই ঘরের বন্ধ দরজার দু'পাশে দু'জন দাঁড়িয়ে বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে জোরে জোরে ঘা দিয়ে বলল, "এই কে আছিস ভেতরে, দরজা খোল, নয়ত ভেঙে ফেলব।"

আমরা অন্ধকারে শরীরটা লুকিয়ে নজর রাখছি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। শচীদের মিনিট তিন চার ধরে চিৎকারেও ঘরের ভেতর থেকে কোনও প্রত্যুত্তর এল না। রাজকুমার তার একশো কেজির শরীর নিয়ে ডান পায়ে সজোরে একটা লাথি মারল দরজার নিচটায়। দরজাটা দুলে কচমচ কচমচ আওয়াজ তুলে দাঁড়িয়ে গেল, খুলল না।

"খোল শালা।" রাজকুমারের হুঙ্কার। তবু দরজা নীরব। আবার জোরে লাথি। এবার দরজার মাঝ বরাবর। হুড়মুড়িয়ে দরজাটা ভেঙে ঘরের ভেতর পড়ল।

পতনের আওয়াজ বৃষ্টির ঝমঝমানির সঙ্গে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই পরিচিত শব্দ ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

রিভলবারের গুলি ছুটে আসতে লাগল। গুলির আওয়াজ শুনেই শচী ও রাজকুমার ওই ঘরটার দুদিকে ছিটকে দুজনে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ওরা সরে গিয়ে আড়াল নিতেই আমরা পাল্টা গুলি চালিয়ে ঘরের ভেতরের অধিবাসীদের জবাব দিতে শুরু করলাম। আমাদের রিভলবার ও কনস্টেবলদের রাইফেলের ঝাঁক ঝাঁক গুলি দরজার ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে ঘরের ভেতর আছড়ে পড়তে লাগল। ওদের গুলি সবই বৃষ্টির জলে কোথায় চলে যাচ্ছে, বোঝাও যাচ্ছে না। আমাদের দেখাদেখি শচী ও রাজকুমার ঘরের কোণাকুণি অবস্থান থেকে ফাঁকা জায়গা দিয়ে তাদের রিভলবার তাক করে গুলি চালাতে লাগল।

গুলির আওয়াজ বৃষ্টির আওয়াজকে ছাপিয়ে গেল। থেমে যাওয়া কুকুরের দু'একটা ডাক আবার শোনা যেতে লাগল। বস্তি নিবাসীদের কোনও তাপ উত্তাপ নেই। তারা বোধহয় জানে, এমন একদিন হবে। সারা কলকাতা জুড়ে যুদ্ধ হচ্ছে, আর তাদের বস্তিতে হবে না? তাই কোনও ঘরে আলো জ্বলে উঠল না, বা কারও দরজার কপাট খুলল না।

বস্তির দাবার ওপর মিনিট আট দশ দু'পক্ষের অস্ত্র চালাচালি। তারপর আর ঘরের দিক থেকে গুলি ছুটে বাইরে আসছে না। সম্ভবত, ওদের গুলির মজুত শেষ। আরও খানিকক্ষণ আমরা অপেক্ষা করলাম। ওদের উত্তর পাওয়ার জন্য শূন্যে গুলি চালালাম। না, কোনও জবাব নেই। কী হল? ঘুমিয়ে পড়ল না কি? হঠাৎ আকাশ লাগাম টেনে ধরল। বৃষ্টি বন্ধ। নীরবতা। তবে সম্পূর্ণ নয়। ঘরগুলোর টালি ও টিনের চাল থেকে জমে থাকা বৃষ্টির জল নিচে দাঁড়িয়ে থাকা জলের ওপর টুপটুপ করে ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে, আর তারই বাজনায় নীরবতাটাকে সম্পূর্ণ হতে দিচ্ছে না।

জোরালো টর্চের আলো ফেলা হল ঘরের ভেতর। আমরা রিভলবার, রাইফেল উঁচিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। দু'দিকের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল শচী ও রাজকুমার। ঘরের ভেতর থেকে কঁকিয়ে ওঠার একটা ক্ষীণ আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

লাফ দিয়ে আমি, শচী ও রাজকুমার প্রথমে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেলাম। ছোট ঘর। টর্চের আলোয় সব কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একটা ছেলে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। ওর ডান হাতে ধরা রিভলবার। বুকে গুলি লেগে নিঃসাড়।

ওর পাশেই আর একটা ছেলে, উপুড় হয়ে আছে। ওর গলা দিয়েই ক্ষীণ শব্দ বার হচ্ছে। আমাদের ঘরে পদাপর্ণের সময় একবার ও মাথা তুলতে চেষ্টা করল। পারল না।

প্রথম ছেলেটা মনা। মৃত। দ্বিতীয় ছেলেটা শিবু। ভীষণভাবে আহত। মনার ডান হাতে ধরা রিভলবারটা তুলে নিলাম। পুলিশের থেকে ছিনতাই করা। নম্বর দেখলাম দুই নয় নয় সাত চার দুই। অর্থাৎ সাগির খানের সার্ভিস রিভলবারটা। শিবুর তলপেটে আর কাঁধের নিচ গুলি লেগেছে।

ওদের দুজনকে তুলে আমরা বস্তির বাইরে রাস্তায় অপেক্ষমান ভ্যানের দিকে চললাম। আমাদের ফিরে যাওয়ার পথের দু'পাশের ঘরগুলো থেকে বস্তিবাসীরা কোনও সামান্য কৌতূহলেও উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখল না।

আমরা মনা আর শিবুকে নিয়ে ছুটলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দিকে। হাসপাতালে পৌঁছনোর আগেই শিবুর গলার ক্ষীণ আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। তবু আমরা জোরে গাড়ি ছুটিয়ে হাসপাতালে পৌঁছলাম।

চিৎকার চেঁচামেচি করার পর, যখন ডাক্তারবাবুরা ওদের পরীক্ষা করতে এলেন, তার মধ্যে প্রায় মিনিট কুড়ি পঁচিশ মিনিট সময় পৃথিবী পার করে দিয়েছে। ডাক্তারবাবুরা শিবু ও মনাকে পরীক্ষা করে জানালেন, "আমাদের আর কিছু করার নেই।" ওদের দেহ দু'টোকে পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে, ওদের থেকে উদ্ধার করা রিভলবার ও পাইপগান নিয়ে আমরা যখন লালবাজারে ফিরে এলাম, তখন রাত প্রায় দু'টো। আকাশ আবার লাগাম খুলে দিল। কলকাতা ঘুমোক।

কিন্তু কলকাতা কি ঘুমোতে পারবে? তার বুক জুড়ে যে শুরু হয়েছে অস্থিরতার পদচারণা। সেই পদক্ষেপ কোন দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তার কোনও দিশা কেউ জানে না। এ যেন বহুদূরে জ্বলছে একটা রঙিন অলীক স্বপ্নের বাতি, আর তাকে কাছে পেতে উন্মাদের মতো মত্ত হাতির ছোটা। আর সেই 'হাতি' জানে না তার স্বপ্নের ধাক্কায় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে কত সবুজ গাছ, কত গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। কত মায়ের কলজে ফেটে ছিটকে তলিয়ে যাচ্ছে নতুন কিশলয়।

সুতরাং সে ঘুমোবে কী করে? আগামী সকাল কীভাবে তাকে মুখ দেখাবে তা তো সে নিজেই জানে না।

কয়েক শো বছর ধরে সে ভোরের আলো দেখেনি। বিশেষ করে দিক বিভ্রান্তির অক্টোপাশে জড়িয়ে শেষ দু'বছর।

তার চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে ফেরার। আরও ফেরার হল বারোই আগস্ট যখন নকশালরা কংগ্রেসের নেতা নির্মল চট্টোপাধ্যায়কে কাশীপুরে খুন করল। নির্মলবাবু খুন হওয়ার পর কাশীপুর বরাহনগরের কংগ্রেসের ভেতরকার একাংশ, স্থানীয় কিছু কিছু সি.পি.আই.(এম)-এর ভেতরকার মস্তানের সহায়তায় নকশাল সমর্থক বেশ কিছু ছেলেকে হত্যা করে ফেলল। আর এই হত্যাকাণ্ডের জেরে কলকাতা ঘুমোবে কী করে?

কলকাতার বুকে যে চলছে, খুন কা বদলা খুন'। 'জান কা বদলা জান'।

অশান্ত কলকাতাকে শান্ত করার দায়িত্ব আমাদের কাঁধে। কীভাবে করব আমরা শান্ত? মত্ত হাতি, ক্ষুধার্ত বাঘ, হিংস্র হায়না ধেয়ে আসছে কলকাতার বুকে, কী যাদুদণ্ডে নিবৃত্ত করব তাদের?

দু'টোই পথ। একটা আত্মসমর্পণ অর্থাৎ তাদের বরণ করা। অন্যটা তাদের আটক করে খাঁচায় বন্দী করা। কিন্তু মত্ত হাতি মানবে কেন আমাদের দাবি। সে তার দানবতার পরাক্রম জাহির করতে আস্ফালন করবেই। তার জ্ঞানবুদ্ধির কোষে কোষে যে তখন জাঁকিয়ে বসে আছে অন্ধ অহংকারের খুনি নেশা।

সুতরাং খুন সে করবেই। আঠেরোই আগস্ট সন্ধে ছ'টার সময় ব্যাঙ্কশাল কোর্টের মুহুরি, আমাদের প্রাক্তন ড্রাইভার কনস্টেবল তিনকড়ি দত্তকে নকশাল রণজিৎ দাশ ও অনাথ কুমার দে রামচন্দ্র চ্যাটার্জি লেনে বোমা মেরে খুন করল।

খুন করল আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার সঙ্গে যুক্ত বাইশ তেইশ বছরের যুবক বৈষ্ণব

সম্মিলনি লেনের বাসিন্দা প্রহ্লাদ নায়েককে। নকশালরা একুশ তারিখ বিকেল পাঁচটার সময় তাকে কৈলাশ বসু স্ট্রিট ও সুকিয়া রোর সামনে ধরে বুকে গুলি করল। তাদের মত্ত গুলি চালনায় খুন হয়ে গেল আহিরীটোলা স্ট্রিটের বারো বছরের ছোট্ট কিশোরী লীলা চট্টোপাধ্যায়। কী দোষ ছিল তার যে জীবনের ফুল ফোটার আগেই কুঁড়িতে ঝরে গেল ওদের পাইপগানের গুলি বুকে নিয়ে? কেদারনাথ দাস লেনে নকশালদের ছোঁড়া গ্রেনেডে সি.আর.পি-র সিপাই বিজয় বাহাদুর মারা গেল। খুন হল ওই কেদারনাথ দাস লেনের দুয়ের বি বাড়ির অধিবাসী সি.পি.আই.(এম) পার্টির কর্মী অনিল ঘোষ, তাকে রাজাবাগান লেনের নর্দমায় মাথা কেটে নকশালরা খুন করল।

কাঁকুলিয়া রোডের রেলওয়ে লাইনের সংযোগস্থলে একটা কাগজ কুড়ানো লোকের ছিন্নভিন্ন দেহ পাওয়া গেল। মৃতদেহের বুকে পিন দিয়ে লাগানো ছিল একটা কাগজ। কাগজে বাংলায় লেখা, "পুলিশের আই.বি. খতম চলছে, চলবে।- -সি.পি.আই. (এম এল)।" '

মহেশতলা লেনের প্রাক্তন হোমগার্ড গোলকনাথ কর্মকারকে ডেন্ট মিশন রোডের একটা চায়ের দোকানে সন্ধেবেলায় খুন করল। খুন হল টালিগঞ্জ রোডের আর এক প্রাক্তন হোমগার্ড চিত্তরঞ্জন দাশ, খুনটাও হল খুব অদ্ভুতভাবে। পাড়ার কালী প্রতিমা বিসর্জনের মিছিলে সে ছিল একেবারে শেষ প্রান্তে। মিছিল পরিক্রমা করছিল সুলতান আলম রোড দিয়ে। না, রাত মোটেই গভীর হয়নি। সবে সন্ধে সাড়ে সাতটা। কিন্তু নকশালদের বিপ্লবী পরিস্থিতি জোর করে পাকানোর ঠেলায় সন্ধে সাড়ে সাতটাই তখন প্রায় গভীর রাতের সমপর্যায়ে। চিত্তরঞ্জন কোনও অলীক ভাবনাতেও ভাবতে পারেনি, সে ওই ধর্মীয় মিছিলে ব্যক্তিগতভাবে শ্রেণীশত্রু চিহ্নিত হয়ে বিপ্লবের অগ্রগতির জন্য বলি হবে। ,

কিন্তু ঘটনাটা ঘটল তাই। চিত্তরঞ্জন আক্রান্ত হল। তার তলপেট ও তলপেটের নিচের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। মিছিলে হইচই। মিছিলে অংশগ্রহণকারী অন্য লোকেরা নকশালদের দলটাকে তাড়া করল। একজন ছাড়া অন্যরা পালিয়ে গেল। ধরা পড়ল নির্মল বিশ্বাস। সে আবার আমাদের কলকাতা পুলিশের এক হেড কনস্টেবলের ছেলে, যে তার বাবাকে ও 'শ্রেণীবিদ্বেষের আগুনে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল, চিত্তরঞ্জন দাশ বাঙুর হাসপাতালে মারা গেল।

হাসপাতাল ও শ্মশানের বুক তখন মৃত্যুর মিছিলে আবদ্ধ। যুদ্ধের মাঠ থেকে হাসপাতাল ঘুরে শ্মশানের বুকে ঠাঁই। শ্মশানের কালো ধোঁয়া তখন কলকাতার আকাশে। তান্ত্রিক নেতা তাঁর বিনিদ্র লাল চোখে কী উল্লাস দেখেছিলেন তিনিই জানতেন।

কোন অন্ধকার গলির বুক থেকে তিনি খুঁজতে গিয়েছিলেন সূর্যের রশ্মি? ইতিহাসের কোন পরিচ্ছেদে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর পথের নিশানা? মৃত্যুই যে মুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, সৃষ্টির একমাত্র পথ, কোন দেশের কোন কবি সেই ছবি এঁকেছিলেন? নরকই যে স্বর্গে পৌঁছনোর সহজ পথ, কোন মনীষী কবে তা মানুষকে গান বেঁধে শুনিয়েছিলেন?

অবাঞ্ছিত মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর একটা অঞ্চল কবে মুক্তির সোপান হয়ে বাকি দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছে?

ইতিহাসকে নানা জনে নানা কায়দায় নানা ভাষায় বিকৃত করেছে, কিন্তু তা কি কখনও হয় চিরস্থায়ী? চিরস্থায়ী হলে ইতিহাসের ওপর আর মানুষের আস্থা থাকত না। মানুষ জানে, চিরস্থায়ী হলে চেঙ্গিস খাঁ, তুঘলক কিংবা হিটলারেরা ইতিহাসের নায়ক ও পূজ্য হতো।

কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে তা হয় না। সত্য সত্যই। ভুল ভুলই। খনির গভীর বুক থেকে ইতিহাস তুলে আনে সোনা। কোনও তামা, পিতল নয়। ইতিহাস তার জীবন্ত চোখ দিয়ে বুঝে নেয় আসল আর নকলের পার্থক্য, ঠিক আর বেঠিকের তফাৎ। ইতিহাসের কাছে হঠকারি আবেগের কোনও স্থান নেই।

রক্তের ঋণ শোধ করতে সত্তর ও একাত্তর সালে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই কতজনের রক্ত

নিংড়ে একেবারে খতম করল নকশালরা?

সত্তর সালে সারা পশ্চিমবঙ্গের বুকে তারা হত্যা করল দুশো একচল্লিশ জনকে। এই দুশো একচল্লিশ জনের মধ্যে—কলকাতায় সতেরো জন পুলিশ সমেত মোট পুলিশ কর্মীর সংখ্যা উনপঞ্চাশ। বাকিরা কেউ সি.পি.আই.(এম) কর্মী, কংগ্রেস সমর্থক ও সাধারণ মানুষ। তাছাড়া সাতশো একত্রিশটা হামলায় অগ্নিসংযোগ, বোমাবাজি, লুঠ ও সংঘর্ষের মাধ্যমে কত যে লোককে চিরদিনের মতো পঙ্গু, অথর্ব ও কর্মহীন করে ছেড়েছে, তা তাদের শ্রদ্ধেয় নেতাও বলতে পারতেন না।

সত্তরের পর একাত্তর। বিপ্লব আরও তুঙ্গে। তাদের নেতার ঘোষিত মুক্তির সাল উনিশশো পঁচাত্তর আরও এক পা এগিয়ে এসেছে। শবদেহের ওপর তন্ত্রসাধনার যজ্ঞের মঞ্চে আরও তুমুল আগুন ঝরাচ্ছে। একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গে সেই তন্ত্রসাধনার বলি হল সাতশো সাতাশ জন। সাতশো সাতাশ জনের মধ্যে কলকাতায় একশো একুশ জন।

কতজন পুলিশ?

সাতশো সাতাশ জনে পুলিশ কর্মী চুরাশি জন।

সি.পি.আই.(এম) কর্মী একশ ঊনষাট জন

কংগ্রেস পার্টির কর্মী পঁয়তাল্লিশ জন।

এক বছরের মধ্যে এত খুনের ব্যাপকতায় কত লোক যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে তা কি ইতিহাসের খাতা ভুলে গেছে লিখতে? ভোলে নি।

কিন্তু সেটাই করতে চাইছে এক ধরনের মুখোশধারী প্রগতিবাদীরা। তারা ইতিহাস নিজের মুঠোয় পুরে দেখাতে চাইছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গে এক হাজার মানুষ খুন ও প্রায় পাঁচ হাজার মানুষকে পঙ্গু করাটা কিছুই নয় ! ওটা একটা ‘উত্তরণের’ মাধ্যম !

তাদের মধ্যে কেউ গলা নিচু করে বলছে, পথটা সম্পূর্ণ ভুল নয়, কিছুটা ভুল।

কেউ বলছে, একেবারেই ভুল নয়! অর্থাৎ এই খুনের সাধনার মধ্যেই জেগে উঠবে 'মুক্তির দেবতা'!

তারা কথার মারপ্যাঁচে, সময়ের ভুলভালাইয়ার ধাঁধায় মানুষকে ভুলিয়ে দিতে চাইছে যে, তারাই একদিন খুন করেছিল বিচারপতি কিরণ লাল রায়কে, খুন করেছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপাল সেনকে, খুন করেছিল হেমন্ত বসুকে, খুন করেছিল অজিত বিশ্বাস, নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের মতো জননেতা সহ অজস্র সাধারণ কর্মী ও সমর্থকদের। পঙ্গু করেছিল বিচারপতি টি পি মুখোপাধ্যায়কে।

তাদের কাছে প্রশ্ন, এঁদের কি বাঁচার কোনও অধিকার ছিল না? ছিল না তাঁদের বাকি জীবনটা এই পৃথিবীর বাতাস থেকে প্রশ্বাস নেওয়ার স্বত্ব?

আরও প্রশ্ন, কোন অধিকারে তাঁদের মানব জীবনটা ওরা ছিনিয়ে নিয়েছে? তার জন্য দায়বদ্ধ কে এবং কারা?

তাঁদের জীবন ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষতিপূরণ কে বা কারা দেবে? ইতিহাসের পাতায় তাদের পরিচয় কী?

কোন উদ্দেশ্য সাধনে, কার নির্দেশে এঁদের অকালমৃত্যুর সম্মুখীন হতে হল?

আর এই মৃত্যুর মিছিলের জন্য কে উঠবে কাঠগড়ায়?

কে শুনছে এঁদের কান্না? -

কে দেবে এঁদের নামে জয়ধ্বনি?

কে জ্বালবে এঁদের স্মৃতিতে দুটো আলো?

কে গড়বে শহীদ স্মারক? আর তাতে দেবে ফুল?

কে দেবে এঁদের মৃত্যুকে অমরত্বের স্বীকৃতি? কে দেবে?

সত্যের অনেক দায়। তাকে খুঁজে নিতে হয় পথ। মিথ্যার ক্রমাগত বাণেও সে মাথা উঁচিয়ে ঠিক চলে।

সেই দায়ের কাছেই আমরা দায়বদ্ধ।

তাই আমাদেরই দিতে হবে এঁদের স্বীকৃতি, এঁদের বেদীতে আলো আর ফুল, কারণ আমরা তন্ত্র সাধনার উপাসক নই। আমরা মৃত্যুর চেয়ে জীবনকে বেশি ভালবাসি !

জীবন আর মৃত্যুর এই টানাপোড়েনের আড়ালে অন্ধকারে লালিত হচ্ছিল আরেক ধরনের দুষ্কর্মের কারবারী। আর তারা লালিত হচ্ছিল রাজনৈতিক পার্টিগুলোর বুকের ওমের আদর খেয়ে।

রাজনৈতিক দলগুলো যে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা গলা উঁচু করে জাহির করে, তা যে কতটা ভ্রান্ত, ষাটের দশকের শেষ প্রান্তে ও সত্তরের দশকের শুরুর থেকে আরও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল। এবং প্রায় নির্লজ্জভাবে।

ভীত, নীতিহীন, মেরদণ্ডবিহীন কোনও ব্যক্তি আর যাই হোক, দেশসেবক হতে পারে না। কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য এমনই, কিছু ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর হাতে রাজনৈতিক দলগুলোর পরিচালন ভার চলে গিয়েছিল এবং পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ফলে তারা অন্যের আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচার তাগিদে মস্তান, গুণ্ডা, চোরাকারবারী, ডাকাত পুষতে শুরু করেছিল। ভেবেছিল, এদেরকে বেশি বেশি করে নিজের আয়ত্তে রাখতে পারলে নিজের ক্ষমতা কব্জায় রাখা যাবে।

আমাদের দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে দুর্বৃতায়নের ভিত্তিস্থাপন যদিও পঞ্চাশের দশকেই হয়েছিল, কিন্তু সে তার ডালপালা ছড়িয়ে সামগ্রিকভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রকে গ্রাস করতে শুরু করল ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে।

আর তার জন্য যে পার্টিগুলোর দুর্বল নেতৃত্বই দায়ী, সে সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই নেই। এমন কি ক্ষমতালোভী সেই সব নেতারা নিজেদের আখের গোছাতে দুষ্কৃতীদেরই সিঁড়ি হিসাবে মঞ্চে টেনে এনেছে, তাও সত্য। আর এই ছোঁয়াচে রোগে কম বেশি আক্রান্ত হয়নি, এমন পার্টি ভারতবর্ষের মাঠে নেই !

দুষ্কৃতীরা ক্ষমতাসীন পার্টির আঁচল যে খুঁজবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ক্ষমতার আস্বাদ, তার প্রতিপত্তি তারা তো ভোগ করতে চাইবেই। প্রশাসনকে ব্যবহার করে, পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রেখে তারা যে দৌরাত্ম্য চালাবে, এই সাধারণ সত্যটা বুঝতে বিশেষ রাজনীতি বোঝার দরকার নেই।

নেতাদের মদতেই তারা এলাকা দখল রাখার জন্য দৌরাত্ম্য চালায়। নেতাদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় তারা যে আস্তে আস্তে গজিয়ে ওঠে, এরকম লক্ষ লক্ষ কাহিনী সারা ভারতের এ প্রান্তে থেকে ও প্রান্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

আর এ ব্যাপারে পথপ্রদর্শক হিসাবে প্রথমেই নাম করতে হয় কংগ্রেস পার্টিকে। তার প্রধান তিনটে কারণ। প্রথমত, কংগ্রেসই দীর্ঘদিন সারা ভারতবর্ষ শাসন করেছে এবং তারই ফলস্বরূপ দুষ্কর্মের নায়করা তাদের কাছে ভিড় করেছে।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে কংগ্রেস পার্টিটা সাংগঠনিক দিক থেকে একটা গোয়ালঘরের রূপ নিয়েছে। সেখানে দাদা দিদিদের কারবার। আর কোনও এক দাদা কিংবা দিদির লেজ হতে পারলেই কেল্লা ফতে। সেই লেজ হওয়ার জন্য দরকার হয় না খুব বেশি পরিশ্রমের কিংবা কোনও রকম গুণের। দরকার শুধু তৈলমর্দন এবং জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে তাদের কাছে 'নাড়া' বাঁধা। সুতরাং যাদের প্রয়োজন ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার, তারা সে সুযোগ ছাড়বে কেন?

তৃতীয়ত, স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকেই অর্থবান লোকেরা ক্ষমতা ও ভোগের পিপাসায় কংগ্রেস পার্টিকে ময়াল সাপের মতো আস্তে আস্তে গিলে ফেলেছে। তাদেরই দরকার হয় সিপাই সামন্ত। এই সিপাই সামন্ত তারা এলাকায় এলাকায় পেয়ে যায় গুণ্ডা, মস্তানদের ভেতর এবং সহজেই টেনে নেয় তাদের।

কংগ্রেস পথপ্রদর্শক। আর কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে সব পার্টি গজিয়েছে, তারাই বা কী করে এই রোগের হাত থেকে বেঁচে থাকবে? উত্তরাধিকার হিসাবে সেই সংস্কৃতিই তো

তারা রক্তে আর মজ্জায় পেয়েছে। সুতরাং তাদের শরীরও স্ফীত হয়েছে একই কায়দায়।

আর পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর সি.পি.আই.(এম)ও তাদের সঙ্গী পার্টিগুলোতেও মস্তানদের দ্রুত আগমন অব্যাহত রয়েছে। ক্ষমতায় থাকলে এই ধারা চলবেই।

কলকাতায় মস্তানদের দৌরাত্ম্য চিরকালই উত্তর ও মধ্য কলকাতায় বেশি। উত্তর ও মধ্য কলকাতার অল্পবয়সী যুবকদের আড্ডার অন্যতম আলোচ্য বিষয়ই ছিল 'মস্তানী'। কে কোথায় কবে কাকে মেরেছে, কাকে খুন করেছে, কোথায় ডাকাতি করেছে সেই সব কাহিনী নিয়ে জমাট গপ্পোটা তাদের আলোচনার অন্যতম মুখরোচক বস্তু। রক থেকে রকে এক একটা কাহিনী শাখা প্রশাখা বিস্তার করতে করতে কল্পলোকে এমন একটা জায়গায় উত্তীর্ণ হয়ে যায় যে তার নায়ক হওয়ার স্বাদ অনেকেরই মনপসন্দ।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে শ্যামবাজারের ফড়িয়াপুকুরে মস্তান হিসাবে পরিচিত হতে লাগল পান্না মিত্র। মস্তানি আর কী? সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার। জোর করে তোলা আদায় করা। দু'চার ঘা এর কাঁধে ওর পিঠে বসানো। পান্নার মতো মস্তানরা বেশিরভাগই ছিল স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন। এদের জীবনের একটাই মতাদর্শ, 'খাও, পিও, জিও।' সেখানে বাধা পেলেই এরা ক্ষিপ্ত এবং পরিণতিতে দাঙ্গাবাজি।

কেমন মস্তান ছিল পান্না? সে প্রতি সপ্তাহে মুখে কালো কাপড় বেঁধে তার সৈন্যদের নিয়ে খোলা তরোয়াল উঁচিয়ে এলাকা পরিক্রমা করে তার দাপট জাহির করত। যাতে তার বিরুদ্ধে কেউ ফোঁস করার সাহস না পায়।

সে তার ঘাঁটি তৈরি করল যদু মিত্র লেনে লালাজির খাটালে। খাটালটা মস্তানদের ঘাঁটি করার জন্য একেবারে আদর্শ। কারণ খাটালটার চারদিকে চারটে রাস্তা। মাঝখানটায় অবস্থান করলে চারদিকেই নজর রাখা যায়। তাতে পান্নার সুবিধা। কে এল, কে গেল, সে খাটালের সিংহাসনে বসেই পর্যবেক্ষণ করতে পারে। খাটালের খাটিয়াই তার সাম্রাজের মজলিসি আসর বসানোর স্থান। সেখানে বসেই সে হুঙ্কার ছাড়ে, নির্দেশ দেয়, আর ওর নির্দেশ মতো ওর চেলা মনু, বিশু, যতু, শেলু, গুয়ে, তিলক ও জয়হিন্দ নন্দীরা বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে কাজ করে আসে। ক্রমে লালাজির খাটালের নামই হয়ে গেল পান্নার খাটাল।

অন্য অনেক মস্তানদের থেকে পান্না একটু অন্য ধরনের ছিল। কারণ ও নারীসক্ত ছিল না। সমকামী ছিল। আর ওর সেই তৃপ্তি মেটাতে ও পাল স্ট্রিটের অপু ঘোষ নামে একটা অল্পবয়সী সুন্দর চেহারার ছেলেকে পুষতো। অপুকে সে কোনও দাঙ্গা বা মারপিটে অংশগ্রহণ করতে দিত না। যদি সে কোনওরকম আঘাত পায়, সেই আশংকাতেই তাকে লুকিয়ে রাখত। সে অপুকে সিনেমা দেখতে, ঘুরতে নিয়ে যেত।

অন্য আর একটা জায়গায়ও পান্না সাধারণ মস্তান শ্রেণীর থেকে আলাদা ছিল। তা হচ্ছে, সে মদ্যপানে খানিকটা নিরাসক্ত ছিল। ওর প্রিয় নেশা ছিল গাঁজা। খাটালের সিংহাসনে বসে সারা দিনে কত যে ছিলিম উড়িয়ে দিত, তা একমাত্র ওই বলতে পারত। গাঁজার প্রভাবে ওর চোখ সব সময় সিঁদুরের মতো লাল হয়ে থাকত।

না। এমনিতে ওর চেহারাটা বাজখাঁই ধরনের ছিল না। বরং ছিল ছিপছিপে, মাঝারি উচ্চতার। গায়ের রঙ মোটামুটি ফর্সা। সেই শরীরে সবসময়ই চাপিয়ে রাখতো তার নিজস্ব ঘরানার সাজ। পায়জামা ও শার্ট।

চেহারায় হিংস্রতা না থাকলেও, ওর কাজে হিংস্রতা প্রবলভাবে ছিল। সেই হিংস্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটতো যখন সে তার শত্রুদের মোকাবিলা করত বা কেউ তোলা দিতে অস্বীকার করত। সে হিংস্রতা দিয়ে দেখাতে চাইত তার জোর, তার বিক্রম। সব মস্তানরাই এই কৌশল নেয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমেই ওরা সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। ওরা জানে, এই আতঙ্ক ছড়াতে পারলেই ওদের কাজ অর্ধেক শেষ। ওই আতঙ্কের পথ ধরেই সহজে চলে আসবে স্ফূর্তির রসদ।

ষাটের দশকে সহাবস্থানের ভিত্তিতে মস্তানিটা কমই হতো। মস্তানদের মধ্যে একটা চাপা রেষারেষি থেকেই যেত। আর এই রেষারেষিটা সামাল দেওয়াটাই ছিল মস্তান গোষ্ঠীর নেতার কাজ। সেটা ঠিক মতো সামলাতে না পারলে এলাকা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই সে ব্যাপারে ওরা সদা সতর্ক থাকত। আর এলাকার ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে গেলে সে কীভাবে আর মস্তান রইল? মস্তানদের শ্রেণীতে সে হয়ে যাবে একটা হাসির খোরাক।

বেলগাছিয়া অঞ্চলের ভোঁদা ছিল পান্নার চিরশত্রু। আর ওর শত্রু হয়ে উঠেছিল মোহনবাগান লেনের ছোট লখিয়া। তার ওপর ছিল বিদ্যার দল। পান্নাকে শায়েস্তা করার জন্য ওরা একসঙ্গে মিশে গেল। পান্নার কাছে মার খেয়ে ছোট লখিয়া ভোঁদার দলে যোগ দিল এবং সে মোহনবাগান লেন ছেড়ে বেলগাছিয়ার ওলাই চণ্ডী বস্তিতে ভোঁদার এলাকায় গিয়ে বাস করতে শুরু করল।

পান্নার দলের ছেলেদের সে আয়ত্তে পেলে মারধোর করে ছেড়ে দিত। তাছাড়া রাতের দিকে লরি লুঠের প্রধান কারিগর পান্নাকে জব্দ করতে না পারলে ছোট লখিয়া যে এলাকা জুড়ে রাজত্ব কায়েম করতে পারবে না, সেটাও ভালভাবেই জানত। তাই পান্নাকে জব্দ করার জন্য সে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করতে লাগল।

পান্না ছোট লখিয়ার সব খবরই পেত। পান্না লখিয়াকে শাস্তি দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগল। সেই চেষ্টার ফলস্বরূপ একদিন দুপুরবেলা পান্নার ছেলেরা একা লখিয়াকে হাতিবাগানে পেয়ে গেল।

ওকে ওরা টানতে টানতে নিয়ে এল যদু মিত্র লেনে লালাজির খাটালে। খাটালে বিচারক পান্না তার প্রিয় খাটিয়ায় গাঁজা সেবন করে অধিষ্ঠান করছে। লখিয়াকে দেখে পান্না হো হো করে হেসে উঠল। লখিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। পান্না গাঁজার প্রভাবে আরও জোরে হাসতে লাগল। লখিয়াকে বোঝাতে লাগল, যে ছকে সে পান্নাকে শেষ করতে চেয়েছিল, সেই দান উল্টে ছোট লখিয়াই এখন তার হাতে বন্দী।

পান্নার হাসি দেখে লখিয়া বুঝল তার ঘোরতর বিপদ। কিন্তু সেও তো মস্তান, কী করে সম্মান নিয়ে সে পান্নার হাত থেকে মুক্তি পাবে, সেই চিন্তা করতে লাগল।

সে খাটালের চারপাশটা দেখে নিয়ে হঠাৎ পান্নার পা চেপে ধরে বলতে লাগল, "আমাকে এবারের মতো মাপ করে দাও গুরু, আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকব, তোমার বিরুদ্ধে কিছু করব না।"

লখিয়ার কাতর আবেদন শুনে পান্নার হাসির বেগ আরও বেড়ে গেল। সে লাথি মেরে লখিয়াকে সরিয়ে দিয়ে ওর শাগরেদদের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখেছিস, শালা নাকি মস্তান, আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছে।" আবার হো হো হাসি। মনু, বিশু, গুয়েরা হাসিতে যোগ দিয়ে খাটাল উড়িয়ে দিতে লাগল। লখিয়া পান্নার লাথি খেয়ে খাটিয়ার সামনে মাটির ওপর চুপ করে বসে আছে।

পান্না হঠাৎ হাসি থামিয়ে দিয়ে লখিয়াকে বলল, "কি রে, বাড়ি যেতে চাস?" লখিয়া মাথা নেড়ে কোনও মতে জানাল, "হ্যাঁ।" পান্না আবার হেসে উঠল। শাগরেদরা যথারীতি ঠিক সুরে বেজে উঠল।

পান্না হাসি থামালো। ঝপ করে চেলারাও হাসি বন্ধ করে দিল। গুরু যখন হাসি থামিয়ে দিয়েছে, তখন ওরা তো আর হাসতে পারে না।

পান্না বলে উঠল, "যা।" লখিয়া করুণ মুখ করে উঠে দাঁড়াল। পান্না আবার হেসে উঠল। লখিয়া পান্নার মুখের দিকে তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

সে তো আর পান্নার হাসির মাঝপথে চলে যেতে পারে না। তাহলে ফড়িয়াপুকুরের সম্রাটকে অসম্মান করা হয়। অসম্মান করলে যে বিপদ হবে, সেটা লখিয়া বিলক্ষণ জানে।

পান্না হাসি থামিয়ে লখিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল চুপচাপ। খাটালের একটা গরু

হাম্বা স্বরে ডাক দিতেই দৃশ্যের পরিবর্তন হল। পান্না লখিয়াকে বলল, "কান ধর।" লখিয়া মাথা নিচু করে দু'হাত তুলে নিজের কান ধরল। পান্না বলল, "বল শালা, আর কোনওদিন আমার শত্রুতা করবি না।" লখিয়া মিনমিন স্বরে বলল, "আর কোনওদিন তোমার বিরুদ্ধে কিছু করব না।" লখিয়া কান ছেড়ে দিল। দাঁড়িয়ে রইল। আদালত থেকে মুক্তির আদেশ পাওয়ার আশায়। ,

পান্না মিনিট পাঁচেক পর বলল, "যা শালা, আজকে তোকে ছেড়ে দিলাম।" এই আদেশটা শোনার জন্য লখিয়া এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। সে ঘুরে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে পান্না হুঙ্কার ছাড়ল, "দাঁড়া।" লখিয়া দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হল। ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, পান্নার পরবর্তী আদেশ কী হবে সেটা ও অনুমান করার চেষ্টা করছে। না বুঝতে পেরে বিভ্রান্ত।

পান্না আদেশ করল, "এগিয়ে আয়।" লখিয়া যতটা এগিয়ে গিয়েছিল, ততটা আবার পিছিয়ে এল। পান্নার মনের হদিশ ওর এতদিনের চেলারাও আন্দাজ করতে পারছে না।

লখিয়াকে হাতে পেয়ে ওকে শুধু কান ধরিয়ে ছেড়ে দেওয়াটাও ওদের মনঃপূত হচ্ছিল না। ওরা মনেপ্রাণে চাইছিল, ওদের গুরু ছোট লাখিয়াকে আরও কঠিন শাস্তি দিক। এমন কি, পান্নার পাশে বসে সব ঘটনা নিরীক্ষণ করতে থাকা নরমপন্থী অপুও চাইছিল, তার গুরু লখিয়াকে আরও কঠিন কোনও দাওয়াই দিক। যাতে সে তার 'সাত রাজার ধনের' বিরুদ্ধে কোনও কাজ করার সাহস না পায়।

পান্না কী চিন্তা করছিল, তা কিন্তু ওরা কিছুই বুঝতে পারেনি। সে লখিয়াকে সামনে দাঁড় করিয়ে মনুর দিকে তাকিয়ে বলল, "অ্যাই, মনু, তোকে একবার লখিয়া মেরেছিল না?" মনু বলল, "হ্যাঁ।"

মনুর উত্তর শুনে পান্না চুপ, তারপর দু'বার মাথা ঝাঁকাল। লখিয়ার দিকে তাকাল। আদেশ করল, "তুই তোর জামা প্যান্ট খোল।" লখিয়া ভেবে পেল না পান্না কী বলছে। সে জিজ্ঞেস করল, বলছ গুরু?" পান্না নির্মম। হুকুম করল, "জামা প্যান্ট খোল।" লখিয়া হুকুম শুনেও দাঁড়িয়ে আছে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। সে এত লোকের সামনে জামা প্যান্ট খুলবে কী করে। তার মস্তানি জীবনে এ রকম কোনও ঘটনার কথা শোনেনি।

পান্না বলে উঠল, "কী রে শালা লজ্জা করছে? লখিয়া কোনও কথা না বলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। পান্নার চেলারা ওকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। পান্না ওদের নির্দেশ দিল, তোরাই ওর জামা প্যান্ট খুলে দে, ও নিজে খুলতে লজ্জা পাচ্ছে।" আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনু, বিশু, জয়হিন্দরা লখিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মিনিট খানেকের মধ্যে ওর জামাপ্যান্ট খুলে ওকে একেবারে উলঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে দিল। লখিয়া দু'হাত দিয়ে ওর লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করতে লাগল। পান্না হেসে উঠল। বিশুরাও হাসিতে যোগ দিল।

হাসি থামিয়ে মনুকে বলল, "তোর প্যান্ট খোল।" আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনু সেটা কার্যকরী করে দাঁড়িয়ে রইল পরবর্তী আদেশের জন্য।

পান্না লখিয়াকে বলল, 'অ্যাই আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে দাঁড়া। লখিয়া বুঝতে পারছে না কী করবে? সে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। জয়হিন্দ ওর মাথাটা পান্নার পায়ের ওপর চেপে ধরল।

পান্না মনুকে বলল, "মনু ওর পেছনে এসে দাঁড়া।" মনু দাঁড়াল। সে প্রস্তুত। শুধু রেফারির বাঁশি বাজানোর অপেক্ষা। মনু কাজ শুরু করবে। পান্না চিৎকার করে বাঁশি বাজাল, "ফায়ার।"

মনু সঙ্গে সঙ্গে তার শিশ্নটা উপুড় হয়ে থাকা লখিয়ার পাছার নির্দিষ্ট জায়গায় স্থাপন করে গুরুর আদেশ পালনে মনোনিবেশ করল। পান্না ও তার চেলারা সেই দৃশ্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে লাগল। মনে মনে ওরা ওদের গুরুর তারিফ করতে লাগল, "এই না হলে শাস্তি? এ জন্যেই তো ও গুরু হতে পেরেছে।'

লখিয়ার মনে হতে লাগল, এর চেয়ে ওর মরে যাওয়াই উচিত ছিল। ওর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।

মিনিট পাঁচেক পর পান্না মনুকে বলল, “ছেড়ে দে।” মনু থেমে গেল। পান্না লখিয়াকে মারল একটা লাথি। চিৎ হয়ে লখিয়া মাটিতে। ওর আর লজ্জা টজ্জা নেই। এরপর লজ্জার আর কী বাকি থাকে?

পান্না লখিয়ার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠল, “যা শালা, এবার বাড়ি যা। আর কোনও দিন আমাকে কিছু করার সাহস দেখাস না। তোদেরকে আমি কুত্তা ছাগলও ভাবি না। আজকের পর নিশ্চয়ই মনে রাখবি কথাটা। সব শালাকে বলে দিবি, আমার পেছনে লাগলে তোকে যা করেছি, তাদেরও করে দেব।”

লখিয়া কোনও উত্তর দিল না। ওর উত্তর জানা নেই। ওর মনে বোধহয় মস্তানি জীবনের প্রতিই কিছুটা ধিক্কার জন্মেছে। ও ওর জামা প্যান্ট মাটি থেকে তুলে নিল। পান্নার দাওয়াই যে সামন্ততান্ত্রিক প্রথাকেও হার মানায়, সেই সম্পর্কে লখিয়ার আগে কোনও ধারণাই ছিল না।

লখিয়াকে ছেড়ে পান্না উঠে দাঁড়াল। অপুর হাত ধরল। তারপর খাটালের পশ্চিম দিকে হাঁটতে লাগল। ওখানে লালাজি একটা ছোট টালির চালের ঘর পান্নার জন্য ছেড়ে রেখেছে। সেই ঘরে পান্না অপুকে নিয়ে ঢুকে ভেতর থেকে ছিটকিনি তুলে দিল।

মনু, বিশু, গুয়ে, জয়হিন্দরা পান্নার ছেড়ে যাওয়া খাটিয়ায় বসল। ওরা জানে, ওদের গুরু ঘণ্টাখানেক বাদে অপুকে নিয়ে ওই ঘর থেকে বার হবে।

লখিয়া জামাপ্যান্ট পরে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। এই ঘটনা যে মস্তান সমাজে প্রচার হয়ে যাবে, সেটা লখিয়া বিলক্ষণ জানে। তার কান্না সে জন্যই। প্রচার হয়ে গেলে সে মুখ দেখাবে কী করে? মস্তানিই বা করবে কী করে? কেউ কি ওর কথা শুনবে তখন?

পান্নার আরেক শত্রু গজিয়ে উঠেছিল হিন্দ সিনেমা অঞ্চলে, কুখ্যাত মস্তান বসন্ত সাউ। শত্রু হওয়ার প্রধান কারণ, কে বড় মস্তান সেই প্রশ্নে একটা বিতর্কের সূত্রপাত।

বসন্ত চায় পান্নাকে খতম করে সে উত্তর ও মধ্য কলকাতায় নিজে একচ্ছত্র অধিপতি হবে। আবার পান্না বসন্তকে মস্তান হিসাবে স্বীকৃতিই দেয় না। তাতে বসন্তের সম্মানে আঘাত লাগে। সে কতবড় মস্তান প্রমাণ করতে ঠিক করল পান্নাকে খতম করে দেবে।

যেমন চিন্তা তেমন কাজ। বসন্ত একদিন রাত আটটা নাগাদ তার চেলাদের নিয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ক'টা ট্যাক্সিতে চেপে চলল পান্নার ঘাঁটিতে। পান্নাকে মেরে সে যে পান্নার চেয়ে অনেক বড় মস্তান তা প্রমাণ করতে।

পান্না যথারীতি তার খাটালের ঘাঁটিতে বসে গাঁজা টানছিল আর সঙ্গীদের নিয়ে আড্ডা মারছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেল, পর পর ক’টা ট্যাক্সি এসে যদু মিত্র লেনের মুখে দাঁড়াল এবং তার থেকে ঝপাঝপ এক এক করে নামল বসন্ত সাউয়ের ছেলেরা ও বসন্ত নিজে। পান্না দূর থেকেই দেখে বুঝে গেল, ওরা কেউ খালি হাতে নেই। ওদের সঙ্গে মারণ অস্ত্র আছে।

পান্না গাঁজার জ্বলন্ত কলকেটা মাটিতে উপুড় করে দিয়ে ডান হাতের তর্জনীর ডগায় পুড়ে যাওয়া গাঁজার ছাই সামান্য নিয়ে নিজের কপালে একটা টিপ দিয়ে বলে উঠল, “জয় ভোলানাথ!” মনু বিশুরাও সমস্বরে একই রব তুলল।

পান্না খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কঠিন মুখে বসন্তের দলের দিকে তাকিয়ে ভাবল, “বসন্তের এত বড় সাহস, সে পান্না মিত্রকে তারই দুর্গে খুন করতে এসেছে।” তার মাথায় আগুন জ্বলতে লাগল। সে জানে, বসন্তকে আজ ফিরতে দিলে তার সাম্রাজ্যে ধস নামবে। প্রত্যেকে বলাবলি করবে, বসন্ত পান্নাকে তার ঘাঁটিতে গিয়ে মেরে এসেছে। তখন বসন্ত যে পান্নার চেয়ে বড় মস্তান, সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে। আর তেমন হলে কেউ ওকে আর সেলাম ঠুকবে না।

উঠে দাঁড়িয়ে পান্না দাঁত কড়মড় করল। তার সঙ্গীরা চটপট উঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল। সব কিছু এত দ্রুত হল যে ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা তখনও ষাটবার টিকটিক করেনি।

বসন্ত তার দল নিয়ে একটা মীমাংসা করার জন্য বুক উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে খাটালের দিকে। পান্না তার সঙ্গীদের নিয়ে খানিকটা এগিয়ে খাটালের অন্তরালে পোজিশন নিল। তারপর শুরু হয়ে গেল শ্রাবণের ঘোর বৃষ্টির মতো দু পক্ষের বোমাপাতন।

ফড়িয়াপুকুর, হাতিবাগানের বাসিন্দারা বোমাবাজিতে অভ্যস্ত হলেও এত বোমাবর্ষণে কেঁপে উঠল। বারুদের ধোঁয়া আশেপাশের বাড়ির দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে মেঘের মতো আকার নিয়ে উপরে উঠে রাত্রির অন্ধকারকে আরও ঘন করে একটা আস্তরণ তৈরি করল। বারুদের গন্ধে চারিদিক ছয়লাপ। বোমা ফাটার আগুনের হলকা সবকিছুই ধন্ধে ফেলে দিতে লাগল। ধুপধাপ ছোটাছুটি, চিৎকার, গালিগালাজের মধ্যে কে কোন দিকে যাচ্ছে, কোন দিকে ছুটছে তা বোঝার উপায় নেই।

আধঘণ্টা বোমাবাজি, তরোয়ালের ঝঙ্কারের পর দেখা গেল, বসন্ত সাউয়ের ছেলেরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়েছে। বসন্ত একা ধরা পড়ে গেছে পান্নার ছেলেদের হাতে। সে হাঁপাচ্ছে। বুক তার হাপরের মতো উঠছে আর নামছে। পরাজয়ের চিহ্ন তার চোখে মুখে। পালাতে পারেনি বলে মৃত্যুভয় তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে।

অন্ধকার জগতে যুদ্ধবন্দি নিয়ে আন্তর্জাতিক কোনও চুক্তি আছে কিনা তা পান্নার জানা নেই। পান্নারা তা জানে না। জানার প্রয়োজনও হয় না। বসন্তকে খাটালের ভেতর ঢুকিয়ে মাটিতে ফেলে পান্না, তিলক ও গুয়ে এলোপাথাড়ি মারতে লাগল। পান্না তার বুকের জ্বালা বসন্তকে মেরে মেরে জুড়িয়ে নিতে লাগল। বসন্তের হাত পা শুকনো বাঁশের মতো একটা একটা করে মটমটিয়ে ভেঙে দিল। ছুরি দিয়ে পিঠ পেট ফাঁসিয়ে দিয়ে পান্না থামল।

তারপর খাটাল থেকে একটা বিচালির চটের বড় বস্তা এনে তাতে বসন্তের অচৈতন্য দেহটাকে ঢুকিয়ে বস্তার মুখটা বন্ধ করে একটা ঠেলায় চাপিয়ে বস্তাটা নিয়ে এল শ্যামবাজারের খালের ধারে। তখন রাত দশটা। বস্তাটা খালের ধারে ফেলে পান্না তার সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে এল আবার খাটালে। তার বিশ্রাম দরকার। বসন্তের ছেলেমানুষীতে সন্ধেটা তার বেকার গেল। ছিলিম ধরাল। গাঁজায় দম নিয়ে ধকলের ক্লান্তিটা দূর করতে হবে। i

ওদিকে খালধারে অন্য নাটক। খালধারের বস্তির বাসিন্দা ক'জন লোক বস্তাটা দেখতে পেয়ে সেটা টানতে টানতে খালের পাড়ে তুলে নিয়ে এল। রক্তে ভেসে যাওয়া সেই বস্তার বাঁধা মুখ খুলে তারা হতবাক হয়ে দেখল, ভেতরে একটা মানুষ।

তখনও তার মুখ দিয়ে প্রাণের ক্ষীণ আওয়াজ বার হচ্ছে। তারা তাকে বস্তা থেকে টেনে বার করে প্রথমে মুক্ত করল, তারপর নিয়ে গেল আর জি কর হাসপাতালে। অচেনা লোকটাকে সেখানে ভর্তি করে দিল। বসন্ত সাউ বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থেকে বেঁচে গেল।

পান্নার দলের সেনাপতি ছিল মোহনবাগান লেনের জয়হিন্দ নন্দী। পান্না গাঁজায় সারাদিন টং হয়ে থাকলেও জয়হিন্দ গাঁজা বেশি পছন্দ করত না। তার আসক্তি ছিল মদ্যপানে। সে সারাদিনই মদ্যপান করে থাকত। তাছাড়া গুরুর থেকে চেলার আর একটা বিষয়ে তফাৎ ছিল। পান্না সমকামী, কিন্তু জয়হিন্দ নারীদেহই বেশি পছন্দ করত। একমাত্র জেলখানায় সে নারীদেহের বদলে পুরুষ দেহ ব্যবহার করত। আর সেখানে মদের যোগান ইচ্ছামতো নয় বলে গাঁজার আসরেও বসত।

এমন কোনও দুষ্কর্ম ছিল না যা জয়হিন্দ করত না। সে একাধারে পকেটমার, ছিনতাইবাজ, তোলাবাজ, চোর, ডাকাত, খুনী। অন্যধারে বলাৎকারে ছিল ওস্তাদ। তার দুষ্কর্মের পরিণতি পান্নাকে সামলাতে হতো। এতে পান্না অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এবং মনে

মনে ঠিক করে নিয়েছিল, জয়হিন্দকে সে তার দল থেকে সরিয়ে দেবে। কারণ জয়হিন্দের 'কাজে' তার দলের ওপর পুলিশের হামলা ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছিল। কিন্তু সরাব বললেই তো সরানো যায় না। একদিকে জয়হিন্দ তার হয়ে কাজগুলো ভালই করত। অন্যদিকে প্রতিমুহূর্তে দল চালনার কায়দাটা জয়হিন্দ রপ্ত করে নিয়েছিল। সুতরাং জয়হিন্দের বদলি হিসাবে তুখোড় একটা ছেলে তার চাই। সে খুঁজতে লাগল।

ভাবনার মধ্যে এই সিদ্ধান্ত যখন ঘুরপাক খাচ্ছে, তখনই সে পেয়ে গেল হেমেন মণ্ডলকে। জয়হিন্দের চেয়ে হেমেনকে বেশি পছন্দ হওয়ার কারণ, পান্না দেখল, এই ছেলেটার বয়স জয়হিন্দের চেয়ে কম। কোনও নেশা নেই। নারীদের প্রতি নিরাসক্ত। আর দীর্ঘদেহী ছেলেটার গায়ে আছে প্রচণ্ড শক্তি, তার ওপর আক্রমণে সাহসী, কিন্তু জয়হিন্দের মতো যখন তখন ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে গণ্ডগোল বাধায় না। সামাজিক প্রতিপত্তি ও যোগাযোগ জয়হিন্দের মতো নিচুস্তরের নয়। প্রয়োজনে হেমেন যে কোনও জায়গায় পৌঁছে যেতে পারবে। কারণ তখনও তার শরীর থেকে স্কুলছাত্রের গন্ধটা যায়নি। সে আর দ্বিধা না করে জয়হিন্দকে সরিয়ে তার প্রধান সেনাপতির পদটা হেমেনের হাতে সঁপে দিল।

কে এই হেমেন মণ্ডল? কোথা থেকে ওর উৎপত্তি?

দুয়ের এ গৌরীবাড়ি লেনের মুকুন্দ প্রসাদ মণ্ডলের তিন ছেলের মধ্যে কনিষ্ঠ জন হচ্ছে হেমেন। মানিকতলার মোড়ে মুকুন্দবাবুর শয্যাদ্রব্য বিক্রির বিশাল দোকান আছে। ছেলেদের তিনি লেখাপড়া শিখিয়ে সমাজের আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাদের ভাল ভাল স্কুলে সেই উদ্দেশ্যে ভর্তিও করিয়েছিলেন। হেমেনকেও তিনি ভর্তি করিয়েছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে।

সব কিশোর কিশোরীর মতো হেমেনের সামনেও তখন বিস্তৃত নতুন জীবন। কিন্তু এই বিস্তৃত জীবনের চৌকাঠে পা দিয়ে কোন দিকে হাঁটবে নতুন জীবনের পথিকরা? জীবনের গলিপথগুলো তাদের কাছে অচেনা পরিবার, সমাজ, শিক্ষাব্যবস্থা তাদের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যায় সেই সব অচেনা গলিপথ চেনাতে। সেই গলিপথের শেষে কেউ পায় জীবনের রাজপথ, কারও কর্মে জোটে গলিপথের চক্র, কারও বা জীবনধারা হয়ে ওঠে অন্ধগলি। তখন আঁধার রাতে হাজার মাথা কুটেও সে হাতড়ে পায় না মসৃণ কোনও রাজপথ।

আমাদের সামাজিক কাঠামোয় এ এক হাজার বছরের অভিশপ্ত ব্যাধি। চঞ্চল মস্তিষ্ককে পরিচালনার দায় 'ভাগ্যের' হাতে সঁপে দেওয়ার পদ্ধতি থেকে জন্ম নেয় অপরাধ। আর সেই অপরাধের নায়কদের কর্মের প্রবণতাকে অঙ্কুরে বিনাশ করার কোনও দায় কেউ নেয় না। ফলে যে কুঁড়িকে ফোটার আগেই একদিন নিরস্ত করা যেত, সে স্বাভাবিকভাবে ধীরে ধীরে বেড়ে ফুল, ফল থেকে ক্রমে মহীরুহতে পরিণত হল। ছোট অপরাধ থেকে বড়, তারপর আরও বড় অপরাধ সংগঠিত করতে লাগল। যে ঘোড়াকে ছোট বয়সেই লাগাম পরানো যেত, সে লাগামহীন হয়ে ছুটতে লাগল সমাজকে ধ্বংস করার দিকে।

হেমেনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। সাতষট্টি সালের মাঝামাঝি সময়ে পাড়ার ফুটবল ম্যাচ নিয়ে লেগে গেল গণ্ডগোল।

হেমেনের পাড়ার সঙ্গে সংলগ্ন লালাবাগানের। এ রকম গণ্ডগোল তো হামেশাই সব অঞ্চলেই অল্পবিস্তর বাধে। সাময়িক উত্তেজনার পর এলাকার সুস্থ চিন্তার লোকেরা এগিয়ে এসে কিশোরদের থামিয়ে দেন। তাদের নিয়ে যান সঠিক পথে। এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু ঘটল হেমেনদের ক্ষেত্রে। তারা দু'পক্ষই বরং সমর্থন পেয়ে গেল এলাকার অধিবাসীদের কাছ থেকে। তাদের সেই সমর্থনের জোরে আরও উৎসাহিত হয়ে উঠল দু'পক্ষের অল্পবয়সী, রোমাঞ্চে ভরপুর নবীন তরুণেরা। ফলে আজ এ পক্ষের কেউ অন্য পক্ষের ছেলেদের হাতে মার খায় তো অন্যপক্ষের ছেলেরা কাল ওপক্ষের কাউকে মেরে সেটার প্রতিশোধ নেয়।

দীর্ঘদিনের এই মারপিটের খেলা কত দিন শুধু নিরামিষভাবে হাতে হাতে চলবে?

সুতরাং ওই কিশোরদের হাতে একসময় উঠে এল বোমা, ছুরি। কারা দিল এই বোমা ছুরির দাম? অবশ্যই পাড়ার কিছু বয়স্ক ব্যক্তি।

আর কারা যোগান দিল ওই সব অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরদের হাতে বোমা? হেমেনদের যোগানদার পান্নার দল, আর তাদের শত্রুদের অস্ত্র যোগান দিল ছোট লখিয়ার দল।

হাতের ঘুঁষোঘুষি রূপান্তরিত হল বোমার আক্রমণে। কিন্তু দু'পক্ষেরই সৈন্য আস্তে আস্তে যুদ্ধ ছেড়ে পালাতে লাগল। অর্থাৎ তাদের জীবনের গলিপথকে তাদের বাড়ির পথপ্রদর্শকরা অন্যদিকে চালিত করার জন্য ঠিকপথে ঠেলে দিল। কিন্তু হেমেনের ভাগ্যে তেমন কিছু জুটল না, বরং সে তার দলে ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠল নেতা। তারই নির্দেশে দিনে রাতে একটার পর একটা চলতে লাগল সংঘর্ষ।

দু'পক্ষের সংঘর্ষে হেমেনের দলই বেশি ক্ষেত্রে জয় ছিনিয়ে নিতে লাগল। তার কারণ অবশ্যই হেমেন। হেমেন লালাবাগানের কমপক্ষে তিরিশ চল্লিশটা ছেলের গায়ে ক্ষুর চালাল। এই মারপিটের মধ্যেই একদিন বোমাবাজির সংঘর্ষে লালাবাগানের ছেলেদের ছোঁড়া বোমার আঘাতে হেমেনের দলের সদস্য উৎপল মারা গেল। উৎপল নিহত হতে হেমেন আরও ক্ষেপে গেল। প্রতিশোধে ক্ষিপ্ত দলের সবাই জ্বলতে লাগল। এবং পরদিন সে, দেবু, মন্টে, পরেশকে সঙ্গে নিয়ে গৌরীবাড়ির ভেতরেই লালাবাগানের কেষ্ট নামে একটা ছেলেকে ছুরি মেরে খুন করল। ধরা পড়ল মন্টে। তার যাবজ্জীবন সাজা হয়ে গেল।

ভাল অ্যাথলিট হেমেনের সাহস, বুদ্ধি ও আচার ব্যবহার দেখে পান্নার ভাল লেগে গেল। পান্না হেমেনকে তার মূল সেনাপতি বানিয়ে দিল।

পান্নার দলে হেমেন মূল কেন্দ্রে চলে এলে জয়হিন্দের সম্মানে আঘাত লাগল। সে পান্নার দল থেকে বেরিয়ে নিজে একটা দল করল হিটু, বাবুয়া, নাটা শংকর, সোনাদের নিয়ে। এবং তাদের ক্রোধ প্রতিদিন পান্নার দলের উপর ঝরে পড়তে লাগল। জয়হিন্দরা পান্নার দলের ওপর রাতের দিকে আক্রমণ করে তো হেমেনের নেতৃত্বে পান্নার দল দিনের বেলায় আক্রমণ করে। আক্রমণের অর্থ অজস্র বোমাপাত। একদিন দুপক্ষের বোমাযুদ্ধে প্রায় দু ঘণ্টা ধরে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোড বন্ধ হয়ে রইল। সে দিন ছিল গুরু নানকের জন্মদিন। সেই উপলক্ষে যে মিছিল পরিক্রমা করছিল তা বোমা বর্ষণে থেমে গেল। দু ঘণ্টা বোমা যুদ্ধের পর তারা ক্ষান্ত হল। কিন্তু আরও বড় যুদ্ধের প্রস্তুতি চলল। হেমেন জয়হিন্দের দলের মূল বোমাপতি হিটুকে প্রচণ্ড মারল।

জয়হিন্দ ক্ষিপ্ত হয়ে সেদিনই পান্নার ঘাঁটি আক্রমণ করল। পান্নার দল জয়হিন্দের আক্রমণ প্রতিহত করে ওদের তাড়া করল। জয়হিন্দরা ট্যাক্সিতে চেপে পালাতে লাগল। পান্না তার সঙ্গী মনু, বিশু, ভগত, তিলক ও বিজয়কে নিয়ে আর একটা ট্যাক্সিতে চেপে ওদের পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে ওদের ট্যাক্সিকে পেয়ে গেল গণেশ সিনেমা হলের সামনে।

পান্না ট্যাক্সিতে বসেই জয়হিন্দুদের ট্যাক্সি লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল বোমা। জয়হিন্দ বেঁচে গেল। তার অন্য এক সঙ্গী বোমার ঘায়ে মারা গেল। পান্নারা পালাল। পান্না চলে গেল বেলঘড়িয়ার সি.পি.আই.(এম)-এর জঙ্গী নেতা ননী সাহার আশ্রয়ে। কিন্তু ধরা পড়ল এবং মাত্র এক বছরের জন্য কারাবাসী হল। পান্নার তাতে বিশ্রাম হল। পান্নার মতো অপরাধীরা মাঝে মাঝে ওই রকম বিশ্রাম চায়।

পান্নার অনুপস্থিতিতে হেমেন তার দলের সেনাপতি থেকে অধিনায়ক হয়ে গেল। ফড়িয়াপুকুরের ঘাঁটির বদলে তাদের ঘাঁটি পৌঁছে গেল গৌরীবাড়ি অঞ্চলে। বটতলা থানার অঞ্চল ছেড়ে মানিকতলা থানার এলাকায় দৌরাত্ম্য স্থানান্তরিত হল। জয়হিন্দের দলের সঙ্গে ক্ষমতা দখলের সংঘর্ষ দিনদিন বাড়তে লাগল। তাছাড়া দু'পক্ষই দল পরিচালনার অর্থ যোগানের জন্য সাধারণ নাগরিকদের ওপর চাপ বাড়াতে লাগল। এ সবই অল্প কয়েকমাসের ব্যবধানে দ্রুত ঘটে গেল।

এবার নাটকের অন্য পরিবর্তন। তখন আমাদের উত্তর কলকাতার ডিসি ছিলেন বিভূতি চক্রবর্তী। তিনি হেমেনের বাবাকে তার অফিসে ডেকে নিয়ে এসে বললেন, “আপনার ছেলেকে দিন দুয়েকের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে বলুন, নয়ত আমরা বাধ্য হব আপনাকে ওর জন্য আটক রাখতে। আর ও যদি আত্মসমর্পণ করে, ওকে আমি তিন মাসের জন্য পি ডি অ্যাক্টে আটকে রেখে, তিন মাস পর ছেড়ে দেব।”

মুকুন্দবাবু বাড়ি ফিরে বিভূতিবাবুর প্রস্তাবের কথা সবিস্তারে জানালেন। হেমেন শুনল, সে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হল। আটষট্টির ফেব্রুয়ারিতে হেমেন পি ডি অ্যাক্টের আসামী হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলের অন্তরালে চলে গেল।

কিন্তু তিন মাস পার হয়ে গেল। বিভূতিবাবু কথা অনুযায়ী হেমেনকে ছাড়লেন না। মুকুন্দবাবু বিভূতিবাবুর সঙ্গে দেখা করে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি কোন আবেদনেই কর্ণপাত করলেন না। বাধ্য হয়ে মুকুন্দবাবু এলেন লালবাজারে। আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের ডিসি দেবীবাবুকে সবিস্তারে সব কিছু জানালেন। দেবীবাবু দিন তিনেক পর মুকুন্দবাবুকে আবার দেখা করতে বলে চুপ করে গেলেন।

যথা দিনে মুকুন্দবাবু দেবীবাবুর সামনে হাজির। দেবীবাবু মুকুন্দবাবুকে বললেন, “আমি আপনার ছেলেকে ছাড়ার ব্যবস্থা করতে পারি; কিন্তু একটা ব্যবস্থা আপনি করলে তবেই।” মুকুন্দবাবু জানতে চাইলেন কী ব্যবস্থা করতে হবে। দেবীবাবু বললেন, “ছেড়ে দেওয়ার পর আপনার ছেলেকে কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দেবেন। কলকাতায় রাখবেন না। অন্তত কয়েকটা বছর।” মুকুন্দবাবু রাজি হলেন। তিনি দেবীবাবুকে আশ্বস্ত করার পর দেবীবাবু হেমেনকে পি ডি অ্যাক্ট থেকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। হেমেন জেল থেকে বাড়ি ফিরে গেল।

বাড়ি ফিরলে মুকুন্দবাবু দেবীবাবুর নির্দেশ মতো হেমেনকে কলকাতার বাইরে পাঠানোর উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু হেমেন বেঁকে বসল। সে কিছুতেই কলকাতা ছেড়ে অন্যত্র যাবে না। তার না কি মন মানে না।

মানবে কী করে? এখানে এলাকায় সে ‘দাদার' স্থান পেয়ে গেছে। তার কথায় বেশ কিছু ছেলে ওঠে বসে। এখানে সে নেতা। কিন্তু বাইরে গেলে কি আর সে একটা সিংহাসন পাবে? পাবে না। উত্তেজনার আগুনের উত্তাপ গায়ে লাগবে না। সে বাঁচবে কী করে। মস্তানি করাটাই তো তার বাঁচার অক্সিজেন। সুতরাং সে গেল না।

আর না যাওয়ার ফল সে ক'দিনের মধ্যে হাতে নাতে পেল। জেল থেকে বাড়ি আসার দিন বারো পর মানিকতলা থানার তখনকার ওসি সমীর মুখোপাধ্যায় তাকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসে থানার ভেতরে দিলেন ভাল দাওয়াই। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অবশ্যই মস্তানির। এবং ছুরি মারার।

আবার লালবাজার এবং পি ডি অ্যাক্টে। তখন দেবীবাবু শুধু মুকুন্দবাবুকে বলেছিলেন, “আমি কিন্তু আপনাকে বলেছিলাম, ছেলেকে কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দিতে, শুনলেন না। এখন জেল খাটুক।” মুকুন্দবাবু চুপ করে শুনলেন। তিনি কী করবেন? ছেলের অবাধ্যতার শাস্তি তাঁকেও ভুগতে হবে। তিনি যে হেমেনকে বহুবার অনুরোধ করেছিলেন বাইরে চলে যাওয়ার জন্য, তা আর তিনি লজ্জায় দেবীবাবুকে বললেন না, আর অনুরোধও করলেন না হেমেনের মুক্তির জন্য।

মাস দুয়েক পর হেমেন কলকাতার উচ্চ আদালতের নির্দেশে মুক্তি পেয়ে আবার গৌরীবাড়ি ফিরে গেল। দু-দু'বার পি ডি অ্যাক্টে জেল খেটে মস্তান সমাজে তার দর বেড়ে গেল এবং ‘বড় মস্তানের' স্বীকৃতি জুটে গেল।

দ্বিতীয়বার জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার দিন তিনেক পর তার দলের সমীরকে উল্টোডাঙার খালপারের আরেক মস্তান গৌরীবাড়ির কাছেই একদিন সকালবেলা ছুরি মেরে পালাল।

নিজের দলের কোনও ছেলের গায়ে হাত পড়ার অর্থটা সাধারণভাবে মস্তানরা ভাবে তার গায়েই আঘাত লাগা। তারা জানে অচিরেই এর প্রতিকার না করলে তাকে কেউ 'সম্মান' দেবে না। তার প্রতিপত্তি ভাঁটার দিকে চলতে থাকবে। এমনকি দলকেও আর গুছিয়ে নিজের মতো চালাতে পারবে না।

সুতরাং হেমেন তার শাগরেদ পানু, সুজিত সরখেল, ভোলা সাউ, ফাঁপা স্বপন, বাঙাল নারান, বড় নিতাইকে নিয়ে চলল উল্টোডাঙার খালপারের সেই বাড়িতে। যে বাড়ির ছেলে সমীরকে ছুরি মেরে তাকেই খতম করার সাহস দেখিয়েছে। একটা হেস্তনেস্ত করে তবেই তারা অন্য কাজে হাত দেবে। মাথা ঠাণ্ডা না করলে কি কাজ হয়?

বাড়িতে হেমেনের 'আসামী' ছিল না। ছিল তার বাবা, কাকা আর এক দাদা। ছেলের 'দোষের' জন্য তারা মার খেল হেমেনদের হাতে।

মার খাওয়ার পর তারা যাতে আর কোনও দিন হেমেনদের বিরুদ্ধে ফণা তোলার সাহস না পায়, সে জন্য হেমেন তার বিক্রম দেখানোর ক্ষেত্র তৈরি করল। সে ওই ছেলেটার বাবাকে বাধ্য করাল ডিসি বিভূতি চক্রবর্তীকে ফোন করতে। ফোনে হেমেনের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি ভয়ার্ত গলায় বললেন, "হেমেন আমাদের খুন করে ফেলছে, আপনি তাড়াতাড়ি আসুন।" বার্তা পেয়ে বিভূতিবাবু একটা ভ্যানে ফোর্স নিয়ে নিজে একটা জিপে চড়ে পৌঁছে গেলেন যথাস্থানে। তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে।

হেমেনরা তাঁদের আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা প্রত্যেকে হাতে হাতে বোমা নিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল। গাড়ি দুটো পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে হেমেন ও তার সঙ্গীরা ওই গাড়ি দুটো লক্ষ্য করে তাদের হাতের বোমার কার্যকারিতা দেখাতে ছুঁড়তে লাগল। বিকট বিকট শব্দে সেগুলো তাদের গুণাগুণ দেখাল। হেমেনরা পালাল। ওদের কাউকে ধরা গেল না। পুলিশ বাহিনীর কিছু হল না। গাড়ি দুটোর ক্ষতি হল। আর যাদের ভয় দেখানোর দরকার ছিল, তাদের সেটা দেখানো হল।

হেমেন উত্তর কলকাতায় মস্তান হিসাবে স্থায়ী হয়ে গেল। স্থায়ী হলে আপনা আপনিই বিভিন্ন জায়গা থেকে ভাগের অংশ হাতে চলে আসে। অবশ্য তার জন্য নিজের ক্ষমতার রশি বিন্দুমাত্র আলগা করা চলবে না। প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে শক্তির দাপট দেখিয়ে যেতে হয়। আর সেজন্য তো আছেই নিরীহ জীবেরা। তাছাড়া দরকারে পায়ে পা লাগিয়ে কিংবা তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে একটা গণ্ডগোল লাগিয়ে বাজার গরম করে দিলেই হল। অর্থাৎ কায়দাটা হল, সব সময় ঘোষকরা যেন বাজারে বলে বেড়ায়, "ও আছে, ও আছে। তাকে অমান্য কোরো না।" ব্যস, তাতেই কাজ হয়ে যাবে। তোলা আদায় হবে, দালালী হবে। সে যেমন নেশা করে, সেই নেশার বস্তু আমদানী হবে। খুশি মতো পাল তুলে ঘোরা যাবে। সেলাম খাওয়া যাবে।

কিন্তু নলিনী সরকার স্ট্রিটের নন্দ হেমেনকে টাকা পাঠায় না। সেলামও ঠোকে না। নন্দ তখন পকেটমারের সর্দারের ব্যবসা ছেড়ে বাড়িতেই জুয়ার বোর্ড বসিয়ে সারাদিন জুয়া চালায় আর 'নাল' তোলে। তাসের জুয়ার বোর্ড যে চালায়, দান প্রতি বোর্ডের মালিককে কিছু টাকা দিতে হয়। টাকার অংকটাও সে ঠিক করে দেয়। এই টাকাটাকেই ওরা 'নাল' বলে। নন্দ তার জুয়ার বোর্ড চালানোর রক্ষী হিসাবে রেখেছিল জয়হিন্দ, বিদ্যা, হিটুদের। তাদের সে টাকা দিত। হেমেনকে দিত না।

তাতে হেমেন ক্ষেপে গেল এবং একদিন সে জুয়ার বোর্ড আক্রমণ করল। বোর্ড তছনছ করে চলে এল। নন্দর রক্ষীরা ওকে রক্ষা করতে পারল না। হেমেনদের হাতে মার খেয়ে পালাল। নন্দ বাধ্য হল হেমেনের সঙ্গে সমঝোতা করতে। হেমেনকে নন্দ প্রতিশ্রুতি দিল, জেলে থাকাকালীন হেমেনের ছেলেদের সে জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করবে। সেই অনুযায়ী নন্দ হেমেনের দলের যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সদস্য মন্টেকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে একবার জিনিসপত্র পাঠিয়ে চুপ করে গেল।

জিনিস নয়, হেমেনের চাই কড়কড়ে টাকা। এবং নিয়মিত। সে আবার নন্দর বোর্ড আক্রমণ করল। এবারও নন্দর লোকজন নন্দকে রক্ষা করতে পারল না। সে তাদের ওপর বিরক্ত হয়ে তাদের তাড়িয়ে দিল এবং হেমেনের সঙ্গে চুক্তি করে নিয়মিত লেনদেন শুরু করল। হেমেন ঠাণ্ডা হল।

পান্না ইতিমধ্যে আবার জেলে ঢুকে গেছে। খুনের দায়ে। পান্না জেলে ঢুকে যেতে ছোট লখিয়ার আরও বাড়বাড়ন্ত। পান্নার হাতে অপদস্থ হওয়ার কাহিনীটা সে আর ডালপালা ছড়িয়ে বাজারে চলতে দেয়নি। পান্নার দলের ছেলেদের সে প্রায় ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে আরও সুবিধা হয় হেমেন দু'বার পি ডি অ্যাক্টে জেলে ঢুকে যাওয়ার পর।

পি ডি অ্যাক্টে জেল খাটার পর হেমেনের মনে বিভূতিবাবু ও সমীর মুখোপাধ্যায়ের ওপর একটা জাতক্রোধ জন্মে যায়। সে তাই এখানে সেখানে তার দলবল নিয়ে বোমা হাতে দাঁড়িয়ে থাকে এবং ওদের জিপ কিংবা কোনও গাড়ি দেখলেই সেই গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে। তাতে বিভূতিবাবু হেমেনের ওপর আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে থাকেন। যাকে পি ডি অ্যাক্টের মাধ্যমে গরাদের ভেতর আটকে রেখে শান্ত করতে চেয়েছিলেন, সে উল্টে আরও উদ্ধত ও দুর্বিনীত হয়ে উঠতে থাকে দিন দিন। তিনি থামাতে ব্যর্থ হন।

রেলগাছিয়া অঞ্চলে তখন দুটো ওয়াগন ব্রেকারের দল। একটার নেতা নেবুলাল গুপ্তা, অন্যটা চালায় খোকা মণ্ডল ও উজ্জ্বল। নেবুলাল গুপ্তার সঙ্গে হাত মেলায় লখিয়া। এবং সে ওই দলের সর্দার হয়ে যায়। মোহনবাগান লেন ছেড়ে চলে যায় ওলাইচণ্ডীর বস্তিতে। নেবুলাল গুপ্তার সঙ্গে ছোট লখিয়া মিলে যেতে উজ্জ্বলরা পিছু হটতে থাকে। সে তখন তার ব্যবসা চালাতে হেমেনের কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসে। হেমেনকে খোকা ও উজ্জ্বল প্রস্তাব দেয় তাদের সঙ্গে যোগ দিতে।

কিন্তু হেমেন কোনদিন ওয়াগন ব্রেক করেনি। সে রেল লাইন ছেড়ে ট্রাম বাস লাইনেই ভাল আছে। কিন্তু 'যাচা· লক্ষ্মী কি পায়ে ঠেলা যায়?' হেমেনের মধ্যে যে 'ভদ্রলোকটা' ছিল, সে একদিকে পেছনদিকে টেনে ধরলেও, মস্তান হেমেন খানিকটা এগিয়ে যায়। এই চাপান উতোরের মাঝে দ্বিধাগ্রস্ত হেমেন উজ্জ্বলকে প্রস্তাব দেয়, "দেখ উজ্জ্বল, আমি নিজে ওয়াগনের কাজ করতে যাব না, তবে তোদের কাজের জন্য আমি আমার ছেলে দেব। আর যদি খুব দরকার হয় আমি দিনের বেলা যেতে পারি, কিন্তু একদম রাতে নয়।"

উজ্জ্বল বাধ্য হয়ে হেমেনের প্রস্তাব মেনে নেয়। কারণ তার তখন এমন একটা শক্তির দরকার যে কিনা নেবুলাল গুপ্তা ও লখিয়ার যৌথ শক্তিকে প্রতিরোধ করে তার ওয়াগনের কাজটা ভালভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। হেমেনের সঙ্গে উজ্জ্বলের লেনদেনের যে ব্যবস্থাটা ঠিক হয় তা হল, ওরা একসঙ্গে প্রথমদিন যে কাজটা করবে, তার পুরো টাকাটা হেমেন পাবে। দ্বিতীয়বার থেকে অর্ধেক অর্ধেক।

চুক্তি পাকা হয়ে যাওয়ার পর এবার কাজ। প্রথমদিন হেমেন উজ্জ্বলকে সাহায্যের জন্য সৈন্য ধার দিল। ওর দলের ভোলা সাউ, রাধে, সঞ্জয়, সুজিত সরখেল, পাগলা মন্টু, পানু গেল উজ্জ্বলের হয়ে 'কাজ' করতে। কিন্তু 'কাজটা' মনঃপূত হল না। তারা বাধা পেল নেবুলাল গুপ্তা ও লখিয়ার দলের কাছে। যেখানে উজ্জ্বল 'কাজ' করতে গেল, লখিয়ারাও একই সময়ে সেখানে 'কাজ' করতে এল। সংঘাতে উজ্জ্বলরা পিছু হঠল।

হেমেন রেগে গেল। সে আর উজ্জ্বল মিলে ঠিক করল, নেবুলাল গুপ্তাকে খতম করবে। যেমন সিদ্ধান্ত, তেমন কাজ।

দিনটা ছিল উনসত্তরের ডিসেম্বরের দু'তারিখ। হেমেন চলল নেবুলাল গুপ্তাকে শেষ করতে। ওর সঙ্গে আছে পানু, দেবু সাহা, পাগলা মন্টু, বাবুয়া, লালু, বড় নিতাই। সঙ্গে আছে বোমার থলি। সেগুলো তারা প্রয়োগ করবে নেবুলাল গুপ্তা ও লখিয়ার বিরুদ্ধে। তাদের ইচ্ছা বোমার আঘাতে আঘাতে ওদের দলকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে উড়িয়ে দিয়ে বেলগাছিয়ায় উজ্জ্বলকে ওয়াগান ব্রেকার হিসাবে একচ্ছত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে। তাতে তাদেরই লাভ।

হেমেনের দলের সঙ্গে রয়েছে উজ্জ্বলের দলের এমন একজন যে নেবুলাল গুপ্তার সব আঁটঘাট চেনে। কখন কোন স্থানে সে অধিষ্ঠান করবে তা তার নখদর্পণে। কোন পথ দিয়ে গেলে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাওয়া যায় কম সময়ে, তাও তার জানা। কোন সময়ে তারা দলবলের থেকে সামান্য বিচ্ছিন্ন থাকে, তাও সে জানে। কারণ এক সময় সে নেবুলাল গুপ্তার দলেই ছিল। কিন্তু ছোট লখিয়া ওদের দলের সেনাপতি হওয়ার পর সে যা ইচ্ছা তাই করতে লাগল। এবং একদিন ওর অনুপস্থিতিতে লখিয়া ওর ঘরে ঢুকে ওর বোনকে ধরে টানাটানি করছিল। তারপর সে ওই দল ছেড়ে দিয়ে খোকা ও উজ্জ্বলের দলে যোগ দিয়ে লখিয়াকে মারার চেষ্টায় ঘুরছিল। হেমেনকে দিয়ে সেটা হবে ভেবে সে খুব খুশি।

দুপুরবেলা। শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়। পথ প্রদর্শকের নির্দেশে হেমেনরা এগিয়ে যাচ্ছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। হেমেন নিজে মদ্যপানে আসক্ত না হলেও তার দলের অনেকেই সেই রস পান করত। উজ্জ্বলের পাঠানো পথপ্রদর্শক আর পানু, বড় নিতাই, পাগলা মন্টু ও বাবুয়া মিলে যুদ্ধে যাওয়ার আগে প্রস্তুতি হিসাবে কয়েক পাত্র মদ পেটে চালান করে পথে নেমেছিল। শরীর গরম থাকলে লড়াই জমে ভাল।

অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি। মিঠে রোদ শরীরে বোলালে ভালই লাগে। কিন্তু পেটের মদ শরীরের রক্তে তার কাজ শুরু করার পর সেই মিঠে রোদই আদর করে ঝপ করে মদের নেশা চড়চড়িয়ে কয়েক ডিগ্রি বাড়িয়ে দেয়। মস্তানরা ওসব তোয়াক্কা করে না। কোনও কিছু তোয়াক্কা করা ওদের স্বভাবে নেই। তাহলে আর মস্তান হল কী? তারা যেটা ভাবে, যেটা বোঝে, যেটা মাথায় রাখে সেটাই ঠিক। ওরা ভাবে, কোনও কিছু তোয়াক্কা করলে, 'এই বুঝি আমার হার হয়ে গেল, এই বুঝি আমি অন্যের চোখে ছোট হয়ে গেলাম।' দুপুরবেলা মদ্যপান করে রোদ মাথায় নিয়ে হাঁটলে কি আর নতুন কিছু হবে?

ওরা হাঁটছে। কিন্তু পথপ্রদর্শক রাস্তা গুলিয়ে ফেলল। নেশার ধাক্কায় সে সব কিছু একটার বদলে দুটো তিনটে দেখতে শুরু করল। সে হেমেনকে বলল, "গুরু, আমার সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। আমি চিনতে পারছি না।"

হেমেন দাঁড়িয়ে পড়ল। যার ভরসায় যাওয়া, সেই যদি মাঝপথে টালমাটাল অবস্থায় থমকে যায়, তবে যুদ্ধে যাওয়া যে ঠিক হবে না সেটা সে বুঝে গেল। হেমেন ঠাণ্ডা মাথায় ওকে বলল, "তবে আজ গিয়ে কাজ নেই, অন্য দিন যাব।"

হেমেন মুখ ঘুরিয়ে তার দলের ছেলেদের নিয়ে গৌরীবাড়ি ফিরতে লাগল। বোমাগুলোর আর তখন সদ্ব্যবহার হল না। তারা থলির ভেতর বিশ্রাম করতে লাগল।

ওরা কয়েক পা ফিরেছে। থমকে দাঁড়াল।

মোহনলাল স্ট্রিট যেখানটায় আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোডে এসে মিশেছে, ঠিক সেই সংযোগস্থলে 'শ্যামবাজার হোটেলের সামনে ওরা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল। কারণ উল্টোদিক থেকে মানিকতলা থানার সার্জেন্ট চট্টোপাধ্যায় ক'জন কনস্টেবল সঙ্গে করে ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে। কী জন্য আসছে তা বোঝার আগেই পানু, দেবু, পাগলা মন্টু, হেমেন তাদের হাতের বোমা ওদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। এতক্ষণের নিদ্রাভঙ্গের পর বিকট বিশাল আওয়াজ করে বোমাগুলো পরপর ফাটতে লাগল। কাজে এসেছিল, কাজ করে দেখাল।

দুপুরবেলা, পরপর বোমার ক্রমাগত শব্দে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়টার কী অবস্থা হবে? সাধারণভাবে ওখানে যথেষ্ট ভিড় থাকে। সেই ভিড় করা মানুষেরা এদিক ওদিক ছুটতে লাগল। বাস, ট্যাক্সি হর্ন বাজিয়ে উল্টোপাল্টা রাস্তা ধরে বোমার আয়ত্তের থেকে নিরাপদ দূরে যাওয়ার প্রচেষ্টায় আইন ভেঙে দৌড় লাগাল। দোকানদাররা ভেতরে খদ্দের সমেত সদর দরজা ঝপাঝপ বন্ধ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল।

মিনিট দু'তিনেকের মধ্যে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় প্রায় ফাঁকা। রাস্তার এদিক ওদিক পড়ে আছে ক'টা গাড়ি। তার ভেতরে না আছে ড্রাইভার, না আছে কোনও সওয়ারি। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ঘোড়ার ওপরে চোখ টান করে, আদেশের ভঙ্গিতে স্ট্যাচু হয়ে বসে

আছেন। হয়ত ভাবছেন, এমন স্বাধীনতার জন্য তিনি জনসাধারণের কাছে আত্মত্যাগের আহ্বান জানাননি। কাউকে কোনও নির্দেশও দেননি।

বোমার ধোঁয়ার অন্তরালেই হেমেনের দলের প্রত্যেকে যে যেদিকে পেরেছে ছুটে পালিয়েছে। পুলিশ দেখেই তারা আতঙ্কে বোমা ছুঁড়ে দিয়েছে। জানতে বা বুঝতেও চায়নি মানিকতলা থানার পুলিশের ওই বাহিনী তাদের গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে ওখানে গেছে কি না।

তারা অন্য কাজে ওখানে হাজির হয়েছিল। আর হেমেনের দলের ব্যর্থ অভিযান মাঝপথে থমকে যেতে তারা মুখ ঘুরিয়ে ফিরে আসার উদ্যোগ করার সঙ্গে সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যায় পুলিশ বাহিনীর। আর তৎক্ষণাৎ ভয়ে, নিজেদের বাঁচার তাগিদে ওরা ছুঁড়ে দেয় বোমা।

ফল? কনস্টেবল পরশুরাম রাই রক্তাক্ত শরীর নিয়ে শুয়ে পড়ল রাস্তায়। কনস্টেবল উপাধ্যায় সমেত আরও তিনজন কনস্টেবল স্প্লিন্টারের আঘাতে রাস্তার ওপর বসে ছটফট করতে লাগল। সার্জেন্ট চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ কোনও আঘাত লাগেনি। সে ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল। বোমার বর্ষণ শেষে বিমূঢ় হয়ে দেখল পরশুরাম ও অন্যান্য কনস্টেবলদের অবস্থা। দ্রুত সে রাস্তার লোকজন যোগাড় করে পরশুরামদের নিয়ে গেল আর জি কর হাসপাতালে। কিন্তু পরশুরাম বাঁচল না। উপাধ্যায় সমেত অন্য কনস্টেবলদের শরীর থেকে ডাক্তারবাবুরা বোমার টুকরো বার করে ফেলাতে তারা বেঁচে গেল।

বোমা ফাটিয়ে হেমেনের দলের ছেলেরা উদভ্রান্তের মতো ছুটেছে। এদিকে নিজেদের বোমার টুকরো এসে পানুর শরীরে বিঁধেছে। পানু ভয়ে ছুটতে ছুটতে চলে গেল জয়হিন্দের আস্তানায়। তার নিজের জামা কাপড়ে রক্তের ছোপ। সে সেগুলো জয়হিন্দের বাড়িতে খুলে জয়হিন্দের জামা কাপড় পরে আবার পালাল।

জয়হিন্দ তখন সবে ক'দিন আগে একটা ছোট ডাকাতির মামলায় সাজা খেটে জেল থেকে বেরিয়েছে। সে বাড়িতেই ছিল। ঘটনার গুরুত্ব তত বোঝেনি। জানেও না।

মানিকতলা থানার পুলিশ ও ডি সি অফিসের ফোর্স সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অপরাধী ধরবার জন্য আশেপাশে তল্লাশি চালাতে শুরু করেছে। তারা দাগি অপরাধী জয়হিন্দের মোহনবাগান লেনের বাড়িতেও স্বাভাবিকভাবে পৌঁছে গেল। সেখানে পুলিশ বাহিনী পেল পানুর ছেড়ে যাওয়া জামা কাপড়। তাতে সদ্য রক্তের দাগ। জয়হিন্দকে সন্দেহ করল। এবং গ্রেফতার করল।

বোমা ছোঁড়ার পর হেমেনের দলের সদস্যরা ভয়ে ছিটকে গিয়ে পালানোর সঙ্গে সঙ্গে দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। হেমেন আর দেবু সাহা একসঙ্গে ছুটে প্রথমে পৌঁছে গেল গৌরীবাড়িতে নিজেদের আস্তানায়। সেখানে সঙ্গের অব্যবহৃত বোমাগুলো রাখল। তারপর কী করবে, সেই আলোচনা শুরু করল। কিন্তু উত্তেজনায় মাথা ঠাণ্ডা করে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতে পারল না। তারপর জোয়ারের হাতে হাল ছেড়ে দিল। বাধ্য হয়ে নিজেদের বাড়িতে না গিয়ে অন্য একটা বাড়িতে আশ্রয় নিল।

তখন যুক্তফ্রন্টের আমল। জ্যোতি বসু পুলিশমন্ত্রী। তিনি পুলিশ খুনের ব্যাপারে সেদিন সন্ধেবেলায় বিবৃতি দিলেন। তিনি বললেন, "দ্রুত আমরা খুনীদের গ্রেফতার করব, এব্যাপারে কোনও রকম গা ছাড়া ভাব বা ঢিলেমি দেওয়া হবে না।" সেই বিবৃতি রেডিওতে শুনে হেমেনরা ভয় পেল। তারা ঠিক করল, তারা আর গৌরীবাড়ি অঞ্চলে থাকবে না। সেই মুহূর্তেই এলাকা ছেড়ে পালাবে।

হেমেনের এক পিসিমার বাড়ি আছে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার অঞ্চলে। হেমেন আর দেবু সেই রাতেই ওই পিসিমার বাড়িতে আত্মগোপনের জন্য চলে এল। ভয় ওদের মনে চেপে বসেছে। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, বহু ধরনের অপরাধে ওরা অভ্যস্ত ও হাত পাকালেও

খুনে ওদের হাত তখনও পাকেনি। আবার খুনও করল পুলিশের কনস্টেবলকে। দু'বার পি ডি অ্যাক্টে জেল খাটা হেমেন ভাল করেই জানে খুনের অর্থ কী, তার ওপর আবার পুলিশ খুনের। পুলিশের গায়ে হাত দিলে যে কলকাতার পুলিশ ছেড়ে কথা বলবে না সেটা তার অজানা নয়। লালাবাগানের কেষ্টকে খুনের দায়ে মন্টে জেলে। ওদের কানের পাশ দিয়ে সাজা বেরিয়ে গেছে। নয়ত ওরাও ওখানেই থাকত।

সে জানে, শ্যামবাজার মোড়ে অনেকেই তাকে দেখেছে এবং জয়হিন্দের মুখ থেকেও পানু ও তার সঙ্গে তাদের নাম পুলিশ শুনবে। জয়হিন্দ নিজে বাঁচতে সত্যি কথাই গড়গড়িয়ে পুলিশকে জানাবে। সুতরাং পুলিশ অনায়াসেই তাদের নাম জেনে যাবে। তাই তাদের গ্রেফতার এড়িয়ে চলতে হবে। পিসিমার বাড়িও যে বিশেষ গুপ্তস্থান নয়, সেটাও তারা বুঝতে পারছে। কিন্তু কোথায় যাবে?

পিসিমার এক দেওরের সঙ্গে আলাপ ছিল তালতলা অঞ্চলের নকশাল নেতা কাজল ও চন্দনের। সে হেমেনদের নিয়ে তাদের ওখানে গেল। তারা ওদের থাকার ব্যবস্থা করে দিল। ওদের দেওয়া আস্তানাতেই হেমেন আর দেবু কাটিয়ে দিল তেসরা ও চৌঠা ডিসেম্বরের দিন ও রাত। ওখানে বসেই ওরা খবর পেল, পিসিমার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের বাড়িতে পুলিশ ওদের খোঁজে হানা দিয়েছে।

ওরা আরও ভয় পেল। এবং কলকাতা যে তাদের জন্য একেবারে নিরাপদ নয়, সেটা বুঝে গেল। তাই কলকাতা পরিত্যাগ করে অন্য যাওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগল। ওরা কাজলদের কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য চাইল।

কাজলরা নকশাল। এবং নকশালদের আন্দোলন তখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন দিকে ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছে। মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ও গোপীবল্লভপুর অঞ্চলে ওদের ঘাঁটি বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে। কৃষকদের মধ্যে সংগঠন ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতার বেশ ক'জন ছাত্র ও যুবক ওইসব অঞ্চলে বছর দেড়েক ধরে কৃষকদের মধ্যে থেকে ওদের নীতি প্রচার করার ফলেই ওরা সংগঠনের জমি পেয়েছে। কাজলরা হেমেনের অনুরোধ শুনে বলল, “আমরা তোমাদের ডেবরা বা গোপীবল্লভপুরে পাঠিয়ে দিতে পারি। ওখানে তোমরা আমাদের কমরেডদের সঙ্গে মিশে থাকতে পারবে।”

হেমেন বুঝল, কাজলদের বক্তব্য অনুযায়ী ওরা যদি ডেবরা বা গোপীবল্লভপুর যায়, তবে তাদের নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হবে। সেটা ওদের মনঃপূত হল না। কারণ তখনকার নকশাল আন্দোলন ও নকশালদের সম্পর্কে হেমেনদের অভিজ্ঞতা ছিল যে, নকশালরা সৎ, আদর্শবান, আত্মত্যাগী এবং ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লব করার জন্য ওরা নিবেদিত। আটষট্টি উনসত্তর সাল পর্যন্ত নকশালরা তাই-ই ছিল। সুতরাং হেমেনদের অভিজ্ঞতা যে ভুল, তা নয়।

কিন্তু হেমেনরা ছিল উল্টো পথের পথিক। তারা ওইসব ‘বড় বড়’ আদর্শের কথা বুঝত না। ‘আত্মত্যাগ’, ‘বিপ্লব’ ওদের কাছে অনেক দূরের ব্যাপার। ওদের কাছে মস্তানি, দাদাগিরি, রোমাঞ্চই ছিল একমাত্র কাম্য। হাতের লাঠি ঘুরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফল পেতে ওরা অভ্যস্ত। কিন্তু নকশাল হলে ওসব যে আর করা যাবে না, তা ওরা ভালই জানে। ওরা তাই কাজলদের প্রস্তাব নাকচ করে দিল।

নাকচ করলেই তো হবে না। পালাতে তো হবে। কিন্তু কোথায়? হেমেন চিরদিনই প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন। সাধারণ মস্তানদের মতো স্থূল বুদ্ধির নয়। আর যেহেতু সে নেশা করে না, তাই বুদ্ধির প্রখরতা ভোঁতা হওয়ারও সুযোগ পায় না। সে ঠাণ্ডা মাথায় চুপচাপ সব অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করতে পারে। আর সে খবর রাখে, তার মস্তানির ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে বসবাসকারী কোন লোকটা স্বাভাবিক পথে রোজগার করে না। এই ধরনের খবর রাখাটা তার ‘ব্যবসার’ মধ্যে পড়ে।

সে জানত তাদের গৌরীবাড়ি অঞ্চলেই বিভূতি সাহা নামের একজন লোক অধুনা

বাংলাদেশ, তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে চোরাচালান করে। অর্থাৎ ওর সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের ওপারের অন্ধকার জগতের লোকজনের খুব ভাল যোগাযোগ আছে। হেমেন স্থির করল, বিভূতি সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করে তার সাহায্যে তারা পূর্ব পাকিস্তানেই পালাবে। কলকাতা পুলিশের একেবারে নাগালের বাইরে। হেমেন বিভূতি ' সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করল এবং তারই সাহায্যে হেমেন আর দেবু ভারতবর্ষের সীমান্ত পার হয়ে আটই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের জমিতে পা রাখল।

পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে কি হেমেনরা বসে থাকবে? বিশেষ করে ওরা যখন চোরাচালানকারী দলের সাহায্যেই ওই দেশে গিয়েছে। সুতরাং ওরা ওদের সাহায্যকারীদের সঙ্গে যোগ দিল। ওদের আরও সুবিধা হল বিভূতি সাহার ওপারের লোক ফরিদপুরের লক্ষ্মণ সাহার সঙ্গে হাত মেলানোর পর। লক্ষ্মণই হয়ে উঠল ওদের গুরু। লক্ষ্মণের হাত ধরে ওরা শুরু করল চোরাপথের কারবার।

জরি আর হেমেনরা ওপার থেকে এপারে নিয়ে এল রসায়ন দ্রব্য, এপার থেকে ওপারে নিয়ে গেল বেনারসী ও লক্ষৌর চিকন শাড়ি। হেমেন আর দেবু এপারে এলেও কলকাতায় কিন্তু ভুলেও ঢুকত না। কলকাতার পার্শ্ববর্তী কোনও এক পূর্ব নির্ধারিত জায়গায় চোরাই মাল বিক্রি করে চলে যেত বেনারস। সেখান থেকে শাড়ি কিনে গেদে, বানপুর, রাজশাহী, নবাবগঞ্জ, গোপালগঞ্জ হয়ে খেজুরিয়া ঘাট পেরিয়ে সোজা ঢাকা। এবং - মালসমেত মহাজনের গদিতে।

সত্তর একাত্তর সালের প্রায় পুরোটা সময় ধরে ওদের ভালই দিন কাটছিল। একদিকে নকশাল আন্দোলনের ঢেউয়ে পুলিশের সবরকম দফতর ব্যস্ত, অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, তখন কে খোঁজ করে হেমেনদের গতিবিধির ওই সময় চোরাচালানকারীদের খুবই সুদিন। সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে ওরা কোনওদিনই গুরুত্ব দেয় না। গুরুত্ব না দেওয়ার কারণ অবশ্যই টাকা। কীভাবে তারা সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে আয়ত্তে আনে? সেটা খুবই সোজা এবং সরল ব্যাপার।

সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এক একটা দল সীমান্তের এক একটা অংশের দায়িত্বে থাকে। ধরা যাক, একটা দলের ভার এক কিলোমিটার। সেই অঞ্চলের দু'পারের মোড়লরা ওদের থেকে নিলামে সীমান্তটা কিনে নিল। যে বেশি টাকায় ডেকে নেবে, ডাকের টাকা এক থোকে নিয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনী তার হাতেই দেবে সীমান্তের দেখভালের দায়িত্ব। শুধু চোরাচালানকারীদের জিনিসপত্র পারাপারের সময় ওই ডাকবাবুর মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে করতে হবে। ডাকবাবু তখন তার টাকা ওদের থেকে বুঝে নেবে। সুতরাং ভয় কী? শুধু লেনদেনের খেলা। সুতরাং “সেফমাল' বা 'হেভিমাল' যাই নিয়ে যাও না কেন, পাহারাদার ও চালানের দায়িত্বে তো আছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ব-কলমে অঞ্চলের মোড়লরা।

হেমেনরা ‘সেফমাল’ 'নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করত। অর্থাৎ সে সব জিনিসের দাম বেশি, ওজন কম এবং লাভও কম। ওরা চাল, ডাল, নুন, চিনির মতো ‘হেভিমালের’ কারবার করত না। হেমেন আর দেবু এ কাজে বেশ রপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং মহাজনদের কাছে ওরা ছিল প্রিয়পাত্র। বিশেষ করে একবার নবাবগঞ্জ স্টেশনে তোলা আদায়কারীদের সঙ্গে তুমুল মারপিট করার পর।

ওদের সুখের দিনে বাদ সাধলো ঢাকার ইসলামপুর রোডে অবস্থিত ইসলামপুর ফাঁড়ির এক পুলিশ অফিসার। হেমেন আর দেবুকে সে চিনত না, চেনার কথাও নয়। সে চিনত লক্ষ্মণকে। লক্ষ্মণ ওর থেকে মোটা সূদে মাঝে মাঝে তার ব্যবসার প্রয়োজনে টাকা নিত। কিন্তু হেমেনদের সঙ্গে জোট বাঁধার পর তার আর পটাকা ধার করার দরকার হয়নি। তাতে অফিসারটি কিছুটা অবাকই হয়েছিল।

সে একদিন লক্ষ্মণকে হেমেন ও দেবু সমেত ইসলামপুর রোডে দেখতে পেয়ে দাঁড় করাল। হেমেন আর দেবুর দিকে একবার অবজ্ঞা ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে লক্ষ্মণকে

প্রশ্ন করল, “কি ব্যাপার, আর যে টাকা নেনও না, দেনও না?” অফিসারের গায়ে কোনও পুলিশের পোশাক নেই। সাধারণ পোশাকে সে লক্ষ্মণকে দেখতে পেয়ে ওকে ধরেছে। হেমেন তাই বুঝতেই পারল না যে লোকটা পুলিশ অফিসার। সে তাই না বুঝেই, পালটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, “কিসের টাকা?” অফিসার লক্ষ্মণের উত্তর শোনার আগেই হেমেনের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, “আপনার নাম কী?” হেমেন বলল, “মহঃ আলি।”

“থাকেন কোথায়? করেন কী?” অফিসারের প্রশ্ন।

হেমেন কোনও মতে জানাল, আমি ছাত্র, থাকি রাজশাহী।”

অফিসের মাথা নাড়ল দু'বার, তারপর বলল, “এখানে কি কইরতে আইছেন?”

হেমেন বলল, “বেড়াইতে।”

অফিসার বলল, “অ, ঠিক আছে যান।” তারপর লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে প্রায় হুকুমের ভঙ্গিতে বলল, “আমার সঙ্গে দেখা কইরবেন।” হেমেনরা চলে গেল।

হেমেনরা এই ঘটনাকে কোনও রকম গুরুত্ব না দিলেও অফিসারটার মনে কিন্তু হেমেনদের সম্পর্কে সন্দেহ ঢুকে গেল। সে চুপিসাড়ে হেমেন আর দেবুর ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে শুরু করল। এবং অল্প ক'দিনের মধ্যেই সে ফল পেল। জেনে গেল তারা পাকিস্তানের লোক নয়। সে তাই তক্কে তক্কে রইল হেমেনদের ধরার জন্য।

প্রথম সাক্ষাতের দিন দশ পর হেমেন আর লক্ষ্মণ বিকেলবেলা একটা রিক্সায় ইসলামপুর রোড ধরে যাওয়ার সময় অফিসারটি ওদের রিক্সা দাঁড় করিয়ে হেমেনকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, “কি মিয়াঁ, কাটা না গোটা?” প্রশ্ন শুনে বুদ্ধিমান হেমেন বুঝে গেল তার পরিচয় অফিসারটি জেনে গেছে, অন্তত এটা বুঝেছে যে, সে পাকিস্তানী নয়, ভারতীয়। বেআইনীভাবে পাকিস্তানে আছে।

হেমেনরা বাধ্য হয়ে ওর সঙ্গে রফা করল। রফার পরিমাণ দশ হাজার টাকা। কিন্তু অত টাকা তো সঙ্গে নেই। অফিসার ওদের রিক্সায় উঠে বলল, “কোথায় আছে, চলেন।”

রিক্সা তিনজনকে নিয়ে ছুটল পল্টন বাজারের দিকে। দাঁড়াল গুলিস্থান সিনেমা হলের সামনে। লক্ষ্মণ বাজারের ভেতরে গেল, মহাজনদের কাছ থেকে টাকা আনতে। হেমেন অফিসারটার সঙ্গে পল্টন বাজারের প্রাচীরের 'ধারে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রাচীরের ওপারে স্টেডিয়াম, ফাঁকা। আধা বন্দী অবস্থায় হেমেন অফিসারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগল আর সুযোগ খুঁজতে লাগল তার হাত থেকে পালাবার।

সুযোগ পেল। অফিসারের সামান্য অন্যমনস্কতার সুযোগে হেমেন, ওকে ঘুষি ও লাথি মেরে প্রাচীর টপকে স্টেডিয়ামের ভেতর। তারপর ছুট। পেছনে অফিসারটা চিৎকার দিতে লাগল, “ইন্ডিয়ান স্পাই, ধর ওরে।” হেমেন শুনছে। কিন্তু ছুটছে। একছুটে স্টেডিয়াম পার। তারপর রাস্তা। রিক্সায় উঠে একেবারে হোটেলে।

টাকা ফস্কে গেল। তার ওপর লাথি ও ঘুষি। পুলিশ অফিসারটি চুপচাপ বসে থাকবে কেন। রিক্সাওয়ালাদের ধরে ধরে ও পাত্তা পেয়ে গেল হেমেনদের হোটেলের। হেমেনরাও বুঝে গেল, ওদের বিপদ আসন্ন। ধরা পড়লে ‘ইন্ডিয়ান স্পাই' হিসাবে সোজা চালান হয়ে যাবে ঢাকার জেলে। কারণ ওরা যে পাকিস্তানের নাগরিক তার কোনও প্রমাণপত্রই দাখিল করতে পারবে না। ওরা হোটেল ছেড়ে পালাল বাঙালি টোলায় এক মহাজনের বাড়ি। সেখানে দু'দিন কাটিয়ে ওরা ঠিক করল, আর পূর্ব পাকিস্তানে থাকবে না। কারণ ঢাকার জেলখানা থেকে কলকাতার জেলে থাকাই ওদের কাছে বাঞ্ছনীয়। ওরা বানপুর গেদে সীমান্ত দিয়ে এদেশে ফিরে এল। হেমেন চলে গেল বরাকর। ওর মাসিমার বাড়ি।

দেবু আবার চোরাচালানকারী বিভূতি সাহার আত্মীয়। সেই খবরটা বিভূতি চক্রবর্তীর কাছে পৌঁছে গেল। তিনি বিভূতি সাহাকে চাপ দিতে লাগলেন, দেবুকে আত্মসমর্পণ করানোর জন্য। নয়ত তিনি বিস্তৃতি সাহার ব্যবসা তো বন্ধ করে দেবেনই, উল্টে দেবুকে গ্রেফতারের বদলে যেখানে দেখতে পাবেন সেখানেই গুলি করে মেরে ফেলবেন।

বিভূতি সাহা ডিসি সাহেবের হুমকির কাছে নত হয়ে দেবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে ডিসি সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে নিজের ব্যবসা সামাল দিল। দেবু জেলে ঢুকে যেতে হেমেন একা হয়ে গেল। সে এবার তার পুরনো সঙ্গীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করল।

তখন পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন সিদ্ধার্থ শংকর রায়। অরাজকতা দিন দিন গ্রাস করছে পশ্চিমবঙ্গকে। নকশাল আন্দোলন ও রাজ্যে অস্থায়ী সরকারের উপস্থিতিতে আইন শৃঙ্খলারও দিন দিন অবনতি হতে লাগল। নকশাল আন্দোলনের পথ ধরে সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন ভাঙার প্রবণতা বেড়ে গেল। আর সেই সুযোগগুলো কাজে লাগাল সাধারণ মস্তানরা। নকশাল পার্টি থেকে বেরিয়ে এক শ্রেণীর লুম্পেন নকশাল ও অন্যান্য মস্তানরা ক্ষমতাশীল কংগ্রেস পার্টিতে ঢুকে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে লাগল। কংগ্রেসের গোষ্ঠী রাজনীতিতে তারা এক এক গোষ্ঠীতে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীপতির ক্ষমতার উৎস হিসাবে কাজ করার সুযোগ করে নিল। ফলে কংগ্রেসেরই বিভিন্ন গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সংঘর্ষটা একটা দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আর ওই সব গোষ্ঠীপতির ক্ষমতার আড়ালে তারা দুষ্কর্ম করে, তোলা তুলে যথেচ্ছাচার শুরু করল।

হেমেন সেই সুযোগে দমদমের কাজিপাড়ার স্থানীয় ছেলে রামেশ্বরের মাধ্যমে কাজিপাড়ায় তারা পুরনো শাগরেদ সমীর, অজয়, ভোলাকে নিয়ে এল এবং ঘাঁটি গেড়ে বসল। সে হয়ে গেল কংগ্রেসেরই এক গোষ্ঠীপতি শত ঘোষের লোক।

কাজিপাড়ায় ঘাঁটি গেড়ে হেমেন ওই অঞ্চলের ছেলেদের তার দলে টেনে নিল। উঠতি মস্তানদের প্রভাবিত করে তাদের নেতা হয়ে যাওয়ার একটা স্বাভাবিক গুণ ওর মধ্যে ছিল। সেটাকেই দারুণভাবে কাজে লাগিয়ে সে কাজিপাড়াতেও উঠতি মস্তানদের নেতা হয়ে গেল। এবার ওর কাজ হল ওখানকার সি. পি আই (এম) পার্টির প্রভাব কমানো। কারণ ওরাই ছিল ওর কাজের প্রধান বাধা।

সে ওখান থেকে তাড়িয়ে দিল দমদম কাঠগোলার সি.পি.আই.(এম) নেতা সুভাষ চক্রবর্তীকে। খুন হয়ে গেল সি.পি.আই.(এম)-এর জঙ্গী কর্মী কঙ্কাল। ওদের উপস্থিতিতে গণ্ডগোল বাধল ভগবতী কলোনি, আর এন গুহ রোড, জি বি রোড, মল রোডে। হেমেন কাজিপাড়ায় নিজেদের রক্ষা করার জন্য একটা প্রায় দুর্গ বানিয়ে ফেলল। ওদের রক্ষীরা সব সময় বোমা ও বিদেশি গ্রেনেড সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে লাগল। একদিকে ক্ষমতাশীল

পার্টির এক বলিষ্ঠ গোষ্ঠীপতির সমর্থন, অন্য দিকে অস্ত্র ও ষাট-সত্তর জনের বাহিনী নিয়ে হেমেন প্রায় বুক চিতিয়ে চলতে লাগল।

দমদম থানা ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের নাকের ডগাতেই তারা প্রতিদিন আইন ভাঙতে লাগল। গোষ্ঠীপতিদের প্রশ্রয়প্রাপ্ত মস্তানদের দৌরাত্ম্য চোখ বুজে দেখতে পুলিশ বাধ্য হল।

দেখতে দেখতে বাহাত্তর সালের বিধানসভার সাধারণ নির্বাচন এসে গেল। নির্বাচনে কংগ্রেস একটা নতুন কিছু করে দেখানোর তোড়জোড় শুরু করল। কারণ ক্ষমতায় থাকার লোভ ততদিনে সিদ্ধার্থবাবুর কল্যাণে নিচু তলার কর্মীদের মধ্যেও ঙ্গেপে বসেছে। তারা ভাবতে পারছে না, ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়ে যাবে।

বেলগাছিয়ার ওয়াগন ব্রেকার লখিয়াও তখন কংগ্রেস পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী। শত ঘোষের প্রিয় পাত্র। নির্বাচনে লখিয়ার ওপর অনেক দায়িত্ব। টালা পার্কে প্রথমবার আসবেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তিনি ওখানে নির্বাচনী ভাষণ দেবেন। চারদিকে যুদ্ধের গতি। সাজ সাজ রব। টালা পার্কে ডেকরেটরের লোকেরা দিনরাত জেগে মঞ্চ তৈরি করছে। লখিয়াও বসে নেই। শতবাবু তাকে দায়িত্ব দিয়েছে বিশেষ নিরাপত্তার দিকটা ঠিকমতো দেখভাল করার। সে তাই, বাহাত্তর সালের ছয়ই মার্চ বেলগাছিয়ার ওলাই চণ্ডী বস্তিতে একটা বাড়িতে তার আরও পাঁচজন সহযোদ্ধাকে নিয়ে ভোর থেকে বোমা বানাচ্ছে একটার পর একটা। যে

কোনও শত্রুর মোকাবিলা করার সময় ওগুলো তার কাজে লাগবে।

লখিয়ার ব্যবস্থা সব পাকা। বোমা বানাতে বানাতে যাতে কোনও সহকর্মীর কষ্ট না হয়, সে সব খেয়াল রেখেছে। যথাসময়ে খাবার দাবার হাজির। সন্ধেবেলায় গলা ভেজানোর জন্য মদ মজুত। তাদের কথা দিয়েছে, "এবার নির্বাচনের পর শতদার থেকে টাকা নিয়ে মুম্বাই, গোয়াতে স্ফূর্তি করতে যাবে। এখন শুধু একাগ্রভাবে কাজ। তারা তাই খুশি মনে একটার পর একটা বোমা বানিয়ে যত্ন সহকারে গুছিয়ে রাখে। যেমন করে মায়েরা তাদের সদ্যোজাত শিশুদের আদর করে রাখে।

বিকেলবেলা হঠাৎ ওই বাড়ি থেকে এলাকা কাঁপানো মুহুর্মুহু আওয়াজ। এলাকা জুড়ে ভূমিকম্পের মতো দোলানি। লখিয়াদের দলের একজনের হাত থেকে অসতর্কে একটা বোমা মেঝেতে পড়ে যেতে বিস্ফোরণ। সঙ্গে সাজানো গোটা পঞ্চাশেক বোমাও ফেটে চৌচির। গুড় গুড় শব্দ থেমে যাওয়ার পর এলাকার আতঙ্কিত বাসিন্দারা হই হই করে ওই বাড়ির থেকে ছুটে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কারণ তখন কালো ধোঁয়া বার হচ্ছে। ধোঁয়ায় কাঁচা মাংস পোড়ার গন্ধ। উড়ে যাওয়া ছাদ, দেওয়াল দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভেতরে রাক্ষুসে আগুনের হলকা।

খানিকক্ষণ পর পুলিশ এল। আগুন নেভানো হল। তারপর ভেতর থেকে বার করা হল বিভিন্ন মানুষের শরীরের পোড়া অংশগুলো। সেই সব অংশের আকার দেখে বোঝার উপায় নেই, কোন অংশটা কোন ব্যক্তির শরীরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সনাক্তকরণ হল ঘরে পড়ে থাকা বিভিন্ন আধপোড়া জিনিস দেখে।

নিহতরা হল লখিয়া ও তার পাঁচজন সহকর্মী। ওরা হল রবি অধিকারী, রাজকুমার সাউ, চাঁন্দু মিত্র, গণেশপ্রসাদ সিং, মাখনলাল ঘোষ। টালাপার্কে ইন্দিরা গান্ধী নির্বিঘ্নে মিটিং করে গেলেন। ছোট লখিয়াদের সেই মিটিং দেখা হল না। যথা দিনে নির্বাচন হল। নির্বাচনে কংগ্রেসের "কিছু একটা করে দেখানোর' ফলশ্রুতি হিসাবে কংগ্রেসের বিস্ময়কর জয়। সেই জয়ে বিরোধীপক্ষ একেবারে ধূলিসাৎ। তারা বিধানসভা বয়কট করলেন। সিদ্ধার্থবাবু বিরোধীহীন বিধানসভাই চালিয়ে গেলেন।

তাদের জন্য লখিয়ারা "শহীদ' হল। সেটা কি ব্যর্থ হবে? শতবাবু তাদের কথা দিয়েছিলেন, নির্বাচনের পর তিনি তাদের ক্লান্তি দূর করতে মুম্বাই, ও গোয়াতে বেড়ানোর বন্দোবস্ত করবেন। সেই কথা রাখতেই মৃত লখিয়াদের ছ'জনের স্ট্যাচু বানালেন। আর 'দেশপ্রেমিক' বানানোর অছিলায় স্টাচুর সামনে পাথরে খোঁদাই করে লিখলেন, সি.পি.আই. (এম) পার্টির ক্যাডারদের আক্রমণে নিহত তরুণ কংগ্রেস কর্মী! ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে ভূগর্ভস্থ জলাধারের পাশে সেই স্ট্যাচু কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতারা, গিয়ে উদ্বোধন করে এলেন। 'মহান শহীদ' লখিয়ার নামে 'যুগ যুগ জিও' ধ্বনিতে এলাকা কাঁপালেন। পরবর্তী কালে শিশুরা সেই স্ট্যাচুর দিকে তাকিয়ে হয়ত ভাবে 'লখিয়ার মতো দেশপ্রেমিকদের কথা'। হয়ত তারা শ্রদ্ধায় মাথা নত করে' চিন্তা করে "লক্ষ্মীনারায়ণ সাউ ওরফে ছোট লখিয়ার মতো দেশপ্রেমিক ও বীর তাদেরও হওয়া উচিত।'

তখন পান্না, খুনের মামলায় যাবজ্জীবন সাজা খাটছে প্রেসিডেন্সি জেলে। ভোঁদা, বিদ্যা, জয়হিন্দের দলও ছত্রভঙ্গ, লখিয়া মারা গেছে। বেলগাছিয়ায় ওয়াগন ব্রেকার হিসাবে 'কাজ' করছে খোকা মণ্ডল ও উজ্জ্বলের দল। হেমেন গৌরীবাড়ি অঞ্চলে পুলিশের জন্য আসতে পারে না।

এই সুযোগটা নিল সুজিত সরখেল। সে হেমেনের খালি জায়গাটা পূরণ করল। অত্যাচার ও তোলা আদায় শুরু করল কিছু নতুন ছেলেদের দলে টেনে।

আমরা ওকে প্রতিদিন তাড়া করতে লাগলাম। ও এলাকা ছেড়ে পালাল। বেশ কিছুদিন ওর কোনও ঠিকানা খুঁজে পেলাম না। খোঁজ করতে করতে অবশেষে ওর উপস্থিতি জানতে পারলাম দমদমের কাজিপাড়ায়। কাজিপাড়ায় যে তখন হেমেনও আত্মগোপন করে আছে

সে খবরটা আমার কাছে ছিল না। সুজিত আর হেমেনের দল ওখানে আলাদা আলাদা ভাবে নিজেদের দল বানিয়ে নিয়েছে। ওখানে দল বানাতে ওদের সুবিধা হয়েছিল, কারণ অঞ্চলটা গরীব এবং পূর্ব বাংলার ছিন্নমূল মানুষে ভরা। ঘরে ঘরে বেকার যুবক। সুজিত ওখানে বেকার যুবকদের মধ্যে নিজের একটা আলাদা রাজত্ব গড়ে তুলেছিল। ওরা সবসময়ই বোমা পটকা নিয়ে আক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে থাকত।

সুজিতকে গ্রেফতার করার দায়িত্ব পাওয়ার পর, আমি আমাদের গোয়েন্দা দফতরের একেবারে তরুণ অফিসারদের নিয়ে একটা ছোট দল প্রস্তুত করলাম। যারা যে কোনও হানার মোকাবিলাতে তৈরি, এবং সাহসী ও ক্ষিপ্র। সেই দলে নিলাম বিমান বসু, অশোক মালাকার, ব্রজ ভট্টাচার্যের মতো তরতাজা অফিসারদের আর কনস্টেবল রইল পরিমল, অসিত, শচীন ও মিশির। এরা প্রত্যেকেই আমাদের বহু যুদ্ধের লড়াকু সৈনিক। এরা পোড়খাওয়া এবং আত্মবিশ্বাসী।

খবর পেলাম সুমিত কাজিপাড়ার মোড়ে প্রতিদিন বিকেলবেলা আড্ডা মারতে আসে। ওর দেহরক্ষী হিসাবে স্থানীয় কিছু যুবক বোমা নিয়ে তৈরি থাকে। যে কোনও শত্রুর মোকাবিলায় ওরা প্রস্তুত। সুতরাং আমরা তাদের ঠিকভাবে প্রতিরোধ করে তবেই সুজিতকে গ্রেফতার করে আনতে পারব।

দুটো, গাড়িতে রওনা দিলাম। একটা গাড়িতে আমি, ব্রজ, পরিমল ও অসিত। অন্য গাড়িটায় বিমান, অশোক, শচীন ও মিশির। আমাদের গাড়ি কাজিপাড়ার মোড় ছাড়িয়ে চলে গেল। না, সুজিতের এখনও সময় হয়নি ভাতঘুম শেষে পল্টন নিয়ে আড্ডায় হাজির হওয়ার। আমরা গাড়ি নিয়ে কাজিপাড়ার মোড় ছাড়িয়ে চলে গেলাম।

মুশকিল হল, আমি আর মিশির ছাড়া আমাদের দলের আর কেউ সুজিত সরখেলকে চেনে না। বছর দুয়েক আগে এক গ্রেফতারের সূত্রে ওকে আমরা চিনি। তাই আমি আর মিশির আলাদা গাড়িতে বসেছি। গাড়ি নিয়ে দু'বার যাতায়াত করেছি। প্রতিবারই শ্যেন দৃষ্টিতে কাজিপাড়ার মোড়ের দিকে তাকিয়ে দেখছি। একই রাস্তা ধরে গাড়ি দুটো বারবার যাতায়াত করলে ওদের নজরে পড়ে যেতে পারে, তাই তৃতীয় বার একটু বেশিক্ষণ সময় নিয়ে আমরা কাজিপাড়ার মোড়ের দিকে ফিরে এলাম। তখন বিকেল সাড়ে চারটে।

হ্যাঁ। এবার আমি আর মিশির দুজনেই দেখলাম, সুজিত ভাতঘুম শেষে পাউডার মেখে আড্ডায় এসেছে। সে কাজিপাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে দুজন মাঝবয়সী লোকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। ওর থেকে হাত আট দশ দূরে দু'চারটে ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। জানি না, ওরা সুজিতের পাহারাদার কিনা। যদি হয়ও, আমরা ওদের বোমার মোকাবিলায় প্রস্তুত। আমাদের সঙ্গে রিভলবার ছাড়াও সীমান্তরক্ষী বাহিনী থেকে আনা একধরনের বোমা মজুত। বোমাগুলোয় ফিউজ লাগানো আছে, তাতে আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে দিলে বিকট শব্দে ফাটে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ওতে কোনও সিপ্লন্টার নেই। শুধু ভয় দেখানোর জন্য। এই বোমাগুলো সীমান্তরক্ষী বাহিনী ব্যবহার করে সাধারণত ছোট ছোট অপরাধীদের ভয় দেখিয়ে সীমান্তে পারাপার বন্ধ রাখার জন্য। ওই ধরনের বোমা সঙ্গে নেওয়ার কারণ, সুজিতের দলের কেউ বোমা ছুঁড়লে আমরা পাল্টা বোমা ছুঁড়ে ওদের ছত্রভঙ্গ করব। যাতে আমরা অনায়াসে আমাদের কাজ সমাধা করতে পারি।

গাড়ি স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, ড্রাইভারকে ইশারায় জানিয়ে দিয়েছি কোনখানটায় দাঁড়াতে হবে। আমি নিজের মুখটা আড়ালে রেখেছি, যাতে সুজিত আমাকে দেখতে না পায়। কারণ আমি যেমন ওকে চিনি, ও তেমন আমাকে চেনে। আর আমাকে দেখলে ও নিশ্চয়ই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না। পালাবে একেবারে কাজিপাড়ার ভেতর। যেখান থেকে ওকে খুঁজে বার করা প্রায় অসম্ভব।

আমাদের গাড়ি যথাস্থানে ব্রেক কষল। চোখের পলক একবারের বেশি চোখের ওপর ওঠবোস করল না। তার আগেই আমি আর অসিত গাড়ির দু'দিকের দরজা খুলে সটান

সুজিতকে পাঁজাকোলা করে তুলে পেছনের সিটে ব্রজ আর পরিমলের কোলে ফেলে দিয়েছি। ওরা দু'জন সুজিতকে চেপে ধরতেই দরজা বন্ধ। গাড়ির ইঞ্জিন চালুই ছিল। আমরা উঠে স্থান ত্যাগ করার মুহূর্তেই বিপত্তি।

সুজিতের কাজিপাড়ার পাহারাদার চিৎকার শুরু করেছে, "সরখেলদাকে নিয়ে পালাচ্ছে, সরখেলদাকে নিয়ে পালাচ্ছে।" আমাদের দিকে বোমা উড়ে এসে পড়ল। বিমান পাল্টা বোমা ছুঁড়তে লাগল। প্রায় পাঁচ মিনিট বোমার আক্রমণ প্রতি আক্রমণের পর আমরা যখন গাড়ি ছুটিয়ে দিয়েছি, তখনই একটা বোমা বিমানদের গাড়ির পেছনে এসে বিশাল শব্দে ফাটল। গাড়ির ক্ষতি হল। তবু গাড়ি থামল না। আমরা সুজিতকে নিয়ে সন্ধের আগেই লালবাজারে ফিরে এলাম।

তারপর ওকে কি পুজো করব? হ্যাঁ, সেই পুজো শুরু করলাম রাতে। সেই পুজোর মন্ত্রের ঠেলায় সুজিতের চিৎকার আমাদের দফতরে উপস্থিত সবাই শুনতে পেল। মন্ত্রের সঙ্গে 'আর করব না, আর করব না'র প্রতিজ্ঞা ওর কণ্ঠনালী থেকে কান্নার সুরে বার হচ্ছে।

একটাই কাজ হল। ওর কাছ থেকে জানতে পারলাম, কাকে কাকে ধরলে হেমেনের সঠিক অবস্থানটা জানতে পারব। হেমেন প্রায় তিন বছর গ্রেফতার এড়িয়ে চলছে। অবশেষে হেমেনকে গ্রেফতার করার দায়িত্বটা কতকটা স্বেচ্ছায় আমি নিজের কাঁধে তুলে নিলাম।

দায়িত্ব নিয়ে আমরা নকশাল আন্দোলন দমন শাখার অফিসাররা ধীরে ধীরে জাল গুটনোর জন্য কাজে নেমে পড়লাম। অপরাধী ধরতে গেলে প্রথমেই জানা দরকার সে কোথায় থাকে, কখন থাকে, কী অবস্থায় থাকে। সেগুলো ঠিক মতো জানতে পারলে তার দুর্বল জায়গায় আঘাত করে তাকে গ্রেফতার করাটাই সহজ পদ্ধতি। অবশ্য এই ধরনটাই যে তোতা পাখির মতো মেনে চলতে হবে, তার কোনও কারণ নেই। তবু অপরাধীর দুর্বল ও সবল স্থানগুলো জানা থাকলে নিজেদের কাজ সঠিক ভাবে করা যায়,. পরিকল্পনা মাফিক এগিয়ে যাওয়া যায়। কম ঝুঁকিতে বেশি ফল পাওয়া যায়।

কিন্তু অপরাধীর সম্পূর্ণ গতিবিধি জানতে গেলে সব চেয়ে আগে দরকার তা জানানোর লোক। এই জানানোর লোক বা সোর্স ঠিক করাটাই একটা গোয়েন্দা অফিসারের অন্যতম প্রধান কাজ, কারণ তার আসল অস্ত্রই হচ্ছে সোর্স, যা দিয়ে সে, অপরাধীদের ঘায়েল করতে পারে। অস্ত্র যত তীক্ষ্ণ হবে কাজও তত ভাল হবে।

সোর্স বানানোর যে পদ্ধতিগুলো আমি অনুসরণ করে সফল হয়েছিলাম তা হল। প্রথমত, যে সব অপরাধীকে গ্রেফতার করতাম, তাদের দীর্ঘ সময় ধরে ভালবাসা দিয়ে প্রথমে তাদের আস্থা অর্জন করে তাদের সোর্স বানিয়ে ফেলতাম।

দ্বিতীয়ত, যার সঙ্গে যেখানেই আলাপ হোক না কেন, তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে, প্রয়োজনে তাদের অসময়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে, তাদের সঙ্গে একটা হৃদ্যতা তৈরি করে আমি তাদের "আমার লোক' বানিয়ে ফেলতাম। উন্নাসিক হয়ে কখনও সম্পর্ক ছিন্ন করতাম না। অপ্রয়োজনীয় মনে করে দূরে সরিয়ে দিতাম না। কাকে যে কখন দরকার, তা আমাদের চাকরিতে কিছুতেই আগের থেকে অনুমান করা যায় না।

তৃতীয়ত, যে সব অপরাধী সাজাপ্রাপ্ত হয়ে বন্দী থাকত, তারা কে কখন জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছে, প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ও প্রেসিডেন্সি জেল থেকে রিপোর্ট নিতাম। এবং আসন্ন মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদিদের সঙ্গে জেলখানায় দেখা করে তাদের আমি কাছে টেনে রাখতাম। প্রয়োজনে তাদের বাড়িতে লোক পাঠিয়ে বা নিজে গিয়ে দেখা করে খবরাখবরের যোগসূত্রের সেতুটা ঠিক রাখতাম। জেলের এই সব সোর্স থেকে আমি বহু খবরই আগাম পেয়েছি। আমরা জানি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তারা আবার ঠিক অন্ধকার জগতের কাছে অনায়াসেই ফিরে যেতে পারে। এবং ফিরে গিয়ে খবরও দিতে পারে।

অবশ্য একটা কথা ঠিকই, প্রত্যেকেই সোর্স হয় না। যেমন প্রত্যেক আসামীই আবার নতুন করে অপরাধ জগতে ফিরে যায় না। আর ফিরে না গেলে সে সোর্স হিসাবে কার্যকরীও হয় না। কিন্তু সাধারণ খবরও তো দিতে পারে। সাধারণ খবরও এক এক সময় দারুণ চমক আনে।

যেমন আমার এক ডাক্তার বন্ধু একবার দিয়েছিল। সেদিন সে তার বাড়ির সামনে একটা ব্যাঙ্কের কাছে তিন চারটে অচেনা ছেলেকে সকাল ন'টা থেকে বার পাঁচেক ঘুরতে দেখে। যাঁরা বারবার ব্যাঙ্কের মূল ফটকের দিকে দেখছিল। ব্যাঙ্ক খুলবে দশটায়। অথচ ন'টার সময় তারা হাজির হয়ে অযথাই ঘুরছে! তাদের গতিবিধি দেখে ডাক্তার বন্ধুটি আমাকে ফোন করে সন্দেহজনক ছেলেগুলো সম্পর্কে জানায়। খবরটাকে গুরুত্ব দিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুটো গাড়িতে ক'জন অফিসার ও কনস্টেবল পাঠিয়ে দিই। ওরা যখন ব্যাঙ্কের সামনে পৌঁছয় তখনও দশটা বাজেনি। মিনিট পাঁচেক বাকি।

ছেলে তিনটির বর্ণনা ডাক্তারের কাছ থেকে নেওয়াই ছিল। তারা ব্যাঙ্ক খোলার অপেক্ষায় ব্যাঙ্কের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের অফিসারেরা সোজা ওদের সামনে গাড়ি দাঁড় করায়। গাড়ি দাঁড়াতেই ওদের সন্দেহ হয়। ছোটে। আমাদের অফিসাররাও পেছনে তাড়া করে। শেষ পর্যন্ত একটা ছেলে পালাল। দুটো ধরা পড়ল। ওদের কাছ থেকে একটা পাইপগান,

একটা রিভলবার ও বোমা উদ্ধার হল। ওরা যে ব্যাঙ্কে ডাকাতি করতে এসেছিল, তা ওদের মুখ থেকে বার করতে লালবাজারে আমাদের মিনিট দু'য়েকের বেশি লাগেনি।

সাধারণ খবরেও এরকম চমক থাকে, তা পুলিশি জীবনে বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। ডাক্তার আমার সোর্স নয়। বন্ধু। অথচ নিয়মিত যোগাযোগের জন্যই তিনি আমাকে খবরটা দিলেন এবং একটা নিশ্চিত ডাকাতির ঘটনা থেকে ব্যাঙ্ককে বাঁচালেন।

এই যে পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতা, তা প্রশিক্ষণ শিবিরেই বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নতুন অফিসারদের শিখিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু সেখানেই রয়ে যাচ্ছে গলদ। কারণ কলকাতা পুলিশে একটা অলিখিত নিয়ম চালু আছে যে, যে সব অফিসার কর্মক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষ নয়, তাদের প্রশিক্ষণ শিবিরে পাঠিয়ে তাদের দিয়ে নতুন অফিসারদের তালিম দেওয়ার কাজ করা। আর এখানেই একেবারে গোড়ায় ভুল হয়ে যাচ্ছে। কারণ যে সব অফিসার কর্মক্ষেত্রে দক্ষ নয় তারা কী করে নতুন অফিসারদের দক্ষ করে তুলবে? তাদের শিক্ষাটা কি গতানুগতিকতার বাইরে কখনও যাবে? অবশ্যই নয়। তাদের অভিজ্ঞতাই বা কতটা?

এখন প্রশ্ন, দক্ষ অফিসারদের প্রশিক্ষণ শিবিরে পাঠিয়ে তাদের যদি কর্মক্ষেত্র থেকে আলাদা করে একটা স্থানে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়, তবে কর্মস্থলে কাজ হবে কী করে?

ঠিক। তার জন্য একটা সহজ উপায় হল, দক্ষ অফিসারদের সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন প্রশিক্ষণ শিবিরে পাঠানো যেতে পারে বা প্রাক্তন দক্ষ অফিসারদের প্রশিক্ষণ শিবিরে নিয়োগ করে নতুন অফিসারদের তালিম দেওয়ার কাজটা করানো যেতে পারে। তাদের প্রচুর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে সঞ্চিত জ্ঞান তারা নতুনদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন। এই সত্যটা উপলব্ধি করে প্রতিটা পদক্ষেপ ফেলা দরকার। নতুন অফিসারদের কাজকর্ম ও চিন্তাধারার মধ্যে এই দিশাটা আনা প্রয়োজন। কিন্তু নতুন ও পুরনো ধরনের মধ্যে কে করবে সেতুবন্ধন? রাজনৈতিক নেতাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে থাকলে একটা দক্ষ বাহিনীও যে অদক্ষে পরিণত হয় তা কি চোখের সামনে জনগণ দেখছেন না? কিন্তু তাদের বোবা দৃষ্টি নিয়ে, বোবা হয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। কারণ তাঁদের সমস্ত বিষয়ের ভাগ্যনিয়ন্তা যে কতগুলো অপরিণত রাজনৈতিক লোক।

হেমেন যে দমদমের কাজিপাড়ায় ঘাঁটি গেড়েছে তা জেনে গেছি। এও জেনেছি, তার দলে কমপক্ষে ষাট সত্তর জন ছেলে আছে। এবং প্রত্যেকেই প্রতিনিয়ত বোমা ও গ্রেনেড নিয়ে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত। হেমেন নিজেও কোমরে গোটা পাঁচেক বিদেশি গ্রেনেড ঝুলিয়ে রাখে। সে কাজিপাড়ার ঘিঞ্জি এলাকায় একটা দুর্গ বানিয়ে ফেলেছে। তাছাড়া খবর পেলাম, সে এক রাতের বেশি কোনও বাড়িতে আশ্রয় নেয় না। এবং কোন বাড়িতে সে আশ্রয় নেবে, তা আগের থেকে গৃহকর্তাকেও জানায় না। সটান ঢুকে পড়ে এবং শুয়ে

পড়ে। বাড়ির বাইরে পাহারায় থাকে অন্য ছেলেরা। অর্থাৎ তাকে গ্রেফতার করতে গেলে একটা ছোটখাট যুদ্ধই করতে হবে ওইরকম একটা বসতিপূর্ণ এলাকায়। এবং সেই যুদ্ধে যে সাধারণ মানুষের প্রাণহানি হতে পারে, তার সম্ভাবনা প্রায় একশ ভাগ। সুতরাং অন্য উপায় নিতে হবে। কী উপায়?

উপায় একটাই আছে। তা হল হেমেনকে তার কাজিপাড়ার ঘাঁটি থেকে বাইরে আনতে হবে। সেটা কী ভাবে সম্ভব সেই চিন্তা করতে লাগলাম। কারণ তা সহজ নয়।

প্রথম কথা, হেমেন চট করে ঘাঁটি ছেড়ে বাইরে আসে না। কাজিপাড়াতে বসেই সে তার দাপট চালায়। আর বাইরে হলেও, কখন কোথায় যায় তাও আগে কাউকে বলে না। সে নেশা করে না। নেশার আকর্ষণে কলকাতাতেও পা ফেলার প্রয়োজন বোধ করে না, তাই নেশার ঝোঁকে বেফাঁস কথা বলার প্রশ্ন তো নেইই, যে বেফাঁসের সূত্র ধরে আমরা তার ঠিকানায় হাজির হব।

দমদম অঞ্চলে বেশ ক'জন মস্তানের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তার মধ্যে একজন সমরেশ কর ওরফে পল। সে তখন শান্তি দত্তকে খুনের দায়ে দমদম সেন্ট্রাল জেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বন্দী। শান্তিকেও আমি চিনতাম। এরা দুজনেই ছিল লবঙ্গ, দারচিনি, এলাচ ইত্যাদির চোরাচালানকারী। তাছাড়া ওরা যশোহর রোডে লরি লুঠ করত। দখল নিয়ে দু'দলের বিরোধের ফলেই পল শান্তিকে গাইঘাটায় স্টেনগান দিয়ে গুলি করে হত্যা করে।

আর একটা পুরনো মস্তানকে চিনি। অবশ্য সে পলদের থেকে মস্তান হিসাবে ছোট। তবে তার বাড়িটা কাজিপাড়ার কাছেই। তার নাম নানু বসু।

তারও একটা দল আছে। এবং সে সেই দলের সাহায্যে কিছু গুপ্ত খুনও করেছে। সে কংগ্রেস পার্টির লোক এবং তার সঙ্গে কংগ্রেসের উঁচু মহলের নেতা শিল্পপতি কমলনাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তো আছেই, উপরন্তু বাহাত্তরের কংগ্রেসের 'কাজের নির্বাচনের' ঠেলায় দমদমের নতুন বিধায়ক লালবাহাদুর সিংয়ের সে একেবারে কাছের লোক।

হেমেনও কংগ্রেসের লোক। কিন্তু দুজনে দুই গোষ্ঠীর লোক। একে অপরের শত্রু। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। হেমেন শতবাবুর গোষ্ঠীর। নানু সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীর। আমার দরকার, এখানে একটা মেলবন্ধনের। কংগ্রেসের গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের যে হাল, তাতে যে এই কাজটা সহজ নয়, তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে।

তবে একটাই ভরসা। তা হল সুব্রত মুখোপাধ্যায় হচ্ছেন পুলিশ মন্ত্রী। এবং হেমেন খুনের দায়ে আত্মগোপনকারী আসামী। সে খুনের মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য লালায়িত হবেই।

সুতরাং ঠিক করলাম আমার তুরুপের তাস হবে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নাম। কারণ পুলিশ মন্ত্রী হিসাবে তিনি হেমেনকে খুনের মামলার থেকে অব্যাহতির ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। সেটা হেমেন জানে। সেইজন্য সে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীভুক্ত হতেও যে দ্বিধা করবে না, তা আমার মতো একটা পুলিশ অফিসার সহজেই বোঝে। ঠিক করলাম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নামটাই টোপ হিসাবে ব্যবহার করব। সেই টোপ হেমেন গিলতে এলেই আমরা ওকে তুলে নেব।

হেমেনকে এই টোপ গেলাতে আমার নানুর সাহায্য চাই। ঠিক করলাম, নানুর বাড়ি যাব। বাড়ির অবস্থানটাও দেখা যাবে। ওর সঙ্গে দেখাও হয়ে যাবে। নতুন বাড়ি করার পর আমাকে যেতে বলেছিল, যাইনি। একদিকে সময়াভাব, অন্যদিকে এত নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলে আর কাজের সময় পাওয়া যায় না। তবুও যোগাযোগ রাখতে যেতে হয়। কখন যে কাকে প্রয়োজন হবে পুলিশি জীবনে, আগের থেকে জানা যায় না।

একদিন সন্ধেবেলা নানুর বাড়িতে একা পৌঁছে গেলাম। বাড়িটা বড় রাস্তা থেকে ভেতরে একটা গলিতে। দোতলা বাড়ি। পাশে একটা মাঠ। সারা বাড়িটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

সামনে লোহার ফটক। ফটক খুলে ভেতরে ঢুকলে বাগান। বাগানের মাঝ দিয়ে মূল বাড়িতে যাওয়ার পথ। চারদিকটা বেশ সুন্দর সাজানো।

ফটক খুলে একাই এগিয়ে গেলাম। কলিং বেল বাজাতেই একতলার সদর দরজা খুলল নানু নিজেই। আমাকে দেখে অবাক। একটু ভীতও মনে হল। বাহাত্তর সালের সেপ্টেম্বরের শেষ দিক। সবে নকশাল আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়েছে। সেই আন্দোলনের মোকাবিলার ঠেলায় আমি তাই ঠিক বাঞ্ছিত নই দমদমের মতো এলাকায়। যদিও নানু আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, কিন্তু হৃদয় দিয়ে যে সেই আমন্ত্রণ নয় তা আমি জানি। আমি এও জানি, বেশির ভাগ লোকই দূর থেকে সম্পর্ক রাখতে চায়, কাছ থেকে নয়। সেটা ভয়ে। যদি সেই সম্পর্কের জেরে নকশালরা হামলা করে। নানুও সেই কারণে ভীত। হোক ভীত। আমার নানুর সাহায্য চাই। আমি তাই একটু হাসলাম। বললাম, "কি রে আমাকে ভেতরে আসতে বলবি না?" নানু পুরনো মস্তান। আমার কথায় তাড়াতাড়ি চোখমুখ থেকে ভয়ের ভাবটা কাটিয়ে বলে উঠল, "সে কি, এ তো আপনারই বাড়ি, আসুন, আসুন।" বুঝলাম, রাজনীতি করে বিনয়টা বেশ রপ্ত করে ফেলেছে। আপ্যায়নের ভাষাতেই তা মালুম। ভেতরে ঢুকলাম। বসবার ঘরে। বেশ বড়। সোফা ও টেবিল চেয়ার দিয়ে বেশ গোছানো।

সোফায় বসলাম। নানু তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে চা-টা বানানোর উদ্যোগ করছিল। আমি বাধা দিয়ে বললাম, "তোর ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই, আমি কিছু খাব না। এদিকে এসেছিলাম, তোর বাড়িটা দেখে গেলাম। এক্ষুণি চলে যাব।"

নানু হেসে বলল, "তা কি হয়, প্রথম এলেন।" আমিও হাসি হাসি মুখ করে বললাম, "আবার আসব, তখন খাব। তোর সঙ্গে একটা দরকার আছে। কাল একবার লালবাজারে আসতে পারবি?" নানু আমার কথা শুনে শুকনো মুখে সামান্য ভেবে জিজ্ঞেস করল, "কখন?" বললাম, "যখন ইচ্ছে। ক'টায় আসতে পারবি বল, আমি থাকব।" নানু বলল, "বিকালে, এই চারটে নাগাদ।" বললাম, "ঠিক আছে, আমি থাকব, দেরি করিস না।" আমি উঠে পড়লাম। তারপর বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে ওর বাড়ি, পাড়া সম্পর্কে কথা বলতে বলতে লোহার ফটক খুলে পাশের মাঠে রাখা আমার গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। নানুর বাড়ির ফটকের পাশে ক'টা ছেলে। দেখে মনে হল নানুর শাগরেদ। নানুও আমার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। গাড়িতে ওঠার আগে আমি নিচু গলায় বললাম, "আমি যে এসেছি এটা কাউকে বলিস না।" নানু মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে।" চলে এলাম।

পরদিন ঠিক সময়ে নানু লালবাজারে হাজির। ওর ফর্সা মুখটা একটু উদভ্রান্ত। বোধহয়, আমার ওকে কী প্রয়োজন সেটা আন্দাজ করতে না পারার জন্যই ওর এই উৎকণ্ঠা। বললাম, "বোস।" নানু আমার উল্টো দিকের চেয়ারে বসল। আমি চা আনতে পাঠালাম। তারপর ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "গতকাল যে তোর বাড়ি আমি গেছি, সেটা কাউকে বলিসনি তো?" ও উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, "না না।" বললাম, "ভাল করেছিস।" নানু এবার মিনমিন স্বরে আমাকে প্রশ্ন করল, "কী প্রয়োজন আছে, সেটা বললেন না তো?"

"বলছি।" তারপর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, "কাজিপাড়ায় হেমেন থাকে তো?"

নানু মাথা নেড়ে জানাল, "হ্যাঁ। কিন্তু কেন?" ওর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, "কীভাবে থাকে?"

নানু আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই চা এল। দিলাম। চা খেতে খেতে ও প্রায় আতঙ্কিত গলায় বলল, "হেমেন একেবারে দুর্গের মধ্যে থাকে। সব সময় ওর সঙ্গে থাকে কম করে পনেরো কুড়িটা ছেলে। সবার কাছেই গ্রেনেড, বোমা, পাইপগান। তাছাড়া আশে পাশে আরও পঞ্চাশ ষাট জন ছেলে আছে, যারা হাঁক পাড়লেই হাজির হয়ে যায়। ও একেবারে ঘাঁটি গেড়ে বসে কাজ চালাচ্ছে।"

আমি নানুর কথা শুনে বললাম, "হুঁ। কিন্তু ওকে যে আমার দরকার।" নানু আমার

কথা শুনে আবার আঁৎকে উঠে বলল, “না, না, ওকে ওখানে ধরতে গেলে বিরাট ঝামেলা হয়ে যাবে। লোকজনও মারা যেতে পারে।”

বললাম, “জানি। তাই তোর সাহায্যের দরকার।”

আমার কথায় নানু কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। হেমেনকে যে ও ভয় পায় তা আমি জানি। তাই বললাম, “তোর ভয় নেই।” নানু মিনমিন স্বরে জানতে চাইল, “কীভাবে সাহায্য করব?” আমি ওকে আমার বিস্তারিত পরিকল্পনার কথা জানালাম। সব শুনে ও পরিষ্কারভাবে বলল, “আমাকে আবার এই ঝামেলার মধ্যে ফেলছেন কেন?”

জানতাম, আমার কথা শুনে নানু চট করে রাজি হবে না। বললাম, “কোনও ঝামেলা নয়, আমি তো আছি। ব্যাপারটা কেউই জানবে না। আর এটুকু না করলে আমি ভাববো তুই আমার লোক না।” শেষের দিকটা ইচ্ছে করেই একটু জোরের সঙ্গে বললাম। যাতে আমার দিক থেকে একটু ভয় পায়। কারণ ও ভাল করে জানে, আমাকে সাহায্য না করলে ওরই বিপদ হতে পারে। আর সাহায্য করলে ওর বিপদে আমি সাহায্য করতে পারি।

তবু নানু বলল, “হেমেন খুব চালাক ছেলে। আমি ওকে বৈঠকবাজি করে ধরিয়ে দিয়েছি। ও তো বুঝে যাবেই, তখন?”

বললাম, “আমরা কি সব মরে গেছি? এত ভয় পাওয়ার কী আছে?” তারপর ওর মস্তানির আঁতে একটু ঘা দিতে বললাম, “কেন, তুই ও কি মরে গেছিস? তুই ওর চেয়ে কম কিসে? তোরও তো কম শক্তি নেই। তাছাড়া ও তো এখন তোদের বিরুদ্ধে কাজ করছে। ধরা পড়লে তোদেরই তো সুবিধা।”

নানু চুপ করে আমার কথা শুনলো। আমার শেষ কথাগুলো যে কাজ করেছে, তা ওর মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম। ও একটা ঢোঁক গিলে বলল, “ঠিক আছে, দেখি কত দূর কী করতে পারি। তবে এই কথাগুলো যেন আগের থেকে চাউর না হয়ে যায়।” হেসে বললাম, “না, প্রচার হবে না। তুই আর আমি ছাড়া তৃতীয় কেউ জানবে না।” নানু উঠে পড়ল। বললাম, “খবর দিস, কতদূর এগোল।” নানু মাথা নেড়ে লালবাজার ছেড়ে চলে গেল।

দিন দুই পর নানু খবর দিল, ও কাজ শুরু করেছে। আমার প্রস্তাব মতো নানু লোক মারফৎ হেমেনকে খবর পাঠিয়েছে যে, ‘সুব্রত মুখোপাধ্যায় ওর সঙ্গে দেখা করতে চান। হেমেন রাজি হলে ও বৈঠকের ব্যবস্থা করবে।' নানুর প্রস্তাবে হেমেন কোনও উত্তর দেয়নি। বলেছে, “ভেবে দেখি, দু'দিন পর জানাব।” খবর পেলাম, দু'দিন পর হেমেন নানুর কাছে জানতে চেয়েছে, “দেখা করলে কোথায় যেতে হবে এবং কবে?” নানু আমার পরিকল্পনা মতো ওকে জানিয়েছে, “আমার গোরাবাজারের বাড়িতে আসবে। ভাইফোঁটার দিন সুব্রতবাবু আমার স্ত্রীর কাছে ফোঁটা নিতে আসবেন। তখনই তোর সঙ্গে আলোচনা সেরে নেবেন।'

প্রস্তাব শুনে হেমেন নানুকে কাজিপাড়ায় ওর ঘাঁটিতে ডেকে পাঠাল। নানু গেল। নানুকে হেমেন খুব যত্ন করে বসিয়ে বলল, “দেখ নানুদা, আমি রাজি, কিন্তু যেন কিছু উল্টোপাল্টা না হয়, আর ভিড়ভাট্টা যাতে না থাকে সেটা দেখ। তুমি বলছ বলেই যাব। জানোই তো ঝামেলা হলে তোমার ঘাড়েই দোষ পড়বে। তখন কিন্তু সামলাতে পারবে না। আমার ছেলেরা কেউ ছেড়ে কথা বলবে না, সেটা তুমি মনে রেখো।” নানুকে হেমেন প্রায় ধমকালো।

কিন্তু নানুর আর পিছিয়ে আসার পথ নেই। সে কোন কুল রাখবে। একদিকে আমি, অন্যদিকে হেমেন। আমি ওকে সাহায্য করতে পারি। হেমেন নয়। সে তাই বাধ্য হয়ে বলল, “ঝামেলা আর কী? তোরা কথা বলবি। আমি তার সাক্ষী থাকব। কথা হয়ে গেলে তুই চলে আসবি। সুব্রতও চলে যাবে। সবই তো তোর ভালর জন্য। দেখ না, যদি মার্ডার কেসটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারিস।”

হেমেন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চিত্রটা পরিষ্কার বুঝতে চাইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, “ক’টার সময়?” নানু বলল, “তিনটের সময়।” হেমেন মাথা নাড়ল। বলল, “ঠিক

আছে, যাও। আমি ঠিক সময় মতো পৌঁছে যাব।"

নানু হেমেনের ঘাঁটি থেকে তার বাড়িতে ফিরে এল। এবং আমাকে জানাল। খবর শুনে আমি খুশি। এবার পরবর্তী ধাপ। পরিকল্পনা কাজ করছে। আমার দেওয়া টোপ গিলতে হেমেন রাজি হয়েছে।

এবার আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। যদিও হেমেন কাজিপাড়া ছেড়ে নানুর বাড়িতে আসবে, তবু এটা ভেবে নেওয়ার কোনও কারণ নেই যে সে নিরস্ত্র এবং একা আসবে। কোনও মস্তানই একা ঘোরাফেরা করতে পছন্দ করে না। তারা শাগরেদ পরিবেষ্টিত হয়ে সামন্ত প্রভুদের মতো চলাফেরাতেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। চারদিকে সৈন্যসামন্ত না থাকলে তারা নিজেদের কম ওজনদার ভাবে। তাদের হুকুম তামিল করার জন্য সদা জাগ্রত সান্ত্রী না থাকলে তাদের চলবে কেন?

আর নানুর বাড়িতে, শত্রু শিবিরে যে হেমেন একা আসবে না, সেটা মস্তান চরিত্র সম্পর্কে যাদের ন্যূনতম জ্ঞানও আছে, তারা অনায়াসে বুঝবে। এবং তারা কেউ পকেটে দূর্বাঘাস নিয়ে আসবে না নানুকে পুজো করতে। কারণ নানুকে ওরা বিশ্বাস করে না, এবং নানু যে ধোয়া তুলসী পাতা নয়, সেটাও ওরা বিলক্ষণ জানে। গোষ্ঠী রাজনীতিতে অভ্যস্ত কোনও কংগ্রেসীই অন্য কংগ্রেসীকে বিশ্বাস করে না। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আবার মস্তান বনাম মস্তান রাজনীতি। সুতরাং পরস্পরকে কুণ্ঠাহীনভাবে বিশ্বাসের গুরুত নেই।

কিন্তু হেমেনের সঙ্গে কতজন আসবে? তা তো আমরা আগের থেকে জানতে পারব না। সুতরাং আমাদের দলটা একটু বড়ই করতে হবে। কথা অনুযায়ী নানুও তার শাগরেদদের তৈরি রাখবে। প্রয়োজন হলে তারা আমাদের সাহায্যে আসবে।

দেখতে দেখতে ভাইফোটার দিন এসে গেল। মস্তানদের আবশ্যিক শক্তির আরাধ্য দেবী কালীপুজোর দাপট অস্তের দিকে। যদিও বহু প্যান্ডেলে তখনও প্রতিমা অধিষ্ঠিত। তারস্বরে মাইকের কীর্তন অব্যাহত। দাদের নামে পরিচালিত পুজোর ব্যাঘাত কে ঘটাবে? আইন তো সব দাদাদের কলার উঁচু পাঞ্জাবির বাঁ পকেটে। তারই মাঝে বাঙালী হিন্দুঘরের বোনেরা ব্যস্ত যমরাজের দক্ষিণ দরজার সামনে কাঁটা বিছিয়ে ভাইয়ের প্রাণ বাঁচিয়ে চিরজীবী করতে। হোক তার ভাই সমাজবিরোধী, খুনী, ডাকাত কিংবা বলাৎকারী। বোনেরা তার কপালে চন্দন, দইয়ের টিপ লাগিয়ে ভাইয়ের অমরত্ব লাভের প্রার্থনা জানাবেই।

আমরা সেই টিপের একটা মিথ্যা গল্প বানিয়ে হেমেনকে টোপ দিয়ে নানুর বাড়িতে এনে তাকে গ্রেফতার করতে যাচ্ছি। তিনটের সময় তার আসার কথা। আমরা বারোটার সময়ই লালবাজার থেকে তিন তিনখানা গাড়ি ছেড়ে দিয়েছি।

গাড়ি এনে রাখলাম বড় রাস্তায়। নানুর বাড়ির গলিতে নিয়ে গেলাম না। দুপুরবেলাতেই ওর বাড়ির সামনে তিনটে গাড়ির থেকে অপরিচিত একগাদা দামড়া দামড়া সন্দেহজনক লোক নামলে, সেটা যে পল্লবিত হয়ে হেমেনের কানের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে, তা নিশ্চিত। এবং সেটা পৌঁছে গেলে হেমেন নাও আসতে পারে। কারণ ও অতি সাবধানী। আমরা বোকার মতো ঝুঁকি নিতে যাব কেন?

গাড়ি গলির মুখ থেকে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড় করিয়ে আমরা কেউ একা, কেউ দু'জন, গল্প করতে করতে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব রেখে নানুর বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। ভাইফোঁটার দিনের ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের দিকে বিশেষ কেউ লক্ষ্যই করল না। আমরা হাঁটতে হাঁটতে নিশ্চিন্তে চলে এলাম।

এবার আমাদের ফাঁদ পাতা আরম্ভ হল। আমাদের অফিসার উমাশংকর, শচী মজুমদার ও কনস্টেবল অসিত থাকবে বৈঠকখানায়। বিমান, অশোক মালাকার, ব্রজ ভট্টাচার্য ও কনস্টেবল পরিমল, মিশির, শচীনরা থাকবে বাইরে, নানুর বাড়ির প্রাচীরের ধারে লুকিয়ে। ওরা হেমেনের সঙ্গীদের ধরবে। ঘরের ভেতর সোফায় বসবে উমাশংকর। শচী সোফার পেছনের চেয়ারে। অসিত সদর দরজার পাশে। যেন সে ননীর কোনও স্থানীয় শাগরেদ।

উমাশংকর আমন্ত্রিত ব্যক্তির মতো নানুর সঙ্গে গল্প করবে। শচী চুপচাপ ওদের গল্পটা শুনবে। আর আমি থাকব নানুর বাড়ির পেছনের একটা রাস্তায়। ঘরের ভেতর আর বাইরের যোগসূত্র এবং সমগ্র পরিস্থিতির কমান্ডার হিসাবে। সোয়া দু'টোর মধ্যে আমাদের সমরক্ষেত্র তৈরি। এবার প্রতীক্ষা। কখন আমাদের শিকার আসবে।

**ওর এক সঙ্গী।** তিনটে বাজতে তখনও মিনিট পাঁচেক বাকি। নানুর বাড়ির পুব দিক থেকে দুটো রিক্সা এগিয়ে এল। একটাতে হেমেন ও অন্যটায় তিনজন। ওরা যে হেমেনেরই সঙ্গী, তা আর বলে দিতে হবে না। ওদের গর্বিত চোখমুখ দেখলেই সহজে বোঝা যায়। রিক্সা দুটো নানুর বাড়ির লোহার ফটকের সামনে দাঁড়াল। রিক্সা থেকে প্রথমে নামল হেমেন। ওর পরনে লম্বা পাঞ্জাবি আর পাজামা। কোমরে যে গ্রেনেড আছে, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কারণ কোমরের চারপাশটা উঁচু হয়ে আছে। পাঞ্জাবীর ঢিলেঢালা ভাবেও সেগুলো বিশেষ লুকিয়ে নেই। লুকনোর চেষ্টা ও বোধহয় করে না। উদ্ধত ভঙ্গিতে ওর পেছন পেছন বাকিরা নামল। রিক্সা দুটোকে ওরা ছাড়ল না। ফিরে যাওয়ার জন্য রেখে দিল। রিক্সাচালকদের বিনয়ী মুখ দেখলেই স্পষ্ট, ওরা ওদের পরিচিত।

ফটক খুলে হেমেন একাই নানুর ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে হাঁক পড়ল, “কই, নানু বোস, কই? ওর মন্ত্রী এসেছে?” কথামতো অসিত এগিয়ে গিয়ে বলল, “এসে যাবে। দাদা আপনাকে ঘরে আসতে বলছে।”

হেমেনের বাঁ হাতটা পাঞ্জাবির পকেটে ঢোকানো। উদ্ধত ডান হাতটা বাইরে। সে হাঁটছে যেন কোনও রাষ্ট্রপ্রধান অন্য এক রাষ্ট্রপ্রধানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছে, তেমন ভঙ্গিতে। ওর দেহরক্ষীরা নানুর বাড়ির ফটক ও তার সংলগ্ন জায়গায় রাষ্ট্রপ্রধানের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যথাযথ স্থান নিয়ে দাঁড়াল।

ঘড়িতে তিনটে। হেমেনকে নানু যথাযথ সম্মান দিয়ে সোফায় উমাশংকরের পাশে বসাল। নানু হেমেনের সঙ্গে উমাশংকরের পরিচয় করিয়ে দিল। উমাশংকরকে দেখিয়ে হেমেনকে বলল, “আমার মাসতুতো ভাই।” হেমেন উশংকরের দিকে একটা কুটিল দৃষ্টি হেনে বলল, “অ।” তারপর নানুকে জিজ্ঞেস করল, “তা তোমার মন্ত্রী কই?”

তখনই বসার ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে আমি ঘরে পা রাখলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দৃশ্যের পট পরিবর্তন। পরিবর্তিত দৃশ্যটা হল, নীরব শচীর একটা ছোট লাফ এবং তার ডান হাতের খোলা রিভলবারের নল হেমেনের পিঠে চেপে ধরা। নানুর ‘মাসতুতো ভাই' উমাশংকর হেমেনের দু'টো হাত ওর পায়ের ওপরেই জোর করে ধরে রেখেছে, যাতে সে কোমরে রাখা গ্রেনেড বার করতে না পারে। নানুর শাগরেদ' অসিতের হাত চেপে ধরে ওর মুখে, যাতে কোনও চিৎকারে হেমেনের দেহরক্ষীদের কাছে সাবধানবাণী না পৌঁছতে পারে। আমি এবার এগিয়ে গেলাম বসার ঘরের সদর দরজার সামনে। এখানে আমার উপস্থিতি মানেই আমাদের বাইরের বাহিনীর কাছে বার্তা পৌঁছনো, ‘চার্জ”। আমি দরজার সামনে দাঁড়ালাম। ডান হাতটা আকাশের দিকে একবার নিক্ষেপ করলাম। ব্যস। লুকিয়ে থাকা বিমান, অশোকরা লাফ মেরে হেমেনের সঙ্গীদের পিঠে রিভলবার ঠেকিয়ে গ্রেফতার করে নিয়েছে। আমি ঘরে ফিরলাম। হেমেনকে দাঁড় করালাম। তল্লাশি করে ওর কোমর থেকে একটা, একটা করে পাঁচটা বিদেশি গ্রেনেড খুলে নিলাম। হেমেন কটমট করে নানুর দিকে তাকিয়ে নানুকে গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে। আর রাগে ফুঁসছে। কারণ যে খুনের দায় থেকে সে মুক্তি পাওয়ার লোভে একটা দর কষাকষি করে ছাড়পত্র পেতে চেয়েছিল, উল্টে নিজের গুরুত্বকে এক ধাক্কায় শূন্যে নামিয়ে তাকে সেই খুনের মামলা মাথায় নিয়ে গ্রেফতার হতে হল। রাগ তো হবেই। যতই রাগ হোক ওর আর কিছু করার নেই। আমাদের জালে এখন বন্দী।

বড় রাস্তায় খবর পাঠিয়ে আমাদের তিনটে গাড়িকেই দ্রুত আনালাম। এবার এক এক করে বন্দীদের আমাদের গাড়িতে তুললাম। নানুও এগিয়ে এসেছে। হেমেন গাড়িতে উঠে

নানুকে 'চিৎকার করে বলল, “শালা যদি কোনও দিন বাইরে আসতে পারি, তোর এই বৈঠকবাজির হিসেব চুকিয়ে দেব। হেমেনের হুমকির চোটে নানু অসহায়ের মতো আমার দিকে ফিরে তাকাল। আমি হেসে ওর কাঁধে হাত রেখে একটু চাপ দিলাম। তারপর গাড়িতে উঠে বসলাম।

গ্রেফতার হওয়া বাকি চারজনের দু'জন হচ্ছে হেমেনের বহু দিনের সঙ্গী সমীর ও অজয়। অন্য দু'জন কাজিপাড়ার ছেলে। আমরা দমদম থানাকে জানিয়ে ওদের পাঁচজনকেই সোজা নিয়ে এলাম লালবাজার। এতদিন যে পাখি আমাদের এক কনস্টেবলকে খুন করে পালিয়ে পালিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল, সে এখন আমাদের খাঁচায়। কী করব ওকে? খেতে তো দিতেই হবে। কিন্তু কী হবে সেই খাবারের রঙ? সাদা না কালো? অপরাধীরা কালো কাজ করে, কিন্তু কালো রঙের খাবার পছন্দ করে না। কিন্তু সেটা না খাওয়ালে তারা পুলিশকে ভয় পাবে কেন? অপরাধ করার আগে চিন্তাই বা করবে কেন? বিশেষ করে যাঁরা পেশাদার, তারা পুলিশের খাদ্য ছাড়া অন্য কিছুকেই ভয় পায় না। সুতরাং কালো রুনুর কালো রঙের খাদ্য ওদের পেট ভর্তি করে খেতে হল।

হেমনের বিরুদ্ধ বহু মামলা ছিল। **তরধে অধ** পরশুরম রাই হত্যার মামলা। কলকাতার নগর দায়রা বিচারালয়ে সেই মামলা শুরু হল।

আমাদের হয়ে মামলার তদন্তকারী অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হল অফিসার নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার। হেমেন প্রেসিডেন্সি জেলে ঢুকে গেল। জেলের মধ্যেও সে বিভিন্ন কয়েদিকে মারধোর করে নিজের দাপট কায়েম রাখল। হেমেনের মস্তানির দর্শন হল, 'গুণ্ডা হবে সেই-ই, তাকে যেখানে ফেলবে, সেখানে বাজবে। সে কি শুধু নিজের গলিতে নাচবে?'

যে আকর্ষণের শক্তিতে তার কিশোর মন গুণ্ডাগিরিকেই জীবনের আদর্শ লক্ষ্য করে নিয়েছিল, তাতে সে তার মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছিল। সে ব্যাপারে সে কোনও দিন পিছিয়ে পড়েনি। তাই জেলখানাতেই বা সে অন্যান্য আসামীদের থেকে পিছিয়ে পড়বে কেন? তার চিন্তা ছিল, পিছিয়ে পড়া মানেই ‘হেমেন মণ্ডল' নামের ‘মিথের' ওপর আঘাত। তাই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েও সে মারপিট করত।

এদিকে কলকাতা নগর ও দায়রা বিচারালয় তাকে চুয়াত্তর সালে, পরশুরাম রাই খুনের মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল। হেমেন বিচারাধীন আসামীর বদলে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি হয়ে গেল।

পশ্চিমবাংলার জেলগুলোতে তখন নকশালপন্থী বন্দী উপচে পড়ছে। আর প্রেসিডেন্সি জেলে রয়েছে কলকাতায় ধৃত কয়েক'শ নকশাল। তাদের বহুজনের সঙ্গেই হেমেনের পূর্ব পরিচয় ছিল আর জেলে থাকতে থাকতে সে পরিচয় গাঢ় হল। এবং বন্ধুত্ব দৃঢ় হল।

হেমেন ঠিক করল সে প্রাইভেটে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফর্ম ভর্তি করল। যথাসময়ে অ্যাডমিট কার্ড এল। এবার হেমেন পরীক্ষায় বসবে। জেলখানার ভেতর পরীক্ষাগুলোর কেন্দ্র হয় ওয়েলফেয়ার অফিসারের অফিস এবং ওয়েলফেয়ার অফিসারই হন পরীক্ষার পরিদর্শক। নির্দিষ্ট দিনে সকালবেলা বন্ধ খামে ভরে প্রশ্নপত্র ও খাতা পর্ষদ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক নিয়ে আসেন। সেগুলো তারা ওয়েলফেয়ার অফিসারের জিম্মায় দিয়ে চলে, যান এবং পরীক্ষা শেষে আবার নিয়ে যান।

হেমেন পরীক্ষায় বসবে। তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা হল প্রশ্নপত্র ও খাতা এল। হেমেন পরীক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু লিখছে কে? উত্তরই বা দিচ্ছে কে? হেমেনই কি? না। উত্তর দিচ্ছে এবং খাতায় সেই উত্তর লিখছে নকশাল নেতা অধ্যাপক নিশীথ ভট্টাচার্য, আজিজুল হক ও মুকুল সর্বাধিকারী। সেই পরীক্ষায় হেমেন সসম্মানে উত্তীর্ণ হল।

প্রেসিডেন্সি জেলের কর্তৃপক্ষ হেমেনকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু সেখানেও সে বেশি দিন রইল না। সে চলে গেল দমদম সেন্ট্রাল জেলে। সেখানেও সে

নিজের অস্তিত্ব দিন কয়েকের মধ্যেই কর্তৃপক্ষকে জানান দিল।

পঁচাত্তর সালের জুন মাসে কলকাতার উচ্চ ন্যায়ালয় হেমেনকে পরশুরাম রাই হত্যার অভিযোগে থেকে অব্যাহতি দিল। যাবজ্জীবন সাজা থেকে সে মুক্তি পেয়ে গেল।

আর তখনই শুরু হয়ে গেল অন্য খেলা। এবার খেলাটা চলল জেলের বাইরে। হেমেনকে কংগ্রেসের গোষ্ঠীরা নিজ নিজ উপদলে টানার চেষ্টায় মেতে গেল। যদিও হেমেন তখনও অন্যান্য বিচারাধীন মামলায় জেলখানায়, কিন্তু যাবজ্জীবন সাজা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তার দাম কংগ্রেসের উপদলীয় নেতাদের কাছে বেশ বেড়ে গেল।

তখন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস দুটি মূল গোষ্ঠীতে বিভক্ত। একদিকে শত ঘোষ, সোমেন মিত্র, গোবিন্দ নস্কর, বারিদবরণ, লক্ষ্মী বসুরা, অন্যদিকে অজিত পাঁজা, প্রণব মুখোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী। এই দুই গোষ্ঠীর অনুগতরা প্রতিদিনই নিজেদের মধ্যে কোথাও না কোথাও সংঘর্ষে লিপ্ত। এই গোষ্ঠীর একজন খুন হচ্ছে তো পরদিন অন্য গোষ্ঠীর লোক খুন হচ্ছে। এই গোষ্ঠী সংঘর্ষেই উত্তর কলকাতায় মারা গেল বাচ্চু, পুলক গঙ্গোপাধ্যায়, লাল্টু-খোকনরা।

ছোট লখিয়া ওলাই চণ্ডী বস্তিতে 'শহীদ' হয়ে যাওয়ার পর তার ছোট ভাই নেবুলাল সাউ তার ফলবিক্রির ব্যবসা তুলে দিয়ে তার দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বেলগাছিয়া অঞ্চলে ওয়াগন ব্রেকারদের নেতা হয়ে গেল। ওয়াগন ব্রেকিং হচ্ছে পেশা। সেই পেশায় জড়িত থাকলে কি 'দেশসেবক' হওয়া যায় না? বিশেষ করে 'শহীদ' পরিবারের ছেলে হয়ে! নিশ্চয়ই যায়! যেমন তার দাদারা দেশের সেবা করত। ঠিক তেমন ভাবে দেশ সেবার জন্য নেবুলালের প্রাণ অধীর হয়ে উঠল। সুতরাং শতবাবু তাকেও বুকে টেনে নিয়ে 'দেশপ্রেমিক' বানিয়ে দিল।

নেবুলালের দলের প্রধান সেনাপতি ছিল পাপ্পু। দলের অন্য সদস্যরা হল বিজয়, বাটা, কয়লা, কার্তিক, কাটা গুলে। এরা ওয়াগন লুঠ করা ছাড়াও রাত্রিবেলায় উল্টাডাঙায় লরি দাঁড় করিয়ে চাল, গম, চিনি লুঠ করত। দিনে এরা শতবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী নেবুলালের নেতৃত্বে কংগ্রেসের রাজনীতি করত আর রাতে লরি লুঠ করত।

নেবুলাল শতবাবুর লোক। অজিত পাঁজা পাল্টা একজনকে খুঁজছিলেন। তিনি সেটা পেলেন হেমেনের মধ্যে। হেমেনের মুক্তির সম্ভাবনা হতেই তিনি হেমেনের দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রস্তাব দিলেন, "হেমেনকে আমি ছাড়িয়ে আনছি, কিন্তু কথা দিতে হবে, হেমেন আমার হয়ে কাজ করবে।" হেমেনের দাদা রাজি হল। অজিতবাবু হেমেনকে বাকি মামলাগুলো থেকে জামিনে ছাড়িয়ে নিলেন। নেবুলালের পাল্টা হিসাবে অজিতবাবুর হেমেন আবার গৌরীবাড়িতে ফিরে এল।

এবার হেমেন শতবাবুর উপদলের বদলে অজিত পাঁজার উপদলের হয়ে কাজ করতে শুরু করল। কাজ আর কী? শতবাবুর প্রভাবকে খারিজ করে অজিতবাবুর প্রভাবকে প্রতিষ্ঠা করা। এই দাদার বদলে ওই দাদার রাজত্ব কায়েম করা। এই দাদার ছেলেদের উচ্ছেদ করে ওই দাদার ছেলেদের বসানো।

নকশাল আন্দোলনের পর ভাঙা হাট। দ্বিধাগ্রস্ত, কিছুটা শঙ্কিত যুবক সমাজ। শিক্ষাক্ষেত্রে চরম অরাজকতা। দুর্বল সরকার। সরকারের মন্ত্রীরা প্রতিদিন নিজেদের মধ্যে মল্লযুদ্ধে ব্যস্ত। একে অপরের শত্রু। অবাধ লুঠের সাংস্কৃতিক হাওয়া। অশিক্ষিত, বোধবুদ্ধিহীন, নিম্নস্তরের চিন্তায় অভ্যস্ত 'দাদারা' বিনাশ্রমে অল্প দিনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। তাদের কাছে গাড়ি, বাড়ি, ক্ষমতা, প্রতাপ। এই আবহাওয়ায় অল্পবয়সী যুবকরা কঠিন শ্রমের রাস্তায় হাঁটবে কেন? আর তাদের জন্য কোল তো পেতেই রেখেছে শতবাবু, অজিতবাবুর মতো দাদারা। তাদের মস্তান বানিয়ে নিজেদের দলের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য।

এই পরিস্থিতিতে উত্তর কলকাতার মস্তান হওয়ার জন্য 'উচ্চাকাঙ্ক্ষী' ছেলেরা

হেমেনকে পেয়ে তার সঙ্গে দলে দলে ভিড়ে গেল। হেমেনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই নেতা হওয়ার যে গুণগুলো ছিল, সেটা কাজে লাগিয়ে অজিতবাবু তার উপদলকে বেশ শক্তিশালী করে তুললেন। হেমেন ওই গোষ্ঠীর একচ্ছত্র যুবক নেতা, সে তখন উত্তর কলকাতার এক শ্রেণীর যুবকদের কাছে প্রায় 'আইডল'। হেমেন গৌরীবাড়ি সংলগ্ন নন্দনবাগানের বেশ্যালয় জোর করে তুলে দিল। সেখানে সে হরি সাহার হাটকে বিস্তৃত করে দেওয়ার জন্য ছোট ছোট 'চৌকি' বসাল। হাটবারের সেই চৌকির আয় তার নিজের হয়ে গেল।

গৌরীবাড়িতে একটা সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো প্রতি বছরেই হয়। ছোট আকারে। হেমেন সেখানে হস্তক্ষেপ করল। পুজোর আকারটা চোখে পড়ার মতো বড় হয়ে গেল। কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষ পত্রিকায় বিবৃতি দিলেন, "হেমেন জোর জুলুম করে জনসাধারণের থেকে চাঁদা আদায় করে গৌরীবাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজো করছে।"

ছিয়াত্তর সালে সেবারের জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সভাপতি ছিলেন অজিত পাঁজা। হেমেনকে আক্রমণ করলে তিনি কি চুপচাপ বসে থাকবেন? তিনি পুজোর মঞ্চেই নিয়ে এলেন সিদ্ধার্থ শংকর রায়, প্রণব মুখোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে। এবং হেমেনকে মঞ্চে তুলে সবার সামনে ঘোষণা করলেন, "হেমেন যদি জোর করে চাঁদা তোলে, তার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। আপনারা বলুন কার কার কাছ থেকে হেমেন জোর করে চাঁদা তুলেছে?"

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে কে কী বলবে? বিশেষ করে তিনি যখন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় ও দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সামনেই ওই রকম চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছেন। সবাই চুপ করে রইল। অজিতবাবু হেসে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন।

কিন্তু চুপ করে থাকলে তো আর গোষ্ঠী রাজনীতি করা চলে না। উপদলকেও শক্তিশালী করা যায় না। শতবাবুরা গোপনে খেলা শুরু করলেন। আর সেই খেলার ফলশ্রুতি হিসাবে হেমেন অল্প ক'দিন পরেই ছিয়াত্তরের ফেব্রুয়ারির তেইশ তারিখে মিসায় আটক হয়ে জেলে ঢুকে গেল। পরদিন দুপুরবেলা প্রেসিডেন্সি জেল ভেঙে চুয়াল্লিশ জন নকশাল পালাল। হেমেন সেই ঘটনার সময় জেল গেটের ভেতরের দিকটায় অন্য আসামীদের আটকে রাখল। এবং আহত জেল সিপাইদের দ্রুত জেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে সাহায্য করল। জরুরি অবস্থায় হেমেনের এই দুঃসাহসিক কাজ সরকারের নজর এড়াল না।

হেমেনকে আবার অজিত পাঁজা মিসার থেকে ছাড়িয়ে নিলেন। হেমেন তার কর্মক্ষেত্রে ফিরে এল। কলকাতায় মিসা আইনে ধৃত হওয়ার পর মুক্তি পেলে নিয়ম ছিল যে, প্রতি দু'সপ্তাহ অন্তর লালবাজারে হাজিরা দিতে মুক্তিপ্রাপ্ত আসামী বাধ্য। আর যদি পরপর দু'বার কোনও আসামী হাজিরা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে তার মুক্তির আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করবে। সেক্ষেত্রে আসামীর পক্ষে কোনও অজুহাতই মানা হবে না।

হেমেন অজিতবাবুর হয়ে 'বিশাল কর্মে' নিয়োজিত থাকায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরপর তিনবার লালবাজারে হাজিরা দিতে ব্যর্থ হল। স্বাভাবিকভাবে তার মুক্তির আদেশ বাতিল হয়ে গেল। আমি দুর্গাপূজার চতুর্থীর দিন তাকে গ্রেফতার করে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠিয়ে দিলাম।

কিন্তু তখনও আমাদের আশ্চর্য হওয়া বাকি ছিল। আমরা দেখলাম, দুই মন্ত্রী অজিত পাঁজা এবং সুব্রত মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিগত জামিনে সিদ্ধার্থবাবুর নির্দেশ নিয়ে পরদিনই অর্থাৎ পঞ্চমীর দিন হেমেনকে মিসা থেকে মুক্ত করে জেল থেকে বার করে স্বস্থানে নিয়ে গেল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মিসা আইনে ধৃত কোনও আসামীর মুক্তি হতে পারে, তা অজিতবাবুরা চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিলেন। এ রকম দৃষ্টান্ত পশ্চিমবাংলায় প্রথম ঘটল।

অবশ্য তারপরও অজিতবাবু নিজের করিশমা দেখিয়ে একই কায়দায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর অনুগত শাগরেদ সরোজ গঙ্গোপাধ্যায়কে মিসা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং এ সবই জরুরি অবস্থার মধ্যে।

জরুরি অবস্থার মধ্যেই কংগ্রেসের একচেটিয়া আধিপত্যের সময় উত্তর কলকাতার ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে একদিকে উল্টাডাঙার হরি, মুরারিপুকুরের চোর মানিক, হালদার পাড়ার সাহেব খোকন, বেলগাছিয়ায় নেবুলাল, গৌরীবাড়িতে হেমেন, আমহার্স্ট স্ট্রিটে কেষ্ট, কংগ্রেসী দাদাদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় একেবারে জুলুমরাজ তৈরি করে ফেলল। তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার দুঃসাহস কেউ দেখাত না।

পুলিশকে অবজ্ঞা করার যে প্রবণতা শিকড় গেড়ে বসেছে, তার গোড়াপত্তন তখনই হল। পুলিশকে কার্যত অচল করে তোলা হল। সমাজবিরোধী যে কোনও ধৃত ব্যক্তিকে কংগ্রেসের কোনও না কোনও দাদা থানায় এসে 'নিজের ছেলে' বলে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

সব নেতাদের কাছেই কোনও না কোনও জঙ্গী সেনাপতি ছিল। তার মধ্যে উত্তর ও মধ্য কলকাতায় সবচেয়ে দামি সেনাপতিই ছিল হেমেন। হেমেনকে নিজের কাছে রাখতে নেতাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল দারুণ। হেমেন সেটা জানত, এবং এটাও জানত, তার কাজের বিরোধিতা করার সাহস অন্তত কলকাতার কাপুরুষ কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে নেই। সে তাই নিজের ইচ্ছা মতো চলত।

এবং সেই ইচ্ছার কারণেই সে অজিতবাবুর ভাই সলিল পাঁজার বাড়ির সামনে কংগ্রেস নেতা প্রদ্যুৎ গুহর ঘাড়ে ক্ষুর চালাল। প্রদ্যুৎবাবু প্রাণে বেঁচে গেলেন, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে কোনও অভিযোগই পুলিশের কাছে তেমনভাবে করলেন না, এবং প্রতিকারও চাইলেন না। হেমেনের সাহস তাতে আরও বেড়ে গেল।

সাতাত্তর সালের সাধারণ নির্বাচন এসে গেল। সেই নির্বাচনে কেন্দ্রে ও রাজ্যে দু'জায়গাতেই কংগ্রেসের পরাজয় হল এবং তারা ক্ষমতা হারিয়ে চুপ করে গেল। বাধ্য হয়ে তাদের সেনাপতিরা কেউ কেউ এলাকা ছেড়ে পালাল। কেউ নতুন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর কাছে আত্মসমর্পণ করল।

হেমেন কিন্তু এলাকাও ছাড়ল না, নতুন ক্ষমতার কেন্দ্র, সি.পি.আই.(এম)-এর কাছে আত্মসমর্পণও করল না। উল্টে গৌরীবাড়ি অঞ্চলে কংগ্রেসের প্রভাব বজায় রাখল, এমন কি বামফ্রন্ট বাংলা বন্ধ ডাকলে, সর্বাত্মকভাবে সারা পশ্চিমবাংলায় বন্ধ সার্থক হলেও গৌরীবাড়িতে হতো না। গৌরীবাড়িতে হেমেন নিজের শক্তির বলে সব দোকানপাট খুলিয়ে রাখত। তাতে সে ক্রমে ক্রমে ওই এলাকায় সি.পি.আই.(এম)-এর এক নম্বর শত্রু রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলল। এবং শত্রুতার একটা চোরাস্রোত তার বিরুদ্ধে বইতেই লাগল।

ইতিমধ্যে হেমেনের দলের তাপস নামে একটা ছেলে কলকাতা পুলিশের গুলিতে মারা গেল। তার জন্য গৌরীবাড়ি অঞ্চল বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠল। এই ঘটনায় দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বেশ ক'টা সভা হল। কিন্তু সেই সভায় অজিতবাবু হাজির হতে অস্বীকার করলেন। হেমেন রেগে গেল। সে অজিতবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল। ছিন্ন হওয়ার পর, বহুরূপী রাজনৈতিক নেতাদের ঢঙে অজিতবাবু হেমেনের নামে যা ইচ্ছা তাই বলতে লাগলেন। তাতে হেমেন আরও চটে গেল, কারণ অজিতবাবুর জন্যই সে বহু অপকর্ম করতে বাধ্য হয়েছে।

কেন্দ্রে সরকারের পতন হতে উনআশি সালে আবার লোকসভা নির্বাচন অবধারিত ভাবে এগিয়ে এল। অজিতবাবু নির্বাচনে দাঁড়ালেন। তখন তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি নির্বাচনের ক'দিন আগে প্রচারের উদ্দেশ্যে মিছিল নিয়ে সকাল সাড়ে এগারোটার সময় বদ্রিনাথ টেম্পল স্ট্রিট দিয়ে যাচ্ছেন। হেমেন তখন তাঁর বিপরীত গোষ্ঠীর লোক। সে

মিছিলের উল্টোদিক থেকে অজিতবাবুর দিকে এগিয়ে এল।

অজিতবাবু হেমেনকে তাঁর সামনে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। হেমেনের দিকে তাকিয়ে একটু শুকনো হাসলেন। তারপর বললেন, "হেমেন, তোর সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। তুই চলে যা।" হেমেন অজিতবাবুর মুখের দিকে একবার তাকাল, তারপর তার বাঁ হাতটা অজিতবাবুর অণ্ডকোষের দিকে নিয়ে গেল। ধরল এবং জোরে চাপ দিল। অজিতবাবু "ও বাবাগো" বলে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা সবাই সেই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখল। কেউ হেমেনকে কোনও কথা বলার সাহস দেখাল না। হেমেন যেমনভাবে ধীর পায়ে এসেছিল, তার 'কাজ'সেরে, ঠিক তেমনভাবে ফিরে গেল। অজিতবাবুকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হল। সেখানে বসেই তিনি নির্বাচন লড়লেন এবং হেরে গেলেন।

এই ঘটনায় একটা মামলা শুরু হল, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে আইনজীবী অজিতবাবু সেই মামলায় সাক্ষ্য দিতে আদালতে এলেন না। ফলে মামলা খারিজ হয়ে গেল। হেমেন নিঃশব্দে তার ক্ষমতা গৌরীবাড়িতে কায়েম রাখল। এবং যুব কংগ্রেসের অন্যতম নেতা হয়ে কাজ চালাতে লাগল। সি আই (এম) শত চেষ্টাতেও তার মুঠির শক্তি আলগা করতে পারল না।

দেখতে দেখতে এসে গেল বিরাশি সালের বিধানসভার নির্বাচন। নির্বাচনে অজিতবাবু বটতলা কেন্দ্র থেকে দাঁড়ালেন। তাঁর দরকার হেমেনকে। তিনি লোক মারফৎ হেফেনকে খবর পাঠালেন দু'জনের মধ্যে একটা গোপন মিটিং করার জন্য। মিটিং হল। পার্ক হোটেলে। অজিতবাবু হেমেনের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেন। হেমেন কথা দিল তাঁর হয়ে নির্বাচনে কাজ করার।

সেই মিটিংয়ের ফল অচিরেই ফলল। নির্বাচনের দিন হেমেনের দলের জঙ্গী দাপটে বিরোধী আর.এস.পি-র প্রার্থী নিখিল দাশের 'কর্মীরা বুথ ছেড়ে পালাল। অজিত পাঁজা বটতলার বিধায়ক হয়ে গেলেন। যদিও পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় বামফ্রন্টই ফিরে এল। অজিতবাবু ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছতে পারলেন না। সাধারণ বিধায়ক হয়েই রইলেন।

ক্ষমতায় থাকতে থাকতে বামফ্রন্টও আস্তে আস্তে কংগ্রেসের ছেড়ে যাওয়া জুতো পরে একই পথে হাঁটতে শুরু করল। রাজনৈতিক কারণগুলোকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রশাসনিক দায়িত্বপূর্ণ পদে অযোগ্য লোককে বসাতে শুরু করল। পার্টির ছোট বড় নেতার স্বার্থ দেখতে গিয়ে পুলিশকে এক এক জায়গায় প্রায় নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে লাগল। সামগ্রিকভাবে দলীয় স্বার্থকে জনসাধারণের স্বার্থের ওপরে দেখা শুরু করল। বামফ্রন্টের শরিক বড় বড় পার্টিগুলো বিচার এবং বাছাই ছাড়াই সদস্য নিতে শুরু করল। আর এসব সদস্যরা জনসাধারণের সঙ্গে গলা উঁচিয়ে উদ্ধত ব্যবহার করতে শুরু করল। একই ঢঙে ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল পার্টি অফিসগুলো ও পার্টির দাদাদিদিরা। বাম চরিত্র হারিয়ে ডান চরিত্রের দিকেই তারা হাঁটতে লাগল।

নির্বাচনের ক'দিন পরে বটতলার সি.পি.আই.(এম)-এর ক'জন সদস্যের উস্কানির জন্য হেমেনের দলের ছেলেরা সি.পি.আই.(এম) -এর আঞ্চলিক কমিটির অফিসে ঢুকে অফিস তছনছ করে ভেঙে দিল। ওই ঘটনায় হেমেনকে গ্রেফতার করার জন্য আমাদের উত্তর কলকাতার পুলিশের শাখা, গোয়েন্দা বিভাগ ও হেড কোয়ার্টার থেকে হন্যে হয়ে তাকে খুঁজতে লাগল। হেমেনকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সে বেপাত্তা।

আমি তখন সিকিউরিটি কনট্রোল বিভাগে। আমি আমাদের দেশের কূট রাজনৈতিক চাপের শিকার হয়ে গোয়েন্দা দফতর থেকে ওই বিভাগে বদলি হয়ে গিয়েছি।

বদলি হওয়ার মুখে আমি সি.পি.আই.(এম) -এর সাধারণ সম্পাদক ও বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করলাম আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে পার্টির পশ্চিমবঙ্গের সদর দফতরে গিয়ে। আমার বদলির কারণগুলো অনুসন্ধানের জন্য। তাছাড়া আমার বিরুদ্ধে

যে সব ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে আমাকে গোয়েন্দা দফতর থেকে সিকিউরিটি কন্ট্রোল বিভাগে বদলি করার জন্য ভিত তৈরি করা হয়েছিল, তার বিবরণও আমি তাঁর কাছে দেওয়ার জন্য উন্মুখ।

তিনি নিজের হাতে লিকার চা বানিয়ে আমাকে দিলেন এবং নিজেও নিলেন। তারপর আমি সি.পি.আই.(এম) পার্টির নেতা হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সহ বেশ ক'জন নেতা ও কর্মীর চিঠি তাঁকে দেখালাম। সেই চিঠির লেখকদের মধ্যে ক'জন আমার সোর্সও ছিল। তিনি সব দেখে আমাকে বললেন, "কিছুদিন সিকিউরিটি কন্ট্রোলে থাকুন, আপনাকে আবার গোয়েন্দা দফতরেই ফেরত নিয়ে আসা হবে, ওখানে যে আপনাকে দরকার তা আমরা বুঝি।" আমি বুঝলাম, রাজনৈতিক চাপের কারণে অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও আমাকে বদলি করাটা ওঁদের কাছে জরুরি। যথারীতি আমি বদলি হয়ে গেলাম।

বদলি হওয়ার ক'মাস পরই সি.পি.আই.(এম) -এর বটতলার অফিসে হেমেনের দলের হাঙ্গামা। আমি হাঙ্গামার কোনও খবরই পাইনি। রাতে লালবাজারের কোয়ার্টারে ঘুমচ্ছি। রাত প্রায় একটা নাগাদ হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। পুলিশের জীবনে মধ্যরাতে টেলিফোন যে সুখবার্তা শোনাবে না, তা জানা। বরং ঘুমকে যে বিদায় জানাতে হবে, সেই সংবাদই বয়ে আনার সম্ভাবনা একশো ভাগ। সেটা জেনে, টেলিফোন না ধরে বিছানায় শুয়ে থাকা যায়। কিন্তু দায়িত্ব এড়িয়ে ছলের ওপর নির্ভর করলে যে নিজের কাছেই ছলনা করা হবে। সেটা মধ্যরাতের বিছানা ত্যাগের থেকেও আরও কষ্টদায়ক। সুতরাং বিছানা ছাড়লাম এবং ফোন ধরলাম। স্বয়ং কমিশনার সাহেব অন্যপ্রান্তে।

আমাকে জানালেন, আমাদের হেড কোয়ার্টারের ডিসি এস মুখোপাধ্যায় ফোর্স সমেত ওয়্যারলেস ভ্যান নিয়ে মানিকতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে তাঁর বিশেষ দরকার, আমি যেন এক্ষুণি সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি।

কমিশনার সাহেবের নির্দেশ। প্রায় মুহূর্তের মধ্যে বেশভূষা পাল্টে নিচে নেমে গাড়ি নিয়ে সোজা ছুটলাম মানিকতলার দিকে। গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছাড়া যে কমিশনার সাহেব নিজে এত রাতে আমাকে নির্দেশ দেননি, তা না বোঝার কোনও কারণই নেই।

পৌঁছে গেলাম মানিকতলার মোড়ে। দেখলাম; মুখোপাধ্যায় বেশ বড় একটা বাহিনী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁর সামনে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, "এসে গেছেন, ভাল হল।" জিজ্ঞেস করলাম, "কী জন্য ডেকেছেন স্যার, তা তো জানি না।" তিনি জানতে চাইলেন, "স্যার আপনাকে কিছু জানাননি?" বললাম, "না, শুধু আপনার সঙ্গে এখানে দেখা করতে বলেছেন।" মুখোপাধ্যায় বললেন, "আজ সন্ধেবেলায় হেমেন বটতলার সি.পি.আই.(এম) -এর অফিস ভেঙে, গুলি চালিয়ে চলে গেছে। ওকে আজ রাতের মধ্যেই ধরতে হবে। কিন্তু কোথাও পাচ্ছি না। না ধরলে আমাদের—।"

আমি যা বোঝার বুঝে গেছি। বললাম, "চলুন দেখি।"

আমি আমার গাড়িতেই মুখোপাধ্যায় সাহেবকে তুলে হেমেনের গৌরীবাড়ির বাড়ির দিকে চললাম। গাড়িতে যেতে যেতেই তিনি জানালেন, "ওর বাড়িতে আমরা গিয়েছিলাম। কিন্তু পাইনি।" বললাম, "চলুন না, গিয়ে দেখা যাক, কী করতে পারি।"

গৌরীবাড়ি লেনে হেমেনের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমি একা এগিয়ে গিয়ে ওর বাড়ির সদর দরজায় জোরে জোরে কড়া নাড়তে লাগলাম। বেশ খানিকক্ষণ কড়া নাড়ার পর ভেতর থেকে উত্তর এল, "কে?" মুকুন্দবাবুর পরিচিত গলা।

বললাম, "আমি, রুনুবাবু।"

তিনি দরজা খুলেই আমাকে দেখে বললেন, "এই নিয়ে তিনবার হল। আমি তো বলেই দিয়েছি, হেমেন নেই। আবার আপনাকে নিয়ে এল। তাছাড়া আমি জানি যে ঘটনার জন্য ওকে খুঁজছেন, তাতে হেমেন ছিল না।"

বললাম, "ঠিক আছে। না থাকলে তো ভালই। কিন্তু ওকে আজ আমাকে নিয়ে যেতেই

হবে। কোথায় আছে, সেটা বলুন।"

উনি আমার কথা শুনে চুপ করে গেলেন। কারণ উনি জানেন, আমি যখন এসেছি তখন ঠিক হেমেনকে নিয়ে যাব। আর ওকে বাঁচালে আমিই বাঁচাব, মারলে আমিই মারব। তাছাড়া অযথা টালবাহানা করে আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সংঘাতে গেলে যে হেমেনেরই আখেরে লোকসান, সেটাও তিনি জানেন।

তাই তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে বললেন, "আপনি যখন এসেছেন তখন তো বলতেই হবে ও কোথায় আছে, তবে দেখবেন- -।" প্রত্যেকের বাবা মার-ই এক আবেদন, "দেখবেন।" অর্থাৎ মারের ঝাপটা যেন অতিরিক্ত না হয়।

বললাম, "ঠিক আছে। এখন বলুন ওকে কোথায় পাব।"

মুকুন্দবাবু আমাকে বদ্রীনাথ টেম্পল স্ট্রিটের একটা বাড়ির ঠিকানা বলে বললেন, "ওই বাড়িটা ও ক'দিন আগে কিনেছে। এখন ওখানেই থাকে। প্রয়োজন ছাড়া এ বাড়িতে থাকে না। "

মুকুন্দবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, "আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন, চিন্তা করবেন না।" আমি চলে এলাম। মুকুন্দবাবু সদর দরজা বন্ধ করে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। আমি জানি, আমি নিশ্চিন্ত থাকতে বললেও তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবেন না। কোনও বাবা মা-ই পারেন না। ছেলে যত বড় অপরাধীই হোক, নিজেরা তাকে কু-সন্তান বলে চিহ্নিত করলেও, পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তাঁরা দুশ্চিন্তা করবেনই। কিন্তু আমাদের কী করার আছে? অপরাধে জড়িত হলে তাকে তো গ্রেফতার করতেই হবে। আমি গাড়িতে ফিরে এসে বদ্রীনাথ টেম্পল স্ট্রিটের দিকে চললাম।

নির্দিষ্ট রাস্তায় বাড়ি খুঁজতে শুরু করলাম। মাঝরাতে একটাও লোক নেই যে তার সাহায্যে ঠিকানাটা খুঁজে বার করব। প্রায় আধঘণ্টা খোঁজার পর অবশেষে হেমেনের আস্তানাটা খুঁজে পেলাম। বাড়িটা পুরনো। একটা দুর্গের মতো। চারদিকে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বাড়ির সামনে একটা বিশাল কাঠের দরজা। বাড়ির পেছন দিকে একটা বস্তি। পুবদিকে একটা কারখানা। কিসের কারখানা কে জানে? চারদিক নিঝুম।

আমি একাই সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। অনেকটা পেছনে প্রায় অন্ধকারে আমাদের বাহিনী দাঁড়িয়ে রইল। কাঠের বড় দরজায় বড় বড় লোহার কড়া লাগানো। আমি সেগুলো নাড়তে লাগলাম, আর হেমেনের নাম ধরে প্রায় চিৎকার করে ডাকতে শুরু করলাম। মিনিট তিনেক পর কড়কড় আওয়াজ করে দরজা খুলল, হেমেন নিজে। ওর পরনে একটা লুঙ্গি আর গেঞ্জি।

হেমেন আমাকে দেখেই বলল, "আপনি, এত রাতে!" আমি শুধু বললাম, "লুঙ্গিটা পাল্টে জামা প্যান্ট পরে আয়, আমার সঙ্গে লালবাজার যেতে হবে।"

হেমেন আমার কথায় একটু আশ্চর্য হল। জানতে চাইল, "কী করেছি, হঠাৎ—।" বললাম, "আজ সন্ধেয় বটতলার সি.পি.এম অফিসে হামলা করিসনি?"

হেমেন বলল, "বিশ্বাস করুন, আমি এর কিছুই জানি না। অথচ আমার নামেই ওরা বলে বেড়াচ্ছে।" বললাম, ওসব পরে শুনব, এখন চল।" হেমেন চুপ করে গেল। ও জানে আমরা ওকে নিয়েই যাব। হেমেন বাড়ির ভেতরে চলে গেল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে জামা প্যান্ট পাল্টে বেরিয়ে এল। আমরা হেমেনকে নিয়ে লালবাজারে ফিরে এলাম। মুখোপাধ্যায় সাহেবের হাতে হেমেনকে তুলে দিয়ে আমি আমার কোয়ার্টারে রাত আড়াইটা নাগাদ ফিরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। মনে মনে প্রার্থনা করলাম, 'আজ রাতে আবার যেন টেলিফোনটা না বেজে ওঠে!'

বিছানায় শুয়ে আমার একটি বিদেশি গল্প মনে পড়ল। গল্পটা প্রথম আমাকে বলেছিল আমারই এক বিশেষ বন্ধু। যেদিন সে গল্পটা বলেছিল, সেই দিনটাও আমার পরিষ্কার মনে

আছে।

তখন আমি গোয়েন্দা দফতরের বিশেষ কাজের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। সেই কাজের ভিত্তিতে আমাদের বাহিনীতে আমার নাম ছড়িয়ে গেছে। আমি দায়িত্ব পালন করে খুশি। যেদিন গল্পটা শুনলাম সেদিনই একটা বিশেষ কাজ মসৃণভাবে শেষ করে মনে মনে আনন্দিত। আমার চোখে মুখে সেই ভাবই ফুটে উঠেছিল। তাই দেখে আমার বন্ধুটি জিজ্ঞেস করেছিল, " কি রে তোকে যে আজ খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছে, কী ব্যাপার?" আমি বললাম, "কেন, যেমন থাকি, তেমনই তো আছি।"

মনে মনে যে আমি সেদিন বেশি পুলকিত, তা আমার মুখের ভঙ্গিমায় যে আর লুকনো নেই, ওর কথাতেই তা পরিষ্কার। তবু সেটা প্রকাশ না করে খানিকটা প্রতিবাদ করলাম। বন্ধুটি বলল, "না, আজ খানিকটা ব্যতিক্রম। নিশ্চয়ই কোনও বড় কাজ করেছিস।" ওর কাছে ধরা পড়ে গেছি। তাই আর মিথ্যা না বলে বলেই ফেললাম, "তা একটা করেছি।" তারপর সেদিনের আনন্দের পেছনের ঘটনার কথা বললাম।

বন্ধুটি সব শুনে আমায় বলল, "শোন, তোকে একটা গল্প বলি। তোর কাজে আসবে।" বললাম, "বল।"

বন্ধুটি বলল, "গল্পটা আমাদের দেশের গল্প নয়, খুব সম্ভবত ফরাসি কিংবা পারস্য উপকূলের কোনও এক দেশের।"

বললাম, "ঠিক আছে। শুরু কর।" বন্ধুটি গল্প বলা শুরু করল।

"একদিন খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে একটা রাস্তার হাড় বের করা বিড়াল সান্ত্রীদের দৃষ্টি এড়িয়ে এক রাজবাড়িতে ঢুকে পড়ল। রাজবাড়ির সামনে বিরাট বিরাট বাগান, তাদের ঘিরে এ মহল্লা, ও মহল্লা। চারদিকে সিপাই সান্ত্রী। তাদের হুংকার। বিড়াল এ রকম আয়োজন এর আগে দেখেনি। সে একটু ভ্যাবাচেকা খেয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল। ভয়ে, খিদেয় ওর গলা দিয়ে স্বরও তখন বের হচ্ছে না। কোথায় যাবে, কোনখানে গেলে ওর একটু খাবার মিলবে কিছুই বুঝতে পারছে না। বড় বড় দালানে, দালানের আশেপাশে চুপিসাড়ে শুধু খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা ফাঁকা দরজা দেখে সে দরজা দিয়ে একটা বিরাট ঘরে ঢুকে পড়ল।

ঘরটা রাজবাড়ির ভাঁড়ার। ভাঁড়ারের এদিক ওদিক ঘুরতেই সে টের পেল, বহু খাদ্য সেখানে মজুত। কারণ ভাঁড়ারের ভেতরে অসংখ্য ইঁদুরের গন্ধ সে ততক্ষণে পেয়ে গেছে। তাদের কিচিরমিচির আওয়াজ তার কানে মধুর গানের মতো লাগল। বিড়ালটা মনে মনে খুব খুশি হল। কারণ ইঁদুর ধরতে পারলেই তার খিদের জ্বালাটা খানিকটা মিটবে। সে ঘাপটি মেরে বসল। এবং একটা ইঁদুর ধরল। সে খুশিতে ইঁদুরটাকে মুখে করে ভাঁড়ারের বাইরে নিয়ে এসে রাজবাড়ির সদরের মূল রাস্তার ওপর কামড়ে কামড়ে খেতে শুরু করল। ইঁদুরের কাঁচা রক্ত, নাড়িভুঁড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাস্তার ওপর পড়তে লাগল। তাই দেখে রাজবাড়ির সান্ত্রী সিপাইরা হই হই করে লাঠি বন্দুক হাতে বিড়ালটাকে মারতে এগিয়ে এল। বিড়ালটা খাবার ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালানোর জন্য এদিক ওদিক তাকিয়ে সুযোগ খুঁজতে লাগল। কিন্তু চারদিক থেকেই ওকে ততক্ষণে সিপাইরা ঘিরে ফেলেছে।

ঠিক ওই সময় রাজা সপারিষদ হরিণ শিকার করে সদম্ভে ফিরছেন। তিনি দেখলেন, একটা বিড়ালকে তাঁর সান্ত্রী সিপাইরা খুন করতে উদ্যত হয়েছে। তিনি দ্রুত সান্ত্রীদের সামনে এসে জিজ্ঞেস করলেন, একে মারছ কেন? এর কী অপরাধ? সান্ত্রীরা জানাল, হুজুর, এর অপরাধ এ একটা ইঁদুর ধরে এনে এই রাজপথের ওপর খাচ্ছে। রাজপথ নোংরা করছে। তাই ওকে এখান থেকে বিদায় দিচ্ছি।

ওদের উত্তর শুনে রাজা একটু হাসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, বিড়ালটা কোথা থেকে ইঁদুরটা ধরে এনেছে? সান্ত্রীরা জানাল, হুজুর, ও ইঁদুরটা ধরেছে রাজবাড়ির ভাঁড়ার থেকে। রাজা আবার হাসলেন, বললেন, তার অর্থ ও আমার উপকারই করেছে। শুনেছি ভাঁড়ারে

ভীষণ ইঁদুরের উৎপাত হয়েছে। বহু খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করে দিচ্ছে।

সান্ত্রীরা সমস্বরে জানাল, হ্যাঁ। রাজা প্রশ্ন করলেন, তাহলে বিড়ালটাকে মারছ কেন? শোন, ওকে কেউ মারবে না। আর বাবুর্চিকে বলে দেবে, আমার হুকুম, বিড়ালটাকে যেন প্রতিদিন দুধ, মাছ, মাংস দেওয়া হয়। ও আজ থেকে আমাদের এখানেই থাকবে। ইঁদুর মারবে আর ঘুরে বেড়াবে। ওকে কেউ তাভাবে না।

রাজা হুকুম দিয়ে চলে গেলেন। বিড়ালের খুব আনন্দ হল। এমন সংবর্ধনা যে তার কপালে জুটবে সে স্বপ্নেও ভাবেনি। রাজা চলে গেলে সে আবার মহানন্দে ইঁদুরের মাংস খেতে শুরু করল।

সেদিন থেকে বিড়ালটা রাজবাড়িতে বাস করতে শুরু করল। সে রাজবাড়ির এক সদস্য হয়ে গেল। প্রতিদিন একটা করে ইঁদুর মারে। খায়। বাবুর্চির দেওয়া দুধ, মাছ, মাংস খেয়ে সে সারাদিন রাজবাড়ির মহলে মহলে ঘুরে বেড়ায়। ওর মন ফুর্তিতে ভরে থাকে। দেখতে দেখতে তার ভেঙে পড়া শরীরের শ্রী ফিরে গেল। তেল-চকচকে নাদুস নুদুস হয়ে গেল। তখন তাকে চেনাই দায়। সে রাজা রানীর প্রিয় পাত্র হয়ে উঠল। ইঁদুরের উৎপাত কমিয়ে আনল।

সেই বিড়ালের আর একটা বন্ধু বিড়াল ছিল। সে তখনও কোনও কাজও পায়নি বা কোনও নির্দিষ্ট বাড়িও পায়নি যে খাবারটা জুটে যাবে। সে তাই এখানে সেখানে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় আর যখন যা পায় তাই কুড়িয়ে খেয়ে কোনও মতে খিদে মেটায়।

রাজবিড়াল একদিন স্বাস্থ্যচর্চার জন্য প্রাতঃভ্রমণ করতে রাজবাড়ির এলাকা থেকে বেরিয়ে বাইরের রাস্তায় ঘুরছে। তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার পুরনো বন্ধুর। বন্ধুটি তো রাজবিড়ালকে চিনতেই পারছে না। কারণ ওর চেহারার এত পরিবর্তন হয়েছে। অবশেষে, বহু কষ্টে চেনার পর বন্ধুটি জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার, তোর চেহারার এত খোলতাই হল কী করে? রাজবিড়াল একবার হাসল, তারপর তার ভাগ্যের এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ঘটনার পূর্বাপর বৃত্তান্ত জানাল। বন্ধুটি শুনে বলল, ইস, আমি যদি এমন একটা কাজ পেতাম, তাহলে খুব ভাল হতো। এমনভাবে আর সারাদিন এঁটোকাঁটা ঘাঁটতে হতো না। দেখ না, আমার জন্য একটা এমন কাজ। কিংবা তোর সঙ্গে রাজবাড়িতেই একটা কাজ জুটিয়ে দে না, তাহলে দুজনে মিলে, ওখানে ইঁদুর মারার কাজ করতে পারব, গল্পগুজব করে আনন্দে দিন কাটিয়ে দেব।

বন্ধুর কথা শুনে রাজবিড়ালটা বলল, না রে, রাজবাড়িতে আর কাজ নেই। তবে আমি চেষ্টা করে দেখব অন্যখানে তোর একটা কাজ জোটে কি না। খবর পেলেই তোকে আমি খবর দেব। রাজবিড়াল রাজবাড়িতে চলে এল। বন্ধুটি আবার এঁটো ঘাঁটতে এ পাড়া ও পাড়ার বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরতে চলে গেল।

এই সাক্ষাতের কিছুদিন পর একদিন রাজবিড়াল রাজার পাশে বসে রাজার আদর খাচ্ছে। তাই দেখে রাজার এক মোসাহেব রাজাকে দুঃখ করে বলল, ইস, আমি যদি এমন একটা বিড়াল পেতাম, আমার খুব উপকার হতো। আমার ভাঁড়ারেও খুব ইঁদুরের উৎপাত হয়েছে, সব কিছু নষ্ট করে দিচ্ছে। কিন্তু ভাল বিড়াল পাচ্ছি না যে বাড়িতে রাখব।

মোসাহেবের দুঃখের কাহিনী শুনে রাজবিড়াল দিল এক ছুট। তারপর খুঁজে নিয়ে এল তার বন্ধু বিড়ালটাকে। এবং তাকে কাজে বহাল করে দিল মোসাহেবের বাড়িতে। বন্ধুটি মোসাহেবের ভাঁড়ারে ঢুকে পটাপট ইঁদুর ধরে খেতে লাগল। মোসাহেব ও তার গিন্নি বিড়ালটার কাজে খুব সন্তুষ্ট। তাকে দুধ, মাছ, মাংস দেয়। সে খায়। দেখতে দেখতে অল্পদিনের মধ্যেই তার চেহারাতেও জেল্লা ফুটে বার হল। দুই বন্ধু দুই বাড়িতে আনন্দেই দিন কাটাতে লাগল।

মাস তিনেক এভাবে চলার পর মোসাহেব গিন্নি বিড়ালটাকে খাবার দেওয়া বন্ধ করে দিল। দুধ, মাছ তো দূরের কথা, ভাত পর্যন্ত দেওয়া বন্ধ করে দিল। রসুইখানার কাছে

ভিড়তেই দিত না। বিড়ালটা আবার তার পূর্বের স্বাস্থ্যের দিকে ফিরে আসতে শুরু করল।

মোসাহেব একদিন মধ্যাহ্ন ভোজ সারতে বসার সময় গিন্নিকে জিজ্ঞেস করল, কি গো বিড়ালটাকে তো ক'দিন ধরে দেখছি না। আগে আমার পাশে বসে খেত। ক'দিন ধরে খাচ্ছেও না। ব্যাপার কী, কোথায় আছে? নাকি পালিয়ে গেল?

গিন্নি কর্তার প্রশ্ন শুনে খাবার পরিবেশন করতে করতে উদাস গলায় বলল, আছে কোথায়। ভাবছি, ওটাকে তাড়িয়ে দেব। গিন্নির উত্তর শুনে মোসাহেব বলল, সে কি, ওটাকে তাড়ালে ভাঁড়ারে আবার ইঁদুর অত্যাচার শুরু করবে না?

গিন্নি কর্তার আশংকার কথা শুনে মুচকি হেসে বলল, ভাঁড়ারে আর একটাও ইঁদুর থাকলে তো অত্যাচার করবে। তিন মাসেই বিড়ালটা সব খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। একটাও নেই। তাই ভাবছি, বেকার আর ওটাকে পুষে কী করব। শুধু শুধু দুধ মাছ ধ্বংস। এখন তাড়িয়ে দিলেই হয়। তোমার কী মত?

মোসাহেব গিন্নির যুক্তিতে প্রসন্ন হয়ে বলল, ভালই বলেছ। ইঁদুর যখন সব শেষ করে দিয়েছে তখন ওটাকে তাড়িয়েই দাও।

গিন্নি তারপর বিড়ালটাকে ঝাঁটা মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। বিড়ালটা মনের দুঃখে তার পুরনো অবস্থায় ফিরে এল। আবার এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে এঁটো ঘেঁটে ঘেঁটে খিদে মেটাতে লাগল। তার জেল্লা দিন দিন কমতে লাগল, আবার হাড় জিরজিরে রোগা হয়ে গেল।

রাজবিড়াল প্রতিদিন প্রাতঃভ্রমণে বার হয়। একদিন তার সঙ্গে বন্ধুর দেখা হয়ে গেল। তাকে দেখে তো রাজবিড়াল অবাক। তার শরীর এত রোগা হয়ে গেছে যে তাকে সে প্রথমে চিনতেই পারেনি। অবাকের পালা সাঙ্গ হলে সে বলল, এ কি চেহারা করেছিস, তোকে কি মোসাহেবের .. বাড়িতে খেতে দেয় না? বন্ধুটা ম্লান হেসে উত্তর দিল, না ভাই, তা নয়। আমাকে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে। রাজবিড়াল জিজ্ঞেস করল, সে কি? কেন? তুই কি ইঁদুর ধরতে পারিস নি?

বন্ধুটি বলল, না, না, ইঁদুর ধরে ধরে আমি তিন মাসের মধ্যে ওদের ভাঁড়ার একেবারে ইঁদুরশূন্য করে দিয়েছি, তাই দেখে গিন্নি একদিন কর্তাকে বলল, ভাঁড়ারে যখন আর ইঁদুর নেই তখন আর বিড়াল পুষবো কেন, তাড়িয়ে দিই। কর্তাও রাজি হল। তারপর গিন্নি আমাকে ঝাঁটা পিটিয়ে বিদায় দিয়ে দিল। আমিও চলে এলাম।

বন্ধুর কথা শুনে রাজবিড়ালটা একটু হাসল। বলল, আমারই ভুল হয়ে গেছে ভাই। আসলে তোর একটা নিশ্চিন্ত চাকরি যোগাড় করে সেখানে বহাল করার সময় আমি এত উত্তেজিত ছিলাম যে তখন তোকে আমি আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি।

বন্ধু জিজ্ঞেস করল, কি এমন আসল কথা যে আমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলি?

রাজবিড়াল বলল, তোকে আমার সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল যে, তুই সব ইঁদুর মারবি না। মাঝে মধ্যে দুই একটা মারবি। তাহলেই তোর চাকরিটা চিরদিনের জন্য থাকবে। সব ইঁদুর মরে গেলে তখন তোকে আর ওদের কিসের প্রয়োজন? আর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তোকে ওরা তাড়িয়ে দেবে। এই কথাটা বলে তোকে সাবধান করে দিইনি বলে, তুইও বুঝলি না। মোসাহেবের কাছে ভাল কাজ দেখানোর লোভে তুই তিন মাসের মধ্যে সব ইঁদুর মেরে সাফ করে দিলি। তাতে তোর চাকরিটা গেল। এই যে দেখ না আমাকে, কেমন বছর বছর রাজবাড়িতে বহাল তবিয়তে আছি। মাঝে মধ্যে দুই একটা ইঁদুর মেরে প্রকাশ্যে নিয়ে এসে সবাইকে কাজ দেখাই। আর দিব্যি দুধ, মাছ খেয়ে ঘুরে বেড়াই। রাজাও আদর করে, রানীও আদর করে। ওদিকে ইঁদুরও আছে, আমিও আছি। মনুষ্য জাতটা কী জানিস? ওদের কাজের সময় তুই কাজী আর কাজ ফুরোলে পাজী। এই কথাটা মনে রাখিস।”

আমাকে আমার বন্ধু এই বিদেশি গল্পটা বলে খুব সম্ভবত সাবধান করে দিয়েছিল। হয়তো সে ইঙ্গিতে আমাকে বলতে চেয়েছিল, সব অপরাধীকে একবারে ঘায়েল করিস না।

কিছু রেখে দে। তাহলে তোরও ওই রাজবিড়ালের মতো 'রাজার' কাছে মূল্য থাকবে। তাই যখনই দেখা হতো, বলত, "কি রে রুণু, বিড়ালের গল্পটা মনে আছে তো?" আমি হাসতাম। উত্তর দিতাম না। কারণ আমি জানি আমাকে কাজ করেই যেতে হবে, সে যে কোনও দফতরেই থাকি না কেন।

গল্পটা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না। পরদিন বেশ দেরিতে ঘুম ভাঙল। আমি যথারীতি কাজে বেরিয়ে পড়লাম। আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে খোঁজ নিলাম, হেমেন সত্যিই সি.পি.আই.(এম) অফিসে হামলার সময় ছিল কি না। খবর যা পেলাম, তাতে পরিষ্কার, হেমেন নিজে ওখানে ছিল না, তবে হেমেনের দলের ছেলেরা ছিল। তারাই হামলা করেছে। এ ব্যাপারে আর অগ্রসর হলাম না। আমার দায়িত্ব ছিল ধরার। মামলার দায়িত্বে অন্য অফিসার। আমি আমার কাজ করে দিয়েছি। বাকি কাজ অন্যদের।

এর কিছুদিন পর আবার আমি ফিরে এলাম গোয়েন্দা দফতরে। ডাকাতি দমন শাখায়। হেমেন ততদিনে বেরিয়ে গেছে জেল থেকে। ফিরে গেছে গৌরীবাড়ি। গৌরীবাড়ি এলাকায় বেশ দাপটেই ওর কাজ চলছে। সি.পি.আই.(এম)- এর কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে ওর দ্বন্দ্ব অব্যাহত।

এমনই একটা সময়ে এক রবিবার সকালে আমি আমার লালবাজার কোয়ার্টারে দুপুরবেলা আড্ডা মেরে ফিরছি। লালবাজার মূল গেটের সামনে আমাকে ধরলেন আমাদের কমিশনার নিরুপম সোম। তিনি বেশ উত্তেজিতভাবে আমাকে বললেন, "আপনি কোথায় ছিলেন, আমি কতক্ষণ ধরে আপনাকে খুঁজছি।"

রবিবার সকালে হঠাৎ এমন কী হল যে স্বয়ং কমিশনার সাহেব নিজে এসে আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছেন? বললাম, "কী এমন হল স্যার, আমাকে খুঁজছেন?"

তিনি যা বললেন, তার জন্য আমি একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি দাঁড়ি, কমা সব বাদ দিয়ে গড়গড়িয়ে বললেন, "সি.এম. আপনাকে তলব করেছেন। আমাকে বলেছেন নিয়ে যেতে। উনি আপনার জন্য রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বসে আছেন।"

একটা সাধারণ পুলিশ ইন্সপেক্টরকে মুখ্যমন্ত্রী খুঁজছেন, তাও আবার রবিবারে একেবারে নিজের চেম্বারে এসে তিনি বসে আছেন! ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে। যেতে তো হবেই। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত একটা সমস্যা আছে। যেটা আমি সোম সাহেবকেও জানাতে পারব না। আড্ডা মারার সময় একটু বিয়ার পান করেছিলাম। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাচ্ছি বলে সে নিশ্চয়ই পাকস্থলীতে চুপচাপ বসে থাকবে না। কণ্ঠনালী দিয়ে বেরিয়ে তার উপস্থিতি জানাবেই। আমি তাই সোম সাহেবকে বললাম, "মিনিট দশেক অপেক্ষা করা যাবে না? আমি একটু ফ্রেস হয়ে নিতাম।"

তিনি আমার কথা শুনে প্রায় আঁৎকে উঠে বললেন, "এক মিনিটও নয়, চলুন চলুন, আমার গাড়িতে উঠুন।" আমি আর কী করি? বললাম, "উঠছি স্যার, এক মিনিট।" তারপর প্রায় দৌড়ে লালবাজারের উল্টো দিকে পানের দোকানে গিয়ে তাড়াতাড়ি কিছুটা পান মশলা নিয়ে জোরে জোরে চিবিয়ে পিক ফেলতে লাগলাম। যাতে পান মশলার গন্ধে বিয়ারের সুগন্ধটা চাপা দেওয়া যায়।

ফিরে এসে উঠলাম কমিশনার সাহেবের গাড়িতে। গাড়ি ছুটল মহাকরণের দিকে। যেতে যেতে সোম সাহেব বিড়বিড় করতে লাগলেন, "ফাটা কেষ্টর জন্য দেবীবাবুকে সি.এম. -এর কাছে পি.কে.সেন সাহেব নিয়ে গিয়েছিলেন। এবার আপনাকে আমায় নিয়ে যেতে হচ্ছে।"

আমরা মহাকরণের চৌহদ্দিতে এসে ঢুকলাম। ছুটির দিন, ফাঁকা। আমরা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর চেম্বারের দিকে এগিয়ে গেলাম। সোম সাহেব আমাকে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব জয়কৃষ্ণ ঘোষের কাছে নিয়ে গেলেন। জয়কৃষ্ণবাবু আমাকে মুখ্যমন্ত্রীর অ্যান্টিচেম্বারে নিয়ে গিয়ে বললেন, "আপনি বসুন, আমি ওনাকে নিয়ে আসছি।" আমি বসলাম। কয়েক

মিনিটের মধ্যেই জ্যোতিবাবু অ্যান্টি চেম্বারে এলেন, পেছনে জয়কৃষ্ণবাবু। তিনি আমার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর জয়কৃষ্ণবাবু বাইরে চলে গেলেন। জ্যোতিবাবু তাঁর অ্যান্টিচেম্বারে আমাকে নিয়ে একা বসলেন। আমি উৎকণ্ঠিত। তিনি কেন ডেকেছেন তা জানার জন্য।

দাবড়িয়ে কথা বলার অভ্যাস আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর। তা আমি জানতাম৷ কায়দা হল প্রথমেই উত্তরদাতাকে ঘাবড়ে দিয়ে তাকে বশবর্তী করে ফেলা। আমি বসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হেডমাস্টারের ঢঙে আমার দিকে তীর ছুঁড়লেন, “আপনার সঙ্গে হেমেনের কী সম্পর্ক?”

এরকম অতি সাধারণ প্রশ্নের যে মুখোমুখি হব, তা আমি আন্দাজ করতে পারিনি। মুখ্যমন্ত্রীর মতো একজন প্রতাপশালী ব্যক্তি যে হেমেনের মতো একটা লোক সম্পর্কে খোঁজ নেবেন, তাও আবার একটা ইন্সপেক্টরের কাছে, তা আমার চিন্তার বাইরে ছিল। আমি এই প্রশ্নের কী উত্তর দেব?

বললাম, “স্যার, একজন অপরাধ জগতের লোকের সঙ্গে একটা পুলিশ ইন্সপেক্টরের যা সম্পর্ক থাকে, তাই।”

তিনি বললেন, “আমি শুনেছি, আপনার সঙ্গে ওর নাকি খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, আর তার জোরেই ও যা ইচ্ছা তাই করে বেড়ায়।”

উত্তর দিলাম, “ভুল। এগুলো সম্ভবত আপনার পার্টির ছেলেরা বলে বেড়ায়। হ্যাঁ, ও আমার অনেক কাজ করে দিয়েছে। যেমন ওর খবরের ভিত্তিতেই আমি হৃষীকেশ সমাদ্দারের মতো খুনীকে ধরেছি। ও নিজে প্রেসিডেন্সি জেল পলাতক কাঞ্চন দলুই ও অন্য একটা নকশাল ছেলেকে দমদম থেকে ধরে আমার হাতে দিয়ে গেছে। এ সব কাজগুলো করাতে ওর সঙ্গে একটা যোগাযোগ তো রাখতেই হয়, ওই পর্যন্তই। আর আপনি তো জানেন, এদের মতো লোকের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখলে অপরাধ জগতের খবরাখবর পাওয়া যায় না। তাই বাধ্য হয়েই ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রাখতে হয়। সেটা কেউ অন্য চোখে দেখলে আমাদের কিছু করার নেই।

জ্যোতিবাবু চুপ করে সব শুনলেন। তারপর বললেন, “আপনার স্ত্রী না কি ওকে ভাইফোঁটা দেয়?” এই প্রশ্নের কী উত্তর দেব? তাও আবার মুখ্যমন্ত্রীকে।

শুধু বললাম, “আমাকে কি খুব বোকা পুলিশ অফিসার মনে হয় স্যার?” তিনি কিছু বললেন না। আবার প্রশ্ন করলেন, “তবে বলছেন আপনার সঙ্গে ওর কোনও গোপন সম্পর্ক নেই?”

দৃঢ়ভাবেই বললাম, “না স্যার। যদি আপনি বলেন, তবে আজই আমি ওকে গ্রেফতার করে আনছি। আমিই ওকে সবচেয়ে বেশিবার গ্রেফতার করেছি। জেলে পুরেছি।”

তিনি বললেন, “তার আর দরকার হবে না। শুধু দেখবেন, এখন আমাকে যেনো শুনতে না হয় আপনার প্রশ্রয়ের জন্যই ও যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াচ্ছে।”

আমি এই কথার কী উত্তর দেব? ভাবলাম, আমার একার কি এত প্রতাপ যে আমার পরোক্ষ সমর্থনে একটা লোক কলকাতার বুকে বসে ‘যা ইচ্ছা তাই করে যেতে পারে? আর সমগ্র পুলিশ প্রশাসন তা চুপ করে বসে দেখছে?

আমি উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। জ্যোতিবাবু বললেন, -“ঠিক আছে, আপনি যান।” আমি অ্যাটেনশন করে মুখ্যমন্ত্রীর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে সোম সাহেব উদ্বিগ্নভাবে পায়চারি করে যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে দাঁড়ালেন। চোখে-মুখে কৌতূহল, মুখ্যমন্ত্রী কেন আমাকে ডেকেছেন সেটা জানার জন্য। আমি সোমসাহেবকে কিছু বললাম না। শুধু বললাম, “চলুন স্যার।”

সোম সাহেব অতি ভদ্র। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন না। প্রশ্ন করলে আমি নিশ্চয়ই বলতে বাধ্য ছিলাম যে কী ব্যাপারে জ্যোতিবাবু আমাকে ডেকেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি জেনেছিলেন কেন আমার জরুরি ডাক পড়েছিল।

জ্যোতিবাবুকে আমার একটা কথা বলার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বলতে পারলাম না। ইচ্ছে ছিল বলি যে, আপনার পার্টির কিছু লোক আছে, যারা কোনও একটা কথা শুনলে সেটাই চোখ কান বুজে বিশ্বাস করে। সময়ের পরিবর্তন কিংবা সমাজের প্রয়োজনের কথা তারা বাস্তবের আবহাওয়ায় পরীক্ষা করে দেখে না। অন্ধের মতো একই দিশায় ছোটে। যেমন তারা বোঝে না, একটা অপরাধীকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার দায়িত্বও একটা পুলিশ অফিসারের কাজের মধ্যে বর্তায়। উপরের কাঠামো দেখে যারা বস্তুর বিচার করে, তারা আর যাই হোক, বাস্তববাদী নয়। হেমেনকে যেমন আমিই সব চেয়ে বেশি ওষুধ দিয়েছি, ঠিক তেমনি আমাকেই নিতে হয়েছে তাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব।

সেই প্রক্রিয়ার ফল ফলতে শুরু করেছিল। হেমেন সব কিছু ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের হয়ে কাজ শুরু করল। ময়দা কল, কাঠ কল, উত্তর কলকাতার সিনেমা ও থিয়েটার হলের অনেকগুলো শ্রমিক সংগঠন ওর হাতে চলে এল। তাতে সি.পি.আই. (এম) -এর লোকেরা ওর ওপর ক্ষেপে গিয়ে ওর বিরুদ্ধে গোপনে চক্রান্ত শুরু করল।

চুরাশি সালের তেইশে জানুয়ারি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষে ওর তৈরি মঞ্চের অনুষ্ঠানে অজিত পাঁজা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে হেমেনকে বড় দেশপ্রেমিকের সঙ্গে তুলনা করে প্রশংসা করে গেলেন !

তার দু'দিন পর ছাব্বিশে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে গৌরীবাড়ি শান্তি কমিটির নামে বামপন্থী পার্টির কিছু সমর্থক ও কর্মীরা এবং কিছু পুরনো নকশাল সমর্থক এক সঙ্গে মিলে গৌরীবাড়িতে মিছিল করে হেমেনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল। হেমেনকে এলাকা থেকে বহিষ্কার করার দাবি জানাল। হেমেন কোনও সংঘর্ষে গেল না। রাত ন'টার সময় গৌরীবাড়ি লেনেই তাকে গ্রেফতার করা হল।

গ্রেফতার করে ওকে লালবাজারের সেন্ট্রাল লক আপে নিয়ে আসা হল। সেন্ট্রাল লক আপেই ওর সঙ্গে দেখা করতে এলেন কংগ্রেসের নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চার মাস পর হেমেন যেদিন প্রেসিডেন্সি জেল থেকে ছাড়া পেল, ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন শত ঘোষ ও সুনীতি চট্টরাজ। কংগ্রেসের গোষ্ঠীপতিরা ওকে নিজেদের গোষ্ঠীতে নিয়ে আসার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করল।

মুক্তির পর হেমেন আমার সঙ্গে দেখা করতে লালবাজারে এল। আমি বললাম, "শোন, তুই আর গৌরীবাড়ি যাস না। কি হবে ঝামেলা বাড়িয়ে। অন্যখানে থাক। এখন তোর দুটো ছেলে হয়েছে। স্ত্রী আছে। ওদের নিয়ে শান্তিতে অন্যখানে গিয়ে বাস কর।"

হেমেন আমার কথা রেখেছে। সে তারপর স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে শহরতলিতে গিয়ে বাস করতে শুরু করল। গৌরীবাড়িতে রইল ওর বাবা মা ও পরিবারের অন্য লোকেরা।

এখন ওর ছেলে দুটোই বড় হয়ে গেছে। তাদের নিয়ে সে সুখেই দিন যাপন করে। গৌরীবাড়িতে আসে। তবে 'শান্তি কমিটি'র নেতারা সেটা ভালভাবে মেনে নেয় না। যে শান্তি কমিটি চুরাশি সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি ঘটনার দু'মাস আগে হেমেনকেই সভাপতি করে সুবোধ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা ওর বিরুদ্ধেই অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে লাগল। যদিও নেবুলাল সাউ ও তার সঙ্গীদের 'শান্তি কমিটি' তাদের অপরাধের জন্য মার্জনা করে দিয়ে বুকে টেনে নিয়েছে।

হেমেনকে নিয়ে রাজনীতি করাটাই ওদের নেতা থাকার মূল বিষয়বস্তু। তাই নিজেদের অস্তিত্ব রাখার জন্যই তারা 'হেমেন, হেমেন' চিৎকারটা ছাড়বে না। হেমেন ওদের 'বিপ্লবের' এক নম্বর শত্রু!

# বেলঘড়িয়ার হাতকাটা আশিষ

আমাদের সমাজের গর্ভের মধ্যেই নিহিত আছে সমস্ত রকম সমাজবিরোধী তৈরী করার আঁতুড়ঘর। সেই আঁতুড়ঘরেই তারা লালিত এবং পালিত হয়ে একসময় দুর্ধর্ষ দুষ্কৃতী হয়ে ওঠে। সেই দুষ্কৃতীর কর্মকাণ্ড দেখে তখন সমাজের ঘুম ভাঙে, গুরুজনদের চোখ কপালে ওঠে, তার আগে নয়।

বিংশ শতাব্দী শেষ নিঃশ্বাস ফেলছে। আমরা একবিংশ শতাব্দীর দিকে এক পা এগিয়ে দিয়েছি। শতাব্দীর এই গমন ও আগমনের মুহূর্তে আমরা পেছন ফিরে আশ্চর্য হয়ে দেখছি কী? যে শতাব্দী শুরু হয়েছিল দেশ স্বাধীন করে ও নতুন করে গড়ার স্বপ্ন দেখে, যেখানে মহান মনীষীরা ছিলেন সেই স্বপ্ন সফল করার নেতৃত্বে, সেই শতাব্দী শেষ হচ্ছে তাঁদের সেই স্বপ্নকে সমস্ত প্রক্রিয়ায় ধূলিসাৎ করার ক্লান্তিহীন ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে।

দর্শন ও মতাদর্শকে সামনে রেখে যারা বুক চিতিয়ে দেশকে নেতৃত্ব দেবে, যাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের যুবশক্তি চোখ খুলবে, তারাই এখন আমাদের দেশে গুণ্ডা, বদমাইশ, খুনী, ডাকাত বানানোর কারখানা খুলে বসেছে। দুষ্কৃতী বানানোর কারখানা পরিচালনায় কে এগিয়ে কে পিছিয়ে সেই কথা নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে দক্ষ।

প্রশ্ন উঠেছে, যারা দুষ্কৃতী বানায়, তারা কি দুষ্কৃতী নয়? অবশ্যই, এ ব্যাপারে একটাই ইতিবাচক উত্তর। কিন্তু পর্দার আড়ালে থাকা এই সব দুষ্কৃতীদের কিছুই করা যায় না। কারণ তারাই দেশের বড় বড় সব 'সভা' আলো করে বসে থাকে। আর মরে সেই সব কাঠবিড়ালীরা, যারা তাদের 'সভায়' যাওয়ার জন্য সেতু তৈরী করেছিল। কত হাজার হাজার এরকম কাঠবিড়ালী যে অকালে চলে গেছে তার হিসাব কে রাখে? তাদের বানানো চূড়ায় বসে যারা সমাজকে সারাদিন চোখ রাঙায়, তারা রাখে কি? না, তারাও রাখে না। প্রয়োজনবোধ করে না।

এমনই এক কাঠবিড়ালী ছিল বেলঘড়িয়ার ঠাকুরবাড়ি সরণির কাছে ঘোলা রোডের দেবেন্দ্রলাল রায়ের পঞ্চম সন্তান আশিষ। সত্তর দশকের শেষ থেকে অষ্টআশি সাল পর্যন্ত আশিষকে চিনত না এমন লোক বেলঘড়িয়া ও তার আশেপাশে ছিলেন না। কিন্তু কীভাবে সে এল অন্ধকার জগতের পাদপ্রদীপের আলোয়?

বিনোদলাল রায় ওরফে দেবেন্দ্রবাবুর বিরাট পরিবার। তার নিজেরই দশ দশটি ছেলেমেয়ে। এই বিরাট পরিবার সামলাতে স্বাভাবিকভাবেই তাকে হিমসিম খেতে হতো এবং প্রতিটি সন্তানকে সমানভাবে গড়ে তোলার জন্য যে দৃষ্টি দেওয়ার সময় ও অর্থ দরকার, তা তাঁর কাছে ছিল না।

আশিষ বেলঘড়িয়ার বাসুদেবপুরের পল্লী হিতসাধন উচ্চবিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ত। ফেল করল। অন্য স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য বাবার থেকে টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল রাঁচি। এই শুরু, এবং সুস্থ জীবনের ধারায় ইতি। সেটা পঁচাত্তর সালের ঘটনা। কিন্তু রাঁচিতে বেশি দিন থাকতে পারল না। পুঁজি ফুরিয়ে যেতে সে ফিরে এল এবং মোহিনী মিলের কোয়ার্টারে এক বন্ধুর বাড়িতে থাকতে লাগল। সেটাও বেশিদিন টিকল না। এসব বেশিদিন টিকতেও পারে না। চৌদ্দ পনেরো বছরের বেকার বন্ধুর বাবার রোজগারে ভাগ বসিয়ে কতদিন চলবে? বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরে এল। ভর্তি হল কলেজ স্ট্রিট শাখার ভবানীপুর টিউটোরিয়াল হোমে। কিন্তু খাঁচা ছাড়া যে পাখি একবার নিজের মত ঘুরে বেড়িয়ে ফূর্তি করার স্বাদ পেয়েছে, সে কি আর শৃঙ্খলার মধ্যে- ফিরে আসতে পারে?

যথারীতি আশিষ এবারও পড়াশুনা ছেড়ে দিল। নাম লেখাল সাট্টার বুকি ভবানীর দলে। এবং তার দলের হয়েই সে শুরু করল সাটার প্যাড লেখা। সাট্টাটা খেলা হয় খেলার আগে এই প্যাডের নম্বর লেখানোর ওপর। যাদের নম্বর খেলার পর মিলে যায়, তারা যে টাকা ওই নম্বরের উপর বাজি ধরেছিল তার ন'গুণ টাকা পায় ওই প্যাড লেখকদের মারফৎ,

আর যাদের নম্বর মেলে না তাদের কোনও টাকা পাওয়ার প্রশ্নই নেই। সাট্টা একটা বিচিত্র ধরনের জুয়া। মুম্বাই থেকে আমদানী হয়েছিল। সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। এই খেলা হয় খুবই গোপন আস্তানায়। মালিক শূন্য থেকে নয়ের মধ্যে যে কোনও তিনটে নম্বর বলে। আর সেই তিনটে নম্বরের যোগফল একটা নম্বরে এলে সেটাই হল শেষ ফল। এই শেষ ফলে বাজি ধরলেই জিৎ, নয়ত নয়। তাছাড়া যে তিনটে নম্বর মালিক বলবে, তার ওপরও বাজি ধরা যায়। এবং সেটা মিলে গেলে একশ ভাগ বেশি অংক জুয়াড়ি পাবে। এইরকম আরও নম্বরের ওপর খেলা আছে। প্রত্যেক মালিক দিনে দু'বার খেলায়। সাট্টার ওপর আবার সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। "সোনার খাঁচা", "সোনার পাখি" ইত্যাদি সেই সব পত্রিকার নাম। এই সব পত্রিকায় পুরনো দিনের ফল ও পরবর্তী খেলার ভবিষ্যৎবাণী থাকে। জুয়াড়িরা ওই পত্রিকা কিনে গপগপ করে গেলে। এর সবটাই যে ফালতু, তা একবারও তাদের মাথায় আসে না। "সোনার খাঁচার" সম্পাদক ছিল "অধ্যাপক" কমল চক্রবর্তী। এই "অধ্যাপকের" বিদ্যার দৌড় ছিল ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত। কিন্তু পাইকপাড়ার বাসিন্দা এই কমল সাট্টার "অধ্যাপনা" করে বহু টাকা রোজগার করে নিয়েছিল। সে বিভিন্ন জুয়াড়িদের চায়ের, আড্ডায় কিংবা গোপন স্থানে নিয়ে যেত। সেখানে সে সেই সব নম্বরপ্রার্থীদের অতি সন্তর্পণে কানে কানে ফিসফিসিয়ে খেলার নম্বর বলত। চুক্তি থাকত, নম্বর মিললে বাজি জেতার অর্ধেক টাকা তাকে দিতে হবে। আবার অনেক সময় সম্ভাব্য নম্বর জানানোর সময়ই সে জুয়াড়িদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে নিত। তার দেওয়া নম্বর অনেক সময় মিলে যেত। সবটাই কাকতালীয়। আবার অনেক সময় মিলত না। না মিললে ওর খদ্দেররা যদি প্রশ্ন করত, 'কেন মিলল না?" কমল নির্বিকার ভাবে একটু হেসে উত্তর দিত, "গট আপ হয়ে গেছে, খামে অনেক লোড হয়ে গেছে।" সাট্টার নম্বরকে ওরা বলে "খাম'। কিন্তু বেশিদিন কমল এই 'খামের' খেলা খেলতে পারেনি। তার চালাকি ধরা পড়ে যায়। তার ফানুস চুপসে গিয়ে আবার সে মূষিকে পরিণত হয়।

এই সাটার চক্রে ঢুকে পড়ল আশিষ। প্যাড লেখার জন্য যে তিন শতাংশ টাকা পেত তাও খুব কম নয়। সেই টাকা উড়িয়ে সে তার মতো করে ফুর্তি কিনে বেড়াচ্ছিল। আর সমাজের কালো দিকের সরু সরু গলিগুলো চিনে নিচ্ছিল।

কিন্তু সাতাত্তরের সতেরোই মে'র একটা ঘটনায় তার চক্র অন্য দিকে চলতে শুরু করল। অশোক ওরফে চন্দন ছিল ওর ছোট ভাই। বেলঘড়িয়ার যতীন দাস বিদ্যামন্দিরে পড়ত। তার বন্ধু ছিল নির্মল পাল। দুজনে একই মেয়েকে ভালবাসত। এ জন্য দুজনের মধ্যে রেষারেষি ছিল। মেয়েটা কিন্তু ওদের কাউকে পাত্তা দিত না। ফলে দুজনেই ভাবত, ওকে পাত্তা দিচ্ছে না প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য। ভেতরে ভেতরে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল। ক্ষিপ্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটল ওইদিন। নির্মল অশোককে আমন্ত্রণ জানাল তার বাড়িতে 'মানসিক পূজার' প্রসাদ খেতে।

সেদিন সন্ধের পর অশোক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল নির্মলদের বাড়ি। নির্মল ওর আরও ক'জন বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তারা সবাই মিলে খুশি মতো গল্পগুজব করতে লাগল। কিশোর বয়সের উচ্ছ্বসিত আড্ডা, যে আড্ডায় থাকে না কোনও পরিকল্পিত বিষয়। যে কোনও বিষয় দিয়ে শুরু, তারপর একের পর এক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। যেখানে সবাই শ্রোতা, আবার সবাই বক্তা।

কিন্তু নির্মলের পরিকল্পনা ছিল অন্য। সে মাঝেমাঝেই দল থেকে ছিটকে যাচ্ছিল, আবার কিছুক্ষণ পর ফিরে আসছিল। এদিকে পুজো শেষ। প্রসাদ এল। সবাই খেল। রাত তখন দশটা। অশোক নির্মলকে বলল, "এবার বাড়ি যাই। নয়ত বাবা বকবে।" নির্মল বলল, "দূর, দাঁড়া না, যাবি ৷ চল আমাদের গাছের ডাব খাই।" অশোক বলল, "না, না, এত রাতে আর ডাব খাওয়ার দরকার নেই।" নির্মল বলল, "আরে চল আমাদের ছাদে যাই।" ছাদ থেকে হাত বাড়ালেই ডাব, নির্মল অশোককে প্রায় জোর করে তার তিন তলার ছাদে নিয়ে

গেল। খোলা ছাদ, ছাদে কোনও রেলিং নেই। ছাদের পাশ দিয়েই উঠে গেছে একটা নারকেল গাছ। হ্যাঁ, সত্যিই সেই গাছে ঝুলছে কিছু ডাব। নির্মল সেইদিকে অশোককে নিয়ে এগিয়ে গেল। ওরা গাছটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এবং মুহূর্তের মধ্যে নির্মল তার পরিকল্পিত কাজটা সেরে ফেলল, যার জন্য অশোক বিন্দুমাত্র সতর্ক ছিল না।

নির্মল অশোককে পেছন থেকে মারল এক ধাক্কা। অশোক টাল সামলাতে পারল না। খোলা ছাদ থেকে ভাসতে ভাসতে পড়ে গেল নিচে। ধুপ করে একটা আওয়াজ। অশোকের কোনও চৈতন্য নেই। গলগল করে রক্ত বার হচ্ছে নাক আর মুখ দিয়ে। নির্মল ছুটে নিচে নেমে এল। একতলায় বাড়ির অন্য যারা ছিল, তারাও নির্মলের চিৎকারে নারকেল গাছটার তলায় ছুটতে ছুটতে এল। অশোককে ওখানে ওইভাবে পড়ে থাকতে দেখে সবাই অবাক। নির্মল চিৎকার করে বলে চলেছে, “চন্দটা ডাব পাড়তে গিয়ে পড়ে গেছে।” সবাই মিলে অশোককে তুলে নিয়ে এল একতলার বারান্দায়। তারপর আর জি কর হাসপাতালে। রাত একটা নাগাদ অশোকদের বাড়িতে খবর গেল, “অশোক নির্মলদের বাড়িতে ডাব পাড়তে গিয়ে পড়ে গেছে, ওকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।'

ওই ভর্তিতে কোনও কাজই হল না। নির্মলের উদ্দেশ্যই সফল হল। দুদিন পর উনিশে মে অশোক হাসপাতালে মারা গেল। নির্মলের পথ পরিষ্কার। তার প্রতিদ্বন্দ্বী চলে গেছে। মেয়েটা এখন তার। সরল হিসেব।

কিন্তু এই সরল হিসেবটা আশিষের মাথায় ঢুকল না। সে এই সরলতার মধ্যে দেখতে পেল এক গূঢ় পরিকল্পিত চক্রান্ত। সে তাই মাঝে মধ্যে নির্মলদের বাড়িতে গিয়ে সোজা সেই ন্যাড়া ছাদে উঠত আর ছাদ থেকে নারকেল গাছের দূরত্ব মাপত। সে দেখতে চাইত সত্যিই একটা ডানপিটে ছেলে ছাদ থেকে নারকেল গাছে উঠতে গিয়ে পড়ে যেতে পারে কি পারে না। এবং দূরত্ব দেখে বুঝতে চাইত সে যতই ডানপিটে হোক না কেন, যুক্তিহীন হিসাবে সেটা ধরার সাহস করবে না। কোনটা সত্যি সেটা হাতে কলমে দেখার জন্য বারবার সেখানে আশিষ যেত।

ছাদ থেকে গাছের দূরত্ব দেখে আশিষের মনে দৃঢ় ধারণা হল যে তার ভাই কিছুতেই সেই রাতে অন্ধকারে ছাদ থেকে নারকেল গাছ ধরার জন্য ঝাঁপ দেয়নি। তার ভাই পাগল ছিল না। মাধ্যমিক পরীক্ষার ছাত্র ছিল। ছাদ থেকে গাছটা যে সে ধরতে পারবে না, তা এক ঝলক দেখেই বোঝার ক্ষমতা যে কোনও পাগলেরও হবে। তার অর্থ একটাই দাঁড়ায়, তার ভাইকে নির্মল ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। সিদ্ধান্তে আসার পর আশিষ ঠিক করল এর প্রতিশোধ সে নেবে।

কিন্তু কী ভাবে? সাটার প্যাড লিখে তো আর খুনের প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না, সেটা নিতে গেলে তাকেও কোনও না কোনও অস্ত্রের ওপর নির্ভর করতে হবে। কোথায় সেই অস্ত্র?

সে সাটার প্যাড লিখতে লিখতেই আস্তে আস্তে হয়ে উঠল বেলঘড়িয়া অঞ্চলের আর এক সমাজবিরোধীদের 'দাদা' লক্ষ্মণ পাইনের ‘ভাই”। ‘দাদার’ হয়ে ‘ভাই’ বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ শুরু করল। “দাদার' ভাইদের দঙ্গলে আশিষ সদস্য হওয়ার পর সে বোমা, পটকা, রিভলবার, পাইপগানের সঙ্গে পরিচিত হতে লাগল। ক্রমে সেগুলোই তার আদর্শ হয়ে উঠল। আদর্শ দুষ্কৃতী তৈরী হওয়ার সব লক্ষণ ওর চলাফেরায়, কথাবার্তায় ফুটে উঠতে থাকল। সে নিজের সঙ্গে রাখতে শুরু করল আগ্নেয়াস্ত্র।

আটাত্তরের আগস্ট মাসে একটা দেশি রিভলবার সমেত সে এক জুট মিলের কাছে বেলঘড়িয়ার থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। গেল দমদম সেন্ট্রাল জেলের ভেতর সমাজবিরোধীদের বৈঠকখানায়। সেই বৈঠকখানায় সে একে একে পরিচিত হতে লাগল দমদমের কুখ্যাত খুনি 'প্রিন্স' সুধীরের দলের রাধেশ্যাম, আর এন গুহ রোডের বাসিন্দা ডাকাতির আসামি নিখিল, বিশ্বনাথ সিংয়ের খুনের মামলায় ধৃত জহর চক্রবর্তীর সঙ্গে।

এইসব বিশিষ্ট বিশিষ্ট 'দাদাদের' কাছ থেকে সে অমূল্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠল। আর সেই সব শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার পর সে জেল থেকে বেরিয়ে ওদের সঙ্গে নতুন দলে যোগ দিল এবং তার কাছে অন্য এক নতুন 'রাস্তা'ও খুলে গেল। সে এবার ওয়াগন ব্রেকিংয়ের রাস্তা ধরে উপার্জন শুরু করল। সাট্টার প্যাড লেখার 'নিম্নস্তরের' কাজ ছেড়ে 'উচ্চস্তরে' উঠল। কিন্তু বাদ সাধল বেলঘড়িয়া থানার পুলিশ। তাকে উনসত্তরের ছাব্বিশে ডিসেম্বর তারা গ্রেফতার করল। তারা মামলা দিল। কিন্তু সেই মামলায় জামিন পেয়ে যেতে আমরা গোয়েন্দা বিভাগ থেকে ওর বিরুদ্ধে মামলা সাজিয়ে লালবাজারে নিয়ে এলাম। সেই প্রথমবার ওকে আমরা চাক্ষুষ দেখলাম। তখন আশি সালের জুলাই মাস। লালবাজারে তখন ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউসের ডাকাতির আসামি ডানকুনির নিমাই ঘোষ, বাচ্চা অমলরা ছিল। এরাও সব লক্ষ্মণ পাইনের দলের সদস্য। লক্ষ্মণই সিল্ক হাউসের লুঠ করা জিনিস বিক্রি করেছিল।

আশিষকে আমরা জেলে পুরে দিলাম। কিন্তু সেই লক্ষ্মণই তাকে আদালত থেকে জামিনের ব্যবস্থা করে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল। তারপর থেকে সে লক্ষ্মণের আস্তানারই বাসিন্দা হয়ে গেল। লক্ষ্মণের কথা মতো কাজকর্ম করতে লাগল।

হঠাৎ একদিন সন্ধেবেলায় লক্ষ্মণের বাড়ির কাছে নাড়ু নামে এক ফাজিল ছেলে লক্ষ্মণের বোনকে টিটকিরি দেয়। যথারীতি সেটা লক্ষ্মণের কানে যায়। নাড়ু বোধহয় জানত না, সমাজবিরোধীরা অনেকটা সামন্ত প্রভু ও হিটলালের মিশ্রিত ফল। নিজেরা সব রকম অপকর্ম করার ছাড়পত্র নিয়েই জন্মেছে। তাতে কেউ বাধা দিতে পারবে না। বাধা দিলেই সেই হাত গুঁড়িয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত ওরা করে ফেলবে। কিন্তু অন্য কেউ যদি ওদের আপনজনকে একটু টিটকারিও দেয়, তবে ওদের আঁতে দারুণ লাগে। ওদের 'ইজ্জত' বহু উঁচু দরের। সেখানে সামান্য পিঁপড়ের কামড়েও নির্ঘাত মৃত্যু।

সুতরাং 'নাড়ুর নাম' লক্ষ্মণের হিটলিস্টে উঠে গেল, সুতরাং তার বোনকে টিটকিরি দেওয়ার জন্য পত্রপাঠ নাড়ুকে ইহজগত থেকে বিদায় নিতে হবে।

যেমন রায় তেমন কাজ। লক্ষ্মণ এই 'কাজে' প্রথমেই আশিষকে বাদ দিল। সে নাড়ুকে খুন করার দায়িত্ব দিল নন্দনপুর কোয়ার্টারের বুলু দত্ত, কাক স্বপন, হাবড়ার কানা জয়দেব, মরু ও নারায়ণ সরকারের ওপর। আশিষকে বাদ দিল কারণ আশিষ তখনও খুনের কাজে ওস্তাদ হয়ে ওঠেনি। হাত পাকেনি।

দায়িত্ব পেয়ে নারায়ণরা বেশি দিন সময় নেয়নি। নাড়ুর গতিবিধি ওদের মুখস্থ। তাছাড়া নাড়ু কোনও বিপদের গন্ধও পায়নি। সুতরাং একদিন সন্ধেবেলায় নারায়ণরা ওকে ঘিরে ধরল। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে নাড়ু ওদের দেখেই থরথর করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু সেটা খুবই অল্প সময়ের জন্য। কারণ ততক্ষণে নারায়ণ সরকারের ভোজালীর কোপ ওর গলায় ছুটে গিয়ে পড়েছে। যে গলা দিয়ে সে লক্ষ্মণ পাইনের বোনকে টিটকারি দেওয়ার 'সাহস' পেয়েছে, সেই গলা মুহূর্তে দু ফাঁক। নারায়ণের কোপের সঙ্গে সঙ্গে কাক স্বপনের ছুরিও ঢুকে গেছে নাড়ুর পেটে। গলা ও পেট থেকে গলগলিয়ে রক্ত পড়ছে রাস্তায়। নাড়ু শুয়ে আছে নিজের সেই রক্তের স্রোতের ওপর। হয়ত সে তখন ভাবছে, যমরাজের চেলারা জানাবে কেন তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হল। নারায়ণরা ধীরে এগিয়ে গেল কাছেই একটা পুকুরের ধারে। সেখানে ভোজালী, ছুরি সব ভাল করে পরিষ্কার করল। ছিটকে আসা নাড়ুর রক্ত যেটুকু তাদের হাতে মুখে লেগেছিল, তাও ভাল করে ধুয়ে ফেলে ওরা গেল লক্ষ্মণের কাছে। লক্ষ্মণ আশিষকে সঙ্গে নিয়ে একটা ঘাঁটিতে খোস গল্প করছিল। সেখানে গিয়ে নারায়ণরা 'সুসংবাদটা' দিল। লক্ষ্মণ শুনল। তার মুখে সামান্য হাসি দেখা দিল। সেই হাসির একটাই অর্থ, "তার রাজত্বে কোনও অন্যায় সে বরদাস্ত করতে পারবে না। অন্যায় কেউ করলে এইভাবেই গর্দান যাবে।'

আশিষও স্বপ্ন দেখল তার নিজের 'রাজত্ব' গড়ার। সে আর শুধু লক্ষ্মণের "ভাই" হয়ে থাকতে চাইল না। বিরাশি সালে সে দীপু, নেপালী নন্দ, আগরপাড়ার কমল, নোয়াপাড়ার বাচ্চুকে নিয়ে নিজে একটা দল করল।

দলের অধিপতি হয়ে সে প্রথমেই অর্থ ও কর্মসংস্থানের কাজে নামল। খবর আনল দীপু ও কমলরা। খবর হল, দমদমের কাজিপাড়ার কাছে এক চোরাচালানকারীর আস্তানায় বেশ ভাল ওজনের সোনার আমদানি হবে আঠেরই ফেব্রুয়ারি সন্ধেবেলায়। আশিষ ঠিক করল, এই দাঁওটাই তাকে মারতে হবে। এতে তার লাভই লাভ। কারণ চোরাচালানকারীরা তাদের ডাকাতির খবর পুলিশকেও জানাতে পারবে না, অথচ তার হাতে বহু টাকা চলে আসবে। সাপ মরবে, কিন্তু লাঠি অক্ষতই থাকবে। যে লোকটা সোনা নিয়ে গন্তব্যস্থলে আসবে, তাকে কমল ভালভাবেই চিনত। তাই আশিষ ঠিক করল, ঘাঁটিতে আক্রমণ না করে ঘাঁটির আশেপাশে রাস্তাতেই তাকে ধরে কাজ উদ্ধার করবে। কারণ ঘাঁটিতে আক্রমণ করলে তাদেরও আক্রান্ত হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থাকবে। ঘাঁটিতে তো আর কেউ তিলক কেটে তুলসী পাতা খেয়ে অপেক্ষা করবে না। ওরাও সব ওদের 'মহান সমাজের' সদস্য।

নির্দিষ্ট দিনে আশিষ, কমল, বাচ্চু ও দীপু কাজিপাড়ার রাস্তায় সন্ধের আগেই হাজির। ওদের সঙ্গে আছে দুটো পাইপগান, দুটো ভোজালী ও বোমা।

শীত শেষ হয়ে গেছে। ফাগুন বইছে কাজিপাড়ার অলিগলিতে। সন্ধের মুখে তাই কিশোর কিশোরীদের মনে বাতাসের টান। সেই টানে ফুটে উঠছে তাদের চোখ মুখের অভিব্যক্তি। অঞ্চলটাতে মূলত নিম্নমধ্যবিত্তদের বাস। যারা সারা বছরে খুব বেশি খুঁজে পায় না আনন্দের দিন, প্রেমের দিন, সুখের দিন। এখন তাই প্রকৃতির উচাটনের আবদারে তাদের মনে জেগেছে কোন জোয়ারের আকুলতা, কে জানে? তারা তাই কখনও কলকল শব্দে উচ্ছ্বসিত, কখনও বা ঢলঢল ঢঙে নৃত্যরত, চলমান। আশিষদের এ সবে বিরক্ত লাগছে। এরা ওদের কাছে সাক্ষাৎ উৎপাত।

সন্ধে পার হয়ে গেল। খবর অনুযায়ী 'সেই লোকটার' আসার সময় হয়ে আসছে। আশিষরা রাস্তার ধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কমল ছাড়া সেই সোনাবহনকারীকে অন্যেরা চেনে না। তাই কমল যেমন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে যাতে তার সোনার হাঁস পালিয়ে না যায়, ঠিক তেমনি অন্যেরাও তাকিয়ে আছে তার দিকে, সে চিহ্নিত করলেই সবাই মিলে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে লক্ষ্যের ওপর।

রাত আটটা। হঠাৎ লোডশেডিং। আশিষদের কাছে এটা একইভাবে আশীর্বাদ ও বিপদের ঘণ্টা। অন্ধকারের আড়াল হল আশীর্বাদ, আবার সেই আড়ালের মাঝখান দিয়ে গলে যেতে পারে তাদের আরাধ্য বস্তু কমলের চোখের মণির দৃষ্টির প্রতিফলন থেকে। তাই লোডশেডিংয়ে আশিষরা আনন্দিত হলেও আতঙ্কিতও হয়ে রইল। আশীষের নির্দেশে ওরা চারজন একসঙ্গে দল বেঁধে দাঁড়াল। কারণ কমলের ইশারা অন্যেরা নাও দেখতে পারে।

অন্ধকারে অনেক রিক্সার মতো অন্য একটা রিক্সাও ওদের পার হয়ে গেল। সেই রিক্সাতে একজন আরোহী। অন্ধকারেও বোঝা গেল সে একদম সাধারণ মাপের মধ্যবয়স্ক মানুষ। রিক্সাটা একটু দ্রুতগতিতে চলে গেল।

আরোহীকে দেখে কমলের চমক ভাঙল। সে চাপা স্বরে বলে উঠল, তো, ওই মালটাই রিক্সায় যাচ্ছে।" কমলের কথা মুখ থেকে খসার সঙ্গে সঙ্গে আশিষরা রিক্সার পেছনে দিল ছুট। কয়েক সেকেণ্ড। ওরা রিক্সার হ্যাণ্ডেল ধরে রিক্সাটা দাঁড় করাল। টেনে নামাল সেই মাঝবয়সী লোকটাকে। আশিষ তার বুকের ওপর চেপে ধরল পাইপগান। কমলরা লোকটার হাতে ঝোলানো ব্যাগটা কেড়ে নিল। তারপর তার জামা ও প্যান্টের পকেটগুলোতে হাত ঢুকিয়ে শুরু করল তল্লাশি। যা যা পাওয়া গেল, টপাটপ বার করে পকেটে পুরতে লাগল। দু'মিনিটের মধ্যে সব কাজ শেষ। আশিষরা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। রিক্সাচালক 'ডাকাত, ডাকাত' বলে চিৎকার শুরু করেছিল, কিন্তু তাকে অবাক করে আরোহীই তাকে চিৎকার থেকে নিবৃত্ত করল।

আশিষরা বেলঘড়িয়ায় নিজেদের ডেরায় ফিরে এল। লুঠ করে কী পেল? চারজনে সেগুলো দেখতে লাগল। তারা পেল নগদ সাড়ে চার হাজার টাকা, দু'টো সোনার বিস্কুট ও

প্রায় আটশো গ্রাম সোনার ছোট ছোট টুকরো। দীপু দায়িত্ব পেল সোনার জিনিসগুলো বিক্রি করার। বিক্রি করল চল্লিশ হাজারে। সে সেই চল্লিশ হাজার থেকে আলাদাভাবে নিজে সরিয়ে নিল দশ হাজার। বাকি টাকা জমা দিল আশিষের কাছে। আশিষ সবাইকে ভাগ করে দিল। কিন্তু দীপু যে দশ হাজার আলাদা সরিয়ে নিয়েছে, সে খবর আশিষ দিন তিনেকের মধ্যে জেনে গেল। সে এই বেইমানি মানতে পারল না। সে প্রতিশোধের জ্বালায় জ্বলতে লাগল। কী ভাবে নেবে প্রতিশোধ? এই চিন্তায় সে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠল।

রথতলার শম্ভু সরকার ছিল দীপুর শত্রু। দীপুকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এটা আশিষ জানত। সে শম্ভুর সঙ্গে যোগাযোগ করে দীপুকে তার হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করে এল। সেই গোপন বৈঠক অনুযায়ী আশিষ দীপুকে একটা কাজের অছিলায় মার্চ মাসের দশ তারিখ রথতলায় পাঠাল। দীপু দলপতির কথায় গেল। শম্ভু তার দল নিয়ে আগেই ঘাপটি মেরে বসেছিল। দীপু নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়াল, যেখানে কথামত আশিষ আসবে৷ কিন্তু আশিষ তখন কোন্নগরে স্বপন দেবনাথের বাড়িতে মাংস ভাত খাওয়ার তোড়জোড় করছে।

দীপু এদিক ওদিক তাকাল। কিন্তু আশিষকে দেখতে পেল না। বরং দেখতে পেল তার শত্রু শম্ভুকে। দীপু মুহূর্তেই বুঝে গেল কী ব্যাপারটা ঘটতে চলেছে। সে ছুটে পালাতে গেল। পারল না। ওকে শম্ভু কোনও সুযোগই দিল না। ল্যাং মেরে ছিটকে ফেলে দিয়ে প্রথমেই ওকে উল্টে নিল। তারপর সোজা তার গলা লক্ষ্য করে নামিয়ে দিল ইঞ্চি দশেক মাপের একটা ছুরি। গরম রক্ত লাগল শম্ভুর হাতে। ছুরিটা গলা থেকে টেনে নিয়ে আরও দুবার একই কায়দায় বসিয়ে দিল দীপুর গলায়। গলার শ্বাসনালী, খাদ্যনালী সব বেরিয়ে এল ওপরে। টুকরো টুকরো হয়ে। চোখ স্থির। সেখানেও রক্ত পড়ে দৃষ্টি বন্ধ। বন্ধ হয়েছিল প্রথম কোপেই, তবু নিশ্চিত হতে পাকা খুনীর মতো আরও দুবার ছুরি বসিয়েছে শম্ভু। দীপুকে খুন করে শম্ভু উঠে দাঁড়াল।

এবার তার কাজ লাশটাকে সরিয়ে ফেলা। সে একটা চটের বড় বস্তা যোগাড় করল। সেই বস্তায় ঢুকিয়ে দিল দীপুর ঠাণ্ডা দেহটা। বন্ধ করল বস্তার মুখ। ততক্ষণে শম্ভুর দলের দুটো ছেলে একটা ঠেলা নিয়ে হাজির। ঠেলাতে তুলে দেওয়া হল দীপুর লাশ সমেত বস্তাটা। ঠেলাটাকে তারা নিয়ে চলল দিল্লি রোডের দিকে। দিল্লি রোডের ধারে বস্তাটা ঠেলে ফেলে দিয়ে ঠেলা নিয়ে ফিরে এল রথতলা। সেটা জল দিয়ে ধুয়ে সাফ করল। দীপু বস্তার ভেতর শুয়ে রইল। দশ হাজার টাকা অতিরিক্ত আত্মসাৎ করাটা তার হজম হল না।

আশিষ তখন স্বপনের বাড়িতে খাসীর হাড় চিবোচ্ছে। সে জানে শম্ভু তার কাজটা নিখুঁতভাবে ততক্ষণে সমাধা করেছে। দীপুর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক কেউ বুঝতেই পারবে না। সে যে কোন্নগরে বেড়াতে এসেছে, সেটা দীপু ছাড়া সবাই জানে। এমন কি তার লক্ষ্মণদা ও। সেজন্য আশিষ নিশ্চিন্তেই কোন্নগরে দিন কাটাচ্ছিল এবং দল গুছিয়ে নিচ্ছিল।

কিন্তু বাদ সাধলাম আমরা। যদিও আশিষ আমাদের কলকাতা পুলিশের এক্তিয়ারের বাইরে সব অপরাধগুলো করেছিল, কিন্তু এক অপরাধীর সন্ধান পেলে "আমাদের প্রয়োজন নেই ওকে" এই ভাব নিয়ে আমরা বসে থেকে নিজেদের কাজকে হাল্কা করতাম না। কোনও অপরাধী সম্পর্কে খবর পাওয়ার. পর তাকে না ধরে বসে থাকলে আমাদের মনেও একটা অপরাধ বোধ কাজ করত। তাই আমরা তাকে ধরে যথাস্থানে তুলে দিতাম। এই প্রক্রিয়া সমানভাবে সবাই মিলে সক্রিয়ভাবে করলে অপরাধ জগত একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে। আমাদের সময় দায়িত্ব যেমন দেওয়া হতো ঠিক তেমনি আমরা নিজেরাও অনেকসময় দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিতাম। অনেক সময় একটা আসামীর খোঁজ করতে করতে অন্য একটা আসামীর খোঁজ পেলে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছি।

দশই মার্চ দীপু খুন হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ আঠাশে মার্চ আমরা খবর পেলাম, আশিষের দলের ছেলেরা পরদিন সন্ধেবেলায় কোন্নগরে মিলিত হয়ে তাদের পরবর্তী কাজের পরিকল্পনা করবে। খবর পাওয়ার পর ঠিক করলাম, আমরা ওদের গ্রেফতার করে পশ্চিমবঙ্গ

পুলিশের হাতে তুলে দেব, যাতে দীপুর খুনের হদিশ ওরা করতে পারে।

আমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের লালবাজারের গোয়েন্দা দফতরের একটা দল কোন্নগরে উনত্রিশ তারিখ রওনা হয়ে গেল। তারা স্বপন দেবনাথের বাড়ির কাছে রাস্তায় অপেক্ষা করতে লাগল ছড়িয়ে ছিটিয়ে, যেখানে আশিষের দলের নেপালী নন্দ, স্বপন, চুঁচুড়ার দিলীপ ও শেখ সৈয়দ, স্বপন কর আসার কথা আছে। আশিষ ওই রাস্তার মোড়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করবে, এমনই খবর আমাদের কাছে ছিল।

ঠিকই, সন্ধের পর আশিষ সেখানে হাজির। তার সেনাদের আগমনের অপেক্ষায় ধীরে ধীরে পায়চারি করছে। আস্তে আস্তে সময় পার হয়ে যাচ্ছে। আশিষ পায়চারি বন্ধ করে উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ওর দলের কেউ আসছে না। ভাবছে, এমন তো হওয়ার কথা নয়। সে দলপতি, সে ওদের ডেকে পাঠিয়েছে, তবু ওরা এল না, কী হতে পারে, তবে কি তারা তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কারও দলে ভিড়েছে? না কি নিজেরাই একটা দল করে 'কাজে' নেমে পড়েছে?

রাত ন'টা। আমাদের দল আর অপেক্ষা করল না। একা আশিষকে গ্রেফতার করে সোজা গাড়িতে তুলে নিয়ে লালবাজারে হাজির। লালবাজারে এর আগেও সে এসেছে। আমাদের ওষুধের ধকল সহ্য করতে কিছুটা অভ্যস্ত তখনই হয়েছিল। এবারও কিছুটা সহ্য করল। আমাদের কাছে তখন দীপুর খুনের ব্যাপারে ওর কোনওভাবে জড়িত থাকার কোনও ইঙ্গিত ছিল না। তবু তাকে আমরা জেলে মাস চারেক আটকে রাখলাম। এবারও তার গুরু লক্ষ্মণ জামিনে তাকে জুলাই মাসের শেষে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সে আবার লক্ষ্মণের আস্তানাতেই থাকতে শুরু করল। এবং নতুন নতুন ছক কষতে লাগল। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। শুধু লক্ষ্মণের নির্দেশ কার্যকরী করা ছাড়া ওর হাতে আর কাজ রইল না। কিন্তু একবার যে নিজে দলপতি হওয়ার স্বাদ পেয়েছে, সে কেন শুধুমাত্র অন্যের গোলামী করবে, হোক না সে তার গুরু। সুতরাং সে নতুন চারটে ছেলেকে তার অধীনে নিয়ে এল। এরা হল সমীর, কমল, বাচ্চু ও বাচ্চা টেনিয়া। এদের নিয়ে সে নিমতার নীরদ রায়ের বাড়িতে তিরাশি সালের জানুয়ারি মাসের এক রাতে ডাকাতি করল। সেখান থেকে তারা লুঠ করল হাজার চারেক টাকা, কিছু গয়নাগাঁটি ও টেপ রেকর্ডার, ইত্যাদি। জানুয়ারিতেই ওরা নিমতার মুরাগাছা অঞ্চলে এক চাল ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বারো হাজার টাকা ছিনতাই করে পালাল।

মার্চ মাসের প্রথমদিকে আশিষ খবর পায়, দার্জিলিং মেলে দাস নামে একটা লোক চোরাচালানের জিনিস নিয়ে আসবে। দাসকে লক্ষ্মণের দলের প্রদীপ লোধ চিনত। প্রদীপকে নিয়ে আশিষরা সেই লোকটাকে ট্রেনের মধ্যেই যথাদিনে ধরে তার চোরাচালানের মালপত্তর নিয়ে ট্রেন শিয়ালদহ স্টেশনে ঢোকার আগেই নেমে গেল। ওই জিনিসগুলো বিক্রি করে ওরা মোট পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পেল। কিন্তু ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে অপু, প্রদীপ, বৈদ্য ও গণেশের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। তাদের ঝগড়া যে থামিয়ে দলকে স্থায়িত্ব দিতে পারত, তাদের সেই নেতা লক্ষ্মণ পাইনকে সি.আই.ডি গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দিল। আশিষ বেশি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেল। কিন্তু এগারোই মার্চ রাত দশটা নাগাদ নাড়ু, মনীশরা আশিষের ডান হাত টেনিয়াকে খুন করল। আশিষ তার শত্রুশ্রেণীর তালিকায় ওদের নামটা ঢুকিয়ে রাখল। কিন্তু কোনও কিছুতেই আশিষের মন মানছে না।

সে এসব খেয়ালখুশি মতো করছে ঠিকই, কিন্তু কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না। সে তার ভাইয়ের হত্যাকারী নির্মলকে যতক্ষণ না খুন করতে পারবে, ততক্ষণ শান্তি পাবে না।' যে 'দিশা' সামনে রেখে সে পথে নেমেছিল, তার কিনারা তাকে করতেই হবে। মনের গোপন ইচ্ছা সে তার দলের অন্যদের জানাল।

ইতিমধ্যে নির্মল হিন্দ মোটর কারখানায় চাকরি পেয়েছে। সে চাকরিতে যোগদান করতে যাবে, খবর পেল আশিষ। তৈরি হল। ঠিক হল একটা স্কুটারে থাকবে সমীর ও আশিষ। সমীর স্কুটারটা চালাবে, আর পেছনে আশিষ বোমা নিয়ে বসবে। নির্মলকে আশিষই

বোমা ছুঁড়ে মারবে। কাজ শেষ হলে সমীর স্কুটার ছুটিয়ে দেবে।

নির্মল হেঁটে আসছে। সে নতুন চাকরি পাওয়ার আনন্দে খুশি মুখ নিয়ে যতীন দাস নগরের মধুসূদন ব্যানার্জি রোডে মিশনের সামনে আসতেই প্রচণ্ড জোরে বোমার শব্দ। বেলঘড়িয়ায় বোমার আওয়াজ নতুন কিছু নয়। সকাল, দুপুর, রাত, বোমার শব্দহীন কোনও তারিখ ক্যালেন্ডার থেকে নিঃশব্দে ছিটকে যেতে পারে না, সেই ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে। এক সময়ের কংগ্রেসী মস্তান ইন্দু মিত্র থেকে শুরু করে সি.পি.আই.(এম) -এর গুণ্ডা ননী সাহা ও খুচরো খাচরা নকশালরা এই প্রক্রিয়া সমানে চালিয়ে গেছে। তাতে বেলঘড়িয়ার গরীব, খেটে খাওয়া মানুষ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত অধিকাংশ উদ্বাস্তু পরিবারের লোকেরা অভ্যস্থ। তারা বিচলিত হয় না। তারা প্রতিদিনই দেখে বেলঘড়িয়ার স্টেশনে একদিকে কংগ্রেসের শক্তি ডাকাত সুরজিৎ দাশগুপ্ত ওরফে ঝাঁপু তার চেলাদের নিয়ে মত্ত, অন্যদিকে সি.পি.আই. (এন)-এর প্রচ্ছন্ন ছায়ায় তাদের বিপরীত দল আশিষের নেতৃত্বে দু'নম্বর গেটের কাছে আড্ডারত। এই দু'দলকে কেউ কিছু বলে না, কেউ ঘাঁটায় না। এমন কি চাপে না পড়লে বেলঘড়িয়া থানার লোকেরাও ওদের কিছু বলে না। তাই বোমার শব্দে অবিচলিত বেলঘড়িয়ার মানুষের দৈনন্দিন জীবন যেমন চলছিল, তেমনই চলতে লাগল।

কিন্তু আজকের বোমাটা নির্মলের কাছে ব্যতিক্রম। সে ছিটকে রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল। তার পিঠের ওপর আরও তিনটে বোমা পরপর আছাড় খেল। রক্তে ভেসে গেল মিশনের সামনের রাস্তা। চাকরি, তারপর বিয়ের স্বপ্ন, শেষ। জীবনের সাইরেন থেমে গেছে।

,

আশিষ নির্মলকে তার আওতায় পেয়ে প্রতিশোধের স্পৃহায় অতি উৎসাহে বোমাগুলো ছুঁড়ছিল। এবং স্কুটার থেকে নেমে এগিয়ে গিয়ে বোমা নির্মলের শরীরের ওপর ফেলছিল। তাতে সে খেয়াল রাখতে পারেনি যে অত কাছ থেকে বোমার সিপ্লন্টার তার শরীরের দিকেও ছুটে আসতে পারে। হয়েও ছিল তাই, তার শরীরে দুটো ছোট সিপ্লন্টার ঢুকে গিয়েছিল। তাতে সে কিছুটা আহত হয়ে ছুটতে পারছিল না।

মিশনের কাছেই ছিল প্রাক্তন নকশাল পঙ্কজ, গণেশ ও নরেশরা। তারা ছুটে এসে নির্মলকে ওই অবস্থায় দেখে সমীর ও আশিষকে তাড়া করল। সমীর স্কুটার নিয়ে পালাতে পারলেও, আশিষ কিন্তু পারল না। সে ওদের হাতে ধরা পড়ল। পঙ্কজদের রাগ ছিল আশিষের ওপর। ওরা আহত আশিষকে হাতে পেয়ে সেই রাগ তার শরীরের ওপর প্রকাশ করতে লাগল। ওরা ঠিক করল, আশিষকেও নির্মলের কাছে পাঠিয়ে দেবে। সেই উদ্দেশ্যে ওরা একটা গাড়িতে আশিষকে তুলে আদর্শনগরে নিয়ে এল। আদর্শনগর ওদের নিজস্ব ঘাঁটি। সেই ঘাঁটির একপ্রান্তে ওরা আশিষকে জ্যান্ত পুঁতে দেওয়ার জন্য গর্ত খুঁড়তে লাগল। আশিষ তার মৃত্যু চোখের সামনে দেখতে পেল। সে অনেক অনুনয় বিনয় করতে লাগল।

গর্ত যখন প্রায় শেষ, তখন পঙ্কজদের দলের একটা ছেলে ফিসফিসিয়ে গণেশের কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, “এটা এখন করা ঠিক হচ্ছে না। প্রথমত, সবাই জেনে যাবে কারা আশিষকে খুন করল, দ্বিতীয়ত, লক্ষ্মণ পাইন কিন্তু প্রতিশোধ নেবে।” গণেশের কথাটা মনে ধরতেই সে সেটা পঙ্কজকে বলল। ওরা সবাই প্রাক্তন নকশাল, খুনের মামলা সম্পর্কে ওদের খুঁটিনাটি অনেক কিছুই জানা আছে। তার ওপর জেল থেকে লক্ষ্মণ পাইন ছাড়া পাওয়ার পর একটা গণ্ডগোল যে বাধবে তা নিশ্চিত। সুতরাং ওরা ঠিক করল, আশিষকে এভাবে দুপুরবেলা জ্যান্ত না। অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

ধূর্ত পঙ্কজ তখন মনে মনে ছক পাল্টে ঝাঁঝাল কণ্ঠে আশিষকে বলল, “ঠিক আছে, তোকে ছেড়ে দিতে পারি, যদি তুই প্রতিজ্ঞা করিস আর কোনওদিন গুণ্ডামি, মস্তানি করবি না।” আশিষ ওদের হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়, সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি কথা দিচ্ছি পঙ্কজদা, আমি সব ছেড়ে দেব।” পঙ্কজ বলল, “তাহলে তোর কাছে যা মাল আছে আমাদের দিয়ে দিতে হবে।” আশিষ রাজি হল। না হয়ে উপায়ও ছিল না। পঙ্কজরা এবার আশিষকে তার বাড়িতে নিয়ে এল তার আগ্নেয়াস্ত্রগুলো আত্মসাৎ করার জন্য। আশিষ

তার কথা রাখল। সে বাধ্য হয়ে তার কাছে গচ্ছিত তার দলের বোমা ও পাইপগান, পিস্তল পঙ্কজকে দিয়ে দিল।

আশিষের ছোট ভাই সন্টু সব কিছু প্রত্যক্ষ করছিল। সে দেখল, বাড়ির সামান্য দূরে পঙ্কজদের পুরো দলটা বসে আছে। তাদের লক্ষ্য আশিষদের বাড়ির দিকে। এবং তাদের নিচুস্বরে আলোচনায় একটা গভীর চক্রান্তের প্রতিফলন। তার মনে হল, আশিষের কাছ থেকে তার অস্ত্রশস্ত্র হাতিয়ে নেওয়ার পরও তারা আশিষকে ছাড়বে না, নিয়ে যাবে এবং খুন করবে। সন্দেহ হতেই সে তার দাদাকে পঙ্কজদের আড়ালে তার আশঙ্কার কথাটা বলল। বার্তা শুনে আশিষের কপালে ভাঁজ পড়ল। সে ভাবল, একবার যখন মৃত্যুর মুখ থেকে আত্মসমর্পণ করে ফিরে এসেছি, তখন আর ওদের কৌশলে ধরা না দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

আশিষ কাঁচুমাচু মুখে পঙ্কজকে বলল, “দাদা, আমি একবার বাথরুম থেকে ঘুরে আসি, আমার তলপেট ফেটে যাচ্ছে।” পঙ্কজ আশিষের দেওয়া পিস্তলটা তুলে বলল, “তাড়াতাড়ি আসবি।” আশিষ মাথা নেড়ে ওখান থেকে সরে পড়ল। আশিষের বাড়ির সবাই পঙ্কজদের ঘিরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ওর বাবা, মা, দিদি ও বোনেরা কাঁদছে। কেউ কোনও কথা বলছে না। তারা এসব পছন্দও করে না। তারা সবাই সুস্থ জীবন যাপনে বিশ্বাসী। আশিষের বড় ভাইরা সব চাকরি করে, তার মধ্যে দু'জন আবার সরকারী কর্মচারী। স্বাভাবিকভাবেই একটা নিম্নমধ্যবিত্ত ছিন্নমূলের সংসার যখন খড়কুটো আঁকড়ে বাঁচার সংগ্রাম করতে করতে উঠে দাঁড়াতে চাইছে, তারা এসব অনাহুত ঝুটঝামেলা পছন্দ করবে কেন? আশিষের কোনও কাজকেই ওরা কোনওদিন সমর্থন করেনি। এমন কি তাদের ভাইয়ের হত্যাকারী নির্মলকে খুন করাটাও তারা চায়নি। তবু বাধ্য হয়েই এই সমাজবিরোধীদের লড়াইকে তাদের হজম করতে হচ্ছে, কারণ সেই সমাজবিরোধীদের একজন তাদের ঘরেই জন্ম নিয়েছে।

আশিষ পঙ্কজদের আড়ালে গিয়েই আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করল না। সে বাড়ির পেছন দিকের প্রাচীর টপকে উধাও। সন্টু ছাড়া আর কেউ দেখল না। সন্টুই তখন তার এই দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমাজবিরোধী কাজের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে।

কিছুদিন আগে সে অন্য একটা দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে এসেছে। সেই দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল আবার আশিষেরই ভাড়া করা একটা ঘরে। আশিষ তখন সদ্য বিয়ে করেছে বেবিকে। বেবি থাকত স্টেশনের পাশে, যেখানে আশিষরা আড্ডা মারত। গরীব ঘরের শ্যামলা, রোগা মেয়েটা ব্লাউজের পাইকারী ব্যবসায়ীর অর্ডার অনুযায়ী ব্লাউজ বানাত। আশিষের সঙ্গে আলাপের পর সে আশিষকে ভালবেসে ফেলে এবং আশিষ তাকে বিয়ে করে। বিয়ে করে আশিষ তার বাড়িতে বেবিকে না নিয়ে গিয়ে আলাদা সংসার পাতে।

সেই দুর্ঘটনার দিন সন্টু তার দাদার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। এসে শুনল, দাদা তার অনুচর নেপালী নন্দকে নিয়ে পাশের ঘরে বোমা বানাচ্ছে। সন্টুর কৌতূহল হল, বোমা কী ভাবে বানায় সেটা দেখার। সে সেই ঘরে দরজা ঠেলে ঢুকল। তাকে সেখানে দেখে আশিষের একটু রাগ হলেও কিছু বলল না। সে তখন দু'তিনটে বোমা বানানোর পর একটা বোমা নিয়ে নন্দর সঙ্গে লোফালুফি খেলছিল। সন্টু নন্দর ঠিক পেছনে দাঁড়িয়েছিল। সে তার দাদাদের কীর্তি দেখতে লাগল আর ভাবতে লাগল সেও কবে থেকে এইরকম স্বাধীন রোমান্টিক জীবনযাপন করতে পারবে। সেও কখন থেকে বোমা বানিয়ে হাসতে হাসতে খেলতে পারবে।

হঠাৎ বিরাট বিকট শব্দ। সন্টুর আর কিছু মনে নেই। তার জ্ঞান ফিরেছিল আর জি কর হাসপাতালের একটা বিছানায়। শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে একবার চারপাশ দেখে নিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর যখন ঘুম ভাঙে তখন দেখেছিল, বিছানার পাশে বসে আছে তার বাবা, মা ও দিদিরা।

নন্দর কিন্তু আর কোনওদিন ঘুম ভাঙেনি। সেই বিকট শব্দের সঙ্গে তার শরীরও টুকরো হয়ে গিয়েছিল। বোমা লোফালুফি খেলার সময় একবার আশিষের ছোঁড়া বোমা সে লুফতে পারেনি, তার শরীরে সেটা ফেটে গিয়েছিল।

কিন্তু তবু সেই ঘরে সে বিদায় নেয়নি। সে একেবারে বিদায় নিয়েছিল ওই আর জি কর হাসপাতালেই।

আশ্চর্য, ওই ঘটনায় আশিষের কিন্তু কিছু হয়নি। সে অদ্ভুতভাবে বোমার আঘাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। আর বেঁচে গিয়েছিল বলেই সন্টুর চিকিৎসার যাবতীয় খরচ সে যোগাড় করতে পেরেছিল। সন্টু দাদার সেই প্রয়াসকে মনে রেখেছে। তাই আজ কৃতজ্ঞ চিত্তে দাদার একটা কাজ করতে পারার জন্য মনে মনে সে খুব খুশি।

মিনিট দশেক পার হয়ে যাওয়ার পর পঙ্কজরা আশিষের বাবাকে প্রশ্ন করল, “আশিষ এখনও আসছে না কেন, বাথরুমটা কোন দিকে?” আশিষের বাবা দেবেন্দ্রবাবু হাত দিয়ে ইশারায় জানিয়ে দিলেন, কোনদিকে বাথরুমটা। পঙ্কজরা সে দিকে এগিয়ে গেল। দেখল, বাথরুমের দরজা হাট করে খোলা, ভেতরে কেউ নেই। তারা এবার বাড়িটায় তন্নতন্ন করে আশিষকে খুঁজতে শুরু করল, কিন্তু কোথায় আশিষ? সে তখন তার এক গুপ্তস্থানে শরীরের ক্ষতে প্রলেপ লাগাচ্ছে।

পঙ্কজরা বুঝল আশিষ তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। তারা আশিষের বাড়ির লোকজনের ওপর হম্বিতম্বি করে তখনকার মত প্রস্থান করল।

আশিষ নন্দন নগরের ঝিলের কাছে কেষ্টর বাড়িতে আশ্রয় নিল। সেখানেই সে সারাদিন কাটিয়ে দিল। কেষ্ট তাকে বাইরে যেতে বারণ করল। আশিষ সেটা মেনে নিল।

ঝিল পাড়ে কেষ্টর ঘরে রাত কাটানোর জন্য তারা দুজনে মিলে রাতের খাওয়া দাওয়ার পর বিছানা করে। তারপর একটু খোলা হাওয়াতে ঘুরে আসার জন্য তারা দুজনে ঝিল পাড়ে একটা বিল্ডার্সের দোকানের পাশে গিয়ে বসে। রাত তখন সাড়ে দশটা। ওরা ঝিল পাড়ে বসে ঝিলের জলের দিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে নিচু গলায় আলোচনা করতে থাকে।

দিন দুই হল পূর্ণিমা তার পুরো চাঁদটা নিয়ে আকাশ থেকে বিদায় নিয়েছে। তবু সামান্য ছোট চাঁদের ফুটফুটে আলো ঝিলের জলের ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে। ঝিলের আশেপাশে দু একটা বাড়িতে ছাড়া প্রায় সব বাড়ির আলো নিভে গেছে। তাদের গদ্যময় জীবনে চাঁদের আলোর রূপ দেখার কোনও স্থান নেই। দৈনন্দিন কঠিন সংগ্রামের শেষে আবার নতুন করে সংগ্রাম শুরু করার জন্য তারা সামান্য বিশ্রামের কোলে চোখ বুজেছে। তাদের কেউ শ্রান্তিতে ঘুমের দেশে কেউ বা শুয়ে শুয়ে জল্পনা কল্পনার রাজ্যে অস্থির চিন্তার মাঝে হেঁটে চলেছে।

হঠাৎ আশিষের কানে এল একটা খসখসানির শব্দ। তার ডান পাশে পড়ল একটা দীর্ঘ ছায়া। সতর্ক আশিষ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দেখল। ছায়ার মালিককে চিনতে তার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হল না। পঙ্কজ, গণেশসহ কুড়ি পঁচিশ জন ছেলে। তাদের দেখেই আশিষের এটাও বুঝতে সময় লাগল না, কি উদ্দেশ্যে এত রাতে তাদের আগমন। তবু সে স্মার্টলি পঙ্কজকে বলল, “কী ব্যাপার পঙ্কজদা, এত রাতে এখানে?”

পঙ্কজ দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলল, “তোকে মারতে এসেছি।” আশিষ মনে মনে ভাবার সময় পেল না যে, সেটা সে জানে। গণেশ নিমেষে আশিষকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়েছে একটা বোমা। আশিষের ধূর্ত চোখ ওদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিল। সে সেই বোমাটা তার দিকে যে ছুটে আসছে সেটা দেখল এবং কোনমতে আত্মরক্ষার্থে তার বাঁ হাতটা সেই বোমার দিকে এগিয়ে দিল। বিকট আওয়াজে নির্জন রাতের ঝিল পাড় তোলপাড়। ঝিল পাড়ের বাসিন্দাদের সেই আওয়াজে কোনও একান্ত স্বপ্নের ব্যাঘাত ঘটল কিনা আশিষ জানে না। সে শুধু দেখল তার বাঁ হাতের কব্জি থেকে হাতটা কেটে ঝুলে গেছে। আর শুধু ধোঁয়া।

ধোঁয়ার ভেতর হারিয়ে গেছে চাঁদের উজ্জ্বলতা। তাই অন্ধকার। আর সেই সাময়িক অন্ধকারের গুহা দিয়ে সে ঢুকে পড়ল কাছেই একটা বুনো ঝোপের ভেতর।

বোমা ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে আশিষের পাশে বসে থাকা কেষ্ট ছুটে পালাতে লাগল। কোথায় পালাচ্ছে সে জানে না। সে শুধু ছুট দিয়েছে পঙ্কজদের নাগাল থেকে দূরত্ব বাড়াতে। কেষ্ট পুরনো ডাকাত। মানিকতলায় একটা বাড়িতে ডাকাতি করার সময় বাড়ির এক বয়স্কা সাহসিনী ভদ্রমহিলার হাতে ধরা পড়ে জেলে গিয়েছিল। মাস দুয়েক হল বেরিয়েছে। সে আর আশিষের সঙ্গে মরতে চায় না। তাই পাগলের মতো তার মৃত্যুভয়ে ছোটা।

ধোঁয়ার অন্ধকারের আড়ালের অন্যদিকে কেষ্টকে ছুটে পালাতে দেখে পঙ্কজরা ভাবল, আশিষই ছুটে পালাচ্ছে। ওরা তখন কেষ্টকে লক্ষ্য করে অনবরত রিভলবার আর পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের নিশানা একবারও স্থির হচ্ছে না। ছুটন্ত কেষ্টর গুলি লাগছে না। সে পালাচ্ছে। তার পিছু নিয়েছে পঙ্কজরা। আর মাঝে মাঝে গুলি চালাচ্ছে। ঝিলের পাশে ছুটতে ছুটতে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কেষ্ট অদৃশ্য হয়ে গেল। পঙ্কজরা আর তাকে দেখতে পেল না। ওরা ভাবল আশিষ আবার তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল। তারা হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

ঝোপের ভেতর আশিষ তার বাঁ হাতের ঝুলন্ত কব্জিটা ডান হাত দিয়ে ধরে রেখে দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সামলাচ্ছে। সে পঙ্কজদের ছোটার ধুপধুপ আওয়াজ ও পিস্তলের গুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। বেশ খানিকক্ষণ পর সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে ঝোপের ভেতর থেকে মুখটা বাড়িয়ে এদিক ওদিক দেখল। ফাঁকা, কেউ নেই। কেষ্ট বেঁচে আছে কি মরে গেছে তাও বুঝতে পারল না। কোনও লোকজন বা সাড়াশব্দ না পেয়ে ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে সে হেঁটে তার পরিচিত একটা বাড়িতে যায় এবং অনুরোধ করে তার বাবাকে খবর পাঠাতে।

খবর পেয়ে দেবেন্দ্রবাবু ও তাঁর বড় মেয়ে শ্যামলী ওই বাড়িতে এসে আশিষের অবস্থা দেখে তাকে নিয়ে যায় কাছেই সাগর দত্ত হাসপাতালে। কিন্তু সেখানকার ডাক্তার তাঁদের পরামর্শ দেন অন্য কোনও বড় হাসপাতালে নিয়ে যেতে। তাঁরা তখন আশিষকে নিয়ে আসেন আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে আশিষের বাঁ হাতটা ডাক্তাররা বাধ্য হয়ে কব্জির ওপর থেকে বাদ দিয়ে দেন।

বেলঘড়িয়া থানা আশিষের খবর পায়। থানা থেকে পুলিশ অফিসাররা আসেন এবং তাঁরা হাসপাতালেই আশিষকে নির্মল হত্যা ও অন্যান্য দু'তিনটে মামলার অভিযোগে গ্রেফতার করে দু'জন কনস্টেবলকে পাহারাদার হিসাবে রেখে চলে যান।

তিরাশির এপ্রিলের চার তারিখ আশিষ সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর বেলঘড়িয়া থানার পুলিশ তাকে জেলে পাঠিয়ে দেয়। সেই সময় জেলে ছিল ওর প্রাথমিক শিক্ষাগুরু লক্ষ্মণ পাইন। কিন্তু লক্ষ্মণ তিরাশিরই শেষদিকে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গেল। কিন্তু ছাড়া পেলে কি হবে, তার একেবারে... পৃথিবী থেকেই ছাড়া পাওয়ার ব্যবস্থা করল ঝাঁপুরা। ঝাঁপু ও বুলু দত্তের দল ওকে খুন করল। আশিষ জেলে বসেই সেই খবর পেল। তার গুরুকে খুন করার বদলা নেওয়ার জন্য তার মন উসখুস করতে লাগল। কিন্তু সে তো বন্দী, তাই তার অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার রইল না। সে আরও জানতে পারল, তার জামিনে মুক্তির ব্যবস্থা না করতে পারার পেছনে রয়েছে পঙ্কজ ও গণেশরা। তারা প্রায় প্রতিদিনই রুটিন করে তার বাবাকে বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়ে বলত যে, "যদি আপনি আশিষকে জেল থেকে ছাড়ান, তবে আপনার পাঁচ পাঁচটা মেয়ের একটারও ইজ্জত থাকবে না। খেয়াল রাখবেন।" তাদের সেই হুমকির ভয়ে দেবেন্দ্রবাবু আর আশিষকে জেল থেকে ছাড়ানোর উদ্যোগ নিতেন না।

আশিষের রাগ ওদের ওপর এমনিতেই ছিল, তার ওপর তার বোনেদের ইজ্জতের ভয় দেখিয়ে তাকে জেলে আটকে রাখার কৌশল করেছে পঙ্কজরা, এটা জানার পর সে দ্বিগুণভাবে জ্বলতে লাগল। সে বারবার তার বাবাকে অনুরোধ করতে লাগল জেল থেকে

জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অবশেষে পঁচাশি সালের দোসরা ফেব্রুয়ারির সন্ধেবেলায় আশিষ জামিনে ছাড়া পেয়ে বেলঘড়িয়ায় 'পদার্পণ' করল। প্রায় দু'বছর পর জেল থেকে বেরিয়ে তার প্রথম কাজ হল দল তৈরী করা। দল তৈরী করতে ওস্তাদদের বেশি সময় লাগে না। সেও এখন ওস্তাদ। সে দিন দুয়েকের মধ্যে দলে নিল শ্যামল মণ্ডল, সোদপুরের নাটা বাবলা, অমল সেন, বিভা সিনেমার কাছের বাসিন্দা মুন্না, কবিরাজ, পৃথ্বীশ, সি.পি.আই.(এম) নেতা প্রদীপ সেনের ভাই রণজিৎ, বাবু ও রবিকে।

প্রথমেই সে ঠিক করল তার গুরুর হত্যাকারীদের ওপর প্রতিশোধ নিতে হবে। দল ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গে সে তার পুরানো রাস্তা দিয়ে বোমা ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ও যোগাড় করতে লাগল।

সাত তারিখ জেল থেকে বেরিয়েই ন'তারিখ সন্ধেবেলায় সে তার দল নিয়ে ঝাঁপুদের ওপর আক্রমণ করতে চলল। সে নিজে নিল একটা পিস্তল। বোমাগুলো অন্যদের দিল। তার এখন বাঁ হাতটা প্রায় অকেজো। সেটা পঙ্কজদের দৌলতে আর জি কর হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা ছোট করে দিয়েছেন। তারপর থেকে তার পরিচয় হয়ে গেছে 'হাতকাটা আশিষ' নামে। অবশ্য তার সামনে প্রকাশ্যে ওকে ওই নামে কেউ ডাকে না। কারণ সেও এখন 'দাদা'।

চলেছে আশিষরা স্টেশনের দিকে ঝাঁপুদের শিক্ষা দিতে। কিন্তু স্টেশনের যেখানটায় ঝাঁপু ও বুলুরা জগুদের সঙ্গে বসে আড্ডা মারে, সেখানটায় গিয়ে আশিষরা দেখল সব শুনশান। ওর শত্রুদলের কেউ নেই। দু'একটা কুকুর ও ভিখারীর দল এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আশিষ বুঝল, তাদের আগমনবার্তা ঝাঁপুরা আগেই পেয়ে গিয়ে নিঃশব্দে কেটে পড়েছে। কারণ তারা বেশিরভাগ সময়ই প্রায় অরক্ষিত হয়ে আড্ডা মারত। অরক্ষিত অবস্থায় আশিষের দলের মোকাবিলা করাটা বুদ্ধিমানের হবে না ভেবে তারা চলে গিয়েছে।

আশিষরা আর কী করবে, রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে তারাও ফেরৎ এসে নতুনভাবে পরিকল্পনা করার জন্য বসল। বাংলা মদ সহযোগে তাদের আলোচনা চলল গভীর রাত পর্যন্ত। সেখানেই সে জানতে পারে, বর্তমানে ঝাঁপুদের রোজগারের উৎস কোথায়। ঝাঁপুরা প্রায় ফাঁকা মাঠে খেলে ভালই রোজগার করছে। আর সেই রোজগারের উৎস রথতলার ই.এম.সি-র জিনিস চুরি করে বিক্রি করা। সেই চুরির মাল বিক্রি করে প্রতিদিন প্রায় এক হাজার টাকা ঝাঁপু হাতে পায়।

খবর পেল, পঙ্কজ অটো রিক্সা চালায়। কিন্তু পঙ্কজের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার আগে সে ঠিক করল, তাকেও দল চালাতে রোজগার বাড়াতে হবে এবং তার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে ঝাঁপুর চুরির জায়গাটা নিজেদের হাতে নিয়ে নেওয়া। এতে ঝাঁপুর ওপরও বদলা নেওয়া হবে এবং নিজেদেরও রোজগার হবে। সেই রাতের আলোচনার ফলস্বরূপ আশিষ দলবল নিয়ে ই.এম.সি-র মাল লুঠ করতে দিন দুই পরে রথতলায় গেল।

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেখল, ঝাঁপুরা তিনটে টেম্পো বোঝাই মাল চুরি করে পালানোর আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। আশিষরা সেই মাল বোঝাই তিনটে টেম্পো ঝাঁপুদের থেকে জোর করে দখল করে নিল। ঝাঁপুরা প্রতিদিন একই কাজ করতে করতে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, তারা এই চুরিটা প্রায় নিজেদের 'অধিকার' ভেবে নিয়েছিল। তাই তারা আশিষদের হামলার মুখে একেবারে অপ্রস্তুত ছিল এবং আশিষদের কাছে হেরে গিয়ে পালিয়ে গেল। আশিষরা সেই তিন টেম্পো চুরির মাল নিয়ে বিক্রি করে দিল। খবর গেল সি.পি.আই.(এম) -এর স্থানীয় নেতা প্রদীপ সেনের কাছে।

সে দু'পক্ষকেই নিজের কাছে ডাকল এবং একটা মধ্যস্থতার মাধ্যমে ঠিক হল, দু'পক্ষেরই চুরির টাকা তার কাছে জমা দিতে হবে। দু'পক্ষই রাজী হল। কিন্তু ঝাঁপুরা দু'একবার প্রদীপের কাছে টাকা জমা দিয়ে, বন্ধ করে দিলেও আশিষরা প্রতিবারই প্রদীপের কাছে মাল বিক্রির টাকা জমা দিতে লাগল। আশিষ এটা জানতে পারল যে ঝাঁপুরা 'নিয়ম'.

মানছে না। সেও টাকা আর প্রদীপের হাতে না দিয়ে, জমা টাকা ফেরৎ চাইল। ততদিনে এগারো হাজার টাকা প্রদীপের হাতে জমে গেছে। সে আশিষকে একটা টাকাও ফেরৎ দিল না। আশিষদের চুরির টাকা আর এক বাটপাড়ের হাতে লুঠ হয়ে গেল। মুখে অবশ্য সে আশিষকে বলল, "আরে আশিষ, তুই টাকাটা আমার থেকে নিয়ে কী করবি? তোর বিপদের দিনে, মামলার সময় ওটা কাজে লাগবে।" আশিষ যা বোঝার বুঝে গিয়ে চুপচাপ হজম করে প্রদীপের কাছ থেকে চলে এল। কারণ তারও প্রদীপকে দরকার। দরকার সি.পি.আই.(এম) পার্টির তরফ থেকে মদত। যেমন তার শত্রু ঝাঁপুরা মদত পায় কংগ্রেসের কাছ থেকে।

আশিষের জেল থেকে ছাড়া পাওয়া, বেলঘড়িয়ায় আগমন ওর শত্রুদের স্বাভাবিকভাবেই খুশী করেনি। অন্যদিকে ঝাঁপুদের 'কাজে' আশিষদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে তাদের রোজগারে টান ধরায় তারা আশিষকে শক্তিহীন করার জন্য নিয়মিত ছক কষে যেতে লাগল। সেই ছকের বাস্তব পরিণতি হিসাবে পঁচাশির এপ্রিল মাসের পাঁচ তারিখ ভোরবেলায় ঝাঁপু, বুলু, ল্যাংড়া মানিক, বাচ্চা রবি, তারক, নিত্য দুলাল, নিতাই, শরৎ পাল, পৃথ্বীশ, সন্তু, কচি, কান্তি, বীরু, সুবল, শান্তা, অরুণ ও তুলসী একে একে যতীনদাস নগর ও কেওড়াপাড়ার বাড়ি থেকে এসে স্টেশনের পাশে তাদের আড্ডাস্থলে হাজির। ওরা প্রতিদিনই সেখানে আসে, তাই কেউ কিছু মনে করল না। তবে অন্যদিন এত ভোরে সবাই একসঙ্গে আসে না।

আজ ওদের চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে কোনও একটা কারণে ওরা উদগ্রিব, সবাই টুকটাক কথাবার্তার মধ্যে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। সাধারণত ওদের এতটা চিন্তিত দেখায় না। চিন্তিত হওয়ার কারণ ওদের বিশেষ নেই। চুরি, ছিনতাই যাদের পেশা, তাদের অলস সময়ে এত চিন্তা কিসের?

পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ দেবেন্দ্রবাবু প্রতিদিনের মতো সেদিনও স্টেশনের পাশে অশোক টিম্বারের ধারে একটা চায়ের দোকানে চা খেতে এসেছেন। দোকানদার তার নিত্যদিনের খদ্দেরকে দেখে চা বানাতে শুরু করেছে। দেবেন্দ্রবাবু ভোরবেলায় কাউকে ব্যস্ত না করে, বাড়িতে প্রথমে চা না খেয়ে ওই দোকানে চা খেতে যেতেন। এটা তাঁর বহুদিনের অভ্যেস। অভ্যেসমত তিনি হাজির। কিন্তু সেদিনটা তাঁর জীবনে ব্যতিক্রম। তাঁকে ঘিরে ধরল ঝাঁপুরা। তাঁকে তারা চা খেতে দিল না। তাঁকে টানতে লাগল বুলু ও নিত্য। দেবেন্দ্রবাবু তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার, আমাকে তোমরা টানাটানি করছ কেন?" বুলু বলল, "ন্যাকা, যেন জানে না, আশিষের বদলা আমরা তোর ওপর নেব।" দেবেন্দ্রবাবু বললেন, "তোমাদের ব্যাপার তোমরা আশিষের সঙ্গে বুঝে নিও।"

কে শুনবে তখন তাঁর কথা? তাঁকে ঘিরে ধরে তখন ঝাঁপুরা স্টেশনের চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দেবেন্দ্রবাবু কী বুঝেছিলেন কে জানে? তিনি কোনমতে কাতরকণ্ঠে বললেন, "আমার কী দোষ?" ঝাঁপু হেসে বলল, "আশিষকে জন্ম দেওয়াটাই তোর দোষ।" এমনভাবে বলল যেন ঝাঁপুদের বাবা মা ঝাঁপুদের জন্ম দিয়ে পৃথিবীর খুব উপকার করেছে। শুধু দেবেন্দ্রবাবুই আশিষকে জন্ম দিয়ে দোষী '

ঝাঁপু উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিতাইদের কী একটা ইশারা করল। নিত্যর কোমর থেকে বেরিয়ে এল একটা খোলা ভোজালী। এবং মুহূর্তের মধ্যে দেবেন্দ্রবাবুর ঘাড়ে সেই ভোজালীর একটা কোপ। দেবেন্দ্রবাবুর ঘাড় ঝুলে গেল। তাঁকে টানতে টানতে তারা নিয়ে চলল সাইডিংয়ের দিকে।

দেবেন্দ্রবাবু হাঁটতে পারছেন না, ঘাড় থেকে মাথা নিচের দিকে ঝুলে গেছে। রক্ত ঝরে তাঁর পাঞ্জাবি ধুতি ভিজে লাল। লাল হয়ে যাচ্ছে রাস্তা।

তবু তাঁকে হাঁটতে হচ্ছে ঝাঁপুর দলের ছেলেদের টানে। স্টেশনের চারপাশের জড়ো হওয়া লোক সেই দৃশ্য দেখছে অবাক হয়ে। কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছে না। তারা দেখছে ঝাঁপু, বুলু, রবিরা বোমা হাতে মিছিল করে চলেছে তাদের উদ্দেশ্য সাধন করার

জন্য। কে এগিয়ে যাবে তাদের বোমার স্বাদ নিতে?

দেবেন্দ্রবাবুকে ওই অঞ্চলের বাসিন্দারা প্রায় প্রত্যেকেই চেনে। তারা ভোরবেলায় দেবেন্দ্রবাবুর রক্তাক্ত, বিধ্বস্ত ঘাড় নিয়ে এমন একটা মিছিল দেখার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তারা মিছিলে অংশগ্রহণকারীদেরও প্রত্যেককে চেনে, তারা জানে, ওইসব চিহ্নিত দুষ্কৃতীরা ওইরকম এক অর্ধমৃতকে নিয়ে মিছিল করতে পারে। তাদের দ্বারা সবই সম্ভব। তারা ওই মিছিল করে দর্শকদের জানাতে চাইছে যে তারাই সবচেয়ে বলবান, তারাই শ্রেষ্ঠ, তাদের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলার পরিণতি ঠিক এইরকমই হবে।

ওইভাবে হাঁটাতে হাঁটাতে তারা দেবেন্দ্রবাবুকে নিয়ে গেল বিবেকানন্দ নগরে। দেবেন্দ্রবাবুর কোনও জ্ঞান নেই। শুধু টানের ওপর তাঁর শরীর এতক্ষণ চলছিল। ঝাঁপুরা তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে তাঁর শরীর ছেড়ে দিতেই ঝপ করে পড়ে গেল। তারপর শুরু হল তাণ্ডব। দেবেন্দ্রবাবুর সারা শরীরের ওপর ঝাঁপুর দলের ভোজালী ছুরির আঘাত একের পর এক ক্রমাগত পড়তে লাগল। পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধের শরীর অনেক আগেই স্তব্ধ হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। তবু ঝাঁপুরা অমিতবিক্রমে চালিয়ে যাচ্ছে ছুরি।

মিনিট দশেক পর ওদের খেলা শেষ হল। ওরা ফিরে গেল সেদিনের মতো কাজ হাসিল করে। আশিষের বাবা হওয়ার মূল্য চুকিয়ে দেবেন্দ্রবাবুর নিথর দেহ শুয়ে রইল বিবেকানন্দ নগরের মাঠে, তাঁর নিজেরই রক্তের বিছানায়।

দেবেন্দ্রবাবু সি.পি.আই.(এম) -এর সমর্থক ছিলেন। তাঁর হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ওই পার্টির তরফ থেকে মিছিল বার করা হল। প্রতিবাদ হল ঠিকই, কিন্তু ঝাঁপুরা কেউ ধরা পড়ল না। তারা যেমনভাবে চলছিল, তেমনই চলল। আশিষ কিন্তু অন্যরকম ভাবতে শুরু করেছে। সে ঝাঁপুদের এই প্রতিহিংসার জন্য নিজেও হিংসায় জ্বলে উঠল। ঠিক করল যেমনভাবে সে তার ভাইয়ের হত্যাকারী নির্মলকে খুন করেছে, ঠিক তেমনভাবেই সে তার বাবার হত্যাকারীদের পৃথিবী থেকে উধাও করে দেবে। কিন্তু এখানে একটাই সমস্যা, নির্মল ছিল একা, তাকে হত্যা করতে তার বিশেষ বেগ পেতে হয়নি, কিন্তু তার পিতৃহত্যাকারীরা সংখ্যায় অনেক এবং তারা সংগঠিত। তাদেরকে একবারে খতম করা যাবে না। তাদের একে একে খতম করতে হবে। তার জন্য তাকে কৌশল অবলম্বন করতে হবে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। তার এই প্রতীক্ষার কথা সে তার চেলাদের কাছে ঘোষণা করল। এবং আরও জানাল, এগুলো করতে হবে তাদের দলের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই। কারণ তারা যদি ঝাঁপুর দলেদের বাড়তে দেয়, তবে তাদের দলের কাজকর্ম শিকেয় উঠবে। ঝাঁপুরাই পুরো বেলঘড়িয়া ও তার আশেপাশের অঞ্চল দখল করে নেবে। আশিষ আরও জানাল, ঝাঁপুরা শুধু তার বাবাকে খুন করেনি, এর আগে তারা লক্ষ্মণ পাইনকেও খুন করে তাদের দলের মস্তিষ্ককেও উড়িয়ে দিয়েছে। আশিষের কথা তারা মেনে নিল।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার পর তাদের বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না। এপ্রিলের তেরো তারিখ রাত দু'টোর সময় আশিষের দলের শ্যামল, কল্যাণীর খোকন দাস, অমল সেন ও প্রদীপ সেনের আত্মীয় বাবু সেন ই.এম.সি কারখানার কাছে চুরি করতে গিয়ে ঝাঁপুর দলের নাড়ুকে দেখতে পেল। কারণ সে একা অল্প কিছু মালপত্র চুরি করে পালাতে চেয়েছিল। তাই অত রাতে এসেছে। কিন্তু সে সময় যে শ্যামলরা ওখানে হাজির হবে, সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। নাড়ু পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। শ্যামল ও বাবু ওকে ধরে ফেলেছে, নাড়ু ওদের কাছে কাকুতি মিনতি শুরু করল, ছেড়ে দেওয়ার জন্য। শ্যামল বলল, "ঠিক আছে, তোকে ছেড়ে দেব যদি আশিষ বলে। চল তোকে নিয়ে যাই আশিষের কাছে।" শ্যামল অমল সেনকে বলল, "তুই গিয়ে তাড়াতাড়ি আশিষকে খবর দে।" অমল চলল আশিষকে খবর দিতে।

অন্যদিকে শ্যামল, খোকন আর বাবু নাড়ুকে টানতে টানতে নিয়ে চলল স্টেশনের তিন নম্বর গেটের দিকে। বাবুর হাতে একটা খোলা পাইপগান। সে নাড়ুর পেছন পেছন চলেছে। আর ওকে দু'পাশ থেকে শ্যামল আর খোকন ধরে আছে। নাড়ুর আর পালানোর কোনও

সম্ভাবনা নেই। ওদের ওই ভাবে তিন নম্বর গেটের দিকে হাঁটা ওই নিশুতরাতে দু'চারটে রাস্তার কুকুর ছাড়া কেউ দেখতে পাচ্ছে, না। নাড়ু বুঝে গেছে, তার এই জীবন আয়ুর শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। সে তাই বাঁচার তাগিদে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল, "তোরা আমায় ছেড়ে দে, আমি এবার থেকে তোদের হয়ে কাজ করব।" শ্যামল বলল, "চুপ, একদম কথা বলবি না, তোরা শালা সব বেইমান, এক্ষুণি যা বলবি, কালকেই ভুলে যাবি।"

অমল আশিষের বাড়ি গেল। এটা আশিষের ভাড়ার বাড়ি। এখানে আশিষ বেবিকে নিয়ে থাকে। ওদের আজ অভিযানে পাঠিরে আশিষ বলেছিল, "আজ তোরা যা, আমার শরীরটা ভাল লাগছে না, বাড়িতে যাচ্ছি।"

অমল বেশ কিছুক্ষণ দরজা ধাক্কাধাক্কি করার পর ভেতর থেকে বেবি প্রশ্ন করল, "কে?" অমল বলল, "আমি অমল, আশিষকে দরকার, আমরা নাড়ুকে ধরেছি।" বেবি একটা জানালা খুলে অমলকে দেখল, বলল, "আশিষ তো রাতে বাড়িই ফেরেনি, খাওয়া দাওয়া করেনি, আমি বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছি।" অমল বলল, "তাহলে ও কোথায় গেল?" বেবির উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে অমল তাদের অন্য একটা আস্তানার দিকে চলল, যেখানে বসে আশিষ সন্ধের পর ওদের সঙ্গে মদ্যপান করছিল। অমল দ্রুতগতিতে অন্ধকার চিরে এগিয়ে যেতে লাগল।

ঠিক। ওখানেই আশিষ মদের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অমল জানে ওই ঘরে ঢুকতে গেলে কোন কায়দায় কীভাবে যেতে হবে। এই কৌশলগুলো একমাত্র তাদের দলের একেবারে কোর কমিটির লোকেরা জানে। অমল সেই কায়দায় ওই ঘরে ঢুকে আশিষকে ঠেলে ঠেলে যখন জাগাল, আশিষ আশ্চর্য হয়ে অমলকে দেখে বলল, "কি রে, এর মধ্যেই তোদের কাজ শেষ?" অমল বলল, "আমরা ঝাঁপুর দলের নাড়ুকে পেয়েছি, ওকে নিয়ে শ্যামলরা তিন নম্বর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তুই গেলে ওর ব্যবস্থা করবে।"

নাড়ুর কথা শুনে আশিষের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ল। সে তিড়িং করে লাফ দিয়ে উঠল। ঝাঁপুর দলের কাউকে সে ছেড়ে দেবে না। সে তার বাবা কিংবা লক্ষ্মণ পাইনের খুনের ব্যাপারে সরাসরি জড়িত হোক বা না হোক।

অমলকে নিয়ে আশিষ যখন ওই বাড়ি থেকে বার হল, তখন ভোর প্রায় সাড়ে চারটে। ঠিক সে সময় ওরা তিন নম্বর গেটের দিক থেকে একটা পাইপগানের গুলির আওয়াজ শুনতে পেল। ওরা দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকাল। কিন্তু দাঁড়াল না, হাঁটতে লাগল।

ওদিকে তিন নম্বর গেটের কাছে এসে নাড়ু বাঁচার তাড়নায় শ্যামলদের সামান্য অসতর্ক মুহূর্তে ছুটে পালাতে গেল। বাবু দেখে ফেলল। তার হাতের খোলা পাইপগান সক্রিয় হয়ে উঠল। পাইপগানের গুলিটা সোজা নাড়ুর পিঠে লেগে তার শরীরে আশ্রয় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মুখ থুবড়ে পড়ল। শ্যামলরা আর আশিষের জন্য অপেক্ষা করল না। পড়ে থাকা নাড়ুর শরীরে ভোজালী দিয়ে ক্রমাগত কোপ দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে স্টেশনের এক নম্বর লাইনের ধারে চ্যাংদোলা করে ফেলে দিল। নাড়ুর দেহ ঝুল করে পড়ল। তারপর শ্যামলরা ফিরে চলল তিন নম্বর গেটের দিকে। একটু এগিয়ে যেতেই তাদের সঙ্গে দেখা হল আশিষদের।

আশিষ কিছু প্রশ্ন করার আগেই বাবু বলল, "শেষ করে দিয়েছি, পালাতে চেষ্টা করেছিল, গুলি করে দিলাম।" আশিষ জানতে চাইল, "মালটাকে কোথায় ফেললি?" শ্যামল বলল, "এক নম্বর লাইনের ধারে।" আশিষ আফসোসের সুরে বলল, "ভালই করেছিস, শুধু লাইনের মাঝখানে ফেললে ভাল করতিস, ফার্স্ট আপ ট্রেনের চাকার তলায় পিষে যেত, কেউ বুঝতে পারত না, কীভাবে মরেছে।" খোকন বলল, "এখন গিয়ে ওইভাবে লাশটা রেখে এলে হয় না? " আশিষ খোকনের দিকে তাকিয়ে বলল, "না, সাক্ষী বাড়ানোর দরকার

নেই, চল, এখনও ভোর হতে অনেকটা বাকি, ঠেকে মালও কিছুটা আছে, একটা মালকে শেষ করার জন্য ওটা খেয়ে ফেলি।”

আশিষ তার দলবলকে নিয়ে গোপন আস্তানার দিকে চলল। চৈত্র শেষের 'মৃদু অগোছালো হাওয়ায় বেলঘড়িয়া স্টেশনের এক নম্বর লাইনের ধারে' চিরনিদ্রায় চোর নাড়ু শুয়ে রইল। ঠিক যেমন সপ্তাহখানেক আগে দেবেন্দ্রবাবু শুয়েছিলেন বিবেকানন্দ নগরের মাঠে।

ঝাঁপুর দলের মাত্র একজনকে সরিয়ে আশিষের শান্তি হচ্ছিল না। সে চাইছিল ঝাঁপুর দলটাকে পুরো নিকেশ করে বেলঘড়িয়ায় একচ্ছত্রপতি হতে। তারা তক্কে তক্কে রইল এবং খোঁজ করতে লাগল তার শত্রুর দলের ছেলেদের কোথায় বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়। আশিষ তার নিজের দলের ছেলেদেরও সাবধান করে দিল, যাতে তারা তাকে না জানিয়ে একা কিংবা দু'জনে এখানে ওখানে ‘ভাড়া' খাটতে না যায়। কারণ ঝাঁপু ও বুলুরা তাদের পেলে প্রেম করে ছেড়ে দেবে না। সে তাদের আরও শেখালো যে একই ‘ঠেকে' তারা যেন মদ খেতে না যায়। মদের ঘোরে কখন তাদের খুন করে ফেলে, তার জন্য প্রথম থেকে সতর্ক হয়ে যাওয়া ভাল। আশিষের দলের ছেলেরা আশিষের যুক্তি মেনে নিল। অন্যদিকে তারা ই.এম.সি কারখানার মাল চুরি করে বহাল তবিয়তে নিজেদের দলের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভালই তৈরি করে নিল। মার্চ মাসে নাড়ুকে খুন করার পর তারা এপ্রিল মে মাস জুড়ে দল বেঁধে ছিনতাই, চুরি, তোলা আদায় করে নিজেদের পকেট ভর্তি করে নিল। আশিষদের দাপটে ঝাঁপুরা কিছুটা পিছু হঠল। অন্যদিকে বেলঘড়িয়া থানার পুলিশ দেবেন্দ্রবাবু খুনের মামলায় ঝাঁপুদের খুঁজছিল, তাই তারা অবাধে ঘুরতে পারছিল না। তবে ঝাঁপু ও তার দলবল যে একেবারে চুপচাপ বসে ছিল তা নয়। তারা বেলঘড়িয়া ছেড়ে এখানে ওখানে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছিল। বিশেষ করে ঝাঁপু, বুলু ও জগু উত্তর চব্বিশ পরগনায় বেশ ক'টা ডাকাতি করল।

আশিষ একটা গোপন খবর পেল। বেলঘড়িয়ার রূপমন্দির সিনেমার পাশে গাঁজা বিক্রেতা বিশ্বনাথ সাউয়ের মেয়ে শোভার সঙ্গে ঝাঁপুর দলের শরৎ পাল জোর করে প্রেম করে।

ইন্দিরা গান্ধী খুন হওয়ার পর সর্দারজীদের ওপর যে অত্যাচার শুরু করেছিল কিছু কংগ্রেসী, তারই পরিণতি হিসাবে হরবংশ সিং ও তার ছেলে খুন হয়। সেই খুনের ব্যাপারে শরৎ পাল ও নকুল কর জড়িত ছিল। যদিও শরৎ নাকি দিব্যি রূপমন্দির সিনেমার আশেপাশে প্রায় দিনই অবাধে ঘুরে বেড়ায়, শোভার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করে। বিশ্বনাথ সাউ কোনও প্রতিবাদ করতে পারে না।

জুনের এক সন্ধেয় আশিষ তার কাটা বাঁ হাতটা প্যান্টের পকেটে লুকিয়ে শরৎকে খুঁজতে তার দলের ক'জনকে নিয়ে রূপমন্দিরের দিকে গেল। আশিষরা দূর থেকে দেখল ঝাঁপুর দলের কান্তি, বীরু, ভরত, অশোক দাঁড়িয়ে আছে। ওরা যে এক্কেবারে নিরস্ত্র নয়, তা ওদের সাজসজ্জা দেখলেই বোঝা যায়। তবু তাদের দেখে আশিষের রক্ত গরম হয়ে গেল। কারণ ওদের মধ্যে দু'জন তার বাবাকে খুন করার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী।

আশিষরা ওদের ধরবার জন্য তাড়া করল। ওরা পালাল। কোনওরকম সংঘাতে গেল না। বিশ্বনাথ ও শোভা দু'জনেই সেই দৃশ্য দেখল। আশিষের ‘বীরত্ব' দেখে তারা তার কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, “কাকে চাই?”

চুপিসাড়ে আশিষ শোভাকে সরাসরি বলল, “শরৎকে আমার চাই।” শোভাও গলা নামিয়ে বলল, “এই কথা? ঠিক আছে। আমি ব্যবস্থা করব, কিন্তু আমাকে কিছু মালকড়ি ছাড়তে হবে।” আশিষ বলল, “তা নিয়ে তোর চিন্তা করতে হবে না, আমার কাজ হয়ে গেলেই ঠিক পাবি, আমি কথা দিচ্ছি।” তারপর নিচুস্বরে ওরা আলাপ করে ঠিক করল, শরৎ শোভার কাছে এলেই শোভা একটা রিক্সাচালকের মারফৎ আশিষকে খবর পাঠাবে। আশিষ

ছক কষে সেদিনের মতো সেখান থেকে চলে গেল।

শরৎকে শোভার কোনও দিনও পছন্দ হত না। কিন্তু শরৎ গায়ের জোর খাটিয়ে তার ওপর অত্যাচার করত। সে খুব গরীবের মেয়ে, বাবা গাঁজা বিক্রি করে। তার কথা কে শুনবে? সে তাই শরতের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করত। এতদিনে শোভা শরতের শত্রুর সাক্ষাৎ পেয়েছে। মনের মধ্যে এত দিনের কুরে কুরে জ্বলতে থাকা জ্বালাটা এবার সে মেটাবেই। তাতে সে আশিষের কাছ থেকে টাকা পাক বা না পাক।

শোভার সঙ্গে যোগাযোগের তিন দিন পর নির্দিষ্ট দিনে সন্ধেবেলায় শোভার পাঠানো এক রিক্সাচালক আশিষের সঙ্গে দেখা করে জানাল, "দাদা, রূপমন্দিরের পেছনে এক নম্বর মন্দিরে শোভা আছে, সেখানে আপনারে দেখা করতে কইছে।" আশিষ ওর কথাটা শুনে বলল, "ঠিক আছে তুই যা।" রিক্সাচালক আশিষের কাছ থেকে দশ টাকার একটা নোট নিয়ে অন্য দিকে চলে গেল৷

আশিষ রিক্সাচালকের সামনে তার প্রতিক্রিয়া না জানালেও দ্রুত তার দলের খোকন, বাবু সেন, শ্যামল ও কার্তিককে খুশির খবরটা জানাল। তারা দ্রুত প্রস্তুত হয়ে নিল। শোভার খবরের মধ্যে শরতের উপস্থিতির ইঙ্গিত যে আছে তা তারা নিশ্চিত। ওরা চারজন দুটো রিক্সায় উঠে রূপমন্দির সিনেমার দিকে চলল। ওরা অসম্ভব সতর্ক। শোভা ওদের খবর পাঠিয়ে ঝাঁপুর দলের লোকেদেরও খবর দিতে পারে, শোভাদের পুরোপুরি বিশ্বাস করাটা কঠিন। কোন সময়ে, কোন মুহূর্তে যে তারা কোন দিকে ঢলে যাবে, তা শোভারা নিজেরাও জানে না। তাই আশিষরা রিক্সায় অতিরিক্ত সাবধান।

কিন্তু শোভার মনের বর্তমান খবর তো আশিষের জানা নেই। ওরাও সময়ে সময়ে টাকার ঊর্ধ্বে উঠে নিজেদের সম্মানের প্রশ্নটাকে বড় করে দেখে। আশিষরা এসব বোঝে না। রক্তের পথই যাদের একমাত্র জীবনদর্শন, মানব-মানবীর গভীর তন্ত্রে কী সুর কখন বাজে, তার খোঁজ তারা কখনও রাখে না।

আশিষরা রাত আটটা নাগাদ রূপমন্দির সিনেমা হলের পেছনে নামল। রূপমন্দির ছোট সিনেমা হল। রাতের শেষ শো চালু হয়ে গিয়েছে। আশিষরা যে নিঃশব্দে ওখানে নামল, তা কেউ টের পেল না।

আশিষ ও বাবুরা শোভার কথামতো মন্দিরের চত্বরে গোপনে ঢুকে পড়ল। বর্ষাকালে সন্ধের পর লোকজন চারপাশে এমনিই কম। বাবু মন্দিরের চাতালে উঠে উঁকি দিয়ে মন্দিরের ভেতরটা দেখল। ঠিকই, একটা ছোট হ্যারিকেনের পাশে বসে শোভা শরৎকে নিয়ে মদ খাচ্ছে। মদের বোতলের ধারে টুকটাক খাবার দাবার। শরতের বাঁ হাতটা শোভার শরীরের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। শোভা মাঝেমাঝে শরতের হাতটা সরিয়ে দিচ্ছে। হ্যারিকেনের আলোয় ওদের ছায়াটা কেমন দীর্ঘ। আর ওদের নড়াচড়ার সঙ্গে ছায়া নড়ে চড়ে স্থির হয়ে শান্ত হচ্ছে। বাবু মন্দিরে চাতালে দাঁড়ানো ওদের বাকি তিনজনকে ইশারায় ডাকল।

লাফ দিয়ে আশিষরা মন্দিরের খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। শরৎ ওদের দেখে শোভাকে ছেড়ে দিয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল, কোনমতে ঠোঁট নেড়ে বলতে লাগল, "আমি, আমি।" আশিষ বলল, "হ্যাঁ, তুই, তোকে নিতে এসেছি, চল।" শরৎ কোন প্রতিরোধই করতে পারল না। একে নেশায় টলমল, তার ওপর তার নিজস্ব প্রেমক্ষেত্রে আশিষদের হঠাৎ আগমনে সে এতটাই ঘাবড়ে গিয়েছে যে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না।

আশিষরা ওকে বিভা সিনেমার কাছে নিয়ে এল এবং ঝাঁপুদের পরিত্যক্ত একটা ফাঁকা ঘরে ওর হাত পা মুখ বেঁধে ফেলে রাখল। যাতে সে উঠে পালাতে কিংবা চিৎকার করে কাউকে না ডাকতে পারে।

আশিষ মন্দির থেকে শরৎকে নিয়ে আসার সময় দু'টো একশ টাকার নোট শোভার হাতে গুঁজে দিয়ে এসেছিল। টাকা পেয়ে শোভা তাকে তার সঙ্গে মদ খাওয়ার নেমন্তন্ন জানিয়েছিল। আশিষ তাকে অন্য এক জায়গায় আসতে বলে এসেছে। বাঁধাছাদা করার পর,

আশিষ খোকনকে শরতের পাহারায় রেখে দিয়ে এসে শোভার সঙ্গে মদ্যপান করতে চলে গেল।

ওরা তিনজন শোভাকে মাঝখানে বসিয়ে মদ খেয়ে শরতের কাছে ফিরে এল। খোকনকে দিল একটা বাংলা মদের পাঁইট। খোকন ঢকঢক করে গিলে ফেলল। মদ খাওয়ার পর রাত এগারোটা নাগাদ ওরা চারজন শরৎকে নিয়ে চলল টেক্সম্যাকো কারখানার ওয়েব্রিজের কাছে। অন্ধকার জায়গা, আশেপাশে বেশ কিছু ঝোপঝাড়। কার্তিক একটা পাইপগান দিয়ে শরতের মাথায় গুলি করল। শরৎ ছিটকে পড়ে গেল। বাবু তাকে উল্টে দিল। আশিষ তখন শরতের কণ্ঠনালির ওপর ভোজালীর একটা কোপ মারল। তারপর টানতে টানতে ওরা শরৎকে পাশের একটা নর্দমায় ফেলে ইট চাপা দিয়ে রেখে চলে এল।

নেশাগ্রস্ত আশিষের কেমন একটা সন্দেহ হল যে, তার মারা ভোজালীর কোপটা শরতের কণ্ঠনালী ঠিক মতো কাটতে পারেনি। তাই ওরা ফিরে আসার পর আশিষ তার দলের অন্যদের বলল, "চল তো, শালা শরৎকে দেখে আসি, মালটা মরেছে কি না।" খোকন বলল, "তুই যা জোরে ভোজালীর কোপ মেরেছিস, না মরে যায় না। ও শালা তখনই পগারপার।" আশিষ বলল, "না রে, আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে।"

দলপতি যখন অনুরোধ করছে, তখন বাকিদের সেই অনুরোধ না রাখার অর্থ দলপতির হুকুম অমর্যাদা করা। তারা তাই কথা না বাড়িয়ে আশিষের পেছন পেছন আবার টেক্সম্যাকো কারখানার দিকে চলল।

সত্যিই তাই। নর্দমায় চিৎ হয়ে শুয়ে শরৎ গোঁ গোঁ শব্দ করছে আর যন্ত্রণায় ছটফট করছে, অর্থাৎ সে তখনও মরেনি। আশিষ শরৎকে ওই অবস্থায় দেখে খোকনের দিকে একবার তাকিয়ে মুচকি হাসল। খোকন বোধহয় একটু লজ্জা পেল, বাবুকে সঙ্গে নিয়ে সে কালো নর্দমা থেকে টেনে তুলল শরতের আধমরা দেহ। ওকে তোলার পর কার্তিক আর আশিষ ঝপাঝপ শরতের কাটা মাথা আর পেটে আরও কটা ভোজালীর কোপ মারল। রক্ত বার হল। আশিষ বলল, "এবার ফেলে দে।" ওরা তিনজন আবার শরতের দেহটা চারটে ইট বেঁধে নর্দমায় ফেলে দিল। এবার আশিষ নিশ্চিত, শরৎ শেষ। আশিষ খুশি, তারা ফিরে চলল যে যার বাড়ি। রাত একটায় ওদের মদ্যপানের পর হিংস্র মত্ততা কেউ দেখল না।

পরদিন সকাল আটটায় বেলঘরিয়া থানার পুলিশ শরতের লাশ ওই নর্দমা থেকে উদ্ধার করে পোস্টমর্টেমে পাঠিয়ে দিল। আশিষদের হাত পরিষ্কার। শোভা ছাড়া সাক্ষী প্রায় নেই। এবং শোভাও প্রত্যক্ষ সাক্ষী নয়। শোভা যদি বা কোনখানে ষড়যন্ত্রের কথা বলেও দেয়, তবে সেও অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেলে চালান হয়ে যাবে। সুতরাং তাকে নিয়ে আশিষদের ভয় নেই। শোভা এখন তাদের। প্রয়োজনে তাকে নিয়ে হুল্লোড় করা যাবে।

জুলাই মাসের প্রথমদিকে এক ভোরে আশিষ তার দলের ছেলেদের নিয়ে রাতের অভিযান শেষে বাড়ি ফিরছে। এখন সে তার দলে আরও অনেক ছেলেকে নিয়েছে। তবে তার একান্ত অনুগত খোকন দাস ও শ্যামলকে সে বিশেষ বিশেষ কাজগুলোর দায়িত্ব দেয়। যেমন রাতের অভিযানের পর যেসব মালপত্র হস্তগত হয়, সেগুলো লুকিয়ে রাখা ও বিক্রি করার দায় সে তাদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছে। তারা ওস্তাদের কথা অনুযায়ী ভালই কাজ কারবার করছে। আশিষ তাদের খোলা মনে বেশি বকশিস দেয়। সেদিন রাতেই কাজের শেষে হস্তগত মালপত্র নিয়ে তাদের দুজনকে সে তার গুপ্ত গোডাউনে ঠিকমতো রাখার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। তারপর মনের সুখে এগিয়ে চলেছে বেলঘড়িয়া স্টেশনের দিকে। ভোর পাঁচটা। দোকানগুলো এখনও চা তৈরির আয়োজন সম্পূর্ণ করেনি। একমাত্র স্টেশন এলাকাতেই পাওয়া যাবে। ওরা তাই খুশ মেজাজে চা পান করতে সেদিকে চলেছে। গতরাতের মদ্যপানের খোয়াব কিছুটা কাটবে। তারপর আবার তাদের নতুন দিনের শুরু নতুন ভাবে, সেটা কীভাবে আসবে তা না জানে তারা, না জানে বেলঘড়িয়ার সাধারণ মানুষজন।

নকুল করের ছেলে অশোক তখন আশিষের দলে। সেও আছে তাদের সঙ্গে। সে আশিষকে ফিসফিসিয়ে বলল, "গুরু, রবিকে দেখেছিস?" আশিষ রবি নস্করকে ঠিকমতো চেনে না। সে অশোকের প্রশ্ন শুনে জানতে চাইল, "কোথায়?" অশোক স্টেশন সংলগ্ন একটা চায়ের দোকানের দিকে আঙুল তুলে একটা ছেলেকে দেখিয়ে বলল, "ওই তো মালটা।" আশিষ দেখল,

একটা গাট্টা গোট্টা কালো ছেলে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে দোকানদারের সঙ্গে কথা বলছে। আশিষের মাথায় চড়চড়িয়ে চড়ে গেল প্রতিশোধের রক্ত। সে জানত, তার বাবার খুনের সময় রবি বোমা নিয়ে সেই হত্যার মিছিলে শুধু যোগই দেয়নি, স্টেশন থেকে বিবেকানন্দ নগর পর্যন্ত তার বাবার খুনের ব্যাপারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল।

আশিষ আর দেরি করল না। রবি যাতে ওদের দেখে পালিয়ে না যেতে পারে, সেইজন্য তার সঙ্গী অশোক কর সমেত গালকাটা সুবল, নাটা বাবলু, লম্বু কাঞ্চনকে ছুটে গিয়ে তাকে ধরবার নির্দেশ দিল।

দূরত্ব খুব বেশি ছিল না। মিনিট খানেকও লাগল না। রবি আশিষদের বেষ্টনীতে আটকে গেল। আশিষদের আর চা খাওয়া হল না। তারা রবিকে নিয়ে একটা রিক্সায় উঠল। রিক্সা আশিষের নির্দেশে চলল ঘোলা রোডের দিকে। রিক্সার মাঝখানে রবিকে বসিয়েছে আশিষ, আর ওরা পাঁচজন রিক্সার এদিকে ওদিকে রবিকে ঘিরে। রিক্সা চালক ছ'জনকে নিয়ে টানতে পারছে না। কিন্তু কোনও উপায় নেই। এ যে আশিষের নির্দেশ। তাকে অমান্য করার সাধ্য তার মতো অতি সাধারণ রিক্সাচালকের কোথায়?

ভোর ছ'টা। তারা ইঁট গোলার পুকুরপাড়ে রবিকে নিয়ে হাজির। বর্ষার পুকুর টইটম্বুর। শান্ত। মাঝে মধ্যে ভোরের হাওয়া তার বুকের জল নিয়ে এদিক ওদিক খেলছে। এখনও তার জলকে নিয়ে মানুষের নিত্যদিনের সংসার শুরু হয়নি। সে ঘুম থেকে উঠে বোধহয় আড়মোড়া ভাঙছে।

আড়মোড়ার মধ্যেই হঠাৎ আতঙ্ক। গুলির শব্দ। রবিকে আশিষরা পুকুর পাড়ে দাঁড় করিয়ে তাদের কোমর থেকে রিভলবার বার করে রবির বুকে ঠেকিয়ে দুটো গুলি করল। রবি ছিটকে পড়ল। একবার বোধহয় উঠে বসার চেষ্টা করল। পারল না। বুক থেকে আস্তে আস্তে রক্ত বার হতে হতে ভেসে যেতে লাগল। তারপর তার দেহ সম্পূর্ণ চুপচাপ। বর্ষার কাদার ওপর সে ঘুমিয়ে পড়ল।

আশিষরা ফিরে চলল। রিক্সাটা তখনও আশিষের নির্দেশ অনুযায়ী একটু দূরে অপেক্ষা করছিল। তারা স্টেশনের ধারে চা খেতে যাবে। আশিষরা দল বেঁধে রিক্সায় উঠল। রিক্সাচালক উল্টোদিকে চলতে শুরু করল।

শান্ত পুকুর আড়মোড়া ভেঙে দেখল, তার পাড়ে একটা জলজ্যান্ত যুবক রক্তাক্ত শরীর নিয়ে শুয়ে আছে। এমন ভাবে শুয়ে থাকতে সে বহু যুবককে দেখছে, তাই তার আর এখন প্রতিক্রিয়া হয় না। সে জানে অন্ধকার পৃথিবীটা এমনই। আজ যে দাপায়, কালই সে শান্ত। আজ যে বোমা পিস্তল হাতে নিজেকে বাদশা ভাবে, আগামিকাল সে খালি হাতের ভিখারী।

তার মৃতদেহের কাছে কটা পিঁপড়ে এগিয়ে যায় গরম রক্ত খেয়ে নিজেদের বলিষ্ঠ করতে। ব্যস, পৃথিবীর কাছে সেই বাদশার দায় ওইখানেই শেষ।

ওই পুকুরের চারপাশের বাসিন্দা, যারা পুকুরের জলে তাদের দিনগুজরানের কোনও কোনও কাজ সমাধা করে, তারা কয়েকজন থালাবাসন পরিষ্কার করতে কিংবা স্নান করতে এল। তারা দেখল রবি নস্করের মৃতদেহ। তারা কী করবে? তারা তো আর ওই দৃশ্য দেখে তাদের কাজ একেবারে বাদ দিতে পারে না। তাদের ওইসব কাজ তো তাদের বেঁচে থাকার অংশ, নিষ্ঠুর বাস্তব। সেই বাস্তবতা বাদ দিয়ে তারা রবির মৃতদেহ নিয়ে কী করবে। তারা খুনের গল্প নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে যে যার কাজ তাড়াতাড়ি সারতে লাগল। তাদেরই মধ্যে একজন কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি রবির লাশের খবর দিল বেলঘড়িয়া

থানায়। থানা থেকে যথারীতি প্রায় চার ঘণ্টা পর দশটা নাগাদ পুলিশকর্মীরা এল এবং রবির লাশ নিয়ে . চলে গেল তাদের পরবর্তী কাজ করতে।

ওই বছরেরই বিশে জুলাই আশিষ খবর পায় তার বাবার হত্যাকারী দলের ক'জন ঝাঁপুর শাগরেদ রোজ ভোরবেলায় ওয়াগন লুঠ করে স্টেশনের চার নম্বর লাইনের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যায়। ওরা দলে কোনও দিন চারজন, কোনওদিন পাঁচজন থাকে। খবরটা পেয়ে আশিষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। একসঙ্গে ঝাঁপুর দলের এতগুলো লোকজনকে পেলে সে একটা বড় ধরনের প্রতিশোধ নিতে পারবে। ঝাঁপুও বুঝবে তার বাবাকে হত্যা করে তাকে শিক্ষা দিতে গিয়ে সে কতবড় ভুল করেছে। সেই ভুলের পরিণামের মাশুল তাকে দিতে হচ্ছে তার দলের প্রত্যেক ছেলেকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে। আশিষ সেদিনই তার দলের ছোট বড় প্রত্যেক সদস্যকে তার আস্তানায় ডেকে বলল, "ওই শালা ঝাঁপুর মালেদের সব কটাকে শেষ করে দিতে হবে। ওদের ওয়াগন লুটের মাল আমাদের হাতাতে হবে। তাই আগামীকাল ভোরবেলাতেই ওদের আমরা শেষ করে দেব। এমন সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না।"

সেই মিটিংয়ে হাজির কেলো, সনৎ, লেলো, বাঁকি, পোঁ, নাটা বাবলু, লম্বু কাঞ্চন, আগরপাড়ার চার নম্বর গলির কালু শাঁখারী, বাপি, সোদপুরের অনুপ, আরিয়াদহের দিলু, এবং অবশ্যই তার ডান হাত কার্তিক, শ্যামল ও খোকন দাস। এরা প্রত্যেকে আশিষের প্রস্তাব একবাক্যে মেনে নিল এবং পরদিন ভোরেই যে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করতে হবে, সেই সিদ্ধান্ত নিল।

তারপর তারা আলোচনায় বসল কীভাবে এই পরিকল্পনা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায়, তার বিস্তারিত আলোচনায়। প্রথমেই তারা বলল, ঝাঁপুর লোকেরা ওয়াগন লুঠ করার পর নিশ্চয় আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া ফিরবে না। তাদের হাতেও থাকবে বোমা বা রিভলবার, পিস্তল ইত্যাদি। সুতরাং ওদেরও রাখতে হবে ভাল রকম অস্ত্র।

আর একটা ব্যাপার ওরা ঠিক করল। ওদের ধরার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যেন ওরা টের না পায়, ওদের ওপর আমরা আক্রমণ করব। তাই ওরা নিজেদের গোপন রেখে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা ছক কষল।

ছকটা হল, চার নম্বর লাইনের ধারে আশিষ গামছা পরে একটা ঝোপের ধারে বসে থাকবে। এমনভাবে থাকবে, মনে হবে কোনও লোক বোধহয় অন্ধকারে বসে প্রাত্যহিক কাজ সারছে। মুখটা আশিষ ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রাখবে, যাতে ওরা ওকে দেখলেও চিনতে না পারে। ওরা আশিষের কাছাকাছি এলে, আশিষ যদি দেখে সত্যিই তাদের চিহ্নিত লক্ষ্যবস্তু আসছে, তখন ঝোপের আড়াল থেকেই মুখ দিয়ে একটা শিস দেবে। ওই শিসের একটাই অর্থ, শত্রু সামনে ——ঝাঁপিয়ে পড়। দলের বাকিরা কেউ থাকবে চার নম্বর রেল লাইনের অন্য ঝোপের আড়ালে, কেউ থাকবে লাইনের ঝুপড়ির পেছনে। কে কোথায় থাকবে, সেটা ভোরবেলায় গিয়ে ঠিক করে নেবে। মিটিংয়ে ঠিক হল, রাতে কেউ বাড়ি ফিরবে না। ওই আস্তানাতেই রাত কাটাবে। ব্যবস্থা পাকা হওয়ার পর আশিষ বাংলা মদ আনাল গোটা সাত আট বোতল। সঙ্গে বেশ কিছু খাবার দাবার। সে গুলো ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে হাওয়া হয়ে গেল। তারপর ওরা দলা পাকিয়ে একটা ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

আশিষ একমাত্র জেগে রইল। সে পাহারা দেবে। সে জানে এখন তার ঘুমোন চলে না। সে হচ্ছে রাজার রাজা। আক্রমণের আগে তার ঘুমোতে নেই। অন্ধকার ফিকে হওয়ার আগেই সবাইকে জাগাতে হবে, নয়ত নেশার ঘোরে অন্যরা যখন ঘুম থেকে উঠবে, ততক্ষণে ঝাঁপুর ছেলেরা তাদের পরিকল্পনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যে যার বাড়ি চলে যাবে। আশিষ সারারাত ঘরের বাইরে পায়চারি করছে। কোনও এক জায়গায় স্থির হয়ে বসছে না। সে জানে, স্থির হয়ে বসলেই বাংলা মদের ক্রিয়ায় তার ঝিমুনি আসবে এবং সেই ঝিমুনি তাকে নিয়ে যেতে পারে ঘুমের দেশে। ঘুম এখন তার কাছে শত্রু। বাকি তার তেরোজন সেনা একটু ঘুমিয়ে নিক, তাহলে তরতাজা হয়ে ওরা ওর শত্রুদের ভালভাবে মোকাবিলা করতে পারবে।

আশিষ ঘন ঘন তার ডানহাতে বাঁধা ঘড়িটা দেখছে। সে ঠিক করেছে, ভোর চারটের মধ্যেই তাদের তৈরি হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যেতে হবে। তাই ওদের সে সাড়ে তিনটের মধ্যেই ডেকে তুলে দেবে। রাত একটা, দুটো, তিনটে। আশিষ আস্তে ঘরে ঢুকে প্রথমে খোকন ও শ্যামলকে ডেকে তুলল। ওদের দুজনকে নিয়ে সে বোমা, পাইপগান, রিভলবারগুলো সব গুছিয়ে কিট ব্যাগ ও অন্যান্য থলিতে রাখল।

তারপর তারা একে একে বাকি এগারোজনকে ঘুম থেকে টেনে তুলল। তারা সবাই চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে দাঁড়াল। তাদের মনে পড়ে গেল সেদিনের অভিযানের কথা। সবাই প্রস্তুত হয়ে নিল। আশিষ তার জামাকাপড় ছেড়ে একটা পুরোনো গামছা পরে নিল। সব কিছু ঠিক। ওরা বেরিয়ে পড়ল। রাত তখন সাড়ে তিনটে। আকাশ মেঘে ঢাকা। অন্ধকার তাই বেশ গাঢ়। রাস্তার কুকুররাও কেউ আশেপাশে নেই। সম্ভাব্য বৃষ্টির আশংকায় তারাও যে যার মতো নিরাপদ আস্তানা খুঁজে নিয়েছে। শুধু আশিষদের চোখে ঘুম নেই। তাদের তো আজ একটা বিরাট অভিযান রয়েছে। যে অভিযানে বেলঘড়িয়ার রাজত্ব তারা নিজেদের হস্তগত করবে। চৌদ্দ জন সেনার দল সেই লক্ষ্যে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। রাতের মদ্যপানের ঘোর কারও কেটেছে, কারও কাটেনি। কিন্তু সবাই আশিষের পেছন পেছন স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলল। স্টেশনের চারপাশটা আশিষ নিজের হাতের রেখার থেকেও ভাল চেনে। অন্ধকারেও সব কিছু ঠাহর করতে পারে। কোন ঝোপটা কোন জঙ্গলী গাছের, তাও সে জানে। ঝুপড়ির কোন ঘরে কে কে থাকে তাকে বলে দিতে হয় না। শ্যামল ও খোকনও চেনে। সে তাই বাকি তেরোজনকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিয়েছে। এক একটা দলকে নেতৃত্ব দেবে শ্যামল, খোকন ও বাপি। বাইরে থেকে যারা এসেছে, তারা যেন শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

প্রত্যেকেই প্যান্ট আর শার্ট পরা। তাদের হাতে হাতে কোনও না কোন অস্ত্র আছে। একমাত্র আশিষ অদ্ভুতভাবে একেবারে প্রথমে চলেছে। তার পরনে শুধু একটা গামছা। খালি গা। ডান হাতে একটা রিভলবার। ব্যস, তার সারা শরীরে আর কিছু নেই।

ভোর চারটে। ওরা চার নম্বর লাইনের ধারে এসে দাঁড়াল। সেখানে লাইন ও ঝুপড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে একটা কাঁচা পায়ে হাঁটা রাস্তা লাইন বরাবর চলে গেছে। ঝুপড়িগুলোর মাঝখানে ঝোপঝাড় ছাড়াও, ঝুপড়িবাসীদের শখের লাউ, 'কুমড়ো ইত্যাদি গাছ আছে। কখনও বা সেই পথের থেকে অন্য রাস্তা বেলঘড়িয়ার ভেতরদিকে বিভিন্ন পাড়ার দিকে চলে গেছে। সে সব রাস্তাগুলো সারাদিনই ব্যস্ত থাকে। ট্রেনের যাত্রীরা ট্রেন ধরবার জন্য বা ট্রেন থেকে নেমে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্য ওইসব রাস্তা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। ওদের চোদ্দজনের দলটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়াল। চোদ্দ জনের ছায়া দেখলে হঠাৎ গা ছমছম করে উঠতে পারে। আশিষ আর শ্যামল ফিসফিসিয়ে কথা বলে এক একটা ছোট দলকে ঝুপড়ি ও ঝোপের অন্ধকারের অন্তরালে লুকিয়ে রাখল। বাইরে থেকে কারও বোঝার উপায় নেই, ওখানে কোনও লোক লুকিয়ে আছে। ঝুপড়ির বাসিন্দাদের পোষা দু'একটা কুকুর মাঝে মধ্যে 'ঘেউ ঘেউ' করে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু ওই পর্যন্তই, এর বেশি ওরা আর এগোল না। জীবনের অগোছালো ব্যবস্থায় তারাও পরিচিত। তাদের কাছে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। বাকিটা ব্যতিক্রম। প্রত্যেকের আড়ালের ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার পর গামছা পরা আশিষ একটা ঝোপে ঢুকে প্রাকৃতিক কাজ করার ভঙ্গীতে বসে পড়ল। লাইনের একেবারে ধারে এবং কাঁচা রাস্তা ধরে কেউ এগিয়ে এলে সে পরিষ্কার দেখতে পাবে। ঝোপের গাছগুলো বৃষ্টির জলে ভেজা। ভেতরে সে আশ্রয় নিতেই ভেজা ঝোপের গাছের পাতা থেকে জল পড়ে তার খোলা শরীর ভিজিয়ে দিল। আক্রমণ করল মশার দল। কোনও কিছুই তাকে বিচলিত করল না। সে শুধু নিজের মুখটা ঝোপের পাতার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রাখল, চোখ দুটো খোলা। ডান হাতে উঁচিয়ে ধরা খোলা রিভলবার। যে কোনও আচমকা আক্রমণ মোকাবিলায় সেটা উদ্যত। পাশে রাখা আছে একটা থলি। তাতে আছে প্লাস্টিক বোমা।

সাড়ে চারটে। দু'একটা কুকুরের উঁচুস্বর আশিষ শুনতে পেল। আওয়াজ তার তেরোজন সৈনিকের কানেও নিশ্চয় পৌঁছেছে। সে কুকুরদের আওয়াজের লক্ষ্যবস্তুর দিকে গলা বাড়িয়ে দেখল, তিনটে ছেলে চার নম্বর লাইনের ধারে ঝাঁপুর শাগরেদ তুলসীর চোরাই লোহার দোকানের দিকে সি.সি.আর. সেতুমুখী যাচ্ছে। তার অর্থ তারা তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। সে চোখ বড় বড় করে ওই তিনটে ছেলেকে চেনার চেষ্টা করল। তারা সত্যি ঝাঁপুর দলের ছেলে না অন্য কেউ। ঝাঁপুর দলের ছেলেরাই তার নিশানা, অন্যদের সে কিছুই করবে না। তারা তার শত্রু নয়।

ছেলে তিনটে আরও এগিয়ে এলে সে তাদের চিনতে পারল। একটা নিত্যগোপাল দাস আর দুজন হচ্ছে দুলাল চক্রবর্তী ও নিতাই দে। ওরা তিনজনেই ওয়াগন লুঠ করত। শুধু তাই নয়, ইন্দ্রপুরীতে একটা বাড়িতে আশিষের নাম করে ওরা ডাকাতি করে এসেছে। ওদের তিনজনকে দেখেই আশিষ জ্বলে উঠল। ওরা তিনজনই ওর বাবার খুনের সময় ছিল। নিত্যই তার বাবার ঘাড়ে প্রথম ভোজালীর কোপ মারে। সামনে শত্রু শিবিরের তিনজনকে দেখে আশিষ আর দেরি করল না। ওই তিনজন যখন তার থেকে হাত বিশেক দূরে, সে তার থলি থেকে দুটো প্লাস্টিক বোমা বার করে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিল।

বিকট শব্দে বোমা দুটো নিতাইদের সামনে ফাটল। ওরা হতচকিত হয়ে গেল। ভোর পাঁচটা নাগাদ বোমার আক্রমণ ওরা আশা করেনি। কিন্তু ওরা ও পেশাদার সমাজবিরোধী। চট করে বুঝে গেল কী হতে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের শত্রুকে তখনও তারা দেখতে পায়নি। তাই তারা প্রতিআক্রমণ করারও লক্ষ্য স্থির করতে পারছে না। এখন একমাত্র উপায় রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যাওয়া। ওরা সেটাই ঠিক করল।

কিন্তু আশিষ অতি ধূর্ত। সে তার শত্রুদের অত সহজে পালাতে দেবে কেন? যখন তার তেরোজন সৈনিক যুদ্ধের জন্য পাশেই লুকিয়ে আছে। সে তাই নিত্যদের কোনও সুযোগই দিল না। বোমা ছুঁড়ে ওদের বিমূঢ় করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডানহাতের দুটো আঙুল নিজের মুখে ঢুকিয়ে শিস দিয়ে উঠল। আর চোখের পলকে তার সেনানীরা শ্যামল, খোকন ও বাপির নেতৃত্বে অন্ধকার ফুঁড়ে নিতাইদের তিনজনকে ঘিরে ধরল।

আশিষ সামনে সেনাপতির ঢঙে এগিয়ে এল, তার কাটা বাঁ হাতের ডানায় ঝুলছে থলিটা। তার ভেতর আছে অবশিষ্ট তিনটে বোমা। সে সেই থলিটা শ্যামলের দিকে বাড়িয়ে দিল। আশিষ শুধু ছেঁড়া গামছা পরে ডান হাতে খোলা রিভলবার নিয়ে ওদের তিনজনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাকিরা অন্য অস্ত্র হাতে ঘিরে আছে। নিত্যদের পালানোর আর পথ নেই। এখন শুধু আশিষের মন মতো তাদের চলতে হবে।

আশিষ তার বিক্রম দেখাতে ওই তিনজনকে নিয়ে যতীন দাস নগরের দিকে চলল। ওই তিনজনই যতীন দাস নগরে বিভিন্ন বাড়িতে ভাড়া থাকত। ভোরবেলায় তখনও যতীন দাস নগরের বাসিন্দারা ঘুম থেকে উঠে রাস্তায় বেরিয়ে আসেনি। দু'একজন আশিষের ওই মিছিল দেখে, পরবর্তী ঘটনার নিশ্চিত পরিণতি কী হবে সেটা অনুমান করে, আঁৎকে উঠে এদিক ওদিক ছিটকে গেল। আশিষ নির্বিবাদে তার মিছিল নিয়ে চলল। মিছিলের সামনের দিকে শ্যামল আর খোকন। মাঝখানে বন্দী নিতাই, দুলাল আর নিত্য। ওদের ঘিরে আছে লম্বু কাঞ্চন, নাটা বাবলু, সনরা। আর একেবারে পেছনে গামছা পরিহিত হাতকাটা আশিষ।

যতীন দাস নগর চক্কর দিয়ে আশিষ ওদের নিয়ে গেল তার নিজের অঞ্চল গোলা রোডে। নিতাইরা চলতে চলতে আশিষের কাছে ক্রমাগত মিনতি করতে লাগল, মুক্তি পাওয়ার জন্য। কিন্তু আশিষের কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই ওদের ছেঁদো কথায়। সে অবিচল। গোলা রোডের ধারে একটা সরু গলিতে ওই তিনজনকে আশিষ নিয়ে গিয়ে প্রথমে রাস্তার ধারে বসতে বলল। নিতাইরা বাধ্য ছেলের মতো বসল।

আশিষ কিছু দড়ি যোগাড় করল। সেই দড়ি দিয়ে সে প্রথমে নিত্যর হাত আর পা বাঁধল। তারপর একইভাবে হাত পা বেঁধে নিতাইকে ফেলে দিল রাস্তায়। দড়ি শেষ। কিন্তু

ভোরবেলায় আর কোথায় দড়ি যোগাড় করতে যায়? আশিষ একটানে তার পরনের গামছাটা খুলে উলঙ্গ হয়ে গামছাটা লম্বু কাঞ্চনের হাতে দিয়ে বলল, "তিন টুকরো করে ছেঁড়।" লম্বু আশিষের কথা মতো গামছাটাকে লম্বা করে তিন ফালি করে ছিঁড়ে আশিষের নির্দেশ অনুযায়ী দুলালের পা বেঁধে দিল। তারপর পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল তার হাত। এবং বাকি এক ফালি গামছা দিয়ে বেঁধে দিল দুলালের মুখ।

নিজেকে উলঙ্গ দেখে আশিষের কেমন লজ্জা লজ্জা করছিল। সে কাঞ্চনদের বলল, "দুলালের পায়ের দিকটা খুলে ওর প্যান্ট খুলে নে।" কাঞ্চন দুলালের পায়ের বাঁধনটা খুলে পরনের প্যান্টটা খুলে আশিষকে দিল। আশিষ সেটা পরে নিজেকে একটু ভদ্র ভাবল।

ভোর তখন সোয়া পাঁচটা। আশিষ সেই গলির ভেতর একটা বাঁশের বেড়া থেকে খোকনদের বলল কটা বাঁশ খুলে নিতে। খোকনরা দ্রুত ছ'সাতটা বাঁশ সেই বেড়া ভেঙে নিয়ে নিল। গরীব গৃহকর্তা জানল না, কী মহৎ কাজে আশিষরা তার শখের বাগান ঘেরার জন্য যে বাঁশ সে পুঁতেছিল, তা লাগবে।

আশিষ নিজেও একটা বাঁশ খোকনদের হাত থেকে নিয়ে নিল। তারপর সে নিতাইদের তিনজনকে বাঁশ দিয়ে এলোপাথাড়ি পেটাতে শুরু করল। ছ'সাতজনের বাঁশের বাড়ি বিশ্রামহীনভাবে তাদের শরীরে পড়তে নিতাই আর নিত্য চিৎকার শুরু করল। দুলালের মুখ আশিষের ছেঁড়া গামছার একটা ফালি দিয়ে বাঁধা, সে বাঁশের বাড়ি খেয়েও চিৎকার করতে পারল না।

ভোরবেলায় নিতাই ও নিত্যর ত্রাহি ত্রাহি চিৎকারে গলির ভেতরের অনেক বাসিন্দা ঘুম থেকে জেগে উঠে ব্যাপারটা কী ঘটছে তা দেখার জন্য তাদের সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এল। তারা ওই বীভৎস কাণ্ড দেখে আশিষদের নিবৃত্ত করতে এগিয়ে এল। তারা প্রায় প্রত্যেকেই আশিষকে চেনে। তাদেরই মধ্যে একজন মধ্যবয়স্ক লোক আশিষকে কোনমতে বললেন, "বাবা আশিষ, ওদের এ ভাবে মারিস না, ওরা তো মরে যাবে।" আশিষ সেই ভদ্রলোককে আগুনের মতো চোখ করে উত্তর দিল, "আমার বাবাকে যখন এই শুয়োরের বাচ্চারা খুন করেছিল, তখন তো এদের গিয়ে আপনারা থামাতে পারেননি, এখন কেন আমাদের বলতে এসেছেন, এখন আপনারা এখান থেকে যান, আমাদের কাজ করতে দিন।" ভদ্রলোক আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, আশিষ তাঁকে বলল, "চুপ, নয়ত, এদের সঙ্গে আপনাকেও যমের কাছে পাঠিয়ে দেব।" শ্যামল বলল, "এরা সব ওয়াগন ব্রেকার, ডাকাত, তাই এদের যা দাওয়াই দরকার তা আমরা দিয়ে দিচ্ছি।" ভদ্রলোক তবু কোনমতে অস্ফুট স্বরে বললেন, "তোমরা কী?" কথাটা আশিষদের দলের কারও কারও কানে গেল। তারা তাঁকে তাড়া করে ধরতে গেল, কিন্তু গলির অন্য বাসিন্দারা যারা এতক্ষণ দর্শকের ভূমিকায় ভাল অভিনয় করছিল, তারা ওই ভদ্রলোককে টেনে তাদের দিকে নিয়ে গেল।

আশিষরা এবার রাস্তার ধারে পড়ে থাকা কতগুলো ইঁট হাতে তুলে নিল এবং সেই ইঁট দিয়ে ওই তিনজনের আধমরা শরীরের মুখে ও বুকে একের পর এক দেহের সমস্ত জোর দিয়ে ঘা দিতে লাগল। সেই ঘা খেয়ে দুলালের মুখের গামছা খুলে গেল। মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়তে লাগল। নিতাইয়ের মাথার ঘিলু রাস্তার ওপর গড়িয়ে পড়ল। নিত্যর বুকের পাঁজর তার পরনের জামা ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এল। ওদের তিনজনের গোঙানিও শেষ।

আশিষ তার সেনাদের ইশারা করে ইঁটগুলো গলির নর্দমার ভেতর কাদায় ফেলে দিতে বলল। ওরা ইঁটগুলো ঝপাঝপ নর্দমার ভেতর ফেলে দিল। আশিষ শ্যামলের কাছে এগিয়ে গিয়ে শ্যামলের কোমরে গোজা ভোজালীটা বার করল। তারপর এক কোপে নিত্যর গলাটা দু'ফাঁক করে দিল। খোকন এবং পোঁ একই ভাবে কাটল নিতাই এবং দুলালের গলা। দুলালের মাথাটা আধকাটা অবস্থায় গামছার বাঁধনে ঝুলে রইল পাশের নর্দমার কাদার একটু ওপরে।

আশিষের, মুখে সামান্য হাসি ফুটল। শ্যামলকে প্রশ্ন করল, "ওদের ক'টা গেল?" শ্যামল বলল, "মাত্র ছ'টা। এখনও মাল বাকি আছে।"

মেঘের আড়াল থেকে সূর্য উঁকি দিচ্ছে। ভোর আসন্ন। সজাগ হল আশিষ। এমনিতেই বেশ কিছু সাক্ষীর সামনে ওরা ওই তিনজনকে হত্যা করেছে। তার ওপর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আরও লোকজন ওদের দেখতে পারে। শুধু তাই নয়, খুন করার পর সেই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখার আর কী আছে? আশিষ তাই ওদের দলের উদ্দেশে বলল, "চল, এখান থেকে কেটে পড়ি।" ছটা বাজতে তখনও কিছুটা বাকি, আশিষ তার দলের অন্য সদস্যদের নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিভা সিনেমা হলের কাছে একটা পুলিশ ফাঁড়ি। ফাঁড়ির কনস্টেবলরা প্রায় সবাই আশিষদের দোস্ত। আশিষের সেই দোস্তদের কাছে খবর পৌঁছে গেল, তিনটে যুবকের লাশ পড়ে আছে। খবর পাওয়ার পর ওরা ব্যস্ত হল। কীভাবে ওরা খবর পেল? হাওয়ায়। ভাল খবর হাওয়া পৌঁছে না দিলেও খারাপ খবর হাওয়া যে পৌঁছে দেয়, সেই প্রবাদ এক্ষেত্রেও খেটে গেল ।

লাশ তিনটে পড়ে আছে। যতীন দাস নগর থেকে একই ভাবে খবর পেয়ে ছুটে এসেছে নিতাইদের বাড়ির লোকজন। তারা জুড়ে দিয়েছে আকাশ ফাটানো চিৎকার। তারা ফাঁড়ির পুলিশদের লাশগুলো ওখান থেকে নিয়ে যেতে দেবে না। তাদের দাবী, খুনী আশিষদের আগে গ্রেফতার করতে হবে, তবে তারা পুলিশকে লাশ সরিয়ে নিতে দেবে। আশিষরা যে ওদের খুন করেছে, এ ব্যাপারে ওরা প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে ফলাও করে শুনেছে।

কিন্তু আশিষরা তখন কোথায়? খুনের পর তারা হাত পা পরিষ্কার করে ধূমায়িত চা খেতে খেতে একটা বড় কাজে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য উল্লাস প্রকাশ করছে। চা খেয়ে অনুপ চলে যাবে সোদপুর, আগরপাড়ায় কালু শাঁখারী, আড়িয়াদহে দিলু। আর বাকিরা এদিক ওদিক ছিটকে যাবে। কারণ আশিষের তেমনই নির্দেশ। তার মনে হচ্ছে, একসঙ্গে তিনটে লাশ পেলে সাধারণ মানুষ একটু ক্ষেপে গিয়ে পুলিশের ওপর চাপ দেবে, পুলিশকে তাই তাদের ধরার জন্য তল্লাশি করতে হবে। হোক না, নিত্যদের মতো ওয়াগন ব্রেকার মারা গিয়েছে। তাতে পুলিশের একটু হাঁফ ছাড়ার মনোভাব আসবে, তবু তাদের কাজ তারা কিছুটা করবেই।

ফাঁড়ির পুলিশ যখন জনসাধারণকে বুঝিয়ে লাশগুলো রিক্সায় তুলে ফিরে আসছে ফাঁড়ির দিকে, তখন আশিষ সদর্পে বিভা সিনেমার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছে, তার রাজত্ব কতটা এগোল। তখন সকাল সাতটা। আশিষ এবার একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তার এক গোপন আস্তানায় গেল। আশিষ গোপন আস্তানায় গিয়ে প্রথমেই মৃত দুলালের প্যান্টটা সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করল। তারপর হাতকাটা সম্রাট আশিষ তার বিশ্রামের জন্য বিছানায় অবস্থান করল।

সেদিন রাতে বেলঘড়িয়ার যতীন দাস নগর, গোলা রোড ও ঠাকুরবাড়ি সরণি জুড়ে বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে বেলঘড়িয়া থানার অফিসাররা অভিযান চালালেন। আশিষ তার গুপ্ত অবস্থান থেকে সব কিছুই লক্ষ্য রাখল। দেখল, কামারহাটির কনস্টেবল সৈয়দ এসেছে তল্লাশিতে। সে জানে খড়দহ থানার অফিসার ইন চার্জ কবীর খানের সঙ্গে সৈয়দের সম্পর্ক খুব গভীর। সৈয়দ আবার অনেক ব্যাপারে ওকে বিনিময় প্রথার ভিত্তিতে ওর "উপকার' করেছে। আশিষ ভাবল, এবারও ওকে দিয়ে কাজ করাতে হবে।

কিন্তু আশিষ সেদিন একটা ধাক্কা খেল। তার অন্যতম প্রিয় বলিষ্ঠ হাত শ্যামল পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল। আশিষ ভাবল, শ্যামল তার সব আস্তানাই জানে, সে যদি পুলিশের ধুনের ঠেলায় তার আস্তানার খবর জানিয়ে দেয়, তবে তাকেও গহ্বরের অন্তরালে চলে যেতে হবে। আশিষ তাই আর কোনও সুযোগ নিল না। ভোরের আগেই সে বেলঘড়িয়া

ছাড়ল। সে জানে কদিন গা ঢাকা দিতে পারলেই তার রাজত্বের পুলিশী হুল্লোড় অনেকটা বরফের দিকে এগিয়ে যাবে। তখন সে আবার ফণা তুলে খেলা দেখাতে পারবে।

বেলঘড়িয়া থেকে বেরিয়ে সে একা হাওড়ার দিকে গেল। হাওড়ায় যে যাচ্ছে, সেই কথাটা সে তার স্ত্রী বেবিকেও জানাল না। শোভাকে তো নয়ই। শোভাকে সে বিশ্বাস করে না। সে জানে পয়সা পেলে শোভা যে কোনও দিকে ঢলে পড়তে পারে। তাকে নিয়ে ফুর্তি করা যায়, গতিবিধির আগাম কোনও খবর জানানো যায় না। নিজের হাওড়ায় গিয়ে হাওড়ার নিলামের অন্যতম অধিপতি বজরঙবলির লোহার গুদামে লুকিয়ে থাকার আবরণের মাঝে সে দু'দিন ধরে বিশ্রাম ও আয়েশ করল। দু'দিনের বেশি ভাল লাগল না। সে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে রাঁচির টিকিট কেটে রাঁচিতে গিয়ে দুরান্দা সেক্টর টু'তে তার এক বন্ধুর বাড়িতে উঠল।

সেখানেও তার একদিনের বেশি ভাল লাগল না। বেলঘড়িয়ায় পরিস্থিতি জানার জন্য তার উদ্বেগ বাড়তে লাগল। তার মনে হল 'রাজা' যেন অকারণে তার ‘রাজত্ব' ফেলে এসে শত্রুর ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আর শত্রুরা তার জায়গায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সে কেন এ সুযোগ দেবে? ঠিক করল, সে তার রাজত্ব বিনাযুদ্ধে হস্তান্তর করবে না।

সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরদিন সে ফিরে এল বেলঘড়িয়ায়। নিজের পাড়ায় চেনা পরিবেশে ঘুরে দেখছে পরিস্থিতির গুরুত্ব। চার নম্বর গলিতে সূর্য সিংয়ের সঙ্গে দেখা। সূর্যের সঙ্গে দেখা হতেই ওর মনে একটা পরিস্থিতি বুঝে নেওয়ার পরিকল্পনা এল। সে জানত, সূর্যের সঙ্গে পুলিশের একটা অংশের ভাল রকম যোগাযোগ আছে।

সে সূর্যকে বলল, “সূর্য, আমি রাত ন'টা নাগাদ তোর অফিসে আসব, কথা আছে। কিছু টাকা রাখিস, আমার দরকার।” সূর্য বলল, “ঠিক আছে, আমি অফিসে বসে থাকব।” আশিষ সূর্যকে দিয়ে একটা খেলার চাল ফেলে চলে গেল। আশিষ চলে যাওয়ার পর সূর্য ভাবল, খবরটা পুলিশকে জানাবে কি জানাবে না। দু'টো দিকই সে খতিয়ে দেখতে লাগল। সূর্য এমনিতে ব্যবসায়ী, কংগ্রেসের সমর্থক। আশিষ ও তার কাজ কারবার সে কোনদিন পছন্দ করে না। আশিষ বহুদিন বহুবার তার থেকে টাকা নিয়ে গেছে। ঝাঁপুদের বলেও তার প্রতিকার হয়নি। অন্যদিকে ঝাঁপুর দলের ছ’সাতজনকে আশিষই খুন করেছে। একেবারে শেষে একসঙ্গে তিনজনকে খুন করেছে। সেই খুনের জের কমেনি। এই জের থাকতে থাকতে যদি আশিষকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া যায়, তবে আশিষ আর চট করে ছাড়া পাবে না। অন্তত ওর অত্যাচার থেকে সে নিজে ও বেলঘড়িয়ার সাধারণ মানুষ বাঁচবে। সূর্য আবার তার এই ভাবনার উল্টো পিঠটা ভেবে নিল, যদি সে ধরিয়ে দেয় তবে আশিষ তার ওপর প্রতিশোধও নিতে পারে। চিন্তার এই টানাপোড়েনে সূর্য শেষমেষ ঠিক করল, সে অঞ্চলের থানা অর্থাৎ বেলঘড়িয়া থানায় খবরটা দেবে না। বেলঘড়িয়া থানায় খবর দিলে আশিষের সেই খবর আগেই পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই সে ঠিক করল বরাহনগরের গোয়েন্দা শাখায় খবরটা জানাবে। সেখান থেকে কোনও খবর আশিষের কাছে পাচার হবে না। সূর্য অতি সাবধানতা অবলম্বন করে খবরটা বরাহনগরে পাঠিয়ে দিল।

যথারীতি সাদা পোশাকের চার পাঁচজন রাজ্য পুলিশের অফিসার বরাহনগর থেকে এসে চার নম্বর গলিতে সূর্য সিংয়ের অফিসে রাত আটটার সময় হাজির। খবর অনুযায়ী ন’টার সময় আশিষ সূর্যের অফিসে আসবে টাকা নিতে। সে এলেই তাকে ধরবে। সূর্য তার অফিসে সেইসব অফিসারকে তার খদ্দের হিসাবে আপ্যায়ন করতে লাগল।

রাত একটু একটু করে ন'টার দিকে এগিয়ে চলল। সূর্য সিংয়ের উত্তেজনার পারা একটু একটু করে চড়চড়িয়ে ওপরে উঠছে। তার অফিসেই আসন্ন একটা একাঙ্ক নাটকের দৃশ্য অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আবার সে হচ্ছে সেই নাটকের পেছনের পরিচালক। পরিচালনায় কোনওরকম ত্রুটি হলে নাটক একেবারে জলাঞ্জলি যাবে এবং তার ফল কিন্তু পরিশেষে ভাল না হতে পারে, এমনকি সেটা হতে পারে বিয়োগান্ত। তাই তার এত উত্তেজনা। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে একবার ভাবতে লাগল, কাজটা সে না করলেও পারত।

রাত ন'টা। আশিষের আবির্ভাবের সময়। এল না। আসতেও পারে, সূর্য ভাবল। সে তো ব্রিটেনের সাংস্কৃতিক ধারায় বড় হয়ে ওঠেনি যে সময়জ্ঞান সম্পর্কে টনটনে থাকবে। সে বড় হয়েছে বেলঘড়িয়ার রেল লাইনের ধারে। ভারতীয় রেলের সময়জ্ঞানের মতো তারও সময় নিজের মর্জিতে চলে, ঘড়ি সেখানে একটা অপদার্থ জিনিস মাত্র।

সোয়া ন'টা, সাড়ে ন'টা, দশটা, টিক টিক করে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। সূর্য সিংয়ের রক্তচাপও ঊর্ধ্বগতিতে। খালি ভাবছে, সাদা পোশাকের পুলিশ আশিষকে না পেয়ে চলে গেলে তার কী অবস্থা হবে? সে কি আশিষের দলের মোকাবিলা করতে পারবে?

আশিষ আসবে কি? সে তখন বিভা সিনেমার পাশে তার এক ছোট ঠেকে বসে আছে। সেখানে বসেই সে খবর পাচ্ছে, সূর্য সিংয়ের অফিসে বরাহনগর থেকে অফিসাররা এসে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। সূর্য তাদের তোয়াজে রাখার জন্য বারবার খাবার দাবার আনিয়ে দিচ্ছে, ওরা খাচ্ছে, আর মাঝেমধ্যে সূর্যকে তার খবরের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করে যাচ্ছে। আশিষ এসব খবর পাচ্ছে আর হাসছে। তার চালটা যে চমৎকার ফলে গেছে, সেজন্য সে ভীষণ আত্মপ্রসাদে বাংলা মদের বোতল গিলে চলেছে। সে খবর পেল, রাত সাড়ে দশটায় পুলিশ অফিসাররা সূর্য সিংয়ের অফিস থেকে চলে গেছে। সূর্যও আর দেরি না করে দ্রুত অফিস ' বন্ধ করে বাড়ি চলে গেছে। আশিষ জানে, আজ সূর্য তার ভয়ে আর ঘুমোবে না। সে তো আর জানে না, তার ওপর আশিষের খুব একটা রাগ নেই। তাকে সে একটা টোপ হিসাবে ব্যবহার করে পুলিশের আচার-ব্যবহারের একটা আন্দাজ করল। এবং তাদের সে একটু নাচিয়ে ছাড়ল। খুব পাকা সমাজবিরোধীরা এরকম চাল মাঝে মধ্যে চালে, তার জন্য পুলিশের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। পুলিশরা জানে, সমাজবিরোধীরা একদিন নিজেদের চালে নিজেরাই ফেঁসে যাবে, সেদিন তাদের এই চালের হিসেব পুরোপুরি চুকিয়ে নেবে। তারা তো জানে না, স্যাঁকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা। যে ঘায়ে 'লোহারা' কুপোকাৎ।

আশিষ আবার নিজের রাজত্ব গুছিয়ে নেওয়ার জন্য পুরো দম নিয়ে কাজে নেমে পড়ে। একদিকে খোকন, স্বপন, পোঁ, লম্বু কাঞ্চন, নাটা বাবলুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তোলা আদায় করতে শুরু করে। অন্যদিকে ব্যারাকপুর মহকুমার সি.পি.আই.(এম) -এর যুব নেতা মানস মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করে। সে চেষ্টায় সে সফল হয়। সে জানে, তাকে তার কাজ চালিয়ে যেতে হলে শাসকদলের ছায়ায় থাকতে হবে। একদিকে তাদের তলে তলে মদত দিতে হবে, অন্যদিকে তাদেরও সাহায্য নিতে হবে। দেওয়া নেওয়ার এ খেলা না খেলতে পারলে দীর্ঘদিন টিঁকে থাকতে পারবে না। বেলঘড়িয়ার সি.পি.আই.(এম) নেতা মিন্টু চক্রবর্তী, রানা গুহদের সঙ্গে তার আগেও পরিচয় ছিল। এবার আরও গভীর হল। সেই গভীরতা অনুযায়ীই সে তার দলবলকে পরিচালনা করতে লাগল। সেই পরিচালনার সুফল সি.পি.আই.(এম) পার্টি তুলতে না পারলেও, আশিষ কিন্তু পুরোদমে ফায়দা তুলতে লাগল। এই ফায়দা তোলাটাই তো ওদের কাজ। সমাজবিরোধীরা জানে, তাদের অবাধে চলাফেরার জন্য শাসকদলের মহীরুহের তলায় আশ্রয় নিতে হবে। শাসকদলগুলোও সেটা জানে। কিন্তু তারা নিজেদের কাজ গুছোনোর জন্য ঠিক তাদের বুকে টেনে নেয়।

সাতাত্তর সালে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা আসার পর সাধারণ মানুষ ভেবেছিলেন বামফ্রন্ট আর যাই করুক, পরিচিত সমাজবিরোধীদের নিজেদের কোলে টেনে নেবে না। এই টেনে নেওয়ার অর্থ যে নিজের ঠাঁই, নিশ্চিত বসার ডাল নিজের হাতেই কেটে ফেলা, সেটা অন্তত তাদের নেতারা বুঝবে। ক্ষমতায় আসার পর একেবারে প্রথমদিকে বামফ্রন্ট নিজেদের ভাবমূর্তি কিছুটা উজ্জ্বল রাখতে সমাজবিরোধীদের থেকে নিজেদের দলকে আলাদা রাখতে কিছুটা হলেও সফল হয়েছিল। কিন্তু দু'তিন বছর পর তারা অচিরেই সাধারণ মানুষের চিন্তাকে ভুল প্রমাণিত করে সমাজবিরোধীদের পরোক্ষে প্রশ্রয় দিতেই শুধু লাগল না, তাদের থেকে সাহায্যও নিতে লাগল। এর ফল দাঁড়াল, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস পার্টিকে

একসময় যেমন সমাজবিরোধীরা আস্টেপৃষ্ঠে বেঁধে গ্রাস করেছিল, ঠিক তেমনি বামফ্রন্টের বিভিন্ন পার্টিকেও তারা ময়াল সাপের মতো গিলতে লাগল। যে আদর্শের জয়গান গেয়ে তারা ক্ষমতায় এসেছিল, সেই আদর্শকে কার্যত প্রায় বিসর্জন দিয়ে তাদেরই বহুদিনের পার্টি ক্যাডাররা নিজেরাই সমাজবিরোধী কাজে নিজেদের লিপ্ত করে টাকা লুঠতে মাঠে নেমে পড়ল। তারপর লুঠের টাকা নিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায় নেমে পড়ল। শুধু আশিষ নয়, এরকম বহু আশিষ তাদের আশীর্বাদ পেয়ে তাদের পেশায় ছুটতে লাগল।

পঁচাশির ডিসেম্বর। শীতের সন্ধে। আশিষ তার শাগরেদ স্বপনকে নিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ে কলকাতা থেকে ফিরছে। ট্যাক্সি ছাড়া আশিষ এখন অন্য গাড়িতে চাপে না। তার পকেটে সবসময় দশ পনেরো হাজার টাকা থাকে। তার মনে এখন সবসময় সানাই বাজে। টাকা আসে ভূতের হাত দিয়ে, যায়ও ভূতের হাতে। তাতে তার কী?' সে তো শুধু মাঝখানে উড়বে। তাদের ট্যাক্সি যখন যশোহর রোড ধরে বিরাটির মোড়ের কাছাকাছি এল, আশিষ দেখতে পেল তার পুরনো শত্রু ঝাঁপুর দলের অন্যতম সদস্য এবং তার বাবাকে খুন করার সময় যে তার বাবার চুলের মুঠি টেনে টেনে হাঁটিয়েছিল, সেই তারক সরকার বিরাটির মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে রয়েছে আরও দু'টো ছেলে।

তারককে দেখে তার স্বভাবসিদ্ধ আগুন ভেতরে জ্বলে উঠল। সে সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সিচালককে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল। কোমর থেকে পিস্তল বার করে গাড়ির বাঁ দিকের দরজা খুলে তারকের দিকে দৌড় দিল। স্বপনও নেমে আশিষকে সাহায্য করল। তারকের এক সঙ্গী পালাল। তাকে আশিষ ধরতে পারল না। তার জন্য আশিষের কোনও আক্ষেপ হল না। সে তার আসল শত্রুকে ধরে ফেলেছে। স্বপন ধরেছে তারকের অন্য আর এক সঙ্গীকে। তাকে আশিষ চেনে না। না চিনুক, তাকে আশিষ ছাড়ল না। দু'জনকেই আশিষ নিয়ে এল ট্যাক্সির কাছে। তারপর ট্যাক্সির পেছনের সিটে স্বপনকে একধারে বসিয়ে তারক ও তার সঙ্গীকে মাঝখানে বসিয়ে নিজে বসল বাঁ দিকের দরজার পাশে। হাতে তার খোলা পিস্তল। তারক ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। সে শুধু একবার আশিষকে বলল, “আমি সব কিছু ছেড়ে দিয়েছি। তুই আমায়-- -এসব কী করছিস?” আশিষ চোয়াল শক্ত করে একবার তার দিকে তাকাল, কোনও উত্তর দিল না।

আশিষ বিরাটির মহাজাতি পাড়ায় তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ধলার কাছে গেল। ধলা তখন পাড়ার একটা বাড়ির সামনের বারান্দায় বসে সঙ্গীদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল। আশিষের ট্যাক্সি তাদের সামনে দাঁড়ালে ধলা আশিষকে দেখে একগাল হেসে ট্যাক্সির সামনে এগিয়ে এল।

আশিষ ট্যাক্সি থেকে নেমে ধলার সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কিছু বলল। উপস্থিত অন্যরা কেউ সেই কথা শুনতে পেল না। অন্যরা শুধু দেখতে পেল, আশিষের কথা শুনে ধলা একবার ট্যাক্সির ভেতরটা ভাল করে দেখল। তার মুখ শুকিয়ে গেছে। তারপর আশিষের দিকে তাকিয়ে নেতিবাচকভাবে মাথা নাড়ল অর্থাৎ আশিষের প্রস্তাব সে মানতে পারছে না। আশিষ ধলার ওই উত্তর শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে ধলাকে বলল, “শালা তোরা সব মেয়েছেলে হয়ে গেছিস।” আশিষ আর দাঁড়াল না। সে ট্যাক্সিতে তার জায়গায় এসে বসে ট্যাক্সিচালককে কোন দিকে যেতে হবে তার নির্দেশ দিতে লাগল।

ট্যাক্সিচালক তার নির্দেশ মতো গাড়ি চালিয়ে বিরাটির সর্দার পাড়ার একটা অন্ধকার মতো জায়গায় একটা ছোট টালির চালের ঘরের সামনে দাঁড়াল। ট্যাক্সির বাঁ দিকের দরজা একটানে খুলে আশিষ নেমে ওই ঘরের দিকে তাকিয়ে ডাক দিল, “রতন, এই রতন।” ঘরের ভেতর থেকে অন্ধকারের মধ্যেই উত্তর ভেসে এল, “কে?” আশিষ উত্তরদাতার কণ্ঠস্বর বোধহয় ভালভাবে চেনে, সে তাই বলে উঠল, “বেরিয়ে আয় না শালা, আমি আশিষ।” টালির চালের ছোট ঘরটার দরজা খুলে গেল। একটা ছেলে বেরিয়ে এল, তার মুখ ভালভাবে দেখা যাচ্ছে মা। আশিষ তাকে চিনে নিয়েছে, সেই-ই তার ইয়ারদোস্ত রতন।

আশিষ তাকে দেখে বলল, “কি রে, তুই মাল আমার গলা চিনতে পারছিস না?” রতন

তার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, “আরে গুরু এত রাতে তুমি আসবে ভাবিনি, কোনও কিছু চাই না কি?” আশিষ রতনের কথার উত্তর না দিয়ে তার ডান হাতের কনুইয়ের কাছটা ধরে নিজের দিকে টেনে ট্যাক্সির থেকে সামান্য দূরে গিয়ে নিচু স্বরে মিনিট খানেক খুব গোপনে কথা বলল। তারপর ওরা দুজনেই ট্যাক্সিতে উঠে বসল। আশিষ বসল তার নির্দিষ্ট জায়গায় আর রতন চালকের পাশে সামনের সিটে। এবার রতন ট্যাক্সিচালককে নির্দেশ দিতে লাগল।

মিনিট সাত আট পর রাত সাড়ে দশটার সময় রতন ট্যাক্সিচালককে একটা জায়গায় তার গাড়ি দাঁড় করাতে বলল। জায়গাটায় অন্ধকার স্তব্ধ তো হয়ে আছেই, চারধারে এমন সব বড় বড় গাছগাছালিতে ভরা যে দূরের আলোও খুব বেশি সেখানে এসে ঠিকরে পড়ছে না। একমাত্র ট্যাক্সির হেডলাইট যতটুকু আলো ছড়াতে পারছে, ততটুকুই দৃশ্যমান। আশিষ এখন খুব খুশি, সে তার পকেট থেকে তিনশ টাকা বার করে ট্যাক্সিচালককে দিল। রতন তাকে বলে দিল কীভাবে সে তার গাড়ি নিয়ে যশোহর রোডের দিকে যাবে। চালক তার কথা মন দিয়ে শুনল। আশিষ ও স্বপন এবার তারকদের ট্যাক্সি থেকে নামাল। ট্যাক্সি চলে গেল।

রতন ওই অঞ্চলে চষে খাওয়া ছেলে। সব চেনে। সে আশিষদের নিয়ে এগিয়ে চলল। রতন একেবারে সামনে। তার পেছনে স্বপন। মাঝখানে তারক ও তার সঙ্গী। পেছনে পিস্তল হাতে আশিষ। রতন একটা গাছে গাছে ভরা নির্মীয়মাণ বাড়ির ভেতর ঢুকল। বাড়িটাতে শুধু ইঁট ও ছাদ ঢালাইয়ের কাজ হয়েছে। অন্য সব কাজ বাকি। দরজা জানালা বলতে শুধু ফাঁকা ফাঁকা জায়গা।

অন্ধকারের ভেতরই রতন আশিষকে ডেকে বলল, "মালটাকে এখানে নিয়ে আয়।" আশিষ তারকের কোমরে পিস্তল ধরে রতনের দিকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল। তারক কি সহজে যেতে চায়? সে কান্নাকাটি জুড়ে দিল। আশিষ তারকের পেছনে মারল ডান পায়ে সজোরে এক লাথি, তারক মুখ থুবড়ে রতনের সামনে পড়ল। রতন ঘরের মাঝখানে একটা সোজা কলামের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে তারককে টেনে তুলল। আশিষ আর স্বপন তারকের দুটো হাত কলামটার পেছনে টেনে নিয়ে গেল। রতন তারকের হাত দু'টো বেঁধে দিল। তারক কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে বসে পড়ল। আশিষ চাপা অথচ তীক্ষ্ণ গলায় বলল, "শালা, আমার বাবাকে যখন ঘাড়ে কোপ দিয়ে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে খুন করেছিলি, তখন তোর কান্না কোথায় ছিল?"

স্বপন আশিষের কাজ বোধহয় আন্দাজ করতে পেরেছিল। বুঝেছিল, আশিষ তারককে খুন করবে। সে ভয় পেল। আশিষকে বলল, "আমি একটু আসছি।" তারপর আশিষের উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে দ্রুত দরজার খোলা জায়গা দিয়ে বেরিয়ে একটু দূরে অন্ধকারে বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। আশিষ মনে মনে হাসল। স্বপনকে কিছু বলল না। সে রতনকে বলল, "একে শালা গুলি করব না, গুলির খরচ অনেক। আওয়াজ হলেও আশেপাশের মানুষেরা জানতে পারবে। আরও দড়ি কোথায় আছে দেখ।" রতন বলল, "দাঁড়া, দেখছি।"

তারকের সঙ্গীটা ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে আছে। এই অবস্থায় তার কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছে না। এমন যে হবে তাও তার কল্পনার বাইরে ছিল। সে এখন আশিষদের হাত থেকে মুক্তি চায়। কিন্তু মুক্তি চাইলেই তো আর পাওয়া যাবে না। আশিষদের মূর্তি দেখেই সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে, সে ছুটে পালাতে গেলে আশিষ তাকে পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়ে খুন করতে পারে। সে তাই চুপচাপ আশিষদের কাণ্ড দেখে যাচ্ছে।

আশিষের আদেশ শুনে রতন অন্ধকার ঘরগুলোর থেকে একটা ময়লা গামছা এনে আশিষের হাতে দিল। গামছাটা দেখেই বোঝা যায় রাজমিস্ত্রিরা কাজের সময় ওটা ব্যবহার করে। আশিষ সেটা হাতে নিয়ে বলল, "ঠিক আছে।" এবার সে দ্রুত গামছাটা তারকের গলায় পেঁচিয়ে দিয়ে একটা দিক রতনের হাতে দিল, অন্যদিকটা এগিয়ে দিল তারকের সঙ্গীর হাতে।

তারকের সঙ্গী আশিষের নির্দেশ শুনে গামছার অন্য দিকটা ধরতে প্রথমে অস্বীকার করল। আশিষ একইভাবে চাপা গলায় বলল, "কুত্তার বাচ্চা, যদি না মরতে চাস, তাহলে আমার কথা শোন।" তারকের সঙ্গী ভয়ে আর আশিষের কথা অমান্য করতে পারল না। তারক কাতর ভাবে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আছে। বন্ধু তার বোবা চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল। সে গামছার অন্য প্রান্তটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধরল। তার কাছে এটা একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি, হয় নিজে মর, নয়তো নিজে বাঁচতে বন্ধুকে খুন করার কাজে শত্রুদের সাহায্য কর। নিজে বাঁচতে সে তাই আশিষের কথামতো গামছাটা টান দিতে লাগল।

অন্যদিকে রতন টানছে। এদিকে তারকের সঙ্গী ও আশিষ একসঙ্গে। তারকের গলা দিয়ে প্রথমে গোঁ গোঁ আওয়াজ বার হল। মুখ হাঁ হয়ে গেল। টপটপ করে গ্যাঁজলা পড়তে লাগল মেঝেতে। তারপর জিভ বাইরে বেরিয়ে একটু একটু করে বড় হতে হতে প্রায় জিভের গোড়া পর্যন্ত বেরিয়ে এল। ততক্ষণে হাত পা এগিয়ে গেছে। চোখ দুটো ঠিকরে প্রায় নাকের কাছে পৌঁছে গেছে। আশিষ রতনকে বলল, "দাঁড়া। দেশলাই জ্বালা।" রতন ওর দিকের গামছার প্রান্তটা ছেড়ে দিয়ে দেশলাই জ্বেলে তারকের মুখের সামনে ধরল। খুনের বিশেষজ্ঞ আশিষ খুঁটিয়ে দেখল। রতনকে বলল, "এবার লাশটাকে চালান করতে হবে।"

রতন বলল, "ঠিক আছে, পাশের পুকুরে ফেলে দিলেই হবে।" আশিষ খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "তাই কর, মালটা ডুবে যাক।" রতন কলামের সঙ্গে পিছমোড়া করে বাঁধা তারকের হাত দুটো খুলতে লাগল। ওখানেও রক্ত ঝরেছে। তারক গলায় গামছার টান খেয়ে বাঁচার জন্য আপ্রাণ ছটফট করতে করতে হাত ছাড়াতে গিয়ে দড়িতে ও কলামে নিজের হাত

এমনভাবে ঘষেছে যে, হাতের চামড়া ছিঁড়ে মাংস বেরিয়ে ওখানটা পুরোপুরি রক্তাক্ত হয়ে গেছে। রতন তবু কোনমতে সেই দড়িটা খুলে তারককে কলাম থেকে মুক্ত করল। তারকের শরীরটা ঝপাস করে মেঝেতে পড়ে গেল। আশিষ তারকের গলা থেকে গামছাটা টেনে খুলে নিল। তারকের সঙ্গী এখন নিজে বাঁচতে আশিষের কথা মতো সব কাজ করে যাচ্ছে।

ওরা তিনজনে মিলে কংগ্রেস নেতা অজিত পাঁজার বোনের বাড়ির পাশের পুকুরধারে তারকের শরীরটা টানতে টানতে নিয়ে গেল। অন্ধকার আর ঘন কুয়াশা একসঙ্গে মিলে একাকার, কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না। পুকুরটা খুব ছোট নয় আবার বড়ও নয়, সাধারণ মাপের, আটপৌরে। পুকুরের চারপাশে রয়েছে নারকেল ও সুপুরি গাছ। শীতে ওরা জবুথবু, ঠায় দাঁড়িয়ে আশিষদের কাজকর্ম দেখছে।

পুকুরধারে এসে আশিষ আর অপেক্ষা করল না, সে রতনকে খুব আস্তে বলল, "এবার টপকে দে।" রতন মৃত তারকের হাত দু'টো ধরল। আশিচম আর তারকের সঙ্গী ধরল একটা করে পা। তারপর ওরা লাশটা তুলে দোলাতে লাগল। পাঁচ ছ'বার দুলিয়ে তিনজনে একসঙ্গে পুকুরের জলে ছুঁড়ে দিল তারককে। ঝপাং করে একটা শুধু শব্দ হল পুকুরের স্থির ঠাণ্ডা জলে। তারপর সবকিছু আবার চুপচাপ।

তারকের দেহটা ডুবল না, ভাসতে লাগল। ওরা ভাবল, খানিকটা পর ডুবে যাবে। আশিষ এবার গামছা ও দড়িগুলো একটা আধলা ইঁটে জড়িয়ে ওই পুকুরের মাঝখানটায় ছুঁড়ে দিল। সেটা টুপ করে ডুবে গেল।

আশিষ বলল, "চল।" ফাঁকা বাড়িটায় ওরা তিনজন যখন ফিরে এল, তখন রাত সাড়ে এগারোটা। ওদের অনেকটা ধকল গেছে। আশিষ আর দাঁড়াল না, সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সামনের রাস্তায়। দেখল, স্বপন দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আশিষ ওকে দেখে হাসতে হাসতে রতনকে বলল, "শালাটা চিরদিনের ভিতু, অথচ সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।" রতন বলল, "ছাড়ো বস, ঠিক আছে। এখন চল।" আশিষ তারকের সঙ্গীকে বলল, "শোন, কাউকে মাল কিছু বলেছিস তো তোকেও একদিন খালাস করে দেব।" উত্তরে সে বলল, "পাগল; এখন থেকে বস আমি তোমার।" উদ্ধতভঙ্গিতে ডানহাত দিয়ে ওর গর্দানে একটা রদ্দা মেরে আশিষ হাঁটতে হাঁটতেই বলল, "সেটা খেয়াল রাখিস।" তারপর রতনের দিকে তাকিয়ে বলল, "কোথায় মাল পাওয়া যাবে?"

রতন বলল, "সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি।"

ওরা যশোহর রোডে এসে উঠল। স্বপনও এখন সঙ্গী হয়েছে। সে যা বোঝার বুঝে গেছে, তারকের পরিণতি সম্পর্কে একটা কথাও আশিষদের কাছে জানতে চাইছে না। রতন যশোহর রোডের ওপর একটা ধাবায় এসে ঢুকল। আশিষের সঙ্গে বাকিরাও। ধাবার কর্মচারীরা সকলেই রতনকে চেনে। তাদেরই একজন জিজ্ঞেস করল, "আজ এত দেরিতে?" গম্ভীর হয়ে সে বলল, "একটা কাজে গিয়েছিলাম, তাই দেরি হল, মাল আর মাংস দে, তন্দুরি রুটি দিবি দু'টো করে।" ওরা হাত মুখ ভাল করে ধুয়ে একটা টেবিল দখল করে বসল। প্রথমেই মদ এল। রাম। তারপর গরম মাংস ও রুটি। সঙ্গে গোটা গোটা খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজ। রতনদের নিয়ম অনুযায়ী, আশিষরা পান করা শুরু করে দিয়েছে। গল্পও শুরু করেছে। তাদের সুখদুঃখের। সে সব গল্প জুড়ে শুধু মস্তানি, লুঠপাট, পুলিশ ও নেতাদের কথা। ভুলেও ওরা তারকের নাম উচ্চারণ করল না। এসব ব্যাপারে ওরা সবাই সমানভাবে জ্ঞানী।

রাত একটা বাজতে আর বেশিক্ষণ নেই। আশিষরা দোকানের বিল মিটিয়ে উঠে দাঁড়াল। এখন শরীর বেশ গরম, তরতাজা, মদের ক্রিয়ায় কোথায় চলে গেছে শীতের আক্রমণ। ওরা রাস্তায় এসে দাঁড়াল, তারপর আবার আশিষের নেতৃত্বে হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

আশিষ চুপিসাড়ে রতনকে একটা কিছু কথা বলেছে। ওরা সেই কথা মেনে হাঁটছে।

আশিষের মনে একটা খটকা লেগেছে, সে সেই কথাটাই রতনকে বলেছে। রতন আশিষের কথায় সায় দিয়ে আবার সেই পুকুর ধারে এসে দাঁড়াল।

হ্যাঁ, আশিষের খটকাই ঠিক। তারকের দেহটা ডোবেনি। সেটা ভাসছে। সেটাকে ডোবাতে হবে। নয়ত সকালবেলাতেই ওই অঞ্চলে একটা ভাসমান যুবকের দেহ দেখে হইচই পড়ে যাবে। যা ওদের কাছে কাম্য নয়।

কিন্তু কীভাবে ডোবাবে? আশিষ তারকের সঙ্গীকে বলল, "এ্যাই, জামা প্যান্ট খুলে জলে নেমে লাশটাকে পাড়ে নিয়ে আয়।" তারকের সঙ্গী আশিষের কথা শুনে লজ্জা পেল, কিন্তু মুখে বলল, "এই শীতে গুরু জলে নামব !" আশিষ বলল, "নামবি, তুই যে আমাদের হয়েছিস, এটাই তোর প্রথম পরীক্ষা।" সে আর কী বলবে? জামাপ্যান্ট খুলে পুকুরপাড়ে রেখে জীবন বাঁচাতে জলে নেমে কিছুটা সাঁতার কেটে তার প্রিয় বন্ধুর লাশের কাছে পৌঁছে বাঁ হাত দিয়ে তার গলার কাছে জামাটা শক্ত করে ধরে পাড়ের দিকে টেনে নিয়ে চলল। পুকুর ধারে কিছুটা নেমে জলের কাছে রতন, আশিষ ও স্বপন দাঁড়িয়ে।

তারকের সঙ্গী তারকের দেহটা একেবারে ধারে আনার পর রতনরা লাশটাকে টেনে তুলল বেশ খানিকটা ওপরে। তারকের জামা প্যান্ট, সোয়েটার, জলে ভিজে অনেক ভারী হয়ে গেছে। ওর দেহটা আশিষ চিৎ করে শোয়াল। তারপর একটা থান ইঁট নিয়ে তারকের নাভির ওপর শরীরের সব শক্তি দিয়ে পনেরো কুড়িটা ঘা মারল। ইঁটটা আশিষ জলে ফেলে দিয়ে বলল, "এবার আবার ছুঁড়ে দে।" রতন, স্বপন, তারকের সঙ্গী আশিষের নির্দেশ অনুযায়ী আবার তারকের দেহটা দুলিয়ে দুলিয়ে যতটা দূরে ফেলা যায়, তত দূরে ফেলল।

আবার একটা ঝপাং করে শব্দ। এবার তারকের দেহটা সত্যিই জলের নিচে তলিয়ে গেল। আশিষের মুখে নিঃশব্দে হাজির হল একটা বিজয়ের হাসি, সেটা কুয়াশা ভেদ করে স্বপনরা দেখতে পেল না। আশিষ তারকের সঙ্গীকে বলল, "জামাপ্যান্ট পরে নে।" সে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ভেজা শরীরের ওপরেই চাপিয়ে নিল তার পোশাক। আশিষ খালি বাড়িটার দিকে চলতে শুরু করল। তার পেছনে অন্য সবাই। আশিষ পুকুরের দিকে নজর রাখা যায়, এমন একটা জায়গায় গিয়ে বসল। পাশে অন্যরা বসল ওকে ঘিরে। সিগারেট ধরাল। তারপর খুব নিচু গলায় নিজেরা গল্প করতে লাগল। তারক পুকুরের নিচে কাদার ওপর যে শুয়ে আছে, সে কথা তারা একবারও আলোচনায় আনল না।

এইভাবে এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল। তারকের দেহ আর ভেসে উঠল না। আশিষ এতক্ষণ সেটাই লক্ষ্য করছিল। তার দেখার দরকার ছিল, তারক আবার ভেসে ওঠে কিনা। একঘণ্টা পরও যখন ভাসল না, আশিষ বুঝল তার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। সে রতনকে বলল, "চল, এবার কেটে পড়ি।"

ওরা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে আবার যশোহর রোডে দাঁড়াল। আশিষ রতনের সঙ্গে করমর্দন করে কিছু টাকা ওর হাতে গুঁজে দিল। রতন বলল, "গুরু এসব আবার কেন, তোমার একটা কাজ করে আমি টাকা নেব?" আশিষ বলল, "কাল এটা দিয়ে মস্তি করিস। এখন আমরা চলি।"

রতনকে ছেড়ে আশিষরা হাঁটতে শুরু করল। অল্প কিছুটা যাওয়ার পর আশিষ তারকের সঙ্গীকে বলল, "আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখিস। তোর কাজে আসবে।" সে কিছু বলল না। আশিষ তাকেও দু'টো একশ টাকার নোট দিল। মুখে বলল, "কাল খরচ করিস। এখন যা।" সে আশিষের কাছ থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। কোনও মতে বলল, "ঠিক আছে গুরু।" তারপর সেও বিরাটির সর্দার পাড়ার দিকে হাঁটতে শুরু করল।

রাত প্রায় আড়াইটা। শীত এখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যশোহর রোডে মাঝে মধ্যে কুয়াশা ভেদ করে স্পট লাইট জ্বালিয়ে লরি চলে যাচ্ছে। লরিগুলো চলে যাওয়ার পরেই আবার সব কিছু নিঃঝুম। আশিষ স্বপনকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেলঘড়িয়ার দিকে যেতে শুরু করল। তার দিল আজ খুব খুশ। এ সময় তার শোভার মতো একজনকে দরকার হয়। বিশ্রামটা যে

যত্ন সহকারে দিতে পারে। কিন্তু এত রাতে সে আশা নেই। তাই তারা অন্ধকারেই দু'টো ছায়া হয়ে চলছে।

পরদিন রতন বেলঘড়িয়া এল আশিষের সঙ্গে দেখা করতে। আশিষ ওকে দেখে এগিয়ে গেল। রতন তার গলার পর্দাটা তলানিতে নিয়ে গিয়ে বলল, "দুপুর দুটোয় ভেসে উঠেছে। কিছুটা হইহল্লা হয়েছে। তিনটের সময় পুলিশ লাশ নিয়ে চলে গেছে।" আশিষ শুনল।

সে নির্বিকার চিত্তে বলল, "একটা ট্যাক্সি ধর, বলবি কলকাতায় যাব।" রতন একটা ট্যাক্সি দাঁড় করাল। ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে আশিষ রতনকে বলল, "চল, মাল খাবি, ফুর্তি করবি, বাকি সব কিছু ভুলে যা।" রতন ওর কথা শুনে হাসল, ট্যাক্সিতে বসল। ট্যাক্সি ছুটল কলকাতার দিকে। তারক এখন কোন নরকে আছে তা ভেবে লাভ কী, তারা এখন যাচ্ছে স্বর্গসুখের সন্ধানে।

পঁচাশি সালটা আশিষের এমনভাবেই আনন্দের উড়ানে চেপে কাটল।

ছিয়াশি সালের প্রথম দিকেও তেমনভাবেই কাটছিল। কিন্তু হঠাৎ জীবনের সুরবাহারের একটা তার ছিঁড়ে গেল। দলের অন্যতম স্তম্ভ খোকন দাস বোমায় মারা গেল।

তখন গরম কাল, খোকন পাঞ্জাবি পায়জামা পরে ফুলবাবু সেজে সন্ধেবেলায় বিভা সিনেমার সামনে দাঁড়িয়েছিল। মাঝেমধ্যে সিগারেটের ধোঁয়া আকাশে উড়িয়ে দিয়ে অল্পবয়সী মেয়েদের দিকে প্রেমপ্রেম ভাব করে তাকিয়ে কাছে টানার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ দুটো বোমা পরপর তার শরীরের ওপর নিখুঁত নিশানায় আকাশ থেকে পড়ল। খোকনের শখের পাঞ্জাবি এফোঁড় ওফোঁড় করে বোমার টুকরোগুলো তার শরীরে ঢুকে গেল। খোকন শুধু একটা চিৎকার করল। হাতের জ্বলন্ত সিগারেট ছিটকে গেল। তারপর সিনেমা হলের সামনেই খোকন মাটিতে আশ্রয় নিল। বুক ও মুখ ও তলপেটের খানিকটা করে অংশ লাফিয়ে কোথায় চলে গেছে। সেখানে এখন ছোট ছোট গর্ত। তাতে শুধু রক্ত। সেই রক্তে বিন্দুমাত্র অস্থিরতা নেই। খবর পেয়ে খোকনকে তবু তার দলের ছেলেরা হাসপাতালে নিয়ে ছুটল।

আশিষরা বেলঘড়িয়া থানায় চাপ দিল ঝাঁপুর দলের কান্তিদের গ্রেফতার করার জন্য। তাদের বিশ্বাস, কান্তিরাই খোকনের ওপর বোমা ছুঁড়ে পালিয়েছে। কিন্তু পুলিশ থেকে জানানো হল, না, কান্তিরা খোকনকে বোমা ছোঁড়েনি। খোকন নিজের কাছে রাখা বোমা ফেটেই মারা গেছে।

আশিষের দল সি.পি.আই.(এম) পার্টির নামে পুলিশের বক্তব্যের প্রতিবাদে পরদিন চব্বিশ ঘণ্টা বেলঘড়িয়া বন্ধ ডেকে দিল। আশিষরা যখন বন্ধ ডেকেছে, তখন বন্ধ তো আর ব্যর্থ হতে পারে না। বেলঘড়িয়ায় কার কলিজা এত বড় যে ওর বিরুদ্ধে গিয়ে বন্ধের প্রতিবাদ করে। তাই সেদিন ভোর থেকে বেলঘড়িয়ার বাজার হাট, দোকান, বাস রিক্সা সব অচল। আশিষের দলের 'সমাজদরদী' খোকন দাসের খুনের প্রতিবাদে বাধ্য হয়ে বেলঘড়িয়ার সাধারণ মানুষ নিশ্চল হয়ে রইল।

এতে বোধহয় অঞ্চলের সি.পি.আই.(এম) পার্টির নেতাদের কিছুটা লজ্জা লজ্জা বোধ হচ্ছিল। তাই লোকাল কমিটির সদস্য বিশু দাস আশিষের কাছে পার্টির একজন সদস্য মারফৎ অনুরোধ করে পাঠাল বন্ধটা যেন বারো ঘণ্টা পর তুলে নেওয়া হয়। অর্থাৎ পুরোপুরি চব্বিশ ঘণ্টা যাতে আশিষরা তাদের ঘোষণা মতো চালিয়ে না যায়। আশিষ অনুরোধটা শুনল, ভাবল, তারপর সেই দূতকে বলল, "ভেবে দেখি।" দূত চলে যাওয়ার আধঘণ্টা পর পার্টির তিন নেতা, যারা আশিষের বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিল, সেই মিন্টু চক্রবর্তী, তুষার গঙ্গোপাধ্যায় ও রানা গুহ আশিষের সঙ্গে দেখা করে একই অনুরোধ করল। বলল, "এতে তোর কথাও থাকবে আর আমাদের কথাও থাকবে।" আশিষ জানে অঞ্চলের পার্টির নেতাদের অনুরোধকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করলে পরবর্তীকালে তাকেও বিপদে পড়তে হতে

পারে। সে জানে, ওই পার্টির নেতারা প্রচণ্ডভাবে প্রতিহিংসাপরায়ণ। সে তাই নিজের জেদ থেকে কৌশলে পিছিয়ে এসে তাদের বলল, “ঠিক আছে, আপনারা যখন বলছেন বারো ঘণ্টার বেশি বন্ধ রাখার দরকার নেই, তখন তাই হবে। আপনারা শুধু পার্টির তরফ থেকে প্রচার করে দিন, বারো ঘণ্টা পর বন্ধ তুলে নেওয়া হল।” এখানেও সে এক ঢিলে দুই পাখি মারল। সে ভাবল, যদি সি.পি.আই.(এম) পার্টির লোককে দিয়ে বন্ধ তুলে নেওয়ার প্রচার করা যায়, তবে বেলঘড়িয়ার সবাই জলজ্যান্ত দেখে নেবে যে, বন্ধটা সত্যিই সি.পি.আই.(এম) ডেকেছিল এবং আশিষরা ওদেরই লোক।

আশিষের কথায় আশ্বস্ত হয়ে তুষাররা চলে গেল। তারপর তারা সেদিন দুপুরবেলা বিভা কলোনির উত্তম ঘোষ ও গৌতম দত্তকে একটা রিক্সায় চড়িয়ে, মাইক লাগিয়ে প্রচারে পাঠিয়ে দিল। তারা মাইকে প্রচার করতে “ লাগল, “কমরেড খোকন দাসের মৃত্যুর প্রতিবাদে আমাদের পার্টির তরফ থেকে ডাকা চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ-এর বদলে আমরা বারো ঘণ্টা বন্ধ ডাকছি। বারো ঘণ্টার পর আপনারা বন্ধ তুলে নেবেন। বনধের অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য আপনাদের রক্তিম অভিনন্দন জানাচ্ছি।” সেই প্রচারে বেলঘড়িয়ায় সাধারণ মানুষ হাঁক ছেড়ে বাঁচলেন। বারো ঘণ্টা পর বন্ধ উঠে গেল।

বন্ধ উঠে গেলেও আশিষের মন থেকে খোকন উঠে গেল না। খোকন তার সবচেয়ে পুরনো সঙ্গীদের একজন। অন্তরঙ্গদের একজন। আশিষের সব খবরই খোকন রাখত। শুধু রাখতই না, আশিষের পরিবর্তে দলের প্রয়োজনে সেই দল চালনা করত। খোকনের মৃত্যুটা তার মনে একটা দুঃখের প্রলেপ লাগিয়ে দিল।

সে প্রতিশোধের জন্য গুমরাতে থাকল। ঠিক সেসময় একদিন সন্ধেবেলা নিমতার বাবু তার কাছে এল। আড্ডা দিতে দিতে বলল, “গুরু, আজ তোমার আমাকে তিনশো টাকা দিতে হবে, আমার বৌয়ের বাচ্চা হবে।” আশিষ গম্ভীরভাবে বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে, তারপর গাম্ভীর্য সরিয়ে একটু হেসে হাল্কাভাবে বলল, “বাচ্চাটা তোর তো?” বাবুও হেসে রসিকতা উড়িয়ে দিয়ে বলল, “কি যে বল গুরু।”

আশিষের মুখ এবার শক্ত হয়ে গেল। ওকে যারা চেনে, তারা জানে এই শক্ত মুখের আশিষ খুব ভয়ানক, নিশ্চয়ই কোনও ছক কষছে। আশিষ চুপ। বিশেষ কিছু চিন্তা করছে। বাবু উদগ্রীব হয়ে ওর মুখের দিকে উত্তর শোনার জন্য তাকিয়ে আছে। ওর তিনশো টাকা ভীষণ জরুরি, বাচ্চা হবে, অনেক খরচ।

গম্ভীর আশিষ মুখ ফাঁক করে দাঁত চিবিয়ে বাবুকে বলল, “আমি তোকে তিনশো নয়, পাঁচশ টাকা দেব, তুই যদি আমার একটা কাজ করে দিস।”

বাবুর টাকার দরকার যে কোনও কিছুর বিনিময়ে। সে তাই বলল, “কী কাজ বল না, আমি করে দিচ্ছি।” আশিষ বাবুর মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, “পৃথ্বীশকে মানে ক্ষিতীশকে চিনিস তো? যে এখন বেলঘড়িয়া ছেড়ে আগরপাড়ার ফুটবল মাঠের পাশে একটা ভাড়া বাড়িতে থাকে। ” বাবু বলল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভাল ভাবে চিনি, ডাকাতি করে বেড়ায়, আমার সঙ্গে ভাল ভাব আছে।”

আশিষ বলল, “ভালই হল। তুই ওকে গিয়ে কালই একটা খবর দিবি, কিন্তু খবরদার আমার কথা ঘুণাক্ষরেও বলবি না।” বাবু বলল, “এ আর এমন কি কাজ। আমি কালকেই ওকে বলব, কিন্তু কী বলব?”

আশিষ তখন বাবুকে জানাল, তাকে ক্ষিতীশের কাছে কী খবর দিতে হবে। বাবু শুনল। তারপর চলে গেল। বাবু চলে যাওয়ার পর আশিষ দ্রুতগতিতে কোথায় লুকিয়ে পড়ল না চলে গেল, বোঝা গেল না। সে জানে বাবু ঠিক তার কাজ করবে। বাবুর কাজের পর তাকে তার কাজ করতে হবে।

গরমকাল। পরদিন রাত ন'টায় আশিষ তার দলকে নিয়ে গেল নন্দনপুরের ঝিলের পাড়ে। ওর সঙ্গে আছে গোপাল, শ্যামল, কালু শাঁখারী, সাঁপু পাইন। তারা তীক্ষ্ণ ভাবে

পর্যবেক্ষণ করে একেবারে একটা অন্ধকার জায়গায় বসল। ওদের দু'পাশে দু'টো জঙ্গলী গাছের ঝোপ। সেই ঝোপ দুটোর মাঝখানটায় ওরা বসল। ফলে একটা তৃতীয় ঝোপের মতো ওদের দলটাকে মনে হতে লাগল। কায়দাটা এমনভাবে হল, দূর থেকে ওদের যেন কেউ দেখতে না পায়, কিন্তু অন্য কারও আগমন তারা পরিষ্কার দেখতে পাবে। হঠাৎ ওদের সামনে কেউ এলেও ভাববে ওরা পাঁচজন একেবারে নিরামিষ গল্পে মেতে আছে, আর গরমে ঝিলের হাওয়ায় নিজেদের শরীর ঠাণ্ডা করছে। রাত একটু একটু করে বাড়ছে, ঝোপের মধ্যে খসখস আওয়াজ। গিরগিটি জাতীয় প্রাণীরা বোধহয় গরমে ছটফট করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু আশিষরা তাদের স্থান বেদখল করায় তারা সামান্য বিদ্রোহ করে আবার শক্তির ভারসাম্যের তুলনা করে ঝোপের অন্ধকারে নিজেদের লুকিয়ে রাখছে। আশিষ সদা সতর্ক, সে জানে বাবু যদি ঠিকমতো কাজ করে, তাহলে তার নাটক শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই।

রাত পৌনে দশটা নাগাদ তাদের দিকে দুটো রিক্সা আসতে দেখা গেল। দু'টো রিক্সাতেই দুজন করে আরোহী। দূর থেকে অন্ধকারে তাদের মুখ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু আশিষের আশা, তার পরিকল্পনা অনুযায়ীই রিক্সা দুটো আসছে। বাবু তার নির্দেশ মতো কাজগুলো গুছিয়েই করেছে। এরকম কাজ করলেই তার মনে আনন্দ হয়।

রিক্সা ক্রমাগত তাদের দিকে এগিয়ে আসতে আশিষ তার দলের অন্য সদস্যদের সতর্ক করে দিল। তারাও রিক্সা দুটোর আরোহীদের দিকে কড়া নজর রাখছিল। রিক্সা দুটো যখন ওদের থেকে মাত্র হাত দশেক দূরে, তখন আশিষ প্রথম রিক্সাটার একজন আরোহীকে চিনতে পারল। তার কাঙ্ক্ষিত। ক্ষিতীশ খুশি খুশি মুখে বসে আছে। তার পাশে যে বসে আছে, তাকে আশিষ চেনে না। এমন কি, দ্বিতীয় রিক্সার আরোহী দুজনের একজনকেও আশিষ চেনে না।

বাবু কাজ করেছে। তাকে আশিষ দায়িত্ব দিয়েছিল, ক্ষিতীশকে একটা বাড়িতে ডাকাতি করার পরিকল্পনার কথা বলে এই ঝিল পাড়ে পাঠাতে। ওই ডাকাতিতে বাবুও অংশগ্রহণ করবে, সেই কথাটা যেন ক্ষিতীশকে বুঝিয়ে বলে এবং সেই বাড়িতে বাবুই পথপরিদর্শক হিসাবে নিয়ে যাবে, তাই বাবু ঝিলের ধারে ক্ষিতীশের জন্য সময় মতো অপেক্ষা করবে।

রিক্সা দুটো শুধু দাঁড়ানোর অপেক্ষা। আশিষরা সদলে উঠে দাঁড়িয়ে পলকে রিক্সা দুটোই ঘিরে ধরল। আশিষ আর স্বপন ক্ষিতীশকে টেনে নামাল। ক্ষিতীশ আশিষকে ওইখানে ওইভাবে দেখবে স্বপ্নেও ভাবেনি। বাবুর খেলাও সে বুঝে গেছে এবং সে যে একটা শত্রু শিবিরের আচ্ছাদনে বন্দী হয়ে গেছে, সেটা বুঝতে এক মুহূর্ত দেরি হল না। সে তবু আশিষকে খানিকটা উন্নাসিক ভঙ্গীতে বলল, "তুই, বাবু কই?" আশিষ বলল, "তোর জেনে লাভ নেই।" আশিষের পিস্তল ক্ষিতীশের বুকে ঠেকানো। স্বপন ক্ষিতীশকে তল্লাশি করে তার প্যান্টের পকেট থেকে একটা দেশি রিভলবার বার করল, কোমর থেকে একটা ভোজালী। সাঁপু, কালু, গোপালরা ক্ষিতীশের তিন সঙ্গীর পকেট থেকে দু'টো করে ডিসকো বোমা পেল।

ডিসকো বোমা জামার বুক পকেটেই রাখা যায়। এই বোমার প্রথম কারিগর ছিল বরাহনগরের মহাদেব গঙ্গোপাধ্যায়। এগুলো সে ছোট ছোট কাচের শিশিতে বানাত। প্রথমে শিশির ভেতর একটু বোমার মশলা ঢুকিয়ে দিত। তারপর ক'টা খ্যাপলা জালের কাঠি ঢুকিয়ে দিয়ে আবার কিছু মশলা এবং জালের কাঠি দিয়ে বাকি ফাঁকা জায়গায় মশলা দিয়ে শিশির মুখটা খুব ভাল করে আটকে দিত। বরাহনগরের রাজু, কমলরা মহাদেবের কাছ থেকে হাতে কলমে এগুলো শিখে এ ব্যাপারে ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল

ক্ষিতীশের সঙ্গীদের কাছ থেকে সাঁপু, কালুরা ছ'টা ডিসকো বোমা পেয়ে ফেলে দিল না। সেগুলো নিজেদের কাজে লাগানোর জন্য রেখে দিল। রাক্ষসরা কি খাবার পেলে ফেলে দেয়? এরা বোমা খেয়ে নিল।

আশিষ ক্ষিতীশকে নিজের জিম্মায় রেখে বাকি তিনজনকে ছেড়ে দিল। তারা রিক্সায়

এসেছিল। হেঁটে ফিরতে লাগল। ক্ষিতীশের ডাকে ডাকাতি করে কিছু রোজগার করতে এসেছিল, কিন্তু ডাকাতির বদলে ক্ষিতীশকে আশিষের হাতে জমা দিয়ে ওরা বেলঘড়িয়া ছেড়ে আড়িয়াদহের দিকে প্রাণ হাতে নিয়ে চলল।

আশিষ এবার প্রতিশোধ নিতে ক্ষিতীশকে নিয়ে গেল ক'টা কংগ্রেসী ছেলের কাছে। আশিষ ক্ষিতীশকে বলল, "বল শালা, তুই কী কী করেছিস।" ক্ষিতীশ আমতা আমতা করে বলল, "আশিষ ঠিকই বলছে, আমিই ঝাঁপুর মা আর বোনকে কুপিয়েছি।" এটুকু বলে সে চুপ করে গেল।

আশিষ ক্ষিতীশের ঘাড়ে একটা রদ্দা মেরে বলল, "চুপ করলি যে, আর কিছু করিসনি?"

ক্ষিতীশ রদ্দা খেয়ে বলল, "তার এক সপ্তাহ পরে গোঁয়া গোবিন্দকে নিয়ে আমিই ঝাঁপুর বাড়িতে আশিষের নামে ডাকাতি করেছি।" আশিষ বলল, "এ সব তোর গুরুর বাড়িতে কেন করেছিস, সেটা তো খোলসা করে বললি না।"

ক্ষিতীশ মাথা নিচু করে কোনও মতে বলল, "ঝাঁপুর বোনকে আমি চেয়েছিলাম, ওরা মানল না, আমিও তাই বদলা নিয়ে নিলাম।" ঝাঁপুর পার্টির লোকেরা ক্ষিতীশের সব কথা শুনল। দু'চারটে গালাগালি দিল। আশিষ সেদিকে কান দিল না। সে ক্ষিতীশকে নিয়ে ওখান থেকে সরে পড়ল। তাকে নিয়ে গেল টেক্সম্যাকো কোম্পানির দিকে। .

আশিষরা অন্ধকার খুঁজল। রাত এগারোটা নাগাদ ক্ষিতীশকে নিয়ে এল ওই কোম্পানির ওয়েব্রিজের কাছে। ক্ষিতীশ ক্রমাগত আশিষের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল। আশিষের কাছে এসব প্যানপ্যানানির কোনও অর্থ নেই। তার ভাল লাগছিল না। সে তার হাতে রাখা ক্ষিতীশের ভোজালী দিয়েই তার গলায় মারল একটা আস্ত কোপ। কোপের ওজনে ক্ষিতীশের ধারাপাতের মতো "এবার ছেড়ে দে, একবার ছেড়ে দে, আর করব না" কাঁদুনি এক ঝটকায় শুধু বন্ধ হল না, সে ছিটকে গিয়ে মাটিতে পড়ে গলা ধরে কাটা মুরগীর মতো ছটফট করতে লাগল। গলগল করে রক্ত পড়তে লাগল হাত বেয়ে।

ক্ষিতীশকে ওই অবস্থায় দেখে আশিষের মন আনন্দে মেতে উঠল। শত্রুর রক্ত ঝরা দেখলে আশিষের মুখ চোখ প্রতিশোধের তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়। সে এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্ষিতীশের ছটফট করা শরীরের ওপর। তারপর পাগলের মতো মারতে লাগল একটার পর একটা কোপ। প্রতিটা কোপের সঙ্গে ক্ষিতীশের রক্ত ছিটকে ছিটকে উঠে এসে লাগতে লাগল আশিষের সর্বাঙ্গে। সাঁপু, স্বপন, কালুরা ঘিরে দাঁড়িয়ে আশিষের তাণ্ডব দেখতে লাগল। ক্ষিতীশের অঙ্গের এমন কোনও অংশ বাকি রইল না আশিষের ভোজালীর ছোঁয়া থেকে রক্ষা পেল। ক্ষিতীশকে চেনার কোনও উপায় রইল না। নাক, মুখ, চোখ, দাঁত, পেটের নাড়িভুঁড়ি, বুকের পাঁজর সব শরীরের বাইরে। মনে হতে লাগল, কোনও উন্মাদ জন্তু তার থাবা দিয়ে খুবলে খুবলে খেয়ে রেখে গেছে শিকার।

প্রায় মিনিট কুড়ি এক নাগাড়ে ক্ষিতীশকে কোপানোর পর আশিষ উঠে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "শালা, ভেবেছিল আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবে।" আশিষকেও চেনা যাচ্ছে না। তার জামা প্যান্টের সামনের দিকটা ক্ষিতীশের রক্তে সম্পূর্ণ লাল। ডান হাতের খোলা ভোজালীর মাথা থেকে টপটপ করে রক্ত পড়ছে। আশিষ তার সহকর্মীদের নির্দেশ দিল, "লাশটা উল্টে দে। যাতে কাল ওকে কেউ চিনতে না পারে।" সাঁপুরা ক্ষিতীশের লাশটা উল্টে দিল 1

আশিষ এবার ফিরতে লাগল। সঙ্গে তার সহযোদ্ধারা। আশিষ ঝিলে এসে ক্ষিতীশের রক্ত ধুয়ে ফেলতে লাগল। কাঁচা রক্তের গন্ধ লাগছে। এরকম গন্ধ তার ভালই লাগে। তার মনে হয়, "সেই তো রাজার রাজা।" ঠিক করল, গন্ধটা সে সারারাত উপভোগ করবে। কিন্তু জামাটায় যা রক্ত লেগেছে, তা আর উঠবে না। চিহ্ন মুছবে না। সে তাই চিহ্ন মুছে ফেলার

জন্য জামাটা খুলে ফেলে দিল। সাঁপু আবার সেটা ইঁটে বেঁধে ঝিলের মাঝখানে ছুঁড়ে দিল। ভোজালীটা স্বপন ধুয়ে রেখে দিল। ওটা পরে কাজে লাগবে। রাত সাড়ে বারোটা একটা নাগাদ ওরা যে যার বাড়ি ফিরে গেল। অবশ্য তার আগে স্টেশনের পাশে গিয়ে দু'বোতল বাংলা মদ শেষ করল।

পরদিন আশিষের কাছে খবর এল, ক্ষিতীশের লাশ পুলিশ দুপুর একটা নাগাদ তুলে নিয়ে গেছে। লাশটা কার, সেটা কেউ সনাক্ত করতে পারছে না।

সন্ধেবেলায় বাবু আশিষের কাছে এল। আশিষ তাকে একগাল হেসে পাঁচশো টাকা দিয়ে বলল, “আরও লাগলে বলিস। তুই কাজটা দারুণ করেছিস।” বাবু টাকাটা নিয়ে আর দাঁড়াল না। তার স্ত্রীর গর্ভযন্ত্রণা শুরু হয়েছে। সে স্ত্রীকে ‘আসছি’ বলে আশিষের কাছে চলে এসেছে। আশিষ কথা রেখেছে। ঠিক যেমন সেও কথা রেখেছে। এ লাইনে টিকতে হলে কথা ঠিক রাখতে হবে। বাবু জানে।

আশিষ ক্ষিতীশের কথা ভুলে গেল। এখনও তার হাতে অনেক কাজ, খুন করার অনেক শত্রু আছে। তাদেরকে এক এক করে ‘বিদায়' দিতে হবে। এবার তার নিশানায় এল ঝাঁপুর দলের আর একটা ছেলে। কচি। কচিও ছিল তার বাবাকে খুন করার অন্যতম কাণ্ডারী। আশিষ খবর নিয়ে জেনেছে, কচি বেলঘড়িয়া ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে বরাহনগরের আলমবাজারে। কচিকে সে চেনে না। তাকে চেনে কার্তিক। সে তাই কার্তিককে দায়িত্ব দিল কচিকে কোনও এক ছুতোনাতা করে বেলঘড়িয়ায় নিয়ে আসার। কারণ বেলঘড়িয়াই তার সাম্রাজ্য, সেখানে সে তার খুশি মতো শত্রুকে ঘায়েল করতে পারে।

ছিয়াশির মাঝামাঝি। কার্তিক দায়িত্ব পেয়ে কচির সঙ্গে আলমবাজারে গিয়ে নতুন করে বন্ধুত্ব পাতাল। মাতাল কচি কার্তিকের পয়সায় প্রতি সন্ধেতেই আলমবাজারের বিভিন্ন ঠেকে চোলাই মদ খায় আর মনের দেরাজ খুলে আড্ডা মারে।

এভাবে সপ্তাহখানেক চলার পর একদিন রাতে কার্তিক কচিকে বলল, “দূর, তোদের এখানকার মালে শালা ঝাঁঝ কম, নেশা ঠিক হয় না, আমাদের ওখানকার র মাল যদি খাস, তবে দেখিস কেমন লাগে। কাল শালা তোর এখানে আসব না, তুই বরং চলে আসিস আমাদের ওখানে, আমি বিভাতে টিকিট কেটে রাখব, সিনেমা দেখার পর মাল খাব।” নেশায় চুর হয়ে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে তিন চারবার কচি বলল, “তাই হবে গুরু, অনেকদিন আমারও ওদিকে যাওয়া হয় না। যাব।” কথাবার্তা পাকা হয়ে যাওয়ার পর কার্তিক ফিরে গেল বেলঘড়িয়ায় এবং আশিষের সঙ্গে দেখা করে পুরো পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করল।

আশিষ কার্তিকের দক্ষতার প্রশংসা করে বলল, “দারুণ কাজ করেছিস রে, আমি কাল বিভার ইভিনিং শো'র দু'টো টিকিট কিনে রেখে দেব। তারপর তুই ওকে নিয়ে ক্যাম্পের মাঠে বসে মাল খাস। আমি ব্যবস্থা করে রাখব।”

কথা শেষ। সব কাজ পাকা। কচি বিনা পয়সায় সিনেমা দেখা ও মদ খাওয়ার আমন্ত্রণের লোভে পরদিন বিকেল সাড়ে চারটেরও আগে বিভা সিনেমার সামনে হাজির। সন্ধের শো শুরু হবে পাঁচটায়। কচি সিনেমা হলের সামনে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে কার্তিককে খুঁজল। কিন্তু কার্তিককে দেখতে পেল না। দু'চারজন পরিচিত ব্ল্যাকারকে দেখতে পেল। তাদের দিকে এগিয়ে কচি কুশল বিনিময় করল। অনেকদিন পর তারা অন্তরঙ্গভাবে কচিকে পেয়ে সিগারেট ও চা খাইয়ে আপ্যায়ন করল। পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করতে করতে কচি তাদের আতিথেয়তায় একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। ব্ল্যাকাররা টিকিট বিক্রি করতে করতে কচির বর্তমান হালচালের সব খবরাখবর নিতে লাগল।

কচির চা খাওয়া সিগারেট টানা শেষ। কার্তিক হাসতে হাসতে কচির কাছে এসে বলল, “কি রে কখন এসেছিস?” কচি বলল, “অনেকক্ষণ, তোর দেরি হল কেন?” কার্তিক গলা নামিয়ে কচির কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে বলল, “পরের কাজটা গুছিয়ে আসতে একটু

দেরি হল। চল, পাঁচটা বাজে, হলে ঢুকে পড়ি। ছবি শুরু হয়ে যাবে।”

কার্তিক কচিকে নিয়ে হলে ঢুকে পড়ল। কার্তিকের কাছে আশিষের দেওয়া দু'টো টিকিট আছে। কার্তিক সেই দু'টো দেখিয়ে ছবি দেখার জন্য সিটে গিয়ে বসল। কাজ ঠিকঠাক চলছে কিনা তা দেখার জন্য আশিষ শ্যামলকে লাগিয়ে রেখেছিল। শ্যামল হল থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে সব খেয়াল রাখছিল। কার্তিকরা হলের ভেতর ঢুকে যাওয়ার পর সে গিয়ে আশিষকে বলল, “কার্তিক কচিকে নিয়ে হলে ঢুকে পড়েছে।” আশিষ শুনল। তার কোনও রকম অভিব্যক্তি হল না। শুধু নির্দেশ দিল, “কিছু দড়ি যোগাড় করে রাখিস, রাতে কাজে লাগবে।”

শ্যামল দড়ি যোগাড় করতে গেল। ওদিকে হলে তখন ছবি শুরু হয়ে গেছে। কচি সেখানে মন বসিয়ে দিল। কার্তিকের মন পড়ে আছে অবশ্য শো ভাঙার পরের কাজে। সেই কাজগুলো তাকে ঠিক মতো করতে হবে। নয়ত তীরে এসে ডুবলে আশিষের গালাগালি তাকে শুনতে হবে। তবে সে নিশ্চিত জানে বেলঘড়িয়াতে যখন একবার কচিকে সে আমদানী করতে পেরেছে, তখন আশিষ তাকে জ্যান্ত আর ফিরতে দেবে না আলমবাজারে। জানে, আশিষের যমচোখ তাদের প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

সাড়ে সাতটার একটু পরে শো শেষ হল। কার্তিক কথা মতো তাকে মদ খাওয়াতে নিয়ে চলল। কচির খুব আনন্দ। অনেকদিন পরে পুরনো অঞ্চলে এসে তার এমনিতেই খুব ভাল লাগছে, তার ওপর একসঙ্গে সিনেমা দেখা, তারপর মদ খাওয়া। বিভা সিনেমা হলের পাশে একটা মাঠ। ক্যাম্প মাঠ নামে পরিচিত। কার্তিক কচিকে নিয়ে সেখানে গেল।

বৃষ্টিভেজা মাঠের এক কোণায় ওরা বসল। মাঠের এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিছু গাছ। সে সব গাছ থেকে মাঝে মাঝে জল মাখানো হাওয়া এসে ওদের চোখে মুখে লাগছে। পুরো মাঠটা অন্ধকার।

ব্যবস্থা আগেই সব করা ছিল। একটা বাচ্চা ছেলে কার্তিককে চোলাই মদের বোতল ও দুটো গ্লাস দিয়ে গেল। কার্তিক সিনেমা হলের সামনে থেকে ফুলুরি ও আলুর চপ কিনে এনেছিল। সেগুলোকে চাট হিসাবে ব্যবহার করে ওরা দু'জন শুরু করল চোলাই পান। আধ ঘণ্টার মধ্যেই দু'জনের ভেতর চোলাই মদের খেলা শুরু হয়ে গেল। তাতে চুটিয়ে চলল মদের আড্ডা, যেখানে শ্রোতা ও বক্তা দুজনেই। কিন্তু কার্তিক এখন খুব সংযত।

রাত পৌনে ন'টার সময় আশিষের নির্দেশ মতো মদের আড্ডায় যোগ দিল শ্যামল ও গোপাল। তারা আরও দু'টো বোতল নিয়ে এসেছে। বোতলের পর বোতল উড়ে যাচ্ছে। কচির নেশা ধরেছে বেশ। সে কার্তিককে রাত দশটা নাগাদ বলল, “কেতো, আজ আমি যাই রে, পরশু আসব, সেদিন সব খরচা আমার।” কার্তিক বলল, “যাবি তো ঠিকই, এত তাড়া কিসের? সবে তো জমেছে, শ্যামলরা একটু চালাক।” কচি কার্তিকের অনুরোধ গিলে বলল, “ঠিক আছে, তবে আমায় কম দে, এখানকার মালটাই শালা আলাদা, ঝট করে ঝটকা মারে।” গোপাল বলল, “র মালের দামও এখানে বেশি নেয়, মালটাও তাই ভাল দেয়।”

রাত এগারোটা নাগাদ মহারাজ হাতকাটা আশিষ এল। কচি ঢুলুঢুলু চোখে তাকে দেখে বলল, “আরে গুরু, তোমার কথা কতবার কেতোকে জিজ্ঞেস করেছি, খালি বলে, জানি না।” শ্যামল আশিষকে একটা বড় গ্লাসে মদ ঢেলে হাতে ধরিয়ে দিল। আশিষ গ্লাসটা নিয়ে একটানে মদটা শেষ করে কচিকে বলল, “আমার পাত্তা লাগাচ্ছিস কেন? মারবি নাকি?” কচি তার পুরনো শত্রু শিবিরের নেতার মুখে ওই উত্তর শুনে একটু ভয় পেয়ে কোনও মতে বলল, “পাগল না কি গুরু, আমি শালা ওসব লাইন ছেড়ে দিয়েছি।” ,

এরকম টুকরোটাকরা কথাবার্তায় রাত প্রায় বারোটার কাছাকাছি পৌঁছে গেল। আশিষের পাশেই অন্ধকারে শ্যামল বসেছিল। আশিষ শ্যামলকে কনুই দিয়ে একটা গোঁত্তা মারল। শ্যামল সেই গোঁত্তার ইশারা বুঝে উঠে মাঠের একটা কোণার দিকে চলে গেল।

তিন চার মিনিট। শ্যামলকে আবার অন্ধকারে ফিরে আসতে দেখা গেল। তার হাতে

দড়ি আর দু'তিনটে চেরাই কাঠ। কাঠগুলো সব হাত পাঁচেক লম্বা। তিন চার ইঞ্চি করে চওড়া। শ্যামল অন্ধকারে ওদের কাছাকাছি আসতেই আশিষ উঠে দাঁড়িয়ে তার ডান পাটা ধাঁই করে চালিয়ে দিল কচির গলা আর মুখ লক্ষ্য করে। কচি মদে টইটম্বুর। সে একটু ঝিমোচ্ছিল। আশিষের একটা বিরাট ওজনদার লাথি মুখের ওপর খেয়ে সে "ওরে বাবারে" বলে একটা চিৎকার করে কাদামাখা মাঠে ছিটকে পড়ল। ছিটকে গিয়ে নেশার ঘোরটা কিছুটা উথালপাতাল হল। মনে হল, যমখানায় ঢুকে পড়েছে। সে একসময়কার পাকা মস্তান। ঝট করে উঠে পালাতে গেল। আবার লাথি। এবার লক্ষ্য বুক। কচি কঁকিয়ে উঠে ছিটকে গেল।

আশিষ একটা চাপা গলায় হুঙ্কার ছাড়লো, "নিয়ে যা।" সঙ্গে সঙ্গে গোপাল আর শ্যামল, কচিকে টেনে হিচড়ে মাঠের পাশে একটা গাছের কাছে নিয়ে গেল। শ্যামলের হাতের দড়ি এবার কাজে লাগল। কচিকে সেই গাছের সঙ্গে বাঁধা হল। কচি হাঁকপাঁক করে খালি বলতে লাগল, "ওরে কেতো, তুই আমার সঙ্গে বৈঠকবাজি করলি, এটা ভাল হল না।" কার্তিক তার লাল দাঁত বার করে ঢেউ খেলিয়ে খিলখিল শব্দে হাসতে লাগল। সেই হাসির চোটে কচির কান্না আরও ঠেলে বার হতে লাগল।

এবার চেরা কাঠের খেলা। প্রথমে আশিষ কাঠের রোলার দিয়ে মারল কচির পেটে। কচির পেট চোলাই মদে ঠাসা। আশিষের কাঠের রোলারের মারে সেই মদ ভকভকিয়ে মুখ দিয়ে বমি আকারে বেরিয়ে এল। পরের মারের জন্য আশিষরা দয়া করে ওর বমি শেষ হওয়া পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করল।

দুর্গন্ধ ছড়িয়ে গেল চারপাশে। ওসব আশিষদের নাকে লাগছে না। তারা নিজেরাও চোলাই মদ খেয়ে আছে, তার ওপর সামনে শত্রুর কাঁচা রক্ত দেখছে, সেখানে সামান্য দুর্গন্ধতে কি আসে যায়? এবার শুরু হল কাঠের ডাণ্ডা দিয়ে এলোপাথাড়ি মার। কচির প্রাণটা এত কচি নয়। মারের তালে তালে তার চিৎকার চলছে। কিন্তু চিৎকারের গভীরতা ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। জামাপ্যান্ট ছিঁড়ে খানখান। রক্তে ও কাদায় সেগুলো বীভৎস। অন্ধকার, তাই সম্পূর্ণভাবে গোচরে আসছে না। জ্ঞান যে কচি হারিয়েছে তা বোঝা গেল। কারণ মারের উত্তরে শরীর আর আগের মতো নড়েচড়ে জানান দিচ্ছে না।

আশিষ মার থামিয়ে কিছু চিন্তা করল। ওর আবার এক ধরনের খুন ভাল লাগে না। একঘেয়েমি লাগে, তাই বৈচিত্র্য আনতে চায়। সেইজন্যই সে ওস্তাদ। চিন্তা শেষে শ্যামলকে ইশারা করল। শ্যামল মাঠ থেকে বেরিয়ে গেল। গেল প্রফুল্ল নগর কলোনিতে। সেখানে বৈদ্যুতিক তার কাটার ওস্তাদ পলুর বাড়ি। পলু তখন জেলে। বাড়িতে আছে তার ভাই কালু। সে তার দাদার মতো ওস্তাদ না হতে পারলেও আশিষের দলে ঢুকে অন্যান্য সমস্ত 'কাজই' শিখেছে। শ্যামল কালুকে ডাকল। কালু ঘুমিয়েছিল, কিন্তু শ্যামলের ডাক শুনে পরিচিত স্বর চিনতে তার অসুবিধা হল না। সে দ্রুত বিছানা ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চোখ কচলাতে কচলাতে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে শ্যামলদা?" শ্যামল বলল, "চল, তোকে আর রণজিৎকে গুরু ডাকছে, কাজ আছে।"

কালু ঘরের খোলা দরজা টেনে দিয়ে শ্যামলের সঙ্গে চলল রণজিতের বাড়ির দিকে। একই পাড়ার ছেলে রণজিৎ পলুর এক নম্বর শাগরেদ। পলু জেলে যাওয়ার পর সে আশিষের দলে যোগ দিয়েছে। শ্যামল আর কালু অন্ধকার বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল। রণজিৎও চোলাই মদ খেয়ে ঘুমিয়ে ছিল। কালু আর শ্যামল বেশ গলা উঁচিয়ে ওর নাম ধরে হাঁক পাড়ল। পেটে চোলাইয়ের বর্ষা, বাইরে প্রাকৃতিক বর্ষা, স্বাভাবিকভাবেই রণজিৎ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তবু কড়া নাড়া আর ডাকের চোটে তারও ঘুম ভাঙল। উঠে এল। কাজ আছে শুনে সেও বেরিয়ে এসে শ্যামলের সঙ্গে যোগ দিয়ে ক্যাম্পের মাঠের দিকে চলল।

শ্যামল ওদের দুজনকে নিয়ে আশিষের সামনে হাজির। কচির অবস্থা তখন খুবই সঙ্গীন। গাছের সঙ্গে বাঁধা। মাথাটা ঝুলে আছে। মাঝে মাঝে ওর "ও মা গো, ও মা গো" গোঙানিতে বোঝা যাচ্ছে সে বেঁচে আছে। কালু ও রণজিৎ একবার কচিকে অন্ধকারে দেখে

নিল। রণজিৎ আশিষকে প্রশ্ন করল, “এত রাতে ডাক, কী কাজ আশিষদা?” আশিষ সিগারেট টানছিল। প্রশ্ন শুনে সে সিগারেটে একটা টান দিল। জ্বলন্ত সিগারেটের আগুনে আশিষের মদ্যপ মুখটা অনেকটা নেকড়ে বাঘের মতো লাগল। তার টকটকে লাল চোখ দুটো সিগারেটের টানে একবার জ্বলছে, আবার অন্ধকারে নিভে যাচ্ছে। সে কচিকে দেখিয়ে রণজিৎ আর কালুকে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, “এ মালটাকে এখানে সাবাড় করব না, একে তোরা দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে খতম করে ফেলে দে। মনে রাখিস, এই শুয়ারের বাচ্চাও আমার বাবাকে খুন করার একটা পাণ্ডা।” বেলঘড়িয়া ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে ভেবেছিল, বাঁচবে। সেটা যে ভুল বুঝিয়ে দিস।

দায়িত্ব শুনে রণজিৎ বলল, “একে হাত পা বেঁধে একটা রিক্সায় তুলে দাও, বাকি কাজটা আমাদের।”

কার্তিকের প্রচণ্ড নেশা হয়েছে, সে রণজিতের কথায় হেসে উঠে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, ‘এর আবার হাত পা বাঁধতে হবে? শালা যা মার খেয়েছে, পালাতেই পারবে না।” আশিষ কার্তিকের কথার উত্তর দিল, “তুই চুপ কর, কেলোরা ঠিক বলেছে, ও শালার জান কই মাছের মতো, এতক্ষণ যা খেয়েছে তাতেই অক্কা পাওয়ার কথা, কিন্তু পায়নি, সেটা দেখেছিস তো, তাই ওকে বেঁধেই নিতে হবে, যা।” তারপর গোপালের দিকে তাকিয়ে বলল, “একটা রিক্সা নিয়ে আয়।” গোপাল শিস দিতে দিতে গুরুর কথা মতো রিক্সা ডাকতে মাঠের অন্যপ্রান্তের দিকে চলল।

শ্যামল, রণজিৎ আর কালু আশিষের নির্দেশ অনুযায়ী কচিকে গাছের বাঁধন থেকে খুলে ফেলল। কচি জ্ঞান ফিরে পেয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় ও মা গো ডাক দিচ্ছিল। তারপর পরিস্থিতি টের পেয়ে কার্তিকের ওপর তার রাগ হল। ঘৃণায় সে বিড়বিড় করে কার্তিককে গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে। কার্তিক মত্ত অবস্থাতেও সেগুলো শুনল। তার সম্মানে আঘাত লাগল। সে কচির গালে দুই থাপ্পড় মেরে বলল, “শালা, আমার বাপ মা তুলে গালাগালি দিচ্ছিস, দে, আর কতক্ষণ?” তারপর হাসতে লাগল। শ্যামলরা কচিকে মাটিতে ফেলে তার হাত পা বাঁধছে। হাত আর পা কাঠের ডাণ্ডার কয়েক'শ বাড়ি খেয়ে আর ঠিকঠাক জায়গা মতো নেই। শরীরের কোন কোন অংশ যে অক্ষত আছে, তাও অন্ধকারে ঠিক মতো বোঝা যাচ্ছে না।

একটা রিক্সা মাঠের ভেতর দিয়ে আসার আওয়াজ কানে এল। আশিষ সেই আওয়াজের দিকে তাকিয়ে দেখল। বুঝল, রিক্সার ওপর বসে আছে স্বয়ং গোপাল। কাদায় রিক্সার চাকা ঢুকে যাচ্ছে, তাই খুব দ্রুত এগিয়ে আসতে পারছে না। রিক্সাচালক রিক্সাটা গায়ের জোরে টেনে নিয়ে আসছে। তবে গোপাল যে তাকে ঠিক নির্দেশ মতো নিয়ে আসছে, সে ব্যাপারে আশিষের কোনও সন্দেহ নেই। রিক্সা এসে তার সামনেই দাঁড়াল। রিক্সাচালক অন্ধকারেই আশিষকে দেখে একবার হাত তুলে নমস্কারের ভঙ্গী করল। যে কোনও সম্রাটের দরবারে কোনও ক্রীতদাস হাজির, রিক্সাচালকের ভঙ্গীমাটা অনেকটা সেরকমই আশিষ বলল, “তুলে দে।” শ্যামল, গোপাল, রণজিৎ কচির হাত পা বাঁধা আধা-মৃত দেহটা রিক্সার পাদানিতে তুলে দিল। কচির পা দু'টো পাদানির বাইরে প্রায় মাটিতে ঠেকে গেছে। মাথাটা উল্টো দিকে কোনওমতে পাদানির ভেতর। কচিকে তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রিক্সার সিটে উঠে বসল রণজিৎ ও কালু। তারা তাদের চারটে পা কচির দেহের ওপর রাখল। ওই দৃশ্য দেখে ও তার পরিণতির কথা ভেবে ভয়ে ভয়ে কাঁপা গলায় রিক্সাচালক আশিষকে বলল, “দাদা।”

আশিষের বিরুদ্ধে বেলঘড়িয়ায় তখন বলার মতো কেউ নেই। রিক্সাচালকের মৃদু আপত্তি শুনে প্রথমে আশিষের আশ্চর্যই লাগল। সে তবু নিজেকে সংযত রাখল। কারণ তাকে দিয়েই তার কাজ করাতে হবে। সবসময় যে মাথা গরম করা ঠিক নয়, তা সে এতদিনে শিখে গেছে। সে তাই রিক্সাচালককে বলল, “তোর কোনও ভয় নেই, ওরা যেখানে নামিয়ে দিতে বলবে, সেখানে নামিয়ে তুই বাড়ি ফিরে যাবি। আশিষ ওকে পকেট থেকে

কুড়ি টাকা বার করে ওর হাতে গুঁজে দিল। রিক্সাচালক আর কোনও কথা না বলে অন্ধকার ফুঁড়ে রিক্সা টানতে শুরু করল।

রিক্সাটা যখন ক্যাম্পের মাঠের বাইরে চলে গেল, আশিষ তার শাগরেদদের বলল, "তোরা সবাই বাড়ি যা, আমিও যাচ্ছি, বেবি বোধহয় না খেয়ে বসে আছে।" শ্যামল কাঠের ডাণ্ডাগুলো কুড়িয়ে নিল, সেগুলো আবার কখন আশিষ চাইবে, কে জানে? সেগুলো তো গুছিয়ে রাখতে হবে।

কচিকে নিয়ে রিক্সা এসে থামল বেলঘড়িয়ার সি.সি.আর. সেতুর কাছে। সি.সি.আর সেতু দিয়ে দূরপাল্লার ট্রেনগুলো দক্ষিণেশ্বর হয়ে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে চলে যায়। নিচে কী হচ্ছে কে জানে? আর রাত একটার সময় ওই সব জায়গা তো বিভীষিকাময়। কচিকে রণজিৎ আর কালু রিক্সার পাদানি থেকে টেনে নামল।

কচিকে নামানোর সঙ্গে সঙ্গে রিক্সা ঘুরিয়ে রিক্সাচালক তাড়াতাড়ি পালাল। কচি তখনও মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কথা বলে যাচ্ছে, যা শোনার কোনও ইচ্ছাই কালু কিংবা রণজিতের হল না। তারা জানে, তাদের শুধু গুরুর হুকুমই মানতে হবে। রিক্সাচালক অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রণজিৎ ও কালু কচিকে রেল লাইনের দিকে টেনে নিয়ে চলল। সি.সি.আর সেতুর কাছাকাছি আসার পর ওরা দুজন থামল। কচির পিঠের সমস্ত চামড়া রেললাইনের পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্টোনচিপসের ঘষায় ঘষায় উঠে গিয়ে কাঁচা লাল লাল মাংসগুলো চোখের সামনে পরিষ্কার।

রণজিৎ কোমর থেকে একটা ভোজালী বার করল। তারপর কচির গলায় বলি দেওয়ার ভঙ্গীতে এক কোপ। গলায় কোপ পড়লে যতটা চিৎকার করার সম্ভাবনা থাকে, ততটা জোরে কচি চিৎকার করল না। কারণ ওর শরীরে তখন কঠিন হৃদপিণ্ডটা ধুকধুক করে চললেও চিৎকার করার মতো অবশিষ্ট শক্তি বা অনুভূতি কোনটাই ছিল না। তাই রণজিতের কোপে একটা অতি ক্ষীণ আওয়াজ ওর গলা থেকে বেরিয়ে ওর হৃদপিণ্ডের ধুকধুকানি বন্ধ করে দিল।

আশিষের আর একটা শত্রু শেষ করে রণজিৎ ও কালু হাঁটতে হাঁটতে প্রফুল্ল নগরে তাদের বাড়িতে ফিরে গেল। ওরা ঘুমোবে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে আশিষ চা খাচ্ছিল। খবর এল সি.সি.আর সেতুর তলায় একটা লাশ পাওয়া গেছে। লাশটার হাত পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। সারা শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন আর গলাটা দুটো ফাঁকে বিভক্ত। আশিষ বুঝল, লাশটা কার। তার মুখে হালকা একটা হাসির আভা চট করে খেলেই মিলিয়ে গেল। ভাবল রণজিৎ আর কালু তাহলে বাকি কাজটা ভাল ভাবেই করেছে। সে মনে মনে তার পরবর্তী খুনের নিশানা ঠিক করে নিল।

এবারের নিশানা আমতলা নন্দনপুরের সন্তু, কারণ সন্তু তার বাবাকে খুনের সময় মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিল। আশিষ জানে, সন্তু ইতিমধ্যে শোভার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে কেলো বাবুকে সঙ্গে নিয়ে নিজের দলের লোক লোহার ছাঁটের ব্যবসায়ী তুলসীকে খুন করেছে। তাই সন্তু এখন ঝাঁপুর ভেঙে যাওয়া দলের মধ্যেও অপাংক্তেয়।

সেই সুযোগটাই আশিষ নিল। কচিকে খুন করার মাসখানেক পর সে, শ্যামল, গোপাল, ডাকাত কৃষ্ণা, ডি.পি.নগর বাজারের মিঠু, বাবু দত্ত, বাবু সেন মিলে দুপুর দেড়টা নাগাদ সন্তুর বাড়ির কাছে গেল এবং সন্তুকে পেয়ে গেল। তারা এটাই চেয়েছিল। বিলম্ব করে লাভ কী, তাকে তারা সেখান থেকে তুলে নিয়ে এল। এবং সোজা তার গুরু ঝাঁপুর খালি বাড়িতে নিয়ে এল। প্রথমেই আশিষ ঝাঁপুর পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে একটা নোংরা কাপড় খুঁজে নিল, সন্তুর মুখে সেটা গুঁজে দিল। যাতে তার পরবর্তী কাজের জন্য সন্তু চিৎকার না করতে পারে। কাকুতি মিনতি না করে। এসব মিনতি টিনতি আশিষের ভাল লাগে না। মিনতি আর কান্না শুনলেই তার শরীরের ভেতরটায় কেমন বমি বমি ভাব আসে।

আশিষ কাপড় গুঁজে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলরা সন্তুকে দ্রুত চিৎ করে শুইয়ে

দিয়ে ওর জামাপ্যান্ট খুলে উলঙ্গ করে দিল। তারপর ওর হাত পা বেঁধে ফেলল। সন্তু গোঙাতে গোঙাতে ছটফট করে যতটা পারে তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু যেখানে চারটে ছেলে তার শরীরে চেপে বসে আছে, সেখানে সে কতটা বাধা দিতে পারবে?

এই পর্ব শেষ হওয়ার পর শ্যামলরা উঠে দাঁড়াতেই আশিষ তার ঘৃণার প্রিয় প্রকাশ লাথিটা সজোরে সন্তুর তলপেটের নিচে মারল। সন্তু ব্যথায় মুখ কুঁকড়ে ফেলল। বাঁধা হাত দুটো দিয়েই তলপেটের খোলা নিচটা চেপে ধরার চেষ্টা করল। আশিষ শ্যামলকে বলল, "জানালার শিকের সঙ্গে বেঁধে রাখ, যাতে এদিক ওদিক যেতে না পারে।" শ্যামলরা সন্তুকে টেনে নিয়ে গেল একটা বন্ধ জানালার কাছে, তারপর তার পা দুটো জানালার শিকের সঙ্গে লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। সন্তুর পা দুটো ওপরে উঠে গেল আর সে চিৎ হয়ে মুখে কাপড় গোঁজা অবস্থায় পড়ে রইল। বাঁধা হাত দুটোও টেনে বেঁধে দিল একটা চৌকির পায়ার সঙ্গে। যাতে সে পায়ের বাঁধন খুলতে না পারে। উলঙ্গ সন্তু মশা আর পিঁপড়ের খাবার হিসাবে শুয়ে রইল।

বাড়ির চারধারের দরজা জানালা বন্ধ। আশিষ বাড়ির সদর দরজায় একটা তালা ঝুলিয়ে চাবিটা শ্যামলকে দিয়ে বলল, "বাকি কাজটা তোরা রাতে সেরে ফেলিস, আমি কলকাতায় একটু কাজে যাব। ফিরতে দেরি হবে। আমার জন্য অপেক্ষা করিস না।" শ্যামল ও গোপাল মাথা নেড়ে দায়িত্ব বুঝে নিল।

রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ শ্যামল, গোপাল ও বাবু দত্তরা ঝাঁপুর বাড়ির সদর দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকে অন্ধকারে একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে সেই ঘরটায় গেল, যে ঘরটায় ওরা দুপুরবেলা সন্তুকে বেঁধে রেখে গেছে। শ্যামল একটা ছোট মোমবাতি জ্বেলে দেখল, সন্তু একইভাবে ত্রিভঙ্গ অবস্থায় ঝুলে আছে। ওর চারধারে মশা ভনভন করছে। কিছু লাল পিঁপড়ে কামড় দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশ ফুলিয়ে দিয়েছে।

সন্তু খিদেয় তৃষ্ণায় কাহিল হয়ে সারাদিন তার একসময়ের গুরুর বাড়িতে পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে মশার অত্যাচার সহ্য করতে করতেই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। শ্যামলদের আগমনের আওয়াজ শুনে জেগে উঠে গোঁ গোঁ শব্দে মুক্তির আবেদন জানিয়ে ছটফট করতে লাগল। পা দুটো জানালার শিকের সঙ্গে বাঁধা, তাই যতটা পারে শরীরটা ঘষে ঘষে শ্যামলদের পায়ের কাছে এগিয়ে আসার চেষ্টা করল। পরিত্যক্ত চৌকির পায়ার সঙ্গে টানা দিয়ে বাঁধাটা শ্যামলরা খুলে দিল। সন্তুর তখন চোখ দিয়ে জল পড়ছে, সেটাও গোপাল, শ্যামল দেখল। কিন্তু ওদের ওসব জলটল দেখার সময় নেই। সম্রাটের নির্দেশ মতো সন্তুর মাথাটা মেঝের থেকে তুলে ধরল। শ্যামল দড়িটা নিয়ে সন্তুর গলায় পেঁচিয়ে দিল। সন্তু তখন মাথা নেড়ে নেড়ে বাঁধা হাত দুটো দিয়ে একবার গোপালের পা আরেকবার শ্যামলের পা ধরে প্রাণ ভিক্ষা করে চলেছে। শ্যামল সন্তুর হাত পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল।

ছোট মোমবাতি জ্বলে জ্বলে ছোট হয়ে আসছে। শ্যামলদের তাই তাড়া আছে। এ সময় সন্তুর দিকে মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ নেই। শ্যামল সন্তুর গলায় প্যাঁচানো দড়ির এক প্রান্ত গোপাল আর বাবু দত্তর হাতে দিয়ে নিজে একটা প্রান্ত ধরে টানতে লাগল। দড়ির টানে টানে সন্তুর জীবন পাখি আকাশে ওড়ার জন্য একটু একটু করে ডানা মেলতে লাগল। মিনিট তিনেকের মধ্যে সেই পাখি পুরো ডানা মেলে উড়ে গেল।

সন্তুর ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ দেখে পাকা খুনি শ্যামলরা বুঝে যেতেই দড়ি টানা ছেড়ে দিল। সন্তুর মাথাটা ঝপ করে ঘরের মেঝেতে পড়ে ডান দিকে হেলে গেল। নাক দিয়ে রক্ত পড়ল। শ্যামলের দায়িত্ব শেষ বাকি শুধু প্রমাণ লোপ করার অধ্যায়ের কাজ।

গোপাল ঘরের কোণে রাখা একটা বস্তা নিয়ে এল। শ্যামলরা খুলে ফেলল সন্তুর হাত আর পায়ের বাঁধন। দ্রুত তারা প্রথমে জামা প্যান্ট, তারপর সন্তুর দেহটা সেই বস্তার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে বস্তার মুখটা দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে সদর দরজার দিকে নিয়ে চলল। সদর দরজার কাছে এনে ওরা একবার এদিক ওদিক ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে দেখে নিল,

কোন লোক তাদের দেখছে কিনা। না, রাত একটার সময় কেউ ওদের দেখবার জন্য জেগে বসে নেই। ওরা নিশ্চিন্ত হল। তারপর একটানে সন্তুর লাশ বোঝাই বস্তাটা বাইরে বার করে এনে সদর দরজায় ছিটকানি তুলে একটা তালা লাগিয়ে দিল, যাতে অনাহূত কেউ ওই বাড়িতে অনায়াসে ঢুকতে না পারে। তাদের কীর্তির কিছু ছোটখাটো স্বাক্ষর তো রয়ে গেছে, সেগুলো দেখে কেউ যেন ভ্রূও না কোঁচকায়।

এবার ওরা বস্তাটার চারকোণা ধরে আলতো করে তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। ওদের গন্তব্যস্থল রেল লাইন। বস্তার ভেতর সন্তুর দেহটা দুলতে দুলতে চলল শ্যামলদের নির্দিষ্ট ঠিকানার লক্ষ্যে।

বেলঘড়িয়ার ফাঁকা স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের ডাউন লাইনের ওপর শ্যামলরা ধপ করে সন্তুসমেত বস্তাটা ফেলে দিল। সন্তুর দেহের ওটাই এখন থেকে ঠিকানা। যতক্ষণ না প্রথম ডাউন ট্রেন বস্তার ওপর দিয়ে ছুটে চলে গিয়ে ওর লাশটা দু'টুকরো করে যায়।

শ্যামল, গোপালরা চলে গেল। ভোরবেলায় তাদের কর্তব্য সমাধানের কথা আশিষকে জানিয়ে দিলেই হবে। অবশ্য আশিষ যদি কলকাতা থেকে ফেরে, তবেই জানাতে পারবে। সম্রাটের কাজ তো সমাধা হয়ে গেছে, তাতেই তারা খুশি। তাই ওরা হাত পা ধুয়ে নতুন করে মৌজ করতে যখন বসল, তখন ঘড়ির কাঁটা দেড়টায়।

সকাল আটটার সময় আশিষ ট্যাক্সি থেকে নামল। ওর বাড়ির সামনে গোপাল দাঁড়িয়েছিল। ভোরবেলাতেই সে তার গুরুকে সন্তুর শেষ পর্বের সংবাদ জানাতে এসে বেবির কাছে শুনেছে, রাতে আশিষ বাড়ি ফেরেনি। তখন থেকে গোপাল আশিষের অপেক্ষায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, সে তো আর সংবাদটা সঠিক জায়গায় পরিবেশন না করে চলে যেতে পারে না।

আশিষকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে সে সেদিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতেই বুঝল, আশিষও, গত রাত বিনা ঘুমে কাটিয়েছে। কার ঘরে ছিল, তা আর গোপাল জানতে চাইল না। ট্যাক্সিটা ফিরে যেতে যে আশিষের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে নিচু গলায় তাদের গতরাতের অভিযানের খবর জানিয়ে দিল।

সব শুনে আশিষের ঠোঁটের কোণায় একটু হাসির রেখা ফুটল। তার সবচেয়ে ভাল লাগছে তারই একসময়ের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘরেই তার চ্যালাকে শেষ করতে পারার জন্য। আশিষ তার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে গোপালকে নির্দেশ দিল, "আজ রাতে ঝাঁপুর ওই ঘরে গিয়ে দড়িটড়ি যা আছে সব খুলে পরিষ্কার করে আসিস।"

গোপাল সেই নির্দেশ শুনে চলে গেল। আশিষ এখন ঘুমোবে। গতরাতে অনেক ধকল গেছে। এখন বিশ্রাম দরকার।

এক এক করে শত্রু নিধন করে আশিষ এখন বহাল তবিয়তেই রঙীন দিন কাটায়। একদিকে পুলিশের নিচু তলার অফিসার ও কনস্টেবলদের সঙ্গে তার দোস্তি, অন্যদিকে শাসক সি. পি. আই (এম) পার্টির স্থানীয় ছোট ছোট নেতাদের প্রত্যক্ষ মদতে তার রমরমা কারবার।

সে চাঁদার নামে তোলা তোলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে, কেউ কিছু বলে না। সাট্টাওয়ালা, চোলাই মদ ব্যবসায়ী বা ওই ধরণের সমস্ত বেআইনী কারবারীদের থেকে টাকা আদায়, জমির দালালি, রাতের দিকে ওয়াগন লুট, সব কিছুতেই সে তার কাটা হাত অবাধে প্রসারিত করেছে। সুতরাং স্ফূর্তিতে সে পিছিয়ে থাকবে কেন? তার এই ফেঁপে ওঠা দেখে তারই দলের নিমাইয়ের ভেতর ক্রমাগত হিংসা জমতে লাগল। কারণ আশিষ যেভাবে স্ফূর্তি করে, সে সেভাবে করতে পারে না। তাই সে কম পয়সার স্ফূর্তি করতে গিয়ে সিফিলিস বাধিয়ে বসেছে। এজন্য তাকে ডাক্তারের পেছনে ছুটতে প্রায়ই কলকাতায় যেতে হয়।

শিয়ালদহে এখন ঘাঁটি গেড়েছে ঝাঁপুরা। স্টেশন চত্বরে সে গরীবদের থেকে তোলা আদায় করে, ডাকাতি করে। জেল ঘুরে সে আর বেলঘড়িয়ায় ফিরে যেতে পারেনি। না

পারার অন্যতম এবং প্রধান কারণ অবশ্যই আশিষ। আশিষ যেমন তার দলের ছেলেদের এক এক করে খুন করেছে, ঠিক তেমনি সবদিকে আধিপত্য বিস্তার করে তার ঢোকার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। ঝাঁপু তাই সব সময় আশিষের কাছে পরাজয়ের জন্য রাগে ফুঁসতে থাকে। হাত কামড়ায়। নিমাই সেটা জানে। নিমাই এটাও জানে, যদি সে আশিষকে সরাতে পারে, তবে ক্রমে একদিন আশিষের শূন্য সিংহাসনে বসে সে রাজত্ব করতে পারবে।

কিন্তু আশিষকে চট করে সরিয়ে ফেলাটা খুব সহজ কাজ নয়। আশিষ অতি ধূর্ত। সাবধানী তার চলাফেরা। সে কোথায় কোনখানে থাকবে চট করে সে তার ঘনিষ্ঠদের আগে জানায় না। শত্রুরা যে তার জীবনের জন্য ওঁত পেতে আছে, সে ব্যাপারে সে সচেতন। তাদের খাবার যে ও খেয়ে নিচ্ছে, সেটা জানে। সেই খাবারের লোভে ওরা যে সুযোগ পেলেই তাকে বিদায় দেবে, তাও তার বিলক্ষণ জানা।

নিমাই তাই প্রথমেই ' আশিষকে সি. পি. আই (এম) পার্টিতে তার গোপন মদতদাতাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে নামল। সে তাই একদিন সন্ধেবেলা ওই পার্টির এক সমর্থকের গায়ে লুকিয়ে বোমা ছুঁড়ে মারল। তার ঠিক দু'দিন পর নন্দনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে রাতের অন্ধকারে পর পর তিন চারটে বোমা ছুঁড়ে মারল। এবং রটিয়ে দিল এ সবই আশিষের কাজ।

আশিষ তখন অর্থ ও স্ফূর্তিতে ভাসছে। সে এসমস্ত ছোটখাট ব্যাপারগুলো এড়িয়ে চলে নিজের ভালমানুষের ভাবমূর্তি গড়ায় ব্যস্ত। বোমা মারার দু'টো ঘটনায় তার নাম জড়িয়ে পড়ায় সে খোঁজ নিয়ে তার গুপ্ত শত্রুর পরিচয় জেনে গেল। এবং এও সে জানতে পারল, শিয়ালদহে তার শত্রুদের সঙ্গে নিমাই নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে, তাকে খতম করার জন্য। এই সব খবর সংগ্রহ করার পর স্বাভাবিক ভাবেই আশিষের ভেতর বাঘের গর্জন শোনা গেল। কিন্তু সে গর্জন সে নিজে একা শোনে। কাউকে বুঝতে দেয় না। গর্জন ঠাণ্ডা করতে তার নিমাইকে চাই। যতদিন না সে নিমাইকে হাঁড়িকাঠে চড়াতে পারছে, ততদিন তার গর্জন থামবে না।

আশিষের ভেতর যে ডাক দিয়েছে, তার খবর নিমাই রাখে না। আশিষ একা পরিকল্পনা করে। তার শাগরেদ শ্যামল, রতন, গোপাল, পাঁচু, আর সোদপুরের সুব্রত ও চিলতাকে তার ঘোলা রোডের বাড়ির কাছে ছিয়াশি সালের আগস্ট মাসের এক রাতে জরুরি তলব করে ডেকে নিয়ে এল আশিষ। বার্তা অনুযায়ী দশটার সময় সবাই হাজির।

বৃষ্টিভেজা লোডশেডিংয়ের রাত। আশিষ অন্ধকারের মধ্যেই সবার উপস্থিতি ও তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তার প্রতি তাদের আনুগত্যের পরিমাপ মাপার চেষ্টা করল। তারপর চাপা গর্জনের ভঙ্গিতে জমায়েতের উদ্দেশে প্রশ্ন করল, "তোরা কি চাস আমি বেঁচে থাকি?" প্রায় সমস্বরে উত্তর এল, "সে কি গুরু, এ আবার কেমন কথা?" আশিষ একই ভঙ্গিতে প্রশ্ন রাখল, "কেউ যদি আমাকে খুন করতে চায়, তবে তাকে কী করা উচিত?" শ্যামল যেন অন্য সবার প্রতিনিধি। সেই প্রথম জানতে চাইল, "কোন শালার এত বড় ক্ষমতা আছে, আমাকে শুধু তার নামটা বল। তারপর কী করতে হয় আমি দেখছি।"

শ্যামলের উত্তর শুনে আশিষ কোনও কথা বলল না। সে একবার শ্যামলের মুখের দিকে তাকিয়ে অন্ধকার চিরে দৃঢ়তার রেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করল।

সবাই চুপ। কারণ তাদের মনের কথা একা শ্যামলই জানিয়ে দিয়েছে। এখন তারা চুপচাপ প্রতীক্ষা করছে, কখন আশিষের মুখ থেকে সেই দুঃসাহসী লোকটার নামটা খসবে তার জন্য।

থমথমে জমে থাকা অন্ধকার আরও যেন গাঢ় হয়ে এল। তবু আশিষ প্রথমে জানাল না, কে সেই ব্যক্তি, যে আশিষকে খুন করতে চায়?

আশিষ দাঁতে দাঁত ঘষে শ্যামলের দিকেই তাকিয়ে জানতে চাইল, "হাত কাঁপবে না?" শ্যামল চটপট উত্তরে বলল, "এতদিন যখন কাঁপেনি, এবারেও কাঁপবে না।" ঠোঁট বন্ধ

আশিষের মুখ থেকে শুধু একটা "হুঁ" শব্দ বার হয়ে এল।

আবার নৈঃশব্দ ওদের গ্রাস করল। আশিষই তা ভাঙল। বলল, 'সেই লোকটা যদি আমাদের মধ্যেই কেউ হয়, তবেও কি তোদের হাত কাঁপবে না?"

বোমা ওরা জীবনে অনেক বানিয়েছে, ফাটিয়েছে, শত্রুর বুক লক্ষ্য করে ছুঁড়েছে, কিন্তু হঠাৎ এমন একটা শব্দের বোমার মুখোমুখি ওরা বোধহয় কোনও দিন হয়নি। বিস্ময়ে শ্যামলের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "তার মানে?" আশিষ কেটে কেটে বলল, "তার মানে তাই। এবার বল হাত কাঁপবে কি কাঁপবে না?" আশিষের কথায় অন্ধকার যেন আরও তাদের চেপে ধরল। সবাই নিজের ভেতর নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগল, "সে নয়তো?" উত্তরে তারা পেল, "না, সে নয়। তবে কে?"

ধৈর্য হারিয়ে গোপাল জানতে চাইল, "বল সেই শালার নাম কী, আজই তাকে সরিয়ে দিই।" আশিষ বলল, "এটা তোর কথা। সবাই কি তাই বলছে?" প্রত্যেকের অবস্থাই গোপালের মতো, তারা বলে উঠল, "হ্যাঁ, আমাদেরও একই কথা। তুমি বল।"

আশিষ শুধু বলল, "নিমাই।" শ্যামল অবাক হয়ে বলে উঠল, "নিমাই? সে তো এখানে নেই। আর ও এমন একটা- -

আশিষ শ্যামলকে থামিয়ে বলল, "আমি সব খবর নিয়েই তোদের বললাম। তোরা কিছু না করলেও আমি ওকে মারবই।" শ্যামল বলল, "আমরা কি তাই বলেছি?" আশিষ বলল, "নিমাই এগারোটার সময় এখানে আসবে, আমি সেইভাবেই খবর পাঠিয়েছি। তোরা যে যে এখানে থাকতে চাস না, তারা চলে যেতে পারিস।" পরিস্থিতি গুমোট।

তবু না, জমায়েতের থেকে একজনও নড়ল না। অন্ধকারে ওরা দাঁড়িয়ে রইল নিমাইয়ের আবির্ভাবের অপেক্ষায়, ওদের মুখ দেখলে হঠাৎ মনে হতে পারে, ওরা বোধহয় মূক ও বধির।

এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ওরা কোনও দিন পড়েনি। শ্যামল পরিস্থিতিটায় একটু বৈচিত্র্য আনতে পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট আশিষের দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজে একটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে ফস করে দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেট ধরানোর ফাঁকে- হাতে বাঁধা ঘড়িটা দেখে নিল।

মিনিট পাঁচেক বাকি আছে এগারোটা বাজতে। আশিষের কথা অনুযায়ী নিমাই এখন যখন তখন আসতে পারে। আসুক, সেটাই শ্যামলের মতো অন্যরাও চায়। একটা এসপার ওসপার হয়ে গেলে ঝামেলা শেষ হয়ে যাবে। এসব ছোটখাট ব্যাপার ওরা বেশিদিন ঝুলিয়ে রাখতে পছন্দ করে না। ওদের অনেক কাজ। একটা খুন করতে কত আর সময় ব্যয় করা যায়? সেটা শেষ হলেই ওরা কাজে চলে যাবে।

এগারোটা বেজে একটু একটু করে রাত এগিয়ে চলেছে। নিমাইয়ের দেখা নেই। আশিষ নির্বিকার। ওর বাকি শাগরেদরা ছটফট করছে। কতক্ষণ নিমাইয়ের জন্য সেখানে অপেক্ষা করবে, তা আশিষকে প্রশ্ন করে জানতেও পারছে না। বর্ষার ভেজা ভেজা হাওয়া ওদের চোখে মুখে উড়ে এসে উত্তেজনা কমানোর চেষ্টা চালালেও পারদ নিচের দিকে নামছে না। আধঘণ্টা পার হয়ে গেল এভাবেই। হঠাৎ ওরা দেখল, একটা লোক ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে। পা দুটো স্বাভাবিক ছন্দে নেই।

এগিয়ে এল। আর ঠিক সে সময়ই বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল আকাশে। সেই আলোয় ওরা প্রত্যেকেই দেখল সেই দুলকি চালে চলা লোকটাকে। হ্যাঁ, সে নিমাই। আলোর গতির চেয়ে শব্দের গতি অনেক কম। বিদ্যুৎ ঝলকানির শব্দ যখন তাদের কানে আছড়ে পড়ল, নিমাই তখন ওদের থেকে হাত দুয়েক দূরে।

নিমাই এসে আশিষকেই সরাসরি বলল, "একটু দেরি হয়ে গেল মাইরি, তোরা সবাই এসে গেছিস দেখছি। এখন বল, কী জন্য এখানে ডেকেছিস?" আশিষ তার শিকারকে হাতে পেয়ে উল্লসিত। পরিস্থিতি আয়ত্তে! খেলা শুরুর বাঁশি বাজিয়ে দিতে আর আপত্তি নেই। সে

তাই আগুন ঝরানো গলায় জানতে চাইল, "শিয়ালদায় বুঝি দেরি হয়ে গেল?" আশিষের এই রূপ নিমাই চেনে, সে সতর্ক হয়ে গেল। সে কোনও মতে বলল, "শিয়ালদায় কেন?" আশিষ একইভাবে বলল, "তুই যাস না বুঝি?" নিমাই থতমত খেয়ে বলল, "দূর।"

আশিষ নিমাইয়ের মুখে মারল এক ঘুষি। ব্যস, এতেই শুরু হয়ে গেল ঝড়। সেই ঝড়ের গতি একা সামলায়, সাধ্য কই নিমাইয়ের? শ্যামল, গোপাল, রতনদের কিল, ঘুষি, চড়ের চোটে নিমাইয়ের চিৎকার ঘোলা রোডের মেঘলা আকাশ ফুঁড়ে তোলপাড়। আশিষ শুধু একটা সাংকেতিক ঘুষি মেরেছিল, তারপর বাকি অন্যদের কাজ। সে জানত। সেই-ই থামাল। বলল, "তোরা দাঁড়া। আগে ওর জামাটা খোল।"

নিমাইয়ের নাক, মুখ ফেটে গলগল করে রক্ত জামায় পড়ে ভিজে গিয়েছে। সেটাই টেনে শ্যামলরা খুলে নিল। আশিষ হুঙ্কার ছাড়ল, "জামাটা দিয়ে ওর মুখটা বেঁধে দে, এটা ভদ্রলোকের পাড়া, ওর চিৎকারে সবাই ঘুম থেকে জেগে যাবে।" শ্যামলরা নিমাইয়ের মুখটা বেঁধে ফেলল। তারপর আশিষের নির্দেশ মতো ওকে বাঁধল সামনের একটা লাইটপোস্টে। আশিষ সজোরে মারল তলপেটে এক লাথি।

তারপর কাঠ আর ইঁটের আঘাতে আঘাতে নিমাই শেষ। মাথাটা লাইট পোস্টে কোনওমতে ঝুলে রয়েছে। কখন যে হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে গেছে, তা আশিষ কিংবা ওর সঙ্গীরা কেউ জানে না। ওরা জানে, মৃত্যুঘণ্টা যখন বাজিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন শুধু মারের পর মার চালিয়ে যাওঁ। মৃত্যু আপনিই একসময় পায়ে পায়ে এগিয়ে আসবে। তারপর বাকি কাজটা লাশ সরিয়ে ফেলা। আশিষ আর শ্যামল নিমাইয়ের মুখটা অন্ধকারে তুলে পরীক্ষা করে দেখল। ওরা নিশ্চিন্ত, নিমাই শেষ।

আশিষের নির্দেশ এল। শ্যামল আর রতন নিমাইয়ের প্রাণহীন শরীরটা লাইটপোস্ট থেকে মুক্ত করল। তারপর শুইয়ে দিল রাস্তায়। শ্যামলদের কাণ্ড দেখে আশিষ ওদের খেঁকিয়ে উঠে বলল, "তোদের মাথাগুলো কি সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা, শালা আমার পাড়াতেই লাশ ফেলে রাখলি? চল, লাইনের দিকে।"

আশিষের কথামতো শ্যামল, রতন, পাঁচু, সুব্রত চারজনে নিমাইয়ের চারটে হাত পা ধরে ওকে তুলে বেলঘড়িয়া স্টেশনের দু'নম্বর 'রেলওয়ে গেটের দিকে চলল। সারা রাস্তায় টপটপ করে পড়তে লাগল নিমাইয়ের ফেটে যাওয়া শরীরের রক্ত। দুলতে দুলতে চলেছে নিমাইয়ের শরীর। মিনিট সাত আটের মধ্যে ওরা রেললাইনের ধারে।

ব্যস, নিমাইয়ের শরীরটা আড়াআড়ি করে লাইনের ওপর শুইয়ে দিয়ে ওদের কাজ শেষ। এরপর ভোরের প্রথম ট্রেনের কাজ। সে ছুটতে ছুটতে এসে নিমাইয়ের দেহটা দু'আধখানা করে কেটে দিয়ে চলে যাবে। তারপর রেলওয়ে পুলিশের লোকেরা নিমাইয়ের দু'টুকরো শরীরটা লাইন থেকে তুলে পাঠিয়ে দেবে পোস্টমর্টেমে। সেই পোস্টমর্টেমের কী রিপোর্ট বার হল, তাতে বয়েই গেল আশিষদের। তারা সব কিছুর ঊর্ধ্বে। দরকার হলে নিজের দলের যোদ্ধা মারা যাওয়াতে একটা শোকসভা করবে, এমন কি বনধ কিংবা বিক্ষোভ দেখাতেও পারে। অন্ধকারের সম্রাট আশিষের অশেষ ক্ষমতা। তার কব্জায় বাঁধা অনেকের টিকি।

সুতরাং গভীর রাতে আশিষরা তাদের নিজস্ব ঠেকে বসে চোলাই আর বাংলা মদ খেয়ে আসর জমিয়ে নিল। আশিষের এখন আর শুধু মদ্যপানে মন ভরে না। নিজের শত্রুকে শেষ করে মনটা ভালই। কিন্তু মদ্যপানের সঙ্গে নারীসঙ্গ জুটলে তার আরও ভাল লাগত। কী করবে? কোথায় এত রাতে সে নারী পাবে? সে শোভার খোঁজে উঠে পড়ল।

ছিয়াশি সালের কালীপূজার দিন সাতেক আগে বেলঘড়িয়ার মাছের বাজারে তোলা আদায়ের ধান্দায় সকাল ন'টা নাগাদ আশিষ গিয়ে হাজির। ওর সঙ্গে আছে শ্যামল, গোপাল আর রতন। আশিষ মাছের বাজারে ঢুকেই দেখল বৈদ্যকে। যে ইদানীং ওর বিরোধিতায় সরাসরি ওর শত্রুদের মদত দিচ্ছে। যা আশিষকে খেপিয়ে তুলেছে। বৈদ্য আবার নিজের

শক্তি বাড়ানোর জন্য সি.পি.আই.(এম) নেতা শান্তি ঘটকের দলের সঙ্গে অতিরিক্ত মিশেছে। মিশুক, তাতে আশিষের কিছু যায় আসে না। আশিষের সঙ্গেও শান্তিবাবুর লোকেদের ও সি.পি.আই.(এম) পার্টির অপর গোষ্ঠীর নেতা রাধিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলেদের নিবিড় সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা আছে। এবং সে এটাও জানে, দু'পক্ষের কাছে বৈদ্যর থেকে তার মূল্য বেশি।

সুতরাং বৈদ্যর আর বাঁচার অধিকার নেই। আশিষ তাই দৃঢ় চিত্তে ওর শাগরেদদের নিয়ে বৈদ্যর দিকে এগিয়ে গেল এবং ওকে চারজনে মিলে ঘিরে ধরল।

আশিষ বৈদ্যকে বলল, "বৈদ্য, তোর সঙ্গে কথা আছে।" বৈদ্য বাজারেরই একটা সিমেন্ট বাঁধানো মাছের দোকানে বসেছিল। সে নির্বিকারভাবে বলল, "বল।" আশিষ একটু মুচকি হেসে বলল, "এখানে নয়, বাইরে চল।" বৈদ্য আশিষকে ভালভাবেই চেনে। ওর কথা যে কোনটাই সত্যি নয়, তাও জানে। কিন্তু সকাল ন'টা নাগাদ আর কোথায় নিয়ে যাবে? এটা ভেবে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "চল, কোথায় বাবি।" বৈদ্যর এমন স্বাভাবিক আচরণে আশিষও অবাক হয়ে যায়। তবে তার কোনও বহিঃপ্রকাশ কেউ দেখতে পায় না।

আশিষরা বৈদ্যকে বাজারের বাইরে নিয়ে এল। বাজারের বাইরে এসে আশিষ বৈদ্যকে একটা রিক্সা দেখিয়ে বলে, "ওঠ, একটু ঘুরে আসি।" বৈদ্য নির্বিঘ্নে রিক্সায় উঠে বসল। তার ডানপাশে বসে শ্যামল। অন্য আর একটা রিক্সায় আশিষ উঠে পড়ল। তার দুদিকে রিক্সার সিটে শরীরের অর্ধেক ঢুকিয়ে আর বাকি অর্ধেক বাইরে রেখে বসে পড়ল গোপাল ও রতন। দুটো রিক্সা চলতে শুরু করল। সামনে চলেছে বৈদ্যদের রিক্সা, পেছনে আশিষদের। বেলঘড়িয়ার বাজারে চলতি লোকেরা একবার করে আড়চোখে দেখে নিচ্ছে আশিষদের। কেউ বা কাষ্ঠহাসি হেসে আশিষের দিকে হাত নাড়ছে। ওটা বোধহয় সম্রাটকে অভিভাষণের একটা কায়দা। সম্রাটের দয়ার ওপর বেঁচে থাকার ন্যূনতম দক্ষিণা।

দুটো রিক্সা এসে থামল পঞ্চাননতলার একটা মাঠের ধারে। বৈদ্য ও শ্যামল হাসি হাসি মুখে রিক্সা থেকে নামল। আশিষরাও পেছনের রিক্সা থেকে নামল। আশিষ পার্স বার করে রিক্সাচালকের ভাড়া মিটিয়ে দিল, ওরা ফিরে গেল। তখন সাড়ে ন'টা।

আশিষ বৈদ্যকে মাঠের ভেতরদিকে চলতে বলল। বৈদ্যর এবার কেমন কেমন ঠেকছে। তবু নিজেকে মনে মনে অভয় জানিয়ে স্মার্ট হল। বলল, "কি এমন গোপন কথা যে বাজারে বলতে পারলি না, এখানে নিয়ে এলি, তারপরেও আবার মাঠের একেবারে ভেতরে যেতে হবে।" আশিষ ওর দিকে তাকিয়ে আদেশের ভঙ্গিতে শুধু বলল, "চল, গেলেই শুনতে পাবি।" বৈদ্য আর কথা বাড়াল না, ঘুরে মাঠের দিকে চলতে শুরু করেছে কি করেনি, তার কোমরে আশিষের একটা এক কুইন্টালি লাথি এসে পড়ল। অপ্রস্তুত বৈদ্য সেই লাথির চোটে মুখ থুবড়ে একেবারে মাটির ওপর। তবু বৈদ্য দ্রুত উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে আশিষ একটা ইঁট দিয়ে তার মাথায় মেরে দিয়েছে সজোরে একটা ঘা। বৈদ্যর জ্ঞান চলে গেল। তারপর কত যে ইঁটের আঘাত ওর শরীরের প্রতি অংশে পড়েছে, তা আর কেউই জানে না। এমন কি চিৎকারও সে বেশি করতে পারেনি।

মিনিট পনেরো এমন মারের পর আশিষরা যখন বৈদ্যকে ফেলে উঠে দাঁড়াল, তার অনেক আগেই বৈদ্য মারা গেছে। যে ক'টা ইঁট দিয়ে আশিষ, শ্যামলরা ওকে আঘাত করছিল, সেগুলোর চেহারা দেখলেই তা পরিষ্কার হয়ে যায়। ইঁটগুলো রক্তে এমন মাখামাখি হয়ে গেছে যে সেগুলো দেখে বোঝার উপায় নেই যে প্রকৃতই ওগুলো পোড়া মাটির ইঁট।

দশটার বেশ কিছুটা আগে আশিষরা পঞ্চাননতলার মাঠে বৈদ্যকে ফেলে রেখে নিজেদের আস্তানায় ফিরে গেল। বৈদ্য খুন হয়ে যাওয়াতে সি.পি.আই.(এম) কর্মীদের মধ্যে হইচই বেধে গেল। বৈদ্য শান্তিবাবুর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে ওরাই বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। ওদের ঠাণ্ডা করার জন্য আশিষ নিযুক্ত করল রাধিকাবাবুর গোষ্ঠীর লোকেদের। দু'পক্ষের আলোচনায় 'শান্তি' প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হল। এবং আলোচনার সুফলতা

কার্যকরী করতে দু'পক্ষ মিলিতভাবে 'বৈদ্য খুনের প্রতিবাদে' সারা বেলঘড়িয়ায় একটি মিছিলকে ঘোরাল। তাতে কিন্তু একবারের জন্যও ভুলক্রমে আশিষ বা তার দলবলের বিরুদ্ধে একটা কথাও উচ্চারিত হল না। বেলঘড়িয়ার মানুষ তাদের আসল সম্রাটকে আরও ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করে চিনতে পারল। যুদ্ধ ও শান্তির সীমারেখাটা কোথায় এবং কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেটাও অনুভব করতে তাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না। সুতরাং সম্রাট আশিষকে লম্বা কুর্নিশ করতে তাদের কী জন্য দ্বিধা থাকবে?

দ্বিধা থাকার কথা নয়, তবু কিছু লোকের দ্বিধা থাকে বিভিন্ন কারণে। আশিষের একচেটিয়া অত্যাচারে অতিষ্ঠ বেলঘড়িয়ার দুই একজন মানুষ তাকে সরিয়ে ফেলার জন্য উৎসাহী হলেও কার্যক্ষেত্রে সেটা করে দেখানোর সাহস সঞ্চয় করতে পারে না।

কংগ্রেসের নেপাল ভট্ট ও কামাক্ষ্যা গুহ বেলঘড়িয়া অঞ্চলের আরেক মস্তান বাংলাকে বলল, যদি আশিষকে সে খুন করতে পারে তবে তারা দুজনে মিলে ওকে পঁচিশ হাজার টাকা দেবে। বাংলা ওদের প্রস্তাবে রাজি হল। কিন্তু বাংলার দলের গিঁটগুলো বেশ নরম। খবরটা অনায়াসে পৌঁছে গেল আশিষের কাছে। আশিষ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর প্রতিকার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলার সফরসূচীর খবর রাখতে লাগল।

ছিয়াশির নভেম্বর মাসের ছ'তারিখ। সকাল দশটার একটু পরে ডানলপে একটা ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়ে গেল। আর অন্যদিকে দুর্গানগর স্টেশনের কাছ থেকে আশিষ তাঁর দলবল নিয়ে দশটা পঁয়তাল্লিশ নাগাদ বাংলাকে ধরল। ওকে নিয়ে সোজা চলে এল বেলঘড়িয়ায়। তারপর তার খুনী গুহায়। ঝাঁপুদের খালি বাড়িতে। বাংলাকে ওই বাড়িতে ঢুকিয়ে শ্যামলকে বলল, "চারপাশের কোনও জানালা দরজা খোলা আছে কি না, দেখে নে।" শ্যামল আর গোপাল বলল, "নেই।" তারপর দরজার খিল দিয়ে শুরু করল বাংলাকে মার। মারের চোটে বাংলা একবার করে লাফাচ্ছে আর একবার করে শুয়ে পড়ছে। কিন্তু ওর চিৎকার বাড়ির বাইরে থেকে খুব একটা শোনা যাচ্ছে না। মার শুরু হয়েছিল বারোটা নাগাদ। শেষ হল দুপুর একটায়। আর প্রয়োজন নেই। মৃতদেহের ওপর মেরে নিজেদের আর পরিশ্রান্ত করা কেন? আশিষ তার দল নিয়ে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। সদর দরজায় দিয়ে এল একটা বড় তালা। যাতে কেউ ভেতরে না ঢুকতে পারে। বাকি কাজটা ওরা রাতে সারবে। ইতিমধ্যে যাতে অনধিকার চর্চায় কেউ নেমে না পড়ে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আশিষ শ্যামলদের নিয়ে ভোজ সারতে একটা ট্যাক্সি ধরে কলকাতার দিকে চলল।

ঝাঁপুর বাড়িতে শুয়ে রইল বাংলা। আশিষকে খুন করে নেপাল আর কামাক্ষ্যার থেকে পঁচিশ হাজার টাকা নেওয়া হল না।

কলকাতার এক নামকরা রেস্তোঁরার সামনে আশিষের ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। আশিষরা একে একে ঢুকে পড়ল সেই রেস্তোঁরায়। দু'একজনের হাতে তখনও লেগে ছিল বাংলার শরীর থেকে ছিটকে আসা টুকরো টাকরা রক্ত। সেগুলো হাতের কব্জিতে শক্ত হয়ে বসে গিয়েছিল। রক্তের ছিটেগুলো ওরা রেস্তোঁরার বেসিনে ভাল করে ধুয়ে একটা টেবিলে গোল হয়ে খেতে বসল।

বাংলার মৃতদেহের ওপর তখন ঝাঁপুর বাড়ির মাছি ও পিঁপড়েরা জাঁকিয়ে বসে রক্ত পরীক্ষা করছে আর দুপুরের আহার সারছে। বাংলার মুখ থেকে দাঁতের দুটো পাটিই বেরিয়ে এসেছে। চোখ ঠিকরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে নাকের ওপর। একটা বেশ বড় ইঁদুর কোথা থেকে ছুটে এসে চোখ দুটো খুবলে খেয়ে আবার হঠাৎই বেপাত্তা। চোখের জায়গায় বড় দুটো গর্ত। সেখানে মাংসপিণ্ড বেরিয়ে আছে।

আশিষরা ভোজ সেরে ধর্মতলার একটা সিনেমা হলের সান্ধ্য শো দেখতে ঢুকে পড়েছে। আশিষ তার দলবলকে খুশি রাখতে ওস্তাদ। সে জানে তার দলের ছেলেরাই তার শক্তি। সেই শক্তিকে দখলে রাখতে নিজে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও খাওয়াতে হয়। না খাওয়ালে তার নির্দেশ তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে কেন? সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে

ওরা গেল বারদুয়ারিতে বাংলা মদ পান করতে। সেখানে প্রত্যেকে বেশ কিছুটা মদ্যপান করে আবার একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল এবং সোজা বেলঘড়িয়া। এবার তাদের নিজেদের ঠেকে। আবার মদ্যপান এবং আড্ডা।

রাত বারোটা। আশিষ বলল, "এবার চল, বাকি কাজটা সেরে ফেলি।" ওরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। শ্যামল, গোপাল, রতনদের নিয়ে আশিষ চলল ঝাঁপুর বাড়ির দিকে।

সেখানে বাংলা ওদের অপেক্ষায় শুয়ে আছে। তাদের ওপরই ওর অন্তিম যাত্রা নির্ভর করছে। শ্যামলের হাতে একটা বড় চটের বস্তা। ওরা এসে দাঁড়াল ঝাঁপুর বন্ধ বাড়ির সামনে। আশিষ পকেট থেকে চাবি বার করে দিল গোপালের হাতে। গোপাল সদর দরজাটা খুলে ঢুকে গেল ভেতরে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। রতন দেশলাই জ্বালাল। দেশলাইয়ের আলোয় ওরা নির্দিষ্ট ঘরে এল। রতন একটা মোমবাতি জ্বালাল। মোমবাতির আলোয় ঘরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

বাংলা শুয়ে আছে। চোখের কোটরে মণি দুটো নেই আর সব একই রকম। শ্যামল চাপা স্বরে আশিষকে বলল, "দেখেছিস।" আশিষ বলল, "হ্যাঁ, ইঁদুরের কাজ। বস্তায় ভরে নিয়ে তাড়াতাড়ি চল।" শ্যামল বস্তার মুখটা বাংলার মাথার দিকে রেখে আস্তে আস্তে ঠেলে বাংলার ঠাণ্ডা দেহের অর্ধেক পর্যন্ত নিয়ে গেল। তারপর শ্যামল বস্তার ওপর দিকটা তুলে ধরল। রতন ও গোপাল বাংলার দুটো পা ধরে চাপ দিয়ে দেহের প্রায় পুরোটা ঢুকিয়ে দিল বস্তার ভেতর।

আশিষ বলল, "নিয়ে চল।" তারপর সবাই মিলে বস্তাটা তুলে ধরে সদর দরজার বাইরে এল। মোমবাতিটা রতনের হাতে ধরা। আশিষ তাড়াতাড়ি সেটা এক ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল। রতনকে বলল, "বন্ধ করে দে।" রতন সদর বন্ধ করে চাবিটা আশিষের জিম্মায় দিয়ে দিল।

রাত সাড়ে বারোটায় ওরা যখন বেলঘড়িয়া স্টেশনের চার ও পাঁচ নম্বার গেটের মাঝখানটায় পৌঁছলো, তখন সেখানে কোনও মনুষ্যচিহ্ন নেই। ওরা সন্তর্পণে ওখানকার রেললাইনের ওপর বস্তাটা সমেত বাংলাকে শুইয়ে দিয়ে সেদিনকার মতো কাজ সম্পন্ন করল। এবার হাত পরিষ্কার, বাংলাকে স্বর্গ অথবা নরকের ঠিকানায় পাঠিয়ে ওরা ফিরে চলল নিজেদের ঠিকানায়।

খুন করে লাশ রেললাইনের ওপর ফেলে দেওয়ার পরামর্শটা দিয়েছিল বেলঘড়িয়া থানার অফিসার দ্বিজেনবাবু। দ্বিজেনবাবু মাঝে মধ্যে রেলওয়ে স্টেশনের পাশে পটারিতে ডিউটিতে আসতেন। একবার এলে টানা পনেরো দিন সেখানে পাহারায় থাকতে হতো। সেই সময় তিনি মদওয়ালা ও সাট্টাওয়ালাদের দিয়ে আশিষকে খবর পাঠাতেন, যে ক'দিন তিনি ওখানে আছেন, সে ক'দিন যেন আশিষ খুন টুন না করে। আর খুন করতে একান্ত বাধ্য হলে সে যেন লাশ রেললাইনের ওপর ফেলে দিয়ে আসে। তাতে তাদের আর দায়িত্ব থাকে না। রেলপুলিশের ঘাড়ে দায়িত্ব পড়ে। খুনের মামলার 'আপদ' তাদের ঘাড় থেকে নেমে যায়। আশিষ দ্বিজেনবাবুর অনুরোধটা পালন করত। তাছাড়া বিভা সিনেমা হলের কাছে দেশপ্রিয় নগর কলোনিতে যে পুলিশ ফাঁড়িটা ছিল, তাতে যে হাবিলদার ও কনস্টেবলরা পাহারায় থাকত, তারা তো ছিল আশিষ ও তার দলের ছেলেদের একেবারে ইয়ার দোস্ত। ওরা শ্যামল হোটেল ও মা তারা হোটেলে বসে একসঙ্গে আড্ডা দিত। স্বপন ছিল বিভা সিনেমার কালোবাজারী টিকিট বিক্রির মহাজন। ফাঁড়ির পুলিশরা ওই কালোবাজারী টিকিট বিক্রির লাভের অংশ স্বপনের কাছ থেকে নিয়মিত পেত।

মোহিনী মিল ক্লাব ঘরের তলায় বেলঘড়িয়া থানার আর একটা ফাঁড়ি ছিল, সেখানে পরে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলের পুলিশেরা পাহারায় থাকত। এদের সঙ্গে আশিষদের দারুন দহরম নরম ছিল। এবং আশিষের কাছ থেকে মদ চাইত এবং আশিষ তাদের মদ যোগান দিয়ে ওদের ইচ্ছাপূরণ করত। ওদের থেকে সমস্ত পুলিশ বাহিনীর গতিবিধির খবর আশিষরা

আগাম পেয়ে যেত। তাতে তাদের পরিকল্পনা করার সুবিধা হতো। এমন কি আশিষদের গোপন আস্তানাগুলো ওরা চিনত এবং প্রয়োজনে রাত্রিতেও সেইসব আস্তানায় ফাঁড়ি থেকে লোক গিয়ে খবর দিয়ে আসত।

আশিষের সঙ্গে স্থানীয় কিছু পুলিশের এমন খাতির ছিল যে, তারা ভুলক্রমে কোনও জায়গায় হানা দিয়ে যদি আশিষ ও তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের দেখে ফেলত, তবে তাদের প্রথমে সুযোগ দিত পালিয়ে যাওয়ার। এবং সেই সব হানা থেকে দু'একটা চুনোপুঁটি ধরে তারা ক্ষান্ত হতো।

ছিয়াশি সালের দুর্গাপুজার একাদশীর দিন সকাল থেকে খুব বৃষ্টি শুরু হল। আশিষের মেজাজটা ভাল নয়। দুপুরবেলা সে বাসুদেবপুরের শিবতলা দুর্গাপূজার মণ্ডপের পাশে ক্লাব ঘরে শ্যামল, স্বপন, গোপাল, কানা জয়দেব, সৈন্যবাহিনীর এক জওয়ান, স্বপন সেন ও পুনুকে নিয়ে জুয়া খেলতে ঢুকল।

আশিষ কোমর থেকে তার রিভলবারটা পায়ের নিচে চালান দিয়ে আরাম করে বসে জুয়া খেলা শুরু করল। জুয়া খেলতে খেলতে কখন যে সন্ধ্যা নেমে গেছে সেদিকে কারও খেয়াল নেই। কে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে চলে গেছে। ওরা সেই আলোয় চারপাশে গোল হয়ে জুয়াতে বিভোর।

হঠাৎ সেখানে রেলঘড়িয়া থানার অফিসার ইনচার্জের হানা। সঙ্গে আছে দ্বিজেনবাবু। ওরা ঢুকেই আশিদের দেখে নিয়েছে। দ্বিজেনাবাবু এক লাথি মেরে মোমবাতিটা উল্টে নিভিয়ে দিল। আশিষরা ক্লাব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। অফিসার পুনু, স্বপন সেন ও জওয়ানকে নিয়ে ক্লাব ঘর থেকে চলে গেল।

আশিষ সবই দেখল। তার হঠাৎ মনে পড়ল, রিভলবারটা ক্লাব ঘরেই পড়ে আছে। তাড়াতাড়িতে সেটা নিয়ে আসতে ভুলে গেছে। আর আছে বেশ কিছু টাকা। সে জানে ওগুলো যেমনভাবে ছিল, তেমনভাবেই থাকবে। আশিষ ধীর পায়ে আবার শ্যামলদের নিয়ে ক্লাব ঘরে ঢুকল এবং রিভলবার ও টাকা পয়সা নিয়ে বেরিয়ে এল। তার আর মেজাজ নেই জুয়া খেলার। সে তাই কোনও এক শোভার সন্ধানে শ্যামলদের নিয়ে কলকাতার দিকে পাড়ি দিল।

আশিষ সময় ও সুযোগ বুঝে বেলঘড়িয়া ও নিমতা থানার পুলিশের জিপে চড়ে ঘুরে বেড়াত। এতে সে তার শত্রু এবং সাধারণ মানুষের মনে একটা ধারণার সৃষ্টি করত যে তার সঙ্গে পুলিশের ঘনিষ্ঠতা এত বেশি যে তারা তাকে তাদের গাড়ি পর্যন্ত ব্যবহার করার সুযোগ দেয়। এ ব্যাপারে ওকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করত তখনকার নিমতা থানার জিপচালক কনস্টেবল জামাই। জামাই আশিষকে জিপে তুলে ঘুরিয়ে কিছু টাকা রোজগার করত। তাছাড়া সে কোনও তল্লাশি ও হানার আগে হর্ন দিয়ে বা গাড়ির হেডলাইট ক্রমাগত জ্বালিয়ে ও নিভিয়ে আশিষদের আগাম জানিয়ে দিত, "তোরা তফাৎ যা, বাহিনী আসছে।" আশিষরাও সেই সব সংকেত পেয়ে নিজেদের সাময়িকভাবে আড়ালে নিয়ে যেত।

আশিষের অত্যাচার তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে, বেলঘড়িয়ার সাধারণ মানুষের ভেতর ত্রাহি ত্রাহি রব উঠল। কিন্তু এলাকার সি.পি.আই.(এম) পার্টির ছোট ছোট নেতা ও কর্মীরা ওর হস্তগত, ফলে ওর বিরুদ্ধে কোনও গণবিক্ষোভ বা ওই ধরনের কোনও পদক্ষেপই কেউ নিতে সাহস পেত না। পার্টির ওপর মহলে এ নিয়ে কথাবার্তা হতে লাগল। তারা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ওই অঞ্চলের কর্তাব্যক্তিদের এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বলল। তারা সেই চেষ্টায় ব্যর্থ হল এলাকারই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের দরুন। তারা তখন আমাদের কলকাতা পুলিশকে অনুরোধ করল আশিষকে গ্রেফতার করার।

দায়িত্ব এল আমারই ওপর। আমি তার আগে এক নোংরা চক্রান্ত ও গুজবের শিকার হয়ে গোয়েন্দা দফতর থেকে অন্য দফতরে বদলি হয়ে আবার ঘুরে সেই গোয়েন্দা দফতরেই ফিরে এসেছি। ডাকাত ধরছি। আশিষরা যে এইভাবে পাইকারি হারে বেলঘড়িয়ায় খুন করে

যাচ্ছে, তার খবর বিস্তৃতভাবে জানতাম না।

আশিষ যখন প্রথম আমাদের হাতে ধরা পড়েছিল, তখনই সে আমাদের ওষুধ খেয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে কলকাতা পুলিশের এলাকায় সে কোনওদিন খুব ছোট মাপের অপরাধও করবে না। খবর নিলাম, আশিষ তার কথা রেখেছে। কিন্তু আমাদের এলাকায় অপরাধ না করলেও তুমি অন্য এলাকায় অপরাধ করে যাবে আর আমরা সুযোগ পেলে তোমায় গ্রেফতার করব না, চোখ বুজে থাকব, এ রকম কোনও আন্তর্জাতিক চুক্তি তো তোমার সঙ্গে আমরা করিনি। যে কোনও এলাকায় অপরাধ করলে এবং সেই অপরাধের সঙ্গে জড়িত অপরাধীর খোঁজ যদি আমাদের কাছে আসে, তবে আমরা তাকে গ্রেফতার করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বই।

সুতরাং আশিষকে আমাদের চাই। আশিষের সঙ্গে আমাদেরই এক অফিসারের যোগাযোগ ছিল। আশিষ তার হয়ে গুপ্তচরের কাজ করত। সে উত্তর চব্বিশ পরগনা অঞ্চলের ডাকাতদের খবরাখবর তাকে জানাত। আমাদের সেই অফিসার, সেই খবরেই স্বাভাবিকভাবেই সন্তুষ্ট থাকতেন। তিনি আশিষ নিজে কী কাজ করছে, সেই বিষয়টা গভীরভাবে খতিয়ে দেখেন নি। এবং শাসক পার্টির সঙ্গে আশিষের ঘনিষ্ঠতার দরুণ সেটা বোধহয় দেখারও প্রয়োজন বোধ করেন নি।

আমি আশিষকে গ্রেফতার করার জন্য তাকে কাজে লাগালাম। তাকে দিয়ে আশিষকে খুব হালকা চালে একটা খবর পাঠান হল। যাতে আশিষ কলকাতায় তার সঙ্গে দেখা করে নিজের মতো ফুর্তিফার্তা করে বেলঘড়িয়ায় ফিরে যায়।

সাতাশির ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় লাইট হাউস সিনেমা হলের সামনে আমাদের দল সাদা পোশাকে ফাঁদ পেতে বসে রইল। ওখানেই আসবে আশিষ। বেলঘড়িয়ার অধিপতিকে যথাযথ সম্ভাষণ জানাতে হবে তো। আশিষ একটা ভাড়া করা প্রাইভেট গাড়িতে সঙ্গীদের নিয়ে এল। চোখে মুখে দারুণ খুশি খুশি ভাব, গাড়ি থেকে নেমে সে তার পরিচিত অফিসারকে খুঁজতে লাগল। দেখতে পেল না। তার বদলে দেখল তাকে অন্য ক'জন সাদা পোশাকের অফিসার ঘিরে ফেলেছে। তারপর সোজা লালবাজারে আমার সামনে। সঙ্গে শ্যামল, স্বপন ও গোপাল। গাড়িতে পাওয়া গেছে একটা স্টেনগান ও একটা রিভলবার।

এরপর কি আর ওদের পুজো করব? দুধ কলা দেব কালো পাথরবাটিতে সাজিয়ে? বাজাবো কি শাঁখ, দেব কি উলুধ্বনি?

হ্যাঁ, দেব। তবে সেই পুজো ও শাঁখের ধ্বনি হবে আলাদা। সেই "আর করব না, আর করব না।" ধ্বনিতে একটাই আওয়াজ বার হবে, অবশ্য সেই পুজোর পুরোহিতকে পলকা জনপ্রিয়তার ও গণপ্রতিনিধি হওয়ার জন্য নির্বাচনে দাঁড়ানোর প্রলোভন পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ এরকম আশিষেরা পুজোর পরে জেল থেকে বেরিয়ে সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করবে সেই পুরোহিতেরই। আর তাকে সমর্থন করবে আমাদের চারপাশে নতুন পুরনো সব রঙের দলের ছোট বড় নেতারা।

পুজো হল। তারপর সোজা জেলে। এক বছর আট মাস। ওর বিরুদ্ধে আমাদের একমাত্র মামলা ছিল বেআইনী অস্ত্র রাখা। আর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মামলা ছিল অনেকগুলো। আমরা দেখলাম, আশিষেরা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মামলাগুলোতে পটাপট জামিন পেয়ে গেল। শুধুমাত্র আমাদের দায়ের করা মামলাতেই তারা জেলে থাকতে বাধ্য হল। এক বছর' আট মাস পরে সেই মামলাতেও জামিন পেয়ে বেলঘড়িয়া ফিরে গেল।

এবার অন্য নাটক। খেলা শুরু হয়ে গেল দুই সাট্টাওয়ালার। সাট্টাওয়ালারা সাটার কারবার চালাতে পুলিশ, শাসক দলের প্রভাবশালী কর্মী ও অঞ্চলের মস্তানদের মাসোহারা দিয়ে হাতে রাখে।

স্বাভাবিকভাবেই বেলঘড়িয়া অঞ্চলে সাটার কারবার চালাতে গেলে সাটাওয়ালারা আশিষকে দলের মদতদাতা হিসাবে চাইবে। আশিষকে নিজের দলে পেলে একদিকে যেমন

মস্তানদের হামলা থেকে ব্যবসা বাঁচবে, অন্যদিকে শাসকদলের কুচোকাঁচারা তাদের কর্মচারীদের ওপর কোনও রকম জোরজুলুম করতে ভয় পারে। আশিষই বেলঘড়িয়ায় তাদের নিরাপদ আশ্রয়।

ব্যারাকপুরের সাট্টাওয়ালা ইউনিসের এলাকা ছিল বেলঘড়িয়া। ইউনিস আশিষকে বাদ দিয়ে সাট্টার কারবার অবাধে চালাত। আশিষ জেলে থাকাতে তার সুবিধা হয়ে গিয়েছিল। জেল থেকে বার হওয়ার পর কলকাতার সাট্টাওয়ালা রাম অবতার চাইল আশিষের ওপর নির্ভর করে বেলঘড়িয়ার সাট্টার বাজারটা নিজের দখলে আনতে। আশিষ রাম অবতারের হয়ে কাজ শুরু করল। সে ইউনিসের লোকজনকে বাধা দিতে লাগল। ইউনিসের লোকজনকে হঠাতে না পারলে সে কী করে তার গুরুর কাজ করবে? কিন্তু ইউনিস তা মানবে কেন? সে আশিষকে আটকাতে একদিন রাতে নিজে বোরখা পরে তার এলাকার কিছু পেটোয়া পুলিশ নিয়ে আশিষকে গ্রেফতার করানোর জন্য তার বাড়িতে হানা দিল, কিন্তু আশিষকে পেল না।

আশিষ একবছর আটমাস জেলে উপোসী ছিল, সে কেন রোজ রাতে নিজের বাড়িতে থাকবে? এ ডালে ও ডালে ঘুরে বেড়াবেই, আর এরকম ঘুরে না বেড়ালে তার দলের ছেলেরা ভাববে সে বোধহয় নখদন্তহীন বা সাধু হয়ে গেছে।

ইউনিস তার পরিকল্পনায় বাধা পেয়ে আরও ক্ষেপে গেল। সে অন্য খেলা শুরু করল। বেলঘড়িয়ার মতো সাট্টার বাজার সে হাতছাড়া করতে পারবে না। এই পরিকল্পনায় সে টাকা ছড়াতে লাগল। টাকা না ছড়ালে টাকা আসবে কী করে? সে আশিষের প্রিয় কমরেড ইন আর্মস শ্যামল, গোপাল, স্বপনকে কিনে ফেলল।

অষ্টআশি সালের সতেরোই ডিসেম্বর আশিষকে নিয়ে ওরা সন্ধেবেলায় মদ্যপানে বসল। রোজই ওরা সান্ধ্য আড্ডায় বসে, সেদিনও বসেছে। তবে অন্যদিনের সঙ্গে সেদিনের তফাৎটা হল, অন্যদিন আশিষের পয়সায় মদ কেনা হয়, সেদিন কেনা হল শ্যামলের পয়সায়। তা নিয়ে আশিষ ঠাট্টা করে শ্যামলকে প্রশ্ন করল, “কি রে, কোথাও বুঝি আমাকে লুকিয়ে দাঁও মেরেছিস?” শ্যামল বলল, “আরে না গুরু, রোজ তুমি খাওয়াও, আজ আমি, স্বপন ঠিক করলাম, আমরাই খাওয়াই, গুরুকে কি একদিনও আমরা খাওয়াতে পারব না?” আশিষ শ্যামলের কথায় হাসল, তারপর ওর প্রিয় শিষ্যদের দিকে আদরভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে, চোখ সরিয়ে নিয়ে মদ্যপানে নিজেকে ডুবিয়ে দিল।

শীতের সন্ধ্যায় বাংলা মদের বোতলের পর বোতল ওদের পেটে উড়ে যেতে লাগল। নেশা যখন পূর্ণ চাঁদের মতো আকাশে পুরো জ্বলজ্বল করছে, মনের মধ্যে উড়ু উড়ু ভাব ছোটাছুটি করছে, শ্যামল তখন আশিষকে বলল, “গুরু আমি একটা ভাল মাল জোগাড় করে রেখেছি, যাবে নাকি তার ডেরায়?” আশিষের মনে স্ফূর্তির বান ডেকেছে, সে তার চ্যালার কথা শুনে বলল, “কোথায়?” শ্যামল বলল, “কাছেই, নিমতায়। চলো।” আশিষ ও বলল, “চল, দেখে আসি।”

শ্যামল আগের থেকে একটা প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে রেখেছিল। সেটা আশিষ জানত না। শ্যামল সেটা ডেকে নিয়ে এল। গাড়িতে শ্যামল, স্বপন, গোপাল ও আশিষ উঠল। গাড়ি ছুটল নিমতার দিকে। থামল নিমতার আলিপুর মোড়ে। সেখানে অন্ধকারে একটা পুলিশের ভ্যান দাঁড়িয়েছিল।

শ্যামলদের গাড়িটা আলিপুর মোড়ে দাঁড়াতে ওরা সবাই একে একে নামল। অন্ধকার ফুঁড়ে নিমতার পুলিশ বাহিনী ওদের গাড়িটা ঘিরে ধরল। শ্যামলরা সরে গেল। পুলিশ একমাত্র আশিষকে নিয়ে ভ্যানে তুলল। মাতাল আশিষ ব্যাপারটা কী হতে যাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারল না। শ্যামলরা তাদের গাড়িটা নিয়ে চলে গেল। ওরা জানে, আশিষের সঙ্গে ওদের আর কখনও দেখা হবে না। সেটাই ইউনিসের ইচ্ছা!

সেই ইচ্ছাই পূরণ হল। রাত বারোটা। কুয়াশা ঢাকা আলিপুর মোড়ে নর্দমার পাশে

গুলিবিদ্ধ আশিষের লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেল। তার কিছুক্ষণ পর নিমতা থানা থেকে ঘটা করে একটা ভ্যান এল। সঙ্গে স্থানীয় কিছু লোকজন। থানার লোক আশিষকে ভ্যানে তুলে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে এল। ডাক্তাররা আর কী পরীক্ষা করবে? জীবন থাকলে তো তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। মৃতকে বাঁচিয়ে তোলার বিদ্যা তাদের আয়ত্তে ছিল না। লাশ পোস্টমর্টেমে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ঠিক যে ভাবে আশিষ অনেককে পাঠিয়েছে, সেইভাবেই।

বন্ধুত্ব করে নিজ স্থানে ডেকে নিয়ে এসে খুন করার কায়দাকে সমাজবিরোধীরা বলে 'বৈঠকবাজি' বা বৈঠকিবাজি। যে বৈঠকবাজির কায়দা সে তার চ্যালাদের শিখিয়ে বিশ পঁচিশ জনকে খুন করিয়েছে, সেই একই কায়দা তার শিষ্যরা তার ওপর প্রয়োগ করে তাকে খুন করল! এটাই নিয়ম, এটাই পেশাদার খুনীদের পরিণতি।

আশিষের মৃত্যুতে তার স্ত্রী বেবি ছাড়া আর কেউ ব্যথিত হয়েছিল কি না জানা নেই। হওয়ার কোনও কথা নয়। সেই বেবি আশিষের মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিল এবং খালি হাতে ফিরে এসেছিল। এমন কি মৃত্যুর সময় আশিষের কাছে যে আট হাজার টাকা, ঘড়ি, আংটি ও সোনার একটা 'চেন ছিল তাও তারা ফেরত দিতে অস্বীকার করল। আইনত করতেই পারে। বেবির কাছে তো এমন কোনও প্রমাণপত্র ছিল না যে সে আশিষের স্ত্রী। তাছাড়া নিহত ব্যক্তির জিনিসপত্র ফেরত পাওয়ার কোনও আদালতের নির্দেশও তার কাছে ছিল না।

বেবি এল আমাদের কাছে। আশিষকে যখন গ্রেফতার করি, তখনও সে আসত। এবার এল অন্য কারণে। এল নিমতা থানা থেকে মৃত আশিষের জিনিসগুলো ফেরত পেতে। আশিষ বহু টাকা রোজগার করে টাকায় উড়লেও বেবি কিন্তু টাকার ছোঁয়াচ পায়নি। সে যেমন গরীব ছিল, তেমনই রয়ে গেছিল। বেবির কথা শুনে, তার মানবিক কারণটা অনুভব করে, আমরা আশিষের জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি যাতে সে ফেরত পায় সেজন্য তদ্বির করলাম।

আমাদের এক সময়কার ডি সি সফি সাহেব তখন ছিলেন প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের ডি আই জি। আমরা বেবিকে দিয়ে একটা দরখাস্ত লেখালাম। তারপর আমাদের অফিসার রাজকুমার চট্টোপাধ্যায় বেবিকে নিয়ে গেল সফি সাহেবের কাছে। সফি সাহেব সব শুনে বেবির দরখাস্তের ওপর আর্জি পূরণের বিবেচনার জন্য লিখে দিলেন এবং এস. পি., ডি এস পি ও ওই এলাকার সার্কেল ইন্সপেক্টরকে ফোন করে আশিষের জিনিসগুলো বেবিকে ফেরত দেওয়ার জন্য বলে দিলেন।

বেবি পরদিনই নিমতা থানার থেকে জিনিসগুলো ফেরত পেলেও পুরো টাকাটা ফেরত পায়নি। সেই টাকায় বেবির কত দিন চলবে? চলে না। বেবিরা তাই অসহায় হয়ে সমাজের দুয়ারে মাথা খোঁড়ে। সমাজ তাদের ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু বেবিদের দোষ কী? তারা দুষ্কৃতীদের স্বামী হিসাবে গ্রহণ করেছিল, এটাই তো? এটা হয়তো তাদের অপরিণত বুদ্ধির দোষ, কিন্তু যে সমাজের কোলে, যে সমাজের নায়কেরা এই দুষ্কৃতীদের জন্ম দেয় এবং লালন পালন করে, তাদের কোনও দোষ নেই? কে দেবে তাদের শাস্তি, কে দেবে?

# লেখক পরিচিতি

জন্ম ১৯৩৪ সালের ২৪ শে অক্টোবর, জান সৎকালীন করদ রাজ্য কোচবিহারের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে। ওপার বাংলার ময়মনসিংহ জেলা থেকে তাঁর পূর্বপুরুষ আসেন কোচবিহারে। বাবা ছিলেন কোচবিহার আদালতের উচ্চপদস্থ অফিসার। জেকিন্‌স স্কুল থেকে পাশ করে ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে স্নাতক। সেই সময়েই খেলাধুলোয়, বিশেষ করে ফুটবলে সুনাম অর্জন করেন। কর্মজীবন শুরু চা বাগানের চাকরি দিয়ে। তারপর কলকাতা পুলিশে। সেখানে অসাধারণ কর্মদক্ষতায় সাব- ইন্সপেক্টর পদ থেকে উন্নীত হয়ে ১৯৯২ সালের শেষে ডেপুটি কমিশনার হিসাবে অবসর গ্রহণ। বৈচিত্রময় কর্মজীবনে সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে তো বটেই, বিহার, ওড়িশা, পঞ্জাব, দিল্লি সহ অন্যান্য রাজ্য সরকার ও সি.বি.আই., কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অজস্রবার পুরস্কৃত ও প্রশংসিত। যা কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে বিরল। তাছাড়া ধারাবাহিক সাফল্য ও সাহসিকতার জন্য ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক প্রাপ্তি।